গণেশ টাওয়ার

এই লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য বই

রাইনের নীল চোখে (উপন্যাস)

রোদ ওঠার আগে (,,)

নায়িকা পরিক্রমা (,,)

অতএব ব্যক্তিগত (,,)

অন্বেষণ (,,)

প্যারাসাইট (,,)

আমরা সবাই ব্যস্ত (নাটক)

গণেশ টাওয়ার

শ্রীআদিত্য সেন

দরবারী উদ্যোগ
গঙ্গানগর : ২৪ পরগনা (উত্তর)

পরিবেশক
এন. পি. সেলস্ (প্রাঃ) লিঃ
১০৮, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

গণেশ টাওয়ার

GANESH TOWER

a Bengali novel by Sri Aditya Sen

প্রকাশক ও মুদ্রক

দরবারী উদ্যোগ

গঙ্গানগর

২৪ পরগনা (উ)

প্রচ্ছদ

বিদ্যা অশোক

পরিবেশক

এন. পি. সেলস্ (প্রাঃ) লিঃ

১০৮, বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

এবং

নয়া প্রকাশ ঃ কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ISBN 81-85169-19-5

মুখবন্ধ

সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নামে আজকাল সর্বত্র 'কিং-মেকার'-দেরই প্রভাব ও প্রতিপত্তি। পুরন্দরে পরাঞ্জপে তাঁদেরই প্রতিনিধি। কিং-মেকাররা দেশের বৃহত্তর কল্যাণের নামে বিপুল কর্মকাণ্ডের নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেন। তাতে দেশের প্রকৃত উন্নতি কতটুকু হয়, বলা শক্ত। এঁরাই ছলে-বলে-কৌশলে অপ্রয়োজনীয় কাজকে প্রকৃত কাজ বলে চালাতে চান। এঁদের কথায় ও কাজে এমন একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, পাবলিক সেক্টরের মাধ্যমে দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রচেষ্টাকে তখন একান্তই অপব্যয় বলে মনে হয়।

ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। পাবলিক সেক্টর গড়ে তুলে দেশে সমাজবাদ হয়ত আমরা আনতে পারিনি। ওটা আনতে গেলে গোটা সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। তবু, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল, এর মধ্যে সমাজব্যবস্থায় যেটুকু পরিবর্তন আনা সম্ভবপর, তার চিত্র আমি গঙ্গাধর ও মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জীর মাধ্যমে ফোটাতে চেষ্টা করেছি। যাঁরা সুখ ও আয়াস বিসর্জন দিয়ে, ভয়ংকর বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে লড়াই করে দেশ গড়ার কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের কাজের গভীর তাৎপর্য 'গণেশ টাওয়ার' উপন্যাসের মাধ্যমে আমি তুলে ধরেছি। ভবিষ্যতে কোন গঙ্গাধরকেই আমরা হয়ত মনে রাখব না। এ উপন্যাস তাঁদের রেখাচিত্র বলে গণ্য হবে।

'গণেশ টাওয়ার' সমস্ত ভারতবর্ষের বর্তমান ছবি। বিশেষ কোন ঘটনার পেছনে না ছুটে ঘটনার গতিকে কতকগুলো রেখায় ফুটিয়ে তুলে এক বিশেষ সময়কে গণেশ টাওয়ারে রূপ দিতে চেয়েছি। পরাঞ্জপের মহাযজ্ঞে প্রকৃত কর্মী বিপন্ন বোধ করেন। এঁদের মধ্যে পড়েন গঙ্গাধর, চন্দ্রভানুর মতন চরিত্র। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে যেতে তাঁরা থমকে দাঁড়ান। তাঁরাও ধ্যানস্থ মানুষ, তাই পথভ্রষ্ট হন না। কিন্তু যে পথে এগিয়ে যাওয়া উচিত, সেই পথ উপেক্ষিত হয়ে পড়ে থাকে।

বলা বাহুল্য, এ উপন্যাসের সব চরিত্রই কাল্পনিক। চরিত্র সৃষ্টির মূল রহস্য যাঁরা জানেন, তাঁরা নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন, অনেকগুলো অবস্থা ও পরিবেশ, অনেক পরিচিত-অপরিচিত মানুষের সমন্বয়ে এক একটি চরিত্র গড়ে ওঠে। কাল্পনিক নানা চরিত্রের মাধ্যমে আমি এক একটা বিশেষ অবস্থা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। যদি কেউ তার সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পান তবে তা নেহাতই কাকতালীয়।

এ উপন্যাস লিখতে পাবলিক সেক্টরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বহু গুণিজন ও বিশেষজ্ঞের সাহায্য পেয়েছি। তাঁরা আমার ধন্যবাদার্হ। এ উপন্যাস লিখতে গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ও স্থাপত্য সংক্রান্ত নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। এতে অনেক স্থপতি ও ইঞ্জিনিয়ার-দেরই সাহায্য পেয়েছি। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই আমেরিকা-বাসী ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ দত্ত ও তাঁর স্ত্রী রানী দত্তের কথা। গূঢ় ইঞ্জি-নিয়ারিং সমস্যা সমাধানের জন্যে এঁদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। 'বেদ পরিষদের' উদ্যোক্তা ও সাধারণ সম্পাদক বিভাকর ভট্টাচার্য অতি ধৈর্যসহকারে গোটা পাণ্ডুলিপির খসড়া শুনে তাঁর মূল্যবান মতামত দিয়ে আমাকে উৎসাহিত ও সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। আমার বহু পুরাতন বন্ধুবর নিতাই চট্টোপাধ্যায় শুধু যে পাণ্ডুলিপির সম্পাদনা করেছেন তাই নয়, প্রকাশনার ব্যাপারে বহু-মূল্য সাহায্য করে প্রকৃত বন্ধুত্বের মর্যাদা রেখেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে চাই না। 'নয়া প্রকাশের' অধ্যক্ষ বারীন্দ্র মিত্র এ উপন্যাস প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আগামী দিনের লেখকদের বিকাশের যে গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন, তা অতুলনীয়। তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ না জানালে আমার মুখবন্ধ অপূর্ণ থেকে যায়। এছাড়া যাঁরা পর্দার আড়ালে রয়ে গেলেন, তাঁদেরও আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নতুন দিল্লী

আদিত্য সেন

আমার শ্রদ্ধেয় মা ও বাবা

৺ননীবালা দেবী ও ৺দুর্জয় সিংহ সেনগুপ্ত-এর

স্মরণে

॥ এক ॥

তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে গণেশকে বেছে নেবার অভিনব অবদানের জন্য সমাজরক্ষক ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শস্বরূপ পুরন্দরে পরাঞ্জপে সেবার পদ্মশ্রী পেয়েছিলেন। চারিদিকেই তখন গণেশায়ঃ নমঃ রব। যেন সাত শেয়ালের এক রা। যেন দেশে গণেশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বড় আকারে হাতে নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় নেতা সবাই যেমন হতে পারে না, ওটা শক্তিবিশেষ, তেমনি সব দেবদেবীর ন্যাশন্যাল ফিগার হবার হক্ বা শক্তি নেই। দেখা গেল সব ড্রইংরুমেই গণেশের একটি মূর্তি সাজিয়ে রাখার ধুম পড়ে গেছে; যেন ভারতবর্ষের মাটিতে নতুন কোন গণ-দেবতার বীজ পড়ল। চিঠিপত্রে লেখা হতে লাগল, গণেশায়ঃ নমঃ। সন্তোষীমার মতই 'গণেশ কথা' খুব জোর বিকোতে লাগল। সারা দেশে দরিদ্রদের জন্য বিশসূত্রী কার্যক্রমের সার্থক রূপায়ণে দেখা গেল ভুঁড়িওয়ালা গণেশই সবচেয়ে অ্যাকটিভ্। শুরু শুরুতে জনগণ অত সাড়া দিত না; কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল জনগণও, 'গণেশায়ঃ নমঃ' বলতে বলতে প্রজেক্টগুলোকে অমানুষিক বেগে রূপ দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। গণেশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দু-বছরের মধ্যে দেশের জাতীয় আয় ত বাড়লই দেখা গেল, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠ্ছে। পরাঞ্জপে তখন কয়েকটি জাতীয় সভা ডেকে গণেশ উপাসনার সুফল ব্যাখ্যা করতে থাকলেন।

গণ ঈশঃ অর্থাৎ গণদের রাজা। গণেশ আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা হবে; যারা অভুক্ত, তারা এবার খেতে পাবে। দারিদ্র্যের মাপকাঠির নীচে যারা পড়ে আছে, দেবতার কল্যাণে তারা এবার দারিদ্র্য সীমার ওপরে উঠ্বে। লোকেরাও সেটা বিশ্বাস করতে লাগল, বার বার একটা কথা রোজ বলতে থাকলে একদিন বিশ্বাস হবেই। দ্বিতীয় গণেশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে পরাঞ্জপের মাথায় আইডিয়াটা এসে গেছে, দেশে একটা বিরাট গণেশ টাওয়ার খাড়া করতে হবে, যা পৃথিবীর

মধ্যে অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হবে। গণেশ শুধু ত দেবতা নন, শুধু জন্তু-জানোয়ার, তাই বা কি করে বলা যায়; যারা শুধু পেট পুজো করে, তারাও গণেশকে খুব একটা উপেক্ষার চোখে দেখে না, বা দেখবে না; গণেশ প্রতিষ্ঠা হলে বরং উদার হাতে অর্থ দেবে। যেহেতু গণ ঈশঃ, তাই লেফট্‌টিস্টরাও খুব একটা বিরোধিতা করতে পারবে না, কারণ এটা তাদেরই কথা যে গণেশ একটা ট্রাইব্যাল ফর্ম এবং গণেশ কোন একটা ট্রাইব্যাল জাতির টোটেম্। অন্য রাজনৈতিক দলেরাও হয়ত ওজর-আপত্তি তুলবে না। পরাঞ্জপে ভাবলেন কাজে নামার আগে নানা দিক ভেবে দেখা দরকার; সমর্থনের ওপরেই সফলতা নির্ভর করছে। কাজে নেমে সাফল্য কে না চায়?

তাছাড়া দেশের সংহতি ও ঐক্য নিয়ে যা সমস্যা, আঞ্চলিকতাবাদ যেভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে -বিভেদমূলক শক্তি যেরকমভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠ্‌ছে --সর্বজনগ্রাহ্য কোন দেবতাকে ন্যাশনাল ফিগার না করতে পারলে দেশকে শক্তিশালী করা খুবই শক্ত। গণদেবতাকে যদি ভোট-ব্যাঙ্কে রূপান্তরিত করা যায় তাহলে আখেরে গদিটা টাল্‌মাটাল হলেও সামলান সহজ হবে। জনগণের পুজো পেতে পেতে যদি একদিন গণদেবতা জেগে যান, জাগ্রত বিগ্রহ, জাগ্রত চেতনা নিয়ে আসেন—তবে এ প্রচেষ্টার আন্ত-র্জাতিক স্বীকৃতিও অসম্ভব নয়। দেশবাসী কোন পুজোর দেবতা পেলে যেমন পাগলের মত ছুটোছুটি করে এবং মৃত্যুকেও তুচ্ছ করে দর্শন-স্পর্শনের জন্য জীবনটাকে পর্যন্ত পণ করে দেয়—ওরকম কিছু সিমবল্ যতদিন ন্যাশনাল ইন্‌ট্রিগ্রেশনের মূলকথা না হয়ে উঠ্‌ছে ততদিন দেশটাকে এক করা যাবে না। মাইনরিটি কমিউনিটির কাছে রাম গ্রহণযোগ্য না হলেও এ ট্রাইব্যাল ফর্ম, যা গণেশ টাওয়ার হিসেবে রূপ নিচ্ছে- তাতে নিশ্চয় এদের একটা আপত্তি হবে না।

পরাঞ্জপে ওপর মহলে প্রস্তাবটা দেবার সময় টেগোরের একটা কোটেশন্ জুড়ে দিলেন ঃ

—আনিলাম
অপরিচিতের নাম ধরণীতে
পরিচিত জনতার সরণীতে
আমি আগন্তুক,
আমি 'জনগণেশের' প্রচণ্ড কৌতুক।
খোলো দ্বার,
বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।

দু-হাত দিয়ে নীল আকাশ ছুঁতে চাওয়ার মতই কাণ্ড; দু-হাত কেন অনেক

হাত। গগনচুম্বী তেইশ-তলা গণেশ টাওয়ার খাড়া করা হচ্ছে দিল্লীর রামলীলা গ্রাউণ্ডে। আজ তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেল। দিল্লী শহরে যেন উৎসব পড়ে গেছে--নানা লোকের নানা কথা।

--গণেশ টাওয়ার কে খাড়া করছে রে? দেখ্ গিয়ে এও নিশ্চয় কোন সি.আই.এ-র ফানডিং। আজকাল কিছুই বলা যায় না। সংস্কৃতির নামে কে যে কোথা থেকে কি যে হাসিল করে নিচ্ছে! এসব প্রশ্নের উত্তর কারুর জানা নেই। অন্যজন বলল--উত্তর ভারতের দেবতা ত বজরংবালী --হনুমান্, যিনি সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে গিয়েছিলেন এক লাফে। পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছিল তার তোড়ে আর সমুদ্র তোলপাড় হয়ে উঠেছিল। পবননন্দনকে যদি তোমরা না চাও, আছেন মা-দুর্গা, সারা উত্তর ভারতের দুর্গা-মাইকী জয়। ভগবতী-জাগরণ! তা না, হঠাৎ দক্ষিণা-মহারাষ্ট্র থেকে রাজধানীতে গণেশ আসছেন উড়ে এসে জুড়ে বসতে? ব্যাপারটা কি বলত?

একটা উত্তর এবার পাওয়া গেল। একজন বিজ্ঞের মত জবাব দিলো— সহজ কথা সহজভাবে নিতে শেখো, বুঝলে হে—গণেশ যে গণদেবতা। দেবতা ত অনেক হাজার বছর ধরে পুজো খেলেন, মানুষের কিছু উন্নতি হল? এবার আসছেন মানুষের দেবতা—তিনি পুজো পেলে প্রসাদটা ডাইরেক্টলি পাঁচার করে দেবেন মানুষের কোঁচড়ে। গণদেবতা একবার জাগলে দেশ সমৃদ্ধ হবে, আর্ট-কালচার সব তরতর করে বেড়ে যাবে আর বিশ্বে ভারতের আদর ও সম্মান বাড়বে।

রামলীলা গ্রাউণ্ডে বিশাল সামিয়ানা টানানো হয়েছে, মাইকের পর মাইক। কাতারে কাতারে লোক আসছে। আজমেরী গেট থেকে, আসফ আলি রোড দিয়ে, তুর্কমান্ গেটের দিক থেকে, রঞ্জিত সিং মার্গের ব্রিজ দিয়ে; ওদিকে চাঁদনী চক্, রেড ফোর্ট দিয়ে দরিয়াগঞ্জ হয়ে অসংখ্য মানুষ আসছে রামলীলা গ্রাউণ্ডে।

ভিড়ের মধ্যে একদল রিটায়ার্ড লোক নানা গল্প করতে করতে রামলীলার দিকে একসঙ্গে যেন স্বাস্থ্য-চর্চা করতে চলেছেন। বেড়াবার সময় এঁরা নানা উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দেন। একজন বললেন--১৯২০-২১ সালের মধ্যে অহিংস ধর্ম, যা অসহযোগ আন্দোলন হিসেবে রূপ নিল, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এটি গান্ধীজী রাজনীতির অস্ত্র হিসেবে চালু করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে দেশটা নানা ধর্মযুদ্ধে জয়ী হয়ে একেবারে ডেমোক্রেটিক হয়ে গেল। এখন ত ধর্মনিরপেক্ষ? তবে এখন কেন গণেশ টাওয়ার নিয়ে

এত মাতামাতি ? অন্যজন বোধ হয় কোন রিটায়ার ডেপুটী সেক্রেটারী, সেরকম বিজ্ঞের মতই কথা বলছিলেন, বললেন—কার সঙ্গে কার যোগ-সাজসে এক হাত অন্যের হাত ধরে কত অদৃশ্য হাতে গণেশ টাওয়ার শহরের বুকে খাড়া হয়, ওসব সোশিও-ইকনমিক্, অত কথার কি প্রয়োজন ? কার কত ডালপালা গজাচ্ছে তার হিসেব নিতে গেলেই বিপদ। তুমি গণেশ দেখতে চলেছ, চলই না। অন্যজন সংশোধন করলেন--আজকে কিন্তু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, গণেশ উঠ্‌বেন অনেক পরে। তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—ঐ হল। বীজ পুঁতলেই গাছ।

জাফর মার্গের দিকে রীতিমত জ্যাম। বাসগুলো সবুজ আলো পেয়ে এখন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে--যাত্রীদের জন্য থামবে কি না তা ড্রাইভারই জানে। যাত্রীরা হাত তুলে ড্রাইভারের করুণার প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে। তারই ফাঁক দিয়ে কত লোক যে বেরিয়ে গেল--গাড়ি-ঘোড়া, অ্যাম্‌ব্যাসেডর, মারুতি, ম্যাটা-ডোর, ফট্‌ফটিয়া, স্কুটার আর মানুষজন। মেঘলা আকাশ। হাওয়া দিয়েছে। লোকগুলোর মুখে এতক্ষণ সূর্যের আলো পড়ছিল, এখন মেঘের ছায়া।

হুজুগেরও বলিহারি। গণেশ টাওয়ার বলতে এখনও কিছুই নয়। কথাটা উপরের মহলে চাউর হবার সঙ্গে সঙ্গে গণেশ টাওয়ারে অফিস করার জন্য বড় বড় চাঁইয়েরা উঠে পড়ে লেগেছে। হিন্দুস্থান কমপিউটার টুয়েন্টি ফাস্ট সেনচুরির দিকে তাকিয়ে সবচেয়ে আগে অ্যাপ্লিকেশন্ ছেড়েছে গণেশ ফাউণ্ডেশনের কাছে। এছাড়া বেশ কটা অন্য সরকারী প্রতিষ্ঠানও। প্ল্যানিং কমিশনের কাজকর্মের ডালপালা ত বেড়েই চলেছে--জনগণের আরও বৃহত্তর কল্যাণসাধনে তারাও একটা ইউনিট্ গণেশের পাদদেশে খুলতে চায়। বিলাস কলা আকাডেমি আর্ট গ্যালারী ও মিউজিয়ামের জন্য এখানে মস্ত বড় জায়গা চাইছে। গণেশের বাহন ইঁদুর—নৃত্যরত গণেশ কত উঁচু হবেন এখনও ঠিক হয়নি, সেটা ঠিক করবেন বিদেশী এক্সপার্টরা ; তবে প্রাথমিক আলোচনায় যা ঠিক হয়েছে ৭৫ ফুট উঁচু ত হবেই। যদি তাই হয় তবে তাঁর বাহন ইঁদুর না জানি কত বিশাল হবে। বিলাস কলা আকাডেমির আব্দার শুনলেও হাসি পায়, তাঁরা নাকি আগামী দশ বছরে এত কাজের প্ল্যান করেছেন যে তাঁদের আবার ইঁদুরের ঘরটাই চাই। তাঁরা অবশ্য বলছেন ঠিকই, গণেশ টাওয়ারের পাশেই ইঁদুর-ঘর হবে এবং তাতেই থাকবে বেশীর ভাগ অফিস, হল ঘর সেমিনার রুম, অডিটরিয়াম। তাঁরাই ঠিক কথা বলছেন, ইঁদুরের ঘর ছাড়া অর্থাৎ বাহন ছাড়া বড় কাজ করা নাকি অসম্ভব।

বিরোধী দলগুলো যেমন বড় কিছু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যাপার হতে

দেখলেই সরষের মধ্যে ভূত দেখতে পান, তেমনি এতে তাঁরা বিদেশী কোন এজেন্সী বা মাল্‌টিন্যাশনালের গন্ধ পেয়ে পার্লামেন্টে প্রশ্ন রাখলেন—গণেশ টাওয়ার ব্যাপারটা কি? এতগুলো টাওয়ারে কি শানাচ্ছে না? আবার গণেশকে নৃত্যরত করে টাওয়ার গড়ে না তুললেই কি নয়? গণেশ টাওয়ার ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার আর একটি মোক্ষম প্ল্যান—সেই 'বল্‌ক্যালাই-জেশন'-এর ভয়ংকর একটা প্রজেক্ট। বাইরে থেকে কয়েক কোটি টাকা আসছে কি না? কারা দিচ্ছে, কারা পাচ্ছে এই টাকা—অ্যাঁ? ভারতকে দ্বিখণ্ডিত না করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর যেন ঘুম আসছে না! যেখানে যাও—সেখানে ঐ কয়েক কোটি টাকার খেল্‌। অপজিশন তাই গণেশ টাওয়ারের প্রতিবাদে পার্লামেন্টে সোচ্চার হলেন। কিন্তু ব্যুরোক্র্যাট-দের উদাসীন দৃষ্টিতে সরকারের হাত-পা বাঁধা। তাঁরাই নিশ্চয় উত্তরটা লিখলেন; পরাঞ্জপে তাঁর বিশাল হাত বাড়িয়ে ততদিনে এঁদের অনেককেই বন্ধু করে নিয়েছেন। তাঁদের লেখা উত্তরটাই মন্ত্রীমহোদয় পার্লামেন্টে নিজের বলে চালালেন—দেশে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রসার হোক, এটা সরকার চান। গণেশ টাওয়ার প্রাইভেট সেক্টরের সর্বশেষ একটি অভিনব সাংস্কৃতিক প্রকল্প। এতে সরকার বাধা দিতে পারেন না। যা কিছু হচ্ছে 'ল' অনুসারেই হচ্ছে।

হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছেন গণেশ টাওয়ারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা দেখতে। কাগজে কাগজে, রেডিও-টেলিভিশনে কদিন ধরেই প্রচার করা হচ্ছিল, কখনও কোন আর্টিকেল্‌ মারফৎ, কখনও বা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে। মাইকের পর মাইক—স্বাধীন ভারতের স্বাধীনতাপ্রিয় অগণিত পুলিশ। রাস্তাঘাটে ভি.আই.পি. গাড়ী-ঘোড়া ছাড়া আসা-যাওয়া বন্ধ। প্রধানমন্ত্রী এলেন। গণেশ টাওয়ার ফাউণ্ডেশনের মাথারা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কারা করছেন এই সর্বশেষ সাংস্কৃতিক উপনয়ন—কিছুই বোঝা না গেলেও মাইক থেকে ভেসে এল প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ—ভারতবর্ষ বিশ্বে শান্তি চায়, আপনারা সবাই তা জানেন। ভারত ধীরে ধীরে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে উঠ্‌ছে। বিশ্বশান্তির দূত হতে গেলে শক্তি-শালী হয়ে ওঠা খুবই দরকার। ভারত কিছুটা বলে-বীর্যে শক্তিমান হয়ে উঠেছে বলে সবাই তার শান্তি ও কৃষ্টির বাণী আগের চেয়ে অনেক বেশী শুনছে। ভারত এখন শান্তির কথা বললে আজ আর কেউ ঠাট্টা করে না। আরও শক্তিশালী হলে দেখবেন একদিন তার শান্তির প্রয়াসে অনেক বেশী দেশ শরীক হতে চাইছে—তখন দেখবেন ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনেকে অনুসরণ করতে চাইছে। তার প্রথম পাঠ শুরু হয়ে গেছে—গণেশ টাওয়ার

সেই পদক্ষেপের একটি অন্যতম নিদর্শন। আপনারা জানেন, গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা বর্তমান বিশ্বশান্তির সবচেয়ে ধারাল অস্ত্র। চার দশকের ঘটনা ঘাঁটলে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গণেশ টাওয়ার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতিভূ হয়ে উঠুক। বিশ্বে নিরস্ত্রীকরণ আনুক। এখানে পৃথিবীর জাঁদরেল স্থপতিরা, শিল্পীরা ও বিশেষজ্ঞরা সমবেত হয়েছেন। তাঁরা একটা নতুন ইতিহাস রচনা করবেন বলে উদ্‌গ্রীব—আমরা শুধু তার সুযোগ করে দিচ্ছি। গণেশ টাওয়ার পৃথিবীর দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠুক, তেইশ-তলা গণেশ টাওয়ার প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগের অত্যাশ্চর্য নিদর্শন হয়ে উঠুক। জয় হিন্দ্।

গঙ্গাধর চ্যাটার্জী ও-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর গাড়ী আটকে দেওয়া হল। অগত্যা কি হচ্ছে দেখবার জন্যে তিনি রামলীলা ময়দানে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণও তাঁর কর্ণগোচর হল। তিনি একটু পরেই উঠে চলে এলেন, বললেন—কী যা-তা সব বলছে! গাড়িতে এসে উঠ্‌লেন। চিরকাল পাবলিক সেক্টরের প্রডাক্‌টিভিটি বাড়াতে জীবনপাত করেছেন—সংস্কৃতির নামে এসব ফার্‌স্ তাঁর পছন্দ হবে কেন? ভাবলেন, কোথায় যেন প্রায়রিটির গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। তার মানে দেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে আবার কোথায় যেন থেমে যাচ্ছে, নয়ত দেশের কী এই হাল হতে পারে? এত করাপশন্ বাড়তে পারে?

বাড়িতে ফিরে গম্ভীর হয়ে স্বরাজ পালের এস্‌কর্ট ও ডি.সি.এম-এর ১৩ কোটি টাকার শেয়ার কেনার ইন্‌টারেস্টিং বৃত্তান্ত পড়ছিলেন 'ইণ্ডিয়া টুডে'তে। দুটো স্থায়ী কোম্পানীর ঝুঁটি ধরে টানাটানি করার ছলা-কৌশলটা তাঁর পছন্দ হল না। সেকথাই বলছিলেন মৈত্রেয়ীকে—একটা রিপোর্টে দেখনি বিদেশে নন্-রেসিডেন্টদের হাতে ২০ হাজার কোটি টাকা পড়ে আছে। হেল্ অব্ এ লট্ অব্ মানি। টাকাগুলো দেশে এলে খুবই ভাল হত। কিন্তু শুরুতেই ব্যক্তিগত স্বার্থের ইন্‌ডালজেন্স, মনে হচ্ছে এরা কেউ টাকাটা কাজে লাগাতে পারবে না!

মৈত্রেয়ী হেসে বললেন—চাইলেই পারত। কেউ চাইছে না বলেই পারবে না। সবাই ত আর তোমার মত নয়। পাগলের মত চিরকাল কাজ করলে। বললে তুমি ত রাগ কর। নিজের কথা না ভেবে এভাবে কাজ কেউ করে? আজ যে তোমার শরীর-স্বাস্থ্য সব ভেঙেছে, এর মূলে কি তোমার পরিবার? দুঃখ হয় যখন ভাবি। যেটুকু তুমি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে বা এগিয়ে নিয়ে যাবার আদর্শ রেখেছিলে, সেটুকু থাকে কি না দেখ।

গঙ্গাধর বাধা দিলেন। মৈত্রেয়ী, থাক ওসব কথা। কি হল বা কি হবে সেকথা কোনদিন ভাবিনি। কাজ করে গেছি। আজকাল অবশ্য একটু ভাবি। ভাবি মানে, দেখে-শুনে চিন্তা হয়। দুশ্চিন্তাও বলতে পার। শুনেছ, শহরে একটা গণেশ টাওয়ার হচ্ছে!

—হ্যাঁ, কাগজে দেখছিলাম, কারা করছে?

—জানি না, তবে দেখে এলাম, মানে দেখতে বাধ্য হলাম। তেইশ-তলা গণেশ টাওয়ারের শিলান্যাস করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। অ্যাপারেন্টলি খুব অ্যাম্‌বিশাস্‌ প্ল্যান। সামনে থাকবে ড্যানসিং গণেশ, পেছনে ইঁদুর-ঘরে নানারকম অফিস, অডিটরিয়াম, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, সেমিনার রুম—আরও কত কি! তবে কারা পেছনে আছে সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

—যার চোখের পলকে জগৎ নাচে—তিনি নিশ্চয়।

—জানি না। নর্‌ অ্যাম্‌ আই ইন্‌টারেস্টেড্‌ টু নো। বড় আজে-বাজে কাজে আমরা আজকাল সময়ের অপব্যয় করি, ভাবলে কষ্ট হয়।

—ভবিষ্যতে কত টাওয়ার হবে দেখবে। টাওয়ারে উঠে বসার সুবিধে বুঝতে পারছ ত? জনগণ থেকে প্রথমত অনেক দূরে থাকা যায় আর আশেপাশের লোকগুলোকে বড় ছোট দেখায়। টাওয়ারে যাদের জায়গা হল না—তাদেরই বিপদ।

গঙ্গাধর একটু চুপ করে থেকে কথাটা তলিয়ে দেখতে চাইলেন। মুখে সারা জীবনের অভিজ্ঞতা যেন ছল্‌কে উঠল। বললেন—দেশটা এগোতে এগোতে যখন কোন পিছুটানে সাড়া দেয়, তখনই হয় মুশকিল। শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি, এমন কি টেক্‌নলজি বা নো-হাউয়ের মধ্যে যখন রাজনীতির পাশাখেলা শুরু হয়ে যায়—তখনই ভাবনার কথা। তখন বোঝা যায় না কোন্‌টা সংস্কৃতি আর কোন্‌টা রাজনীতি।

মৈত্রেয়ী চুপ করে রইলেন। গঙ্গাধর বুঝতে পারলেন না মৈত্রেয়ী কথাটা শুনে কোন পুরনো কথা ভাবছে কি না বা কথাটার গভীর অর্থ যাচাই করতে চুপ করে গেল কি না। ফ্যাক্টরিতে যখন কোন সমস্যা হত, তখনও তিনি সমস্যার কথাটা আগে মৈত্রেয়ীকে জানাতেন। গভীর কোন টেক্‌নিক্যাল সমস্যা হলেও মৈত্রেয়ীর সঙ্গে আলোচনা করতেন। মৈত্রেয়ী যদি বলতেন—আমি কি অত সব ইঞ্জিনীয়ারীং সমস্যা বুঝি? আমি লে-ম্যান। তখন তিনি অধৈর্য হয়ে উঠ্‌তেন। বলতেন—কেন, তোমাকে ত সেদিন ব্যাপারটা বোঝালাম, ফ্যাক্‌টরিতে নিয়ে গিয়েও বুঝিয়েছি, তখন ত তুমি বলেছ বুঝেছি, তবে? যেন পৃথিবীতে এমন কোন ব্যাপার থাকতে পারে না যা মৈত্রেয়ী জানেন না, বা বোঝেন না, বা যা বুঝতে তাঁর অসুবিধা হয়। বুঝতে দেরী

হচ্ছে জানলেও গঙ্গাধর মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে পড়তেন--যা তিনি করেন, ভাবেন, মৈত্রেয়ীরও তা যেন করা উচিত, ভাবা উচিত। কিন্তু আজকে মৈত্রেয়ী কি ভাবছেন তা জানার আগ্রহ থাকলেও নিজের কথাই বলে গেলেন তিনি। হয়ত মনটা খারাপ ছিল, কিংবা মনে একটা ব্যথার বোঝা--যা তিনি হালকা করতে চান তাঁর চল্লিশ বছরের সঙ্গীর কাছে।

মৈত্রেয়ী তখনও চুপ করে ছিলেন। তিনি সেই মানুষটিকে বুঝতে পারেন যিনি সারা জীবন ভেবেছেন আমাদের দেশ কেন টেক্‌নলজিতে পিছিয়ে থাকবে, কেন চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজে নেমে পড়বে না? জান, আমাদের ইঞ্জিনীয়ার, আমাদের বিজ্ঞানী, আমাদের কারিগর কারুর চেয়ে কিছু কম নয়, দে আর নো বেটার অর নো ওয়ার্স্ দ্যান্ আদার্স্। এটা আমি দেখেছি, আর আমাদের কর্মীদের ও শ্রমিকদের সম্পর্কে আমার সবচেয়ে বড় ভরসা। মৈত্রেয়ী এসব ভেবেই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, গঙ্গাধরের কথাটার পুনরাবৃত্তি করে বললেন--মনে আবার নেই, তোমার জীবনেই আমি দেখেছি রাজনীতির পাশাখেলা কাকে বলে। ক্যাবিনেট্ সেক্রেটারিয়েট তোমার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পদ অনুমোদন করা সত্ত্বেও যখন সেই অর্ডার পালটে গিয়েছিল, মনে আছে সে কথা? তুমি ত কাজ নিয়ে পাগল, ফ্যাক্টরির প্রডাক্‌টিভিটি কোথায় তুলে নিয়ে গেলে, অথচ দিল্লীর রাজনীতির শিকার হয়ে তখন তুমি পাঁচ বছর স্ট্রেট্ লাইনে মাইনে ড্র করছ। পাঁচশো টাকা স্পেশাল্ পে দেবার কথা ছিল, সেকথা মনে করিয়ে দিলে তুমি বলতে--দেখ মৈত্রেয়ী, আমরা ত আর না-খেয়ে নেই। ওরা যদি ভুলে গিয়ে থাকে, ভুলে যেতে দাও। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সেল মাই সোল ফর এ প্যল্‌ট্রি সাম্ অব ফাইভ্ হান্‌ড্রেড্ রুপিস। তোমার কি খুব অসুবিধা হচ্ছে? আমি সর্বদাই হেসে জবাব দিয়েছি--না, অভাব বোধটা ত মনে।

--থাক, ওসব পুরনো কথা, মৈত্রেয়ী। আমি একজন সাধারণ কর্মী। নিজের কথা খুব একটা ভাবি না। তবে একটা কথা আজকাল ভাবি, যা-কিছু চোখে দেখছ সেটা যে রিয়েলিটি, তা নয়। তাই যা স্পষ্ট নয়, বা চোখে পড়ছে না সেটা বার করাই বিশেষজ্ঞদের কাজ। অনেক সময় দেখবে জার্নালিস্টরাও সোশিওলজিস্ট হয়ে উঠ্‌ছে, কন্‌ক্রিট কিছু না করেও তাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের কদরও বেড়ে যাচ্ছে। ধর, প্রধানমন্ত্রী রাজস্থান ঘুরে এলেন, গরীব লোকেদের প্রকৃত অবস্থাটা যাচাই করে এলেন। যা তাঁকে বলা হল, তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে তার মধ্যে গালগল্পই বেশী। কাজের নামে যখন অকাজ এভাবে বাড়ে তখন গদি বা চাকরী বাঁচাতে যা করা হয়

বা বলা হয়--তার মধ্যে বিরাট একটা গ্যাপ্ থেকে যেতে বাধ্য।

গঙ্গাধরের কথাটা শুনে মৈত্রেয়ীর কৌতূহলটা যেন আবার বেড়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন--এত দেবতা থাকতে এরা গণেশকেই বা রাজধানীতে টেনে আনছে কেন? এ দেশের দেবতা বজরংবালী অর্থাৎ হনুমান্। গোটা পাঞ্জাবে শিখরা ছাড়া হিন্দুরা মা-দুর্গাকে মানে, ওদের কাছে কালকামাই। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটকের লোকেরা আমাদের দুর্গা পুজোর মতই নানা গণেশ মূর্তি বানিয়ে মহাসমারোহে পুজো করে। যতদূর মনে পড়ে গঙ্গাধর তিলক স্বদেশী ভাব ও ভাবনা জাগাতে ১৮৮৫ সালে মহারাষ্ট্রে গণেশ পুজো বহুলভাবে প্রচার করেন। তিনি এ পুজোর সূচনা করেছিলেন পুণেতে। তারপর থেকে গণেশ-চতুর্থী দশদিনব্যাপী মহা-উৎসব। মাদুরাইতে মীনাক্ষী মন্দিরে দেখেছি গণেশের বিরাট পাথরের মূর্তি যা মূল মন্দিরের বাইরে, পুজো কিন্তু তিনিই সবার আগে পান। মহীশূরেও ছড়িয়ে আছে গণেশের নানা স্কাল্প্চার। যেমন, হামপীর হাজার রাম মন্দিরে গণপতি, হালেবিদেও। গোয়ালিয়রে আছে, লক্ষ্নৌতে আছে। বাংলায় গণেশের বিশেষ স্থাপত্যকীর্তি নেই তবে নেপালে মহাকাল মন্দিরে আছে। হঠাৎ এখানে দিল্লীতে গণেশকে উঠিয়ে আনার পেছনে রাজনৈতিক কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, ভেবে দেখেছ?

গঙ্গাধর এই কারণে স্ত্রীকে এত এড্ম্যায়ার করেন। কোথায় কোথায় গণেশ আছে তা তিনি ভাবেননি, তবে গণেশ টাওয়ার নিয়ে এই মুহূর্তে ভাবছেন না, ভাবছিলেন দেশের অবস্থা নিয়ে, তাই বললেন--গণেশের ব্যাপারটা জানি না। গণেশ পুজো কবে থেকে শুরু হল তাও আমার ধারণার বাইরে। তবে টাওয়ার ব্যাপারটা জানি, টাওয়ারে বসে কারখানা চালানোর ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে অনেকবার ঘটেছে। বোর্ডের মিটিং-এ কিছু পাশ করান যে কি দুরূহ ব্যাপার তা ত তুমি জান, টাওয়ারে থাকে বলেই এরা কারখানা বা প্রডাক্শন্ কোন্ রীতিতে চলে বোঝে না।

মৈত্রেয়ী একটু হাসলেন--ঠিক বলেছ, আগে সম্রাটদের লাগত দুর্গ, এখন বোধ হয় নেতাদের লাগে টাওয়ার। দুর্গ বা টাওয়ার সুরক্ষিত, ফাঁকিটা সহজে ধরা পড়ে না।

গঙ্গাধর বললেন--ওরকম কিছু উদ্দেশ্য হবে বোধ হয়। আমাদের মত লোকেদের আজকাল বেঁচে থাকাই মুশকিল। সারাক্ষণ অতীত নিয়ে আর কি থাকা যায়? তাই যা-কিছু দেখছি নিজেকে বড় আলাদা মনে হয়। কারুর সঙ্গে মিশতে ইচ্ছে করে না। বড় এলিনিয়েটেড্ ফিল্ করি। তোমারও নিশ্চয় অনেকটা তাই। ছেলেটাও বাইরে বাইরে থাকে, তাই

আমাদের আর যেন সময় কাটতে চায় না। 'লিভিং পাস্ট' নিয়েই আমাদের ঘর।

—ও কথা বলছ কেন? এখনও তুমি দশ-বারো ঘণ্টা কাজ কর—কি, কর না?

—তা করি, ওটা অভ্যাস, তাই।

মৈত্রেয়ী বললেন—সন্দীপ ফোন করেছিল বিকেলে।

—কবে আসছে?

—পরশু।

—পরশু আসবে? ভেরী গুড। গঙ্গাধরের মুখে তৃপ্তির এক টুকরো আলো এসে পড়ল। মৈত্রেয়ীর তা নজর এড়ায় না।

—চল, খেতে ডাকছে, ধীরেন।

—হ্যাঁ, চল। খিদে নেই। খুব লাইট্ কিছু খাব।

—তোমার প্রিয় ডিশ্ করেছি আজকে। বল ত কি?

—মাছ পাতুড়ি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে খিদে আছে কি না খাওয়ার টেবিলে ভাবব।

মৈত্রেয়ী হেসে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

॥ দুই ॥

গঙ্গাধর চ্যাটার্জী এককালে নিশ্চয় সুপুরুষ ছিলেন। সাহেবদের মত লাল টক্‌টকে রং; সে রং এখন তামাটে। মাথা ভরা চুল, এখন শুধু টাক। তীক্ষ্ণ চোখ। দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যে বয়সের ছাপ পড়েনি। মুখের ডান দিকে একটা আঁচিল। চিবুকে কাঠিন্য; সারা মুখের ব্যক্তিত্ব যেন ধরা আছে তাতে।

সকাল আটটার মধ্যেই চিরকাল দাড়ি কামান, স্নান সারা। এখনও

তাই। সকাল নটার মধ্যেই ঝাড়ুদারদের কাজ শেষ হবার আগেই অফিসে ঢুকতেন। চারিদিকের দরজা-জানলা খোলা থাকত। চারিদিকের আলোয় আলোকিত হয়ে তিনি দু-চোখ খুলে রাখতেন। দেখতেন, কে কখন আসছে। লোকেরা বলত—ওয়াচডগ, 'বাংলার বাঘ'।

দশটার মধ্যে কারখানার নানা ওয়ার্কশপে একবার ঘুরে আসতেন। শপ্-ইন্-চার্জের সঙ্গে নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেন, কোথায় কি সমস্যা দেখা দিল, কি জন্য কাজ আটকে যাচ্ছে—সব ব্যাপারটা যেন তাঁর নখদর্পণে। প্রত্যেক শপের সামনে একটা ব্ল্যাক-বোর্ড রাখা থাকত। নির্দেশটা তাঁরই। প্রতিদিন তিনি সেখানে প্রত্যেক শপ্-এর সমস্যা ও তার সমাধান লিখে রাখতেন; উৎপাদন টারগেটও। দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে কিন্তু বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারদের কারুরই তখনও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা বা সাহস হয়নি। সব কারখানাতেই লাল-মুখো সাহেব, কন্‌সাল্‌টেন্ট। তাদের মোটা মাইনে; যখন-তখন আসে, হচ্ছে-হবে করে, কাউকে মন খুলে শেখায় না। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা তাদের ওপরে নির্ভরশীল, যেটুকু তারা বদান্যতা দেখায়, সেটুকুই কাজ এগোয়। কেউ ভরসা দেয় না, সাহস দেয় না—বলে না, তোমরা পারবে, তোমরা করে যাও। আকারে-ইঙ্গিতে উল্টোটাই বলে।

গঙ্গাধর পাঁচ-দশজন ইঞ্জিনীয়ারকে পালা করে ডেকে নিয়ে আসতেন নিজের বাড়িতে; রাত্রিবেলা তাদের খাইয়ে-দাইয়ে খুব করে বোঝাতেন, কখনও বা ধমক দিতেন, বলতেন—লজ্জা করে না, এখনও প্রতি ব্যাপারে তোমরা সাহেব, সাহেব কর আর সেজেগুজে ঘুরে বেড়াও। তোমরা কেন পারবে না? ওদের চেয়ে তোমরা কিসে কম? কি নেই তোমাদের? ওদের কি এক একটা শিং গজিয়েছে? বল, চুপ করে আছ কেন, জবাব দাও। তবে হ্যাঁ, যা আমি দেখি, ওদের আত্মবিশ্বাস আছে, তোমাদের সেটা নেই। তবে খোঁজ নিয়ে দেখ, দেখবে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে তোমাদের পাল্লা ভারী। তোমরা মেসিন বানাতে গিয়ে, এক-একটা পীস বানাতে গিয়ে ন-বার ভুল কর—আমি কিছু বলব না, মেনে নেব। কিন্তু দশবারের বার আমার ফাইনাল্ প্রডাক্‌ট চাই। ওরা কিভাবে কাজ করে দেখবে; ওরা কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয়, লক্ষ্য করবে; ওরা কিভাবে আত্মবিশ্বাসে ভর দিয়ে দাঁড়ায়, অনুভব করবে—তারপরে কাজে নামবে। ভুল করলে আমি তোমাদের বাহবা দেব না, কিন্তু নতুন কিছু করতে পারলে, আই উইল স্ট্যাণ্ড্ বাই ইউ। এভাবে বুঝিয়ে-সুজিয়ে, সাহস দিয়ে তিনি তাদের আত্মমর্যাদা শেখাতেন, তাদের ভরসা দিতেন, তাদের দিয়ে প্রটোটাইপ্ মেশিন তৈরী

করাতেন।

কন্‌সাল্‌টেন্ট সাহেবরা সব নিয়মের বাইরে ; তাদের জন্য নিয়মকানুন করতে কেউ সাহস পায় না। তাই তারা নানা অন্যায়-আব্দার করেও সব সময় পার পেয়ে যেত। ভারতের সরকারী কারখানাগুলো তখন যেন লাল-মুখোদের মামাবাড়ি।

গঙ্গাধর এদের কাজকর্ম, এদের আউটপুট্ দেখে-শুনে, লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত নিলেন--এটা বন্ধ হওয়া দরকার। ওরা কন্‌সাল্‌টেন্ট হলেও ওরা আমাদেরই নিয়মাধীন। আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা যদি সময়মত আসে, ওরাও আসবে না কেন? দেরীতে আসার জন্য আমাদের ইঞ্জিনীয়ারদের জবাবদিহি করতে হয়--ওদেরও করা উচিত।

গঙ্গাধর এবার তাঁর স্ট্রাটেজী একটু পালটে ফেললেন। যখন-তখন তিনি শপে যেতে লাগলেন। সওয়া একটায় বাড়িতে আসেন--সিঁড়ির কাছ থেকেই বলে ওঠেন--খাবার। টেবিলে এসে সুকতো, চচ্চড়ি, তরকারী আর মাছের ঝোল সব একসঙ্গে মেখে এক গ্রাসে খেয়ে ওঠেন।

মৈত্রেয়ী বাধা দেন--তুমি যদি এভাবে খাও, তোমার যে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাবে। যদি দেড়টার মধ্যে যেতে চাও, তবে আসতে সওয়া একটা বাজে কেন--ঠিক একটাতেই আসতে পার ত!

--কিছু পেন্‌ডিং কাজ ছিল, দেরী হয়ে গেল।

--রোজই কি তোমার পেন্‌ডিং কেস থাকে? আর তার ফলে ডাল-ভাত-চচ্চড়ি বা মাছ সব তোমার কাছে এক গ্রাস? শরীরে কি এতটা সইবে?

তিনি কোন উত্তর দেন না। তাঁর যে হাতে সময় নেই--সাহেবদের ওপরে এই অন্ধ-নির্ভরতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব, এই হীনমন্য-দাসসুলভ মনোভাব কাটিয়ে উঠতেই হবে। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের গড়ে তোলার তিনি যে ব্রত নিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করতে চান এরা কারুর চেয়ে কিছু কম নয়। তাতে যদি জীবন যায়, নিজের শরীর নিপাত হয়—হোক। তবুও ত সেটা দেশের বড় কাজ।

নতুন একটা মেসিন তৈরী হলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেন--সাদা চামড়া ছাড়াই আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা এটা করেছে। যখন দেখলেন, ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা বেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং সাহেবদের ছাড়াই তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছে, ভুল করেও ভুলটা সংশোধন করে নিতে পারছে তখন গর্বে তাঁর বুকটা ফুলে উঠত। তাঁর কাজের ধারা, অ্যাটিটিউড্‌ও পালটে গেল। সাহেবরা তখন কিছু অভিযোগ নিয়ে এলেও তিনি তাদের

কথা শুনতেন না, বরং অন্য কোন পয়েন্ট তুলে সাহেবদের সামনেই ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের প্রশংসা করতেন। সাহেবদের জানান দরকার কোথায় ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা ভাল করছে, তা তিনি সব জানেন। এটা সাহেবদের চোখে ভাল ঠেকছে না, তাও তিনি লক্ষ্য করতেন।

এরকম একটা পারস্পরিক উত্তেজনার অবস্থায় তিনি একটা অর্ডার বার করলেন--সবাই, এমন কি সাহেবরাও রোজ সময়মত আসবে এবং হাজিরা খাতায় সই করবে। তিনি নিজেও তা করছেন।

অপমানে জ্বলে উঠলেন কন্‌সাল্‌টেন্ট-ইন্‌-চার্জ মিঃ স্টুয়ার্ট। ছুটে এলেন গঙ্গাধরের ঘরে, সঙ্গে অন্য সবাই।

মিঃ স্টুয়ার্ট খুব ঠাণ্ডা মেজাজে একটু হেসে বললেন—আপনার সর্বশেষ অর্ডারটা দেখলাম।

গঙ্গাধর বললেন--আশা করি এতে আপনাদের সম্মতি আছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা সব কাজের লোক, কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

--বাট্‌ মিঃ চ্যাটার্জী, উই হ্যাভ নেভার ডান্‌ দ্যাট। হাউ কুড্‌ উই ডু ইট্‌ নাও ?

—দেন্‌ ইউ উইল পাঞ্চ কার্ডস্‌। বুঝিয়ে দিলেন, তোমাদের আমি চিনি, তোমরা এখানে এসে সব এক্সপার্ট হয়ে গেছ, কিন্তু বিলেতে তোমরা অনেকেই কার্ড পাঞ্চ কর।

মিঃ স্টুয়ার্ট গর্জে উঠলেন--আপনি এটা করতে পারেন না। গঙ্গাধরের দৃপ্ত উত্তর--জেন্টলম্যেন, মাই অর্ডার স্ট্যাণ্ডস্‌। ততদিনে তিনি আরও কঠিন হাতে হাল ধরেছেন। যারা শৃঙ্খলা ভাঙছে, কাজ করছে না, মদ খেয়ে ওয়ার্কারদের গলা জড়িয়ে ড্রেনে পড়ে থাকছে, ড্রাঙ্কার্ড হিসেবে তিনি সার্টিফিকেট্‌ দিতে বলছেন ডাক্তারকে--কিংবা যে-কাজে তাদের এখানে নিয়ে আসা, তা তারা কতটা করছে--তার হিসেব চাইছেন ঘনঘন ; ঠিকমত কেউ জবাব না দিয়ে, যারা অবাধ্যের মত শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে যাচ্ছে, তাদের তিনি সব একে একে ফেরৎ পাঠাতে লাগলেন। ফ্যাক্টরিতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। বাকি সবাই সুড়সুড় করে খাতা সই করতে লাগল। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা এতদিনে বুঝল, গঙ্গাধরবাবু শুধু মুখেই সাহস দেখান না, কাজেও সাহস দেখাতে জানেন। তাঁর মনের জোর দেখে বিস্ময়ে হতবাক্‌। তারা দেখল শুধু তিনি তাদের ওপরেই কঠিন নন, সাহেবদেরও এক কথায় ফেরৎ পাঠাবার হিম্মত রাখেন। রীতিমত বাঘের বাচ্চা।

পাবলিক সেক্টর সম্বন্ধে সকালের কাগজে একটা খবর বেরিয়েছিল। কিছু একটা গাফিলতি পেলেই কাগজগুলোও সেটা খুব ফলাও করে ছাপে।

খবরটা পড়তে পড়তেই অতীতের কতগুলো দৃশ্য মনে ভেসে উঠেছিল।

ঘরের সঙ্গে গঙ্গাধরের লাগোয়া অফিস। তিনটে বড় ফার্মের তিনি এখন কন্‌সাল্‌টেন্ট। সকালে কাগজের নীচের দিকে প্রধানমন্ত্রীর বয়ান বেশ বড় অক্ষরে ছেপেছে—পাবলিক সেক্টর ইউনিট্‌স্‌ মাস্ট বী স্ট্রীম-লাইন্‌ড। কথাটা পড়েই ভাবলেন, স্ট্রীমলাইন্‌ড কারা করবে, শুনি? কাজ করলে, ঠিকমত কাজ করাতে পারলে তবে ত স্ট্রীমলাইন্‌ড হবে। এ নিয়ে তিনি যে ফিজিবিলিটি রিপোর্টটা লিখেছেন, তার ভূমিকাটা আর একবার পড়ে নিলেন। অন্য লীড আর্টিকলের হেডিং—চলতি বছরের শেষে আমদানীর পরিমাণ এক হাজার কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে। গঙ্গাধর মাথা নেড়ে সায় দিলেন—তার মানে এতে তাঁর অতটা অসম্মতি নেই। ভাবলেন, দেশের উন্নতির সূচনায় এটা না করে হয়ত উপায় নেই। কিন্তু লীড্‌ আর্টিকলের বক্তব্য প'ড়ে তিনি যেন একটু চিন্তায় পড়লেন—এতটা আমদানী সত্ত্বেও দেশের শিল্প-উৎপাদন বাড়াতে নাকি সেটা খুব একটা সহায়ক হচ্ছে না। গঙ্গাধরের ভ্রূ কোঁচকাল, মনে মনে বললেন—'ডিসম্যাল্‌'। গলদটা কোথায় কেউ না বলে দিলেও তিনি যেন স্পষ্ট দেখতে পান। আগেও কাজ করার সময় দেখেছেন অফিসারদের কোন ড্যাইন্যামিজম্‌ নেই। প্রতিটি কাজ, দেশের কাজ—এটা ভাবতে পারার লোক খুব কম। কেউ স্বপ্ন দেখতে জানে না, দূরেরটা একটু ভেবে দেখে না, নিজের চাহিদা ও অক্ষমতাটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। আজকাল নাকি বেশীর ভাগ অফিসার শুধু নিজেদের কথাটাই ভাবেন, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কি করে সুবিধে আদায় করবেন, বা বিদেশে ঘুরে আসবেন, সেই এক চিন্তা! শ্রমিকদের বা কর্মীদের অন্যায়-আব্দারও তাঁরা মেনে নিতে রাজী—কেন না, তাঁরা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকতে চান না, দে ওয়ান্ট টু বাই পীস্‌। তাই বলে ভয় পাব? কর্মীদের অন্যায়-আব্দার মেনে নেব? রিডিক্যুলাস্‌। ছেলেমেয়ে বিদেশে পড়লেই কি মানুষ হয়ে যাবে? অ্যাবসার্ড। তাছাড়া গদিতে বসে ঝোঁটিয়ে সব নিজেদের কথা ভাবব এবং আশা করব কর্মীরা সব আমার কথায় উঠ্‌বে-বসবে, এই বা কিরকম যুক্তি? তা কখনও হয়? কর্মীরা সব টের পায়, সব জানে, কার স্বভাব কিরকম, কার স্বার্থ কোনদিকে, কে কার মুখে ঝাল খায়। তাদের ফাঁকি দেওয়া ভারী মুশকিল। আজকাল সবচেয়ে যেটা অভাব—প্রত্যেক কাজে প্রচুর ওভারল্যাপিং হচ্ছে, কারুর সঙ্গে কারুর কো-অরডিনেশন নেই। এবিষয়ে চিরকাল তাঁর কড়া নজর ছিল।

মনে পড়ে গেল দুর্গাপুরের কারখানার কাজ যখন কিছুতেই এগোচ্ছে না, দিল্লীর সঙ্গে রীতিমত লড়াই করে গঙ্গাধর একজন সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট

ইঞ্জিনীয়ারের পদ সৃষ্টি করেছিলেন। সারা জীবনে যেসব সরকারী প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন, এটা গঙ্গাধরের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান। সেই ফ্যাক্টরিতে কাজ করার লোক যে কম ছিল তা মোটেই নয়; কিন্তু যেসব অফিসার শুধু সরকারী চাকরী করে তাদের দ্বারা আর যাই হোক কো-অরডিনেশনের কাজ হয় না। যাদের কাজের কোন স্পৃহা নেই, গোটা ফ্যাক্টরির প্রডাক্টিভিটি বাড়াবার তাগিদ নেই, শেখার কোন আগ্রহ নেই, অভারঅল্ পারস্পেক্টিভ নেই, তাদের ওপরে আর যাই হোক, ফ্যাক্টরির ভবিষ্যৎ সঁপে দেওয়া যায় না, তাদের দিয়ে স্বপ্ন গড়া যায় না। রবি বা সুখেন্দুকে নিয়ে সবচেয়ে যেটা অসুবিধা ওরা বড় বেশী 'সরকারী' দৃষ্টি নিয়ে চলে এবং কাজের কথা বললে মাথায় যেন বাজ পড়ে। গঙ্গাধর ভাবলেন, এরাই ব্যুরোক্র্যাসির বেড়াজাল ফ্যাক্টরির চারপাশে নিয়ে আসে আর সেই জালে নিজেদের জড়িয়ে জবুথবু হয়ে বসে থাকে। যারা নিজেরাই নড়তে চড়তে পারে না তারা অন্যদের পথ দেখাবে কি করে? এদের এমনভাবে চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে হবে যাতে কর্মীরাও কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। রবি বা সুখেন্দুর আর একটা দোষ, যেটুকু বলা হল, সেটুকুই করবে। যেটুকু বলা হল না, সেটা পড়ে থাকে। কোন ফলো-অ্যাপ্ অ্যাকশন্ নেই। তাই তিনি অধর লাহিড়ীকে আনিয়েছেন, বয়স চল্লিশের বেশী হবে না। হালকা ছিম্ছাম্ চেহারা বলেই বোধ হয় এত কাজের।

দিন পঁচিশের মধ্যে বোর্ডের মিটিং। ফ্যাক্টরির যাবতীয় সমস্যা, ব্যয়বরাদ্দ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার নানা বিষয়ে নানা আলোচনার পরে বোর্ড যা অনুমোদন করবে সেটাই রূপায়িত হবে। বাকিগুলো পড়ে থাকবে। গঙ্গাধরের এমনও হয়েছে ছত্রিশটা আইটেম্ রেখেছেন—তার মধ্যে বোর্ড দশটা পাশ করল। কিন্তু তিনি নিরাশ হতেন না। জানতেন এই ব্যুরোক্র্যাসির বাঁধাধরা নিয়মে যখন তাঁকে এগোতে হবে, জোঁকের মত লেগে থাকা ছাড়া অন্য পথ নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা বিষয়ে বোর্ডের মিটিং-এ জোর দিতেন ঠিকই কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশ না হলে পরবর্তী মিটিং-এ একই বিষয় অন্যভাবে, অন্য ভাষায় পেশ করে তাকে পাশ করিয়ে নিতেন। তাই আসন্ন বোর্ডের মিটিং নিয়েই তিনি তখন ভীষণ ব্যস্ত। এজেণ্ডা নোট্স্ তৈরী করতে দিয়েছেন দু-জনকে—রবি রায় ও সুখেন্দু বিশ্বাসকে। এতদিন পরেও এরা দু-জনে গঙ্গাধরের কাজের নমুনা এখনও কিছুই ধরতে পারেনি। তিনি যে ফ্যাক্টরির সম্প্রসারণের কথা ভাবছেন, প্রজেক্ট-বহির্ভূত কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা কর্মীদের দেবার কথা চিন্তা করছেন, এদের কাছে তার একটা রূপরেখা বলে দেখেছেন, কাজ হয় না।

সুতরাং গঙ্গাধরের নিজের ওপরে খুব চাপ পড়েছে, নিজেই সেসব বসে বসে করেন, বাড়ি ফিরতে আটটা-নটা হয়ে যায়, খাবার কথাও মনে থাকে না। এদের বোঝাবার বিড়ম্বনার চেয়ে নিজে করা অনেক ভাল। ভারতবর্ষকে গড়ার কাজে যাদের ডাক পড়েছে, তারা কি কম ভাগ্যবান? কাজকর্মের মধ্যে সেটা দেখতে পারলে নতুন হোরাইজন্ খুলবে, এদের সেকথা বললে এরা হাঁ করে শোনে, কোন ভাবান্তর হয় না, যেন সরকারী কাজে এসব ভাবা মহাপাপ!

গঙ্গাধর ঘরে রবি বা সুখেন্দুকেই আশা করেছিলেন কিন্তু চোখ তুলে দেখেন সামনে দাঁড়িয়ে আছেন নতুন সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার অধর লাহিড়ী।

--বলুন।

--সামনে বোর্ড মিটিং-এর জন্য কিছু এজেণ্ডা নোট্‌স্ তৈরী করেছি। কালকে জয়েন করার পরে আমাকেই সে-কাজটা করতে বলা হল।

গঙ্গাধর বুঝে নিলেন কে বা কারা একে এজেণ্ডা নোট্‌স্ তৈরী করতে বলেছে। বললেন--দেখি, বসুন।

অধর লাহিড়ীর বুক কাঁপছিল। জীবনে এজেণ্ডা নোট্‌স্ তৈরী করেননি। আগে ছিলেন সি, পি, ডবলিউ, ডি-তে--পনেরো বছর। সেখানে একেবারে অন্য ধরনের কাজ। এখানকার মত ম্যানেজিং ডাইরেক্‌টরের ঘরে দ্বিতীয় দিনের দিন এজেণ্ডা নোট্‌স্ নিয়ে আসতে হয়নি কোন কালে! গঙ্গাধর-বাবুকে এখনও ভাল করে চেনেন না, এক্সপ্যান্‌শনের যেসব কথা তিনি ভাবছেন, সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়নি। এঁর মনে আরও কি স্বপ্ন আছে তার কিছু আভাসও অধর পাননি। এসব বিষয়ে খুঁটিয়ে কাউকে যে জিজ্ঞেস করবেন, তারও উপায় নেই; রবিবাবু বা সুখেন্দুবাবু সেরকম একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ মোটেই করেননি। রবিবাবু ফাইলটা সামনে তুলে ধরে বলেছিলেন--বোর্ড মিটিং, তার এজেণ্ডা নোট্‌স্ তৈরী করুন। অধর একবার বলেছিলেন--কিছুই যে আমি জানি না, একটু বলে-টলে দিন। --কেন, আমাকে জিজ্ঞেস করে কি এখানে জয়েন করেছেন? ম্যানেজিং ডাইরেক্‌টরের সঙ্গে সরাসরি আপনার যোগাযোগ থাকবে, তাঁর সঙ্গেই আপনার কাজ। এগিয়ে যাবার খুব চান্স, মশায়। বলে দু-জনেই বিশ্রীভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি ছড়িয়েছিলেন। হাসি থামিয়ে এবার গম্ভীর হয়ে রবিবাবু বললেন--তবে একটা কথা বলতে পারি, এখানে এতদিন কাজ করে যা বুঝেছি, এম.ডি. আমাদের ভয়ানক ডাইন্যামিক মানুষ। ঝড় নিয়ে এসে সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চান, তখন সরকারী পাকা

খুঁটি কষে ধরে থাকতে হয়, নয়ত কোথায় যে ভেসে যাবেন, টেরও পাবেন না। অবশ্য কদিনের মধ্যে নিজেই টের পাবেন সেই ঝড়ের তোড় কতটা—রোগা মানুষ, উড়তে অসুবিধা হবে না বলেই মনে হয়।

রাত জেগে পুরনো ফাইলপত্র ঘেঁটে গঙ্গাধর যা চান বা প্ল্যান করছেন বা ভাবছেন এবং যে আইটেম্গুলো বারবার বোর্ডের মিটিং-এ পেশ করা সত্ত্বেও যা পাশ হচ্ছে না সেইসব ভেবে ভেবে এবং তার সঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা জুড়ে এজেণ্ডা নোট্স্ তৈরী করেছেন। অধর ভাবলেন, দেখাই যাক না, কি হয়, দক্ষ অফিসার হিসেবেই তাঁর সুনাম ছিল।

প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গঙ্গাধরের দিকে তাকিয়ে এসব কথাই ভাবছিলেন অধর। এ যে ভয়ানক কাজের মানুষ তা ত সহকর্মীদের অ্যাটিটিউড্ দেখেই টের পেয়েছেন অধর। এত কাজ করতে হয় বলেই তারা যেন সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ জানায়। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এমন সুপুরুষ মানুষও তিনি সচরাচর দেখেননি। মনে পড়ে গেল প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারের কথা। আমেদাবাদের ইণ্ডিয়ান ইন্স্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের গেস্ট হাউসে শুনলেন গঙ্গাধর এসেছেন, সঙ্গে স্ত্রী মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জী। বিকেলবেলা অধর টেনিস খেলছিলেন, এক সহকর্মী বললেন—ঐ দেখুন কে এসেছেন? আপনার ফিউচার বস্। মন দিয়ে আপনার খেলা দেখছেন। অর্ধপথে খেলা শেষ করে অধর এগিয়ে এলেন, বললেন—আমার নাম অধর লাহিড়ী, আমিই সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে আপনার ওখানে কাজ করতে যাচ্ছি।

মাথাটা একটু নাড়িয়ে প্রতি নমস্কারের ভঙ্গীতে গঙ্গাধর আলাপ করিয়ে দিলেন মৈত্রেয়ীর সঙ্গে। —এই আমাদের নতুন এস, ই,—কদিন বাদেই ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছেন। হ্যাঁ, কবে জয়েন করতে পারবেন?

—দেখি, অফিস কবে ছাড়ে?

—হোপ্ ইউ উইল বি এব্ল্ টু জয়েন আস ইন্ ফিফটিন্ ডেজ—অনেক কাজ জমে আছে।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি কি ফ্যামিলি ম্যান?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা উনি এলে কোন্ কোয়াটারটা দেবে? ছয় নম্বরটা দিলে কেমন হয়?

—আগে আসুন ত। আবার বললেন—কাম্ আর্লি।

প্রথম সাক্ষাতেই কোন্ কোয়াটারটা দেবে? অদ্ভুত সপ্রতিভ মহিলা ত। কথায় বুদ্ধির ছাপ, আচরণে মাতৃসুলভ। মৈত্রেয়ীকে দেখেও কম অভিভূত

হননি অধর।

জয়েনিং রিপোর্ট দিয়ে প্রথম যখন গঙ্গাধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, ভূমিকা না করেই তিনি বলেছিলেন—আপনাকে প্রজেক্টগুলোর রূপায়ণ দেখা, ফ্যাক্টরি এক্সপ্যানশন আর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ কো-অর্ডিনেশন সেটাও দেখতে হবে। মাথা নেড়ে ঘরে ফিরে এসেছিলেন অধর। বেশ চিন্তায় পড়লেন, ভাবলেন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে প্রজেক্ট দেখার কাজ না হয় ঠিক আছে, কিন্তু কো-অর্ডিনেশনের কাজ ত ভারী শক্ত। সেটাও দেখতে হবে? আগে ত·সে কথা বলেননি! ভাবতে ভাবতে পনেরো মিনিট কেটেছে কি-না সন্দেহ—সঙ্গে সঙ্গে টাইপ-করা একটি অফিসিয়্যাল্ চিঠি। যা মুখে বলেছেন, সব ডিটেল্‌সে লেখা এই চিঠিতে। অধরের তখন একবার মনে হয়েছিল এই ডাইন্যামিক মানুষটার সঙ্গে তাল রাখা কি তার পক্ষে সম্ভব হবে? পনেরো গিনিট যেতে না যেতেই ডিটেল্‌স চিঠি—ওরে বাবাঃ, এই প্রতিষ্ঠানের ডিসিশন্-মেকিং-এর যদি এই স্পীড্ হয়, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারা যাবে ত? এতদিন সরকারী চাকরী করেছেন অধর, কোনদিন এরকমটা দেখেননি। এক নিমেষের জন্যে মনে হয়েছিল ভারতবর্ষে এই গড়ে তোলার সময়ে যদি দশটা-পনেরোটা এরকম মানুষ থাকত, তবে ভারতের চেহারাই পালটে যেত।

এজেণ্ডা নোট্‌স্‌টা খুব মন দিয়ে দেখছিলেন গঙ্গাধর। তখনও বুক কাঁপছে। কিছুই বলছেন না। এত দেখবার কি আছে? অধর ভাবলেন, কিছুই নিশ্চয় হয়নি। আর এক্ষুণি সে কথাই শুনতে হবে, তার জন্যেই নিজের মনকে শক্ত করছিলেন অধর। একবার গোটা জিনিসটাকে পড়ে নিয়ে উল্টে-পাল্টে কি যেন সব দেখলেন, তারপর হঠাৎ অধর দেখলেন, কলমটা নিয়ে কি যেন সব কারেক্ট করলেন। মুখ তুলে অধরকে যেন একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বললেন—আপনি আগের বোর্ড মিটিং-এর যে রেফারেন্সটা দিয়েছেন, তার এক্সসার্পট কোট-আনকোট করে তুলে দিন। বলে নিজেই লিখে ডট্ ডট্ করে ছেড়ে দিলেন।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অধর। জীবনে এত বড় বিজয়ের আনন্দ বোধ হয় আর কখনও পাননি। যেন একটা দশমণি বোঝা ঘাড় থেকে নেমে গেল। ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন অধর, ডাক দিলেন গঙ্গাধর।

অধর একটু থমকে দাঁড়ালেন, সঙ্কুচিত পায়ে গঙ্গাধরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবলেন, আবার কি হল? কিছু ভুল রয়ে গেছে না কি?

গঙ্গাধর সেটা লক্ষ্য করেই আশ্বাস দিলেন—আপনার প্রথম এক্সাসাইজ

বেশ ভাল হয়েছে। গো এহেড্। আপনাকে আরও একটা কথা বলা দরকার, আপনি যখন কাজ করতে এত আগ্রহী---বসুন। অধর বসলেন। গঙ্গাধর অনেকটা স্বাভাবিক স্বরে জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা এই অনুসন্ধিৎসু ইঞ্জিনীয়ারকে উপহার দিতে চান, তাই বললেন---আমরা যারা ইঞ্জিনীয়ার, আমাদের কি মুশকিল জানেন? আমরা অনেক কিছু ভাবি কিন্তু ঠিকমত প্রকাশ করতে পারি না, মুখে বা কাগজে। অথচ ভেবে দেখুন আমরা চাই, আমরা যা করতে চাইছি অন্যরা বুঝুক---না বুঝলে, আমাদেরই ক্ষতি। যদি ঠিকমত বোঝাতে না পারি আমরা কি করতে চাই, আমাদের কাজের কেউ মূল্য দেবে না। বোর্ড মিটিং-এ তখন ত শুধু মাথা ঠুকতে হবে। আমি বহু চেষ্টায় যা আয়ত্ত করার চেষ্টা করছি তার সিক্রেট্টা আপনাকে বলছি। এমনভাবে প্রকাশ করা চাই যাতে বোর্ডের সামনে মূল বক্তব্যটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, কারণ ধরে নিতে হবে, যা আপনি বলতে চাইছেন সে সম্পর্কে বোর্ডের মেম্বাররা কিছুই জানেন না। এটা যদি মনে রাখেন, দেখবেন কাজ করতে কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

অধর মন দিয়ে শুনছিলেন, ভাবলেন, মানুষটা শুধু যে কাজ পাগল তাই নয়, কিভাবে কাজ করলে সুফল পাওয়া যায় সেদিকেও তীক্ষ্ণ নজর। এঁর কাছে কাজ শেখাও একটা অভিজ্ঞতা। জীবনে এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে। এসব ভেবে কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে ওঠে অধরের। একটা তৃপ্তির ভাব নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বাস্তবিক অধরের মত অফিসার দুর্লভ। ভেঙে পিটিয়ে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন তাঁকে। দেখা হ ্লই সে কথা বলেন। হয়ত মৈত্রেয়ীর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু পেয়েছেন। টেক্‌নিক্যাল ট্রেনিং স্কুল গড়ে তোলা, ক্যানটিন সামলান, স্কুলটা চলছে কি না দেখা---যাবতীয় কাজে মৈত্রেয়ীকে নিঃশব্দে সাহায্য করতেন। চার দেয়ালের মধ্যে গঙ্গাধর যেসব স্বপ্ন দেখে-ছিলেন, জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সেই স্বপ্নের অনেকটাই রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন অধর। অধর জানতেন, বাধাবিঘ্ন ত আছেই কিন্তু সেই বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠেই আমাদের এগোতে হবে।

ধীরেন এক কাপ চা দিয়ে গেল। সকাল দশটা বেজে দশ মিনিট। অচলার কোন সময় জ্ঞান নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু অধৈর্য হলেন গঙ্গাধর। ফিজিবিলিটি রিপোর্টটা টাইপ করাতে হবে। অফিসে যখন কাজ করতেন, দু-জন পি, এ, ঝড়ের মত কাজ করেও গঙ্গাধরের সঙ্গে তাল রাখতে পারত না। এখন রিটায়ারমেন্টের পরে বাঙালী মেয়েটিকে নেহাৎ সাহায্য করতেই রেখেছেন। ভাল ডিক্টেশন নিতে পারে না; অজস্র ভুল

করে। ডিকশনারি খুলে দেখে না। তাই গঙ্গাধর নিজের হাতেই বেশীর ভাগ রিপোর্ট গুলো লেখেন। শেখার আগ্রহ এতটুকু নেই। বাট্ সী মাস্ট লার্ন্। ধৈর্য ধরে আছেন, শেখার সুযোগ দিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেকটি লোক যদি ঠিক-মত নিজের কাজটা নিষ্ঠার সঙ্গে করত দেশের চেহারাটাই পালটে যেত।

অচলা এল সাড়ে দশটার সময়। তিনি একবার তাকালেন। টেবিলে এসে বসলেন। কোন রকম বিরক্তি প্রকাশ না করে বললেন—তুমি আগে এটা টাইপ করে ফেল। ট্রাই টু কাম ইন্ টাইম্।

ঘাবড়ে গিয়ে নিজের সাফাই গাইল অচলা, বলল—মার অসুখ।

—কি হয়েছে?

—বুকে ব্যথা।

—ডাক্তার দেখিয়েছ?

—না, মা বললেন, নিশ্চয় গ্যাসের জন্য ওরকম হয়েছে।

-না, ঠিক করনি। যাও, লাঞ্চের পরে এস। আসতে না পারলে টেলিফোন করে দিও।

অচলা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মার অসুখ ঠিকই কিন্তু ইনি যতটা বিচলিত হয়ে অচলাকে ছুটি দিয়ে দিলেন, অতটা শরীর খারাপ মার বোধ হয় হয়নি। কাল অতীনদা এসেছিল। গল্প করতে করতে দেরী হয়ে গিয়েছিল, মার খেতেও অনেক রাত হয়েছিল। অচলা অনেকবার বলেছিল—তুমি খেয়ে নাও মা, অত রাতে খেলে তোমার সইবে না। তোমার শরীর ভাল না অতীনদা জানে, কিছু মনে করবে না। অত রাতে খেয়ে ও অত দেরীতে শুয়ে হয়ত মার শরীরটা খারাপ হয়েছে—অচলা অতটা গা করেনি। মনে পড়ে গেল, কাল অতীনদা অভিযোগ করেছিল—বয়সের তুলনায় তুমি বড় গম্ভীর হয়ে গেছ, অচলা। কলেজে পড়তে পড়তে যার বাবা হঠাৎ মারা যায়, সে মেয়ে সংসারের বোঝা নিয়ে কতটা হাসতে পারে, অতীনদা?

গঙ্গাধর বললেন—কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে। তোমার মার বেশী বয়স হয়নি জানি, কিন্তু ওরকম একটা শক্ পেয়েছেন ত জীবনে, ডাক্তারকে খবর দিয়ে বাড়িতে যাও।

অচলা জানে না গঙ্গাধরকে কেন যমের মত ভয় পায়। মায়ের অসুখের দোহাইটা সেই ভয়েরই উক্তি। ডাক্তার দেখান হয়ত দরকার। কিন্তু গঙ্গাধর যদি দেরী করে আসার কোন কৈফিয়ৎ না চাইতেন, তবে মার অসুখের কথাটা হয়ত মুখ দিয়ে বেরুতই না।

আস্তে আস্তে ব্যাগটা নিয়ে অচলা বেরিয়ে গেল। গঙ্গাধরের ভয়ে হয়ত ডাক্তারকে কল্ দিয়েই বাড়ীতে ফিরবে। মা আপত্তি করলে বানিয়ে একটা

মিথ্যে কথা বলবে—গঙ্গাধর মেসো পাঠিয়ে দিলেন তোমার অসুখ শুনে। মা আজও সকালে বলেছিলেন—উনি দেরীতে যাওয়া পছন্দ করেন না, রান্না-বান্না ত আমিই বেশীটা করি, তাও তোর বেরুতে এত দেরী হয় কেন তা বাপু জানি না। উনি যেটা চান না, তুই সেটাই করবি। নে, দেরী যখন হয়ে গেছে, না হয় একটা ফোন করে দে। তবু তুই অত দেরী করে যাস না। অচলার চেয়ে মা বোধ হয় গঙ্গাধর মেসোকে আরও বেশী ভয় পান।

গঙ্গাধর রিপোর্টটা নিয়ে আর একবার পড়ে নিজেই টাইপ করতে বসলেন।

অচলা গেট থেকে বেরিয়ে যাবার পরে মৈত্রেয়ী এসে জিজ্ঞাসা করলেন —অচলা অত দেরীতে এসে আবার যে চলে গেল!

—ওকে পাঠিয়ে দিলাম, ওর মা নাকি অসুস্থ।

—টেলিফোন ত করতে পারত?

—পাশের বাড়িতে গিয়ে টেলিফোন করতে হয়ত সংকোচ বোধ করে।

—আজ না হয় মার অসুখ, কালও কি সময়মত এসেছিল?

—হ্যাঁ, কি করবে বল? এরা খুব ক্যালাস। কিছুই শিখবে না, জান। খুব ফ্রাসট্রেটিং। সময়ের মূল্য জানে না, আমার যেটা একেবারে অসহ্য।

মৈত্রেয়ী হাসলেন—তুমি কি এই আধুনিক ছেলে-মেয়েদের ধরে ধরে সময়ের মূল্য শেখাবে? তবেই হয়েছে! গঙ্গাধরবাবু, তোমাদের যুগ আর নেই, টের পাচ্ছ ত?

গঙ্গাধর বললেন—তা বোধ হয় ঠিক। মাঝে মাঝে ভুলে যাই। পুরনো অভ্যাস, সহজে ছাড়তে পারি না। তাছাড়া বয়স ত বাড়ছেই, যুগটাকে বুঝতে যদি ভুল করি তাহলে আমাকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। চিরকাল অপ্টিমিস্টিক ছিলাম ত!

মৈত্রেয়ী হেসে মাথা নাড়লেন।

॥ তিন ॥

রাজধানীতে গণেশ টাওয়ার হবার কথা সারা ভারতে আগুনের হলকার মত ছড়িয়ে পড়ল। গ্রামাঞ্চলে দলবদ্ধ হত্যার খবর কাগজের মাধ্যমে যেভাবে সারা ভারতে আজকাল ছড়িয়ে পড়ে।

গণেশ টাওয়ার খাড়া করার সময়টাও বড় মোক্ষম। ফুল-পেজ বিজ্ঞাপন দিয়ে দিয়ে একটা দলকে ভোটে জিতিয়ে দেবার মতই অভিনব ঘটনা। 'গরীবী হটাও' যখন আর লোককে টানতে পারছে না, 'উইকার সেক্‌শনের' স্লোগান্‌টাও যখন আর লোককে ঠিক চমক্‌ দিতে পারছে না —ঠিক তখনই গণেশ টাওয়ার আইডিয়াটার জন্ম। আজকাল অবশ্য দেশের যত ভাল কাজ, গরীবদের জন্য যত দুশ্চিন্তা, সবই 'মিড-নাইটে' ভাবা হয়। 'মিড-নাইট' ডিপ্লোম্যাসি বোধ হয় শুরু হয়েছিল ব্যাঙ্ক-গুলোর জাতীয়করণের মোক্ষম অস্ত্র শানাতে গিয়ে; সেটা সফল হবার পরেই যত চুক্তি যত সমঝোতা, জনগণের যত কল্যাণকর কার্য সব গিয়ে ঠেকল মিড্-নাইট মেড্-ইজি-তে। গণেশ টাওয়ার সেরকম কোন ডিনার ডিপ্লোম্যাসি বা মিড্-নাইট সোশ্যালিজম্ কি না—এখনও স্পষ্ট জানা যায়নি। তবে গণেশ টাওয়ার ফাউণ্ডেশনের কর্তাব্যক্তিরা নিশ্চয় খুব ঘুঘু লোক—তাঁরা বুঝে গেছেন হনুমানের 'টোটেম' বা 'সিমবল্' নিলে ভবিষ্যতে গদিচ্যুত হবার আশঙ্কা থাকতেও পারে। গণপতি মানে লোকেদের পতি, তাদের রক্ষক, ভক্ষক নন। ওটাই নিরাপদ।

আরও একটা সুবিধে আছে গণপতিকে নিয়ে। নীচের তলার লোকেদের কথাই ভাবুন—তা উইকার সেক্‌শনই হোক্, মুচি, মেথর, ডোমই হোক্ আর ওদিকে বিপ্লবের প্রথম সারির যোদ্ধা ফ্যাক্টরির শ্রমিকই বা ইদানীংকালের জাগ্রত অনুভাবনার প্রতীক চিরকালের সহনশীল সেই কৃষক—গণপতিকে নিয়ে কোন দুর্ভাবনা নেই, তিনি যে দেশজ দেবতা, তিনি শূদ্রের দেবতা। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা সমাজ তাঁকে তাঁর যোগ্য আসন দিতে বাধ্য হয়েছেন বহু রক্তপাত ও সভ্যতার টারময়েলের পরে। সেই নীচের তলার দেবতাকে একবার রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত করা গেলে আর কোন ভাবনা নেই।

সেই পুরাণ-মহাভারতের আমল থেকে গণপতিকে নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই; তাঁকে ঘিরে সমাজ ও সংসারে নানা জল্পনা-কল্পনা ও টানা-পোড়েনের যেন শেষ নেই।

পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে শুধু নাকি ঘন বনবনান্ত ছিল আর ছিল খণ্ড খণ্ড নানা উপজাতি—আজকেও যারা বেঁচে আছে দেশের আনাচে-কানাচে সেই অস্তিত্বের প্রতীক হয়ে। গণেশ নাকি সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের মাতঙ্গ ও মুষিক—এই দুই শক্তিশালী উপজাতির টোটেম। পণ্ডিতদের অনেকের মতে, উপজাতির ধ্বংসস্তূপের ওপরেই নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এক একটা উপজাতি যেমন যেমন সভ্য হয়েছে, তার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে

রেখে গেছে তার অস্তিত্বের প্রতীক—টোটেম। এই টোটেম স্মরণ করিয়ে দেয় আদিম সভ্যতার বিলুপ্তির ইতিহাস।

মানুষের চেহারায়, ব্যবহারে ও স্বভাবে যেমন বৈচিত্র্য, তেমনি দেব-দেবীরও। দুর্গা, জগদম্বা আর জগদ্ধাত্রীর চেয়ে মা-কালীর চেহারা, সৌষ্ঠব অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ, ভয়ংকর। তেমনি ইন্দ্র, বরুণ আর কার্তিকের চেয়ে গণেশ বিচিত্র ভাবনার প্রতীক; নানা পথ ও নানা মতের আকর। বরাহ-পুরাণের মতে, শিব মুখ থেকে উৎপন্ন অপূর্ব সুন্দর কুমার পার্বতী-প্রমুখ দেবতাদের বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শিবের শাপে গণেশ হস্তিমুখ হন। পরে তাঁকে শিব পুত্ররূপে বরণ করেন এবং তিনি গণেশ নামে পরিচিত করেন। শিবপুরাণের রুদ্রসংহিতার কুমার-খণ্ডের মতে, পার্বতীর দিব্য গাত্রমল থেকে জন্ম নিয়ে গণেশ পার্বতীর স্নানগৃহের দ্বারপাল নিযুক্ত হন। শিবের ত একটু খেয়াল-টেয়াল কম। পার্বতীর কথা মনে পড়লেই তিনি পার্বতীর স্নানাগারে পর্যন্ত ঢুকে পড়তেন। এটা বন্ধ করতেই পার্বতীর এক রক্ষকের দরকার পড়ল। কিন্তু শিব অত বাধাটাধা মানেন না। শিব ও তাঁর অনুচরদের ভেতরে প্রবেশ করতে গণেশ বাধা দিলেন। তখন প্রবল যুদ্ধ বাধল। গণেরা প্রচণ্ড মার খেয়ে পালিয়ে গেল। এতে চিরশান্ত শিব জাগ্রত হলেন। ক্রোধে অগ্নিসম হয়ে তিনি গণেশকে আক্রমণ করলেন। বুঝলেন, এই ত্রিনয়ন আর কোঁকড়ান চুল নিয়ে, কিম্ভূতকিমাকার, গোলগাল বেঁটেখাট ভুঁড়িওয়ালা দ্বাররক্ষককে হারান খুব সহজ ব্যাপার নয়। তবু মহাদেব দুর্জয় গণেশের শিরচ্ছেদ করলেন। পার্বতী পুত্রের শোকে অধীর, চোখে জল। মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে তিনি গণেশের জীবন ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু একটা শর্ত ছিল, শনির দৃষ্টি থেকে যেন গণেশকে বাঁচিয়ে রাখা হয়। সব দেবদেবী এসেছেন দেবশিশুকে দেখতে, আশীর্বাদ করতে, দীর্ঘজীবন কামনা করতে। শনিও এলেন, তিনি একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইলেন। শিবের সাবধান-বাণীর কথা পার্বতী ভোলেননি। কিন্তু মায়ের মন, শনি দূর থেকে উপহার দিয়ে চলে যাবেন, সে কি হয়? পার্বতীর কথায় তিনি এগিয়ে এলেন। শনির হাতে অপূর্ব উপহারটা দেখে শিশু ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই উপহার নিতে। সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডুচ্ছেদ হয়ে গেল। উত্তর দিকে শুয়ে ছিল ইন্দ্রের শ্বেতহস্তী—ঐরাবত। বিষ্ণু তার মস্তক কেটে এনে জুড়ে দিলেন গণেশের দেহে। সেই থেকে গণেশ হস্তিমুখ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে, দ্বাররক্ষক গণেশ পরশুরামকে ঢুকতে না দেওয়ায় প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেধে যায়। পরশুরাম একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করে হর-পার্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কৈলাসে আসেন। তাঁরা তখন নিদ্রিত

ছিলেন। পরশুরামের কুঠারাঘাতে গণেশের একটি দাঁত সমূলে উৎপাটিত হয়। তখন থেকে তিনি একদন্ত। গণেশের কোনও কোনও রূপভেদকে কেন্দ্র করে মারণাদি ষট্‌কর্মও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এছাড়া আছে গণেশ-যন্ত্র, তন্ত্রের মূল দেবতা, তাঁকে ভিন্ন সিদ্ধি নেই।

তন্ত্র ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে গণেশকে 'অসুর' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। স্কন্দ ও মোদ্‌গল্য পুরাণে 'বাধার প্রতীক' বলে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে, যিনি সব রকম যজ্ঞই পণ্ড করে দেন। মনুশাসিত সমাজে গণপতি-উপাসকদের সমাজ থেকে দূরে ঠেলে রাখা হয়েছিল। এরা কেউ সেদিন সমাজের বিবাহ আসরে নিমন্ত্রিত হত না বা শ্রাদ্ধে যোগ দিতে পারত না। সে-সময়ে গণপতি ছিলেন বিঘ্নরাজ, বিঘ্ননাশক নয়, তখন তাঁর এক কটাক্ষে সম্ভব-অসম্ভব ব্যাপার ঘটে যেত। রাজা হারাতেন রাজত্ব, চাকরী-ওয়ালাদের যেত চাকরী, ছাত্র হয়ে যেত গবেট, বিবাহযোগ্যা কুমারী মেয়ে স্বামী খুঁজে পেত না, শিক্ষক হারাতেন ছাত্র, স্বামী হারাত স্ত্রী, বিধবা হারাত স্নেহদয়ার আশ্রয়। সমাজে গণপতির প্রকৃত শ্রদ্ধার আসন লাভ করতে বহু যুগ কেটেছে। সে ইতিহাস সভ্যতা ও নানান জাতির সংমিশ্রণের ইতিহাস, বিজয় ও গ্রহণের ইতিহাস, লেনদেনের ইতিহাস। ব্যাসদেবের ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল ; গণেশ যখন সভ্যতার ও সফলতার চাপরাশ পরে মহাজ্ঞানী, মহাশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লেন সংমিশ্রণ ও বিবর্তনের যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে, ঠিক তখনই ব্যাসদেবের মহাভারত রচনার ক্লাসিক ভাবটা জেগেছিল, আগে বা পরে হলে বিপদ হত।

কথিত আছে ব্যাসদেব গণেশ বা বিনায়ককে তাঁর লিপিকর নিযুক্ত করেছিলেন। বিশেষজ্ঞ এই ঘটনার মধ্যে ভারতের লিখন-প্রণালীর দেশজ উদ্ভবের আভাস পান। গণেশ বা বিনায়ক দেশজ দেবতামণ্ডলী থেকে গৃহীত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দেবতামণ্ডলীতে গণেশের উদ্ভব অর্বাচীন। রামায়ণ ও অনেক পুরাণে গণেশের উল্লেখ নেই। আদি মহাভারতেও গণেশের নাম নেই। তাঁর নাম প্রথমে পাওয়া যায় যাজ্ঞবল্ক্যে—তাও দেবতা হিসেবে নয়, রাক্ষস বা অসুর হিসেবে, মানুষের সকল কর্মের সিদ্ধিনাশক হিসেবে। বিনায়ক নামে এক শ্রেণীর রাক্ষসের নামও প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। মনে করা হয় আর্যদের মধ্যে কোনরূপ লিখন-পদ্ধতির প্রচলন ছিল না। সেই কারণে যখন তাঁদের একজন লিপিকরের প্রয়োজন হয়, তখন তাঁরা বিনায়ক নামধারী এক দেশজ জাতির কাছ থেকেই একজন লিপিকরের সাহায্য নিয়েছিলেন। লিপিকর হিসেবে তিনি আর্যদের যে প্রভূত উপকার করেছিলেন, তার জন্যই ব্রাহ্মণ্য দেবতামণ্ডলীতে তাঁকে

দেবতার স্থান দেওয়া হয়েছিল। যাজ্ঞবল্ক্যের সেই সিদ্ধিনাশক রাক্ষস সিদ্ধিদাতা দেবতা হিসেবে গণ্য হয়েছিলেন।

এই সিদ্ধিদাতা গণদেবতাই আবার নৃত্যরত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর ভারতীয় কৃষ্টির মিলন ঘটাতে আবির্ভূত হচ্ছেন রাজধানীতে। আসুন, গণেশ টাওয়ার ফাউণ্ডেশনের শেয়ার কিনুন, শুধু বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয় পুঁজি হলেই চলবে না, এর জন্য শত শত দরিদ্রনারায়ণেরও সহায়তা চাই।

গণপতির নামে তাই রাজধানীতে বিপুল আয়োজন ও ছুটোছুটি পড়ে গেছে—কর্মকর্তারা সবাই ছুটোছুটি করছেন, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আজকের ছুটোছুটিটা সম্মিলিত অপজিশন পার্টির। তাদের আয়োজিত বিরাট সভায় গণ-পার্টির নেতা তারকেশ্বর বক্তব্য রাখবেন। সারা ভারত পদযাত্রা করে তিনি রাজধানীর মাটিকে পবিত্র করেছেন বলে তাঁকে সম্মিলিতভাবে স্বাগত জানান হচ্ছে।

আজকেও কাতারে কাতারে লোক আসছে—অগণিত অসংখ্য মানুষ। রামলীলা গ্রাউণ্ডে এখন মাটি খোঁড়া হচ্ছে। সামনে একটা ছোট অস্থায়ী অফিস খোলা হয়েছে। বাইরে লেখা 'গণেশ ফাউণ্ডেশন', ভেতরে গণেশ টাওয়ারের একটা মডেল। সিমেন্ট, ইট, পাথর, সুরকি, টন টন শিক, লোহার বড় বড় শলাকা—ট্রাক, টেম্পো, অসংখ্য কর্মী, ছেলেমেয়ে, জনানা-মর্দানা, কন্‌ট্রাক্‌টার, শিল্পী, দেশী ও বিদেশী ইঞ্জিনীয়ার ও ভাস্করগণ। যেন কার এক অদৃশ্য ইশারায় ময়দানবের কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। আকাশছোঁয়া ক্রেন প্রতি মুহূর্তে দৈত্যের মত বিকট আওয়াজ করে দোতলা সমান গোল গোল পিলার বসাচ্ছে—ইট-পাথর-সিমেন্ট, লোহা, উঠ্‌ছে-নামছে, নীচে গর্ত হচ্ছে। শব্দ উঠ্‌ছে ধপ্ ধপাস্ ধপ্।

এটা ছিল দুপুরের দৃশ্যপট। এখন বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর। ব্যস্ত দিনের কাজ শেষ। সভা শুরু। গণপার্টির সভাপতি তারকেশ্বর এই পূত স্থানে আজ পদার্পণ করছেন। তার জন্যই এই বিপুল আয়োজন। তারকেশ্বরই এই পূত-স্থানে সভা করতে পরামর্শ দিয়েছেন, যুক্তি দেখিয়ে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন—গণেশ সর্বজনের, সর্বকালের অগ্রজ দেবতা। কারা খাড়া করছে সেটা বড় কথা নয়, ফলদায়ক সিদ্ধিদাতার পুজো জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে করতে পারে। শুধু রুলিং পার্টি বা ক্লাসের যে এ অধিকার তাই নয়, এ অধিকার সমস্ত বিরোধী দলেরও।

যেখানে একদিন পণ্ডিত নেহেরু রানী এলিজাবেথকে সম্বর্ধনা জানাতে শ্বেতপাথরের বেদী রচনা করেছিলেন, সেখানে এখন পশু ও আশ্রয়হীন

মেহনতী মানুষ একসঙ্গে শুয়ে থাকে। দিনের বেলায় তারা হাসিগল্প করে, আড্ডা দেয়, সন্ধ্যার পরে তারা তাস খেলে, জুয়ায় বসে যায় লন্ঠনের আলোতে আর নাক ডাকায়। বেদীর চারদিক থেকেই নীল আকাশ দেখা যায়; জ্যোৎস্নার আলো আর অমাবস্যার গভীর অন্ধকার এদের সঙ্গের সাথী। ভারতের এই নির্বিকার সন্তানেরা আজ জায়গাটা পরিষ্কার ধবধবে দেখে নিশ্চয় আশেপাশের কোন স্থানে পালিয়েছে কিংবা ভিড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে আছে। সারাদিনের অজস্র কর্মকাণ্ড ও ব্যস্ততা দেখে ফিক্ ফিক্ করে হাসে। আর কারণে অকারণে বাজি রাখে। মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে কাজে সামিল হতে চায়। কাজ ত চাইলেই পাওয়া যায় না। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ছাড়াও আজকাল কাজ দেবার মালিক এম.এল.এ. বা কন্ট্রাক্টাররা। ব্রিটিশ আমলের মত কাউকে যোগ্য বলে সাহেবদের কাছে ধরে আনলেই চাকরী হয় না; এখন কর্ম পেতে কাঠখড় পোড়ান ছাড়াও বিশেষ কারুর পিরীত অর্জন করতে হয়। এমন কি, হরিজনের চাকরীর জন্যও আজকাল তিন-চার হাজার টাকা পাগড়ী দিতে হয়, নয়ত বাবুরা কথাই বলে না। এই তাঁবেদারী মহা-ঝামেলার।

রামলীলা ময়দানে বিরাট সামিয়ানা লাগান হয়েছে, দশ হাত দূরে দূরে চোঙা মাইক। এবড়ো-খেবড়ো গর্ত। দেশের অন্যতম গণনেতা তারকেশ্বর সারা ভারতবর্ষের কিরকম চেহারা দাঁড়িয়েছে, চাক্ষুষ দেখে এসেছেন। দেশটা এগিয়েছে কিংবা থেমে আছে, তার সব প্রমাণতথ্য যোগাড় করে তিনি এনেছেন। প্রথমে তারকেশ্বর ফুলের মালা চড়াবেন রাজঘাটে গান্ধী-সমাধিতে; জনসমক্ষে দাঁড়াবার আগে বাপুর কাছে এখনও গড় হতে হয়। আত্মত্যাগ সব সময় যে আত্মরক্ষার কবচ, তা ত নয়; বিশেষ করে আধুনিক যুগে, জননেতার ফ্যাশনেবল্ আদর্শ বর্তমান জগতের বিজ্ঞাপনের মত চির-পরিবর্তনশীল। ডান দিকে—যেখানে রানী এলিজাবেথ দাঁড়িয়ে স্বাধীন ভারতীয়দের অভ্যর্থনা গ্রহণ করেছিলেন নেহেরুজীর হাসি হাসি মুখের পটে—ঠিক তার বারো ফুট দূরে প্রেস গ্যালারী। ভারতীয় লেখক আর ইন্টালেক্চুয়ালরা ছাড়াও উপস্থিত আছেন বিদেশী সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যান; কেউ এসেছেন সিঙ্গাপুর থেকে, কেউ বা মালয় থেকে, কেউ বা ইংরেজ, আমেরিকান ও জাপানী সাংবাদিক।

ঢাকঢোল আর সানাইয়ের দল এল; তাদের পেছন পেছন হলুদ রঙে ছোপা কাপড়ে সুসজ্জিত ভলান্টিয়াররা। সারা ভারতে এরা তারকেশ্বরের সঙ্গে দলে দলে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষে পদযাত্রার সম্মান বেড়েছিল বিনোবাভাবেজীর আমল থেকে; এখন রকেটের যুগেও ভারতবাসীরা পদ-

যাত্রীদের দিকে সমীহ দৃষ্টিতে তাকায়, স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা জানায়, কপালে টিপ পরিয়ে দেয়, ভূরিভোজনের আয়োজন করে। এই তরুণ দলে আছেন তিন-চারশো ছাত্র, শিক্ষক, পি-এইচ, ডি, ও রিসার্চার—যারা ইদানীং স্যোশিওলজিকাল্ দৃষ্টিতে ভারতের পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলোকে নানা মাপ-কাঠিতে বিচার করে নানা জটিল প্ল্যানিং ও সিদ্ধান্তের ফলাফল ছাড়তে অভ্যস্ত। এদের দিয়েই প্ল্যানিং কমিশন ইদানীং অনেক বেস্-রিসার্চ মেটিরিয়াল সংগ্রহ করছেন নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বাসে। হঠাৎ জনতার মধ্যে হাততালি পড়তে দেখে অনুমান করা গেল গণনেতা তারকেশ্বরের আবির্ভাব ঘটেছে ; ঠিক তাই।

অসংখ্য গাঁদা ফুলের মালায় সুশোভিত তারকেশ্বর, একবার মালা খোলেন, আবার মালা পরেন। সমস্ত দলের পক্ষ থেকে বড় বড় নেতারা এসেছেন। অদৃশ্য গণেশ টাওয়ারের দিকে তাঁরা একটা মালা ছুঁড়ে মারছেন এবং অন্য মালাটি স্নেহ ও আদরে পরিয়ে দিচ্ছেন গণদেবতার ভারাক্রান্ত গলায়। একজন নেতা গড়ে তোলা কী চাট্টিখানি কথা—কত মালা লাগে, কত মেহনত্ লাগে। সব দল সবাইকে না চেয়ে একজনকে অন্ততঃ একদিন চাইছে—ভারতবর্ষে এ অভাবনীয় ব্যাপার ঘটতে ত বড় একটা দেখা যায় না ; এটা বোধ হয় গণেশ টাওয়ারের শুভ আবির্ভাবের সুফল।

শত হলেও গণেশ সফলতার দেবতা। কি যে তিনি করেন আর কি যে করেন না ; কি যে ভাবেন আর কি যে ভাবেন না ; কি যে বলেন আর কি যে বলেন না ; তা ঠিকমত কিছুই ঠাহর করা যায় না। শুধু যে চেহারাটার মধ্যে জটিলতা আছে তাই নয়—জন্মলগ্ন নিয়ে পর্যন্ত গণ্ডগোল ; মাঝে মাঝে তিনি আবার উল্টেও যান। এঁকে শূদ্রের দেবতা কি সাধে বলে—শূদ্রদের জন্মই কি ঠিক ছিল যে তাদের দেবতার জন্ম ঘড়ির কাঁটার মত ঠিকঠাক হবে? সমাজে স্বীকৃতি দেবার জন্যেই দেবতার পায়ে পুজো। রাজা-মহারাজারা খুশী হয়ে কত প্রজার জাতপাত পাল্‌টে দিয়েছেন, সেইসব কাহিনীর টুকরো টুকরো ছবি মহাভারতের নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

গণেশের কথা ভাবলেই সমাজের সেইসব চিত্র ভেসে ওঠে। গণনেতা তারকেশ্বর তখন কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। আজও মালার পর মালা গলার থেকে নামিয়ে রাখতে রাখতে তিনি দেশের সামাজিক জাতপাতের মিশ্রণ ও সংঘাতের নানা টানাপোড়েন ও নানা চিত্রের কথাই ভাবছিলেন। একথা ভেবে ভেবেই মালা নিচ্ছিলেন, কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, যারা এই শূদ্রের দেবতাকে, এই সফলতার দেবতাকে আজকে জনগণের সামনে তুলে ধরছে, তাদের কাছে সমাজের এই রিবর্তনের অতটা মূল্য নেই বোধ হয়।

তা না থাক। তারকেশ্বর সারা ভারত পদযাত্রা করে দেখে এসেছেন। *সেই মহাভারতের আমল থেকে আজও কত প্রেম, কত সংঘাত, কত টালমাটাল, কত পরিবর্তন, কত বিবর্তনের কত ইতিহাস গ্রামের আঙিনায়* সংঘটিত হয়, বিবর্তিত হয়; গ্রামের মাঠে-ঘাটে আজও তা কতভাবে নিঃশব্দে অভিনীত হয়; তার হিসেব কে রাখে? আজকের বক্তৃতায় যদি সেইসব পুরনো কথাগাথা সাজিয়ে বলেন, বেশীর ভাগ লোকেরাই বুঝবে না। বলবে, তারকেশ্বর এক সময় ছিলেন সোশ্যালিস্ট, জয়প্রকাশের ডান হাত, এখন ভগবৎ বিশ্বাসী হয়ে শোধনবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছেন। বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস জুড়ে থাকে বলে তাকেও কি শোধনবাদী বলা হবে? শোধনবাদী আখ্যা দেওয়া হবে ভারতের পূত জন্মভূমিতে? এসব ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে জনগণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মালা যখন পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠ্‌ছিল, ভারতের অখণ্ড সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের কথা ভেবে তারকেশ্বরের চোখ দুটো ভিজে উঠ্‌ছিল। মালাগুলো এক এক করে খুলে তিনি ডায়াসে রেখে দিচ্ছিলেন। জনগণের ভালবাসা পেলে নেতা হয়েও নিজেকে কেমন যেন মহীয়ান্ লাগে। জনগণেশ নিয়ে ভাববার এই সুবিধে, তিনি যা, তার ত তল পাওয়া দুরূহ। তিনি যা নন, তাও তাঁর ওপর আরোপ করা যায়।

এই জনগণেশ টাওয়ার যারাই খাড়া করুক--এটা যে বিরাট একটা রাজনৈতিক চাল, তা তিনি স্পষ্ট ধরতে পারছেন। যদিও তিনি দু-চোখ মেলে যা দেখে এলেন, তাকেই বা অস্বীকার করবেন কোন সাহসে? গণেশের আর একটা সুবিধে, তাঁর কোন কাস্ট্-ক্রীড নেই, তিনি জাতি-ধর্মনিরপেক্ষ সর্বভারতীয় দেবতা-নেতা, তিনি নন-কম্যুনাল্। দক্ষিণে দেখে এলেন, বিয়ে-শাদীতে গণেশের কাছেই মেয়ে-বউরা মানত করে। সুফল ফললে পুজো দেয়। মহারাষ্ট্রে ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীতে দশদিন ধরে গণেশের নানা মূর্তি গড়ে মণ্ডপ সাজিয়ে বিরাট করে পুজো হয়, দেখে এলেন। অনেকটা বাঙালীদের দুর্গাপুজোর সমারোহ সেখানে। গণেশের নিরঞ্জন বোম্বাই-এর সমুদ্রে অসাধারণ এক মনোহর দৃশ্য। কর্ণাটকে এক নৃত্যানুষ্ঠানে দেখলেন শিল্পী সফলতার দেবতা গণেশকেই আগে আরাধনা করে নিচ্ছে। উত্তর ভারতে গণেশ ছাড়া কোন পুজোই সম্পূর্ণ হয় না। সেদিন এক ইন্‌টেলেক্‌-চুয়ালের সঙ্গে দেশের নানা সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করছিলেন; মন্দির বা পুজো ওসবে তাঁর বিশ্বাস নেই কিন্তু ড্রইংরুমে সজ্জিত রয়েছে গণেশের এক অপূর্ব ডেকরেটিভ্ পীস্, বিদেশে যাবার আগে এই সাজান গণেশের মুখখানা একবার দেখে রওনা হন। আন্তর্জাতিক

টেরোরিজমের যুগে কোন্ প্লেন কখন যে উড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়—আজকাল কি কেউ জোর দিয়ে তা বলতে পারে? উত্তর প্রদেশে এক মাড়োয়ারী শিল্পপতির ঘরে তারকেশ্বর দু-রাতি অতিথি ছিলেন, সেখানে দেখলেন গোটা পরিবার সকাল-সন্ধ্যায় গণেশের পুজো করে। ওদের নাকি লক্ষ্মী আর গণেশঃ অন্য দেবতার অস্তিত্ব থাকলেও এঁরা দু-জনেই একমাত্র আপনজন।

এসব ভাবতে ভাবতে তারকেশ্বর মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলেন—চারদিক থেকে প্রচণ্ড করতালি উঠল। তিনি আজ কি বলবেন, সেটাই তখন থেকে ভাবছিলেন। মনের মধ্যে এত কথা উঠ্ছে, কোন্টার সঙ্গে কোন্টা যুক্ত করবেন, ভেবে পেলেন না। একবার ভাবলেন, সভ্যতার সঙ্গে সমাজের কি সম্পর্ক—তা নিয়ে কিছু বলবেন, আবার ভাবেন ভারতের সমাজবাদ কি কারণে অন্য পথে ভারতের মাটি ছুঁয়ে আসবে, তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করবেন। কিন্তু এসব নিয়ে কিছু বলতে গেলে মনের অন্য মানসিকতা দরকার। আজ যারা এখানে এসেছে—এদের সমাজবাদ নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই ; তার উৎপত্তি ও বিস্তার নিয়ে কিছু বললেও সেটা অপাত্রে দান হবে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই গণেশের নামে শতবার মাথা ঠুকতে রাজী—এর বেশী নয়। যদি বলি গণেশ শূদ্রের দেবতা, তাঁকে কেন্দ্র করে তোমরা জাগ, চেতনা নিয়ে জেগে ওঠ। 'জাগ' কথাটার কি বিপুল অর্থ, এরা তার কিছুই বিশেষ ধরতে পারবে না। তবু গণেশ টাওয়ার যাঁরাই তৈরী করুন—কালচার ও কৃষ্টির পথটাই আগামী ভারতবর্ষের ঐক্যের মূলমন্ত্র। লম্বোদর যদি দেশে ঐক্য আনার ভারটা নেন, তবে দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদের বড় একটা দুর্ভাবনা কাটে।

এভাবে অনেক চিন্তা ও ভাবনারাশির ঢেউ সামলে তিনি গণ-অঞ্জলি গ্রহণ করতে করতে জনগণকে হাত জোড় করে প্রণাম করলেন। ভাষণ দিতে উঠ্লেন—[বিদেশী জার্নালিস্টরা তাঁর ভাষণ শুনবেন বলেই এতক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছেন।] —ভাইও অউর বহিনো, ভারত এখনও গরীব দেশ আমি দেখে এলাম, ভারতের মানুষেরা অনেকে এখনও দু-বেলা ভাল করে খেতে পরতে পায় না—আমি তাও দেখেছি। কিন্তু ভারত এখনও প্রাণে প্রাণোজ্জ্বল, কৃতি ও আত্মবিশ্বাসী—আমি এটাও দেখেছি [হাততালি]। রামলীলা ময়দান বড়ই পবিত্র, আগে ছিল এখানে রাম-রাবণের লীলা—এখন হবে গণেশলীলা। যেহেতু গণেশ গণদেবতা, তাই আপনারা নিশ্চয় জানেন, কিছু মনোমালিন্য হবেই। রামলীলা প্রবন্ধক কমিটির সঙ্গে গণেশ টাওয়ার ফাউণ্ডেশনের হয়ত একদিন প্রচণ্ড লড়াই বেধে যাবে—যা আমরা রোজই করে থাকি এবং করতে অভ্যস্ত। আর ওতেই আমাদের

আনন্দ বেশী। তবু বলব, পাঁচ হাজার বছর ধরে লড়াই করে, সংগ্রাম করে এখনও আমরা বেঁচে আছি। সেই লড়াই ও সংগ্রামের যে ইতিহাস তার নানা রূপ ও নানা বিন্যাস ঘটেছে ; কখনও রাজার সঙ্গে প্রজার লড়াই, কখনও পুরোহিতের সঙ্গে সমাজের লড়াই, সামন্তবাদীদের সঙ্গে পুঁজি-পতিদের লড়াই ; এখন আবার নয়া সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মাল্‌টিন্যাশনালদের লড়াই। ওতো চলবেই—যে লড়াই করে, সংগ্রাম করে, প্রতিবাদে মুহুর্মুহু সোচ্চার হয়—সেই-ই ত বাঁচে। রাম-রাবণের সঙ্গে যদি গণেশ লড়ে যান, তাহলে আমাদের সান্ত্বনা থাকবে—শুধু মানুষই লড়াই করে না, দেবতারাও লড়াই বা সংগ্রাম ছাড়া বাঁচেন না [হাততালি]।

—গণেশ এমন এক দেবতা, যাঁর মধ্যে শুধু যে পশু ও মানুষের মিলন ঘটেছে তাই নয়, সবার মধ্যেই সেই পরম আত্মা, তারই জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি গণেশবাবা। পুরাণে গণেশের অনেক কাহিনী আপনারা নিশ্চয় পড়েছেন। কেউ বলে, গণেশ দুর্গার সন্তান--যে সন্তান শিবকে চ্যালেঞ্জ করতেও ভয় পাননি [হাততালি]। আমি গণেশজীর নামে আপনাদের কাছে একটাই প্রশ্ন রাখতে চাই—ভারত কী এগোচ্ছে ? হ্যাঁ, নিশ্চয় এগোচ্ছে ; আপনারাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। কিন্তু দেখে এলাম, সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করেও কতকগুলো মূল সমস্যার এখনও সমাধান করতে পারেননি। ভারতের বহু মানুষ, অসংখ্য মানুস খুবই দুর্দশায় আছে—জল নেই, খাবার নেই, চিকিৎসা নেই, শিক্ষা নেই। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ ব্যবধানটা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কেন এরকম হয়--কেন ধনী, ধনী হয়--দরিদ্র দরিদ্রতর হয় ? আপনারাই ভাবুন সে কথা, কারণ সরকার অনেকদিন ধরে ভেবেও দেখছি কিছুই কূলকিনারা করতে পারছেন না ! আমি বলছি না যে সরকার কিছুই করছেন না—যদি তা করতেন, তবে আপনাদের প্রতিবাদের আওয়াজে এখানে টেকা যেত না [হাততালি]।

--আমি জানি আপনারা রাজধানীতে সুখেই আছেন। রোজই জিনিস-পত্রের দাম বাড়ছে সেও আমি জানি, সেজন্য সরকার কতটা চিন্তিত জানি না, আপনারা নিশ্চয় চিন্তান্বিত। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে যা চিরকাল বলা হয়, সেটাই বলা হচ্ছে, পৃথিবীর নানা দেশের মুদ্রাস্ফীতির তুলনায় ভারতে জিনিসপত্রের দাম নাকি সেরকম কিছুই বাড়েনি [শেইম্‌, শেইম্‌]। তবে আপনারা যদি ভাবেন দিল্লীই সারা ভারতবর্ষ, আপনাদের ভুল একদিন ভাঙ্‌বে। সরকার কিন্তু কোটি কোটি টাকা গরীবদের জন্য, উইকার সেক্‌শনের জন্য খরচ করছেন। টাকাগুলো কোথায় যাচ্ছে—সরকারকে কি আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি ? অনেক প্রশ্নের আজকাল সঠিক জবাব

পাওয়া যায় না। এর জবাবও আপনারা পাবেন না। তবে কী সরকার খরচ করেন শুধু খরচ দেখাবার জন্যে?

গণেশ টাওয়ার খাড়া করা হচ্ছে—খুবই ভাল কথা। দেবতা যদি জাগেন, বিশেষ করে শূদ্রের দেবতা, দরিদ্রের দেবতা, তবে কিন্তু ভবিষ্যতের জাগ্রত ভারতবাসীকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। গণেশ টাওয়ার করলেও তারা ধরা পড়ে যাবে [হিয়ার, হিয়ার]। আমি তাই আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যদি গরীবদের জন্য, ভুখা-নগ্ন মানুষদের জন্য কিছু না করা হয়, তবে এরাই কিন্তু একদিন জেগে উঠে দিল্লীর সুখী জীবন ভণ্ডুল করে দেবে। তাই সরকারকে আমি অনুরোধ করছি, সরকারের কাছ থেকে চাই, ঐ কোটি কোটি টাকা যাদের জন্য খরচ করা হচ্ছে, তা কি জানতে আসল লোকেদের দোরে পৌঁছচ্ছে? সেটা দেখাও কি সরকারের দায়িত্ব নয়? যদি ঐ টাকা আসল লোকেদের কাছে না পৌঁছয়—তবে আমরা একদিন খুঁজে বার করবই কাদের নামে এই হরিলুট হচ্ছে, আর কারা এই হরিলুটের ভাগীদার?

সরকার যে সুবিধেগুলো দিচ্ছেন--সেই সুবিধেগুলো যদি আসল লোকে-দের কাছে না পৌঁছয়, তবে কাদের পকেট ভরছে--তা দেখার দায়িত্ব কি সরকারের নেই? [হাততালি]। এই গণেশ টাওয়ার ফাউণ্ডেশনের গণেশ খাড়া করার পেছনে কি উদ্দেশ্য--তা আমি ঠিক জানি না। তবে, যাঁরাই করুন, তাঁরা যেন ভেবে দেখেন গণেশকে নিয়ে খেলতে গেলে খেলাটা কিন্তু ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াবে। আমি তাই ফাউণ্ডেশনকে বলে রাখতে চাই--দেশের উন্নয়ন হচ্ছে কি না তা বিচার করার দায়িত্ব এই গণেশ টাওয়ার নিন, ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় ছোট ছোট আরও অনেক গণেশ টাওয়ার গড়ে উঠুক। গণেশ টাওয়ার হয়ে উঠুক প্রকৃত সমাজবাদের হোতা [হাততালি]। তবে আমি একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করতে চাই—টাওয়ারের মাথায় চড়ে কিন্তু ভারতের প্রকৃত অবস্থাটা জানা যায় না।

ভবিষ্যতে এ জায়গাটা হয়ত বড়ই পবিত্র হয়ে উঠবে—অবশ্য এ নিয়ে যদি লাঠালাঠি না লাগে। আপনাদের সহযোগিতাই হবে এদের ভরসা। —জয়হিন্দ্।

জনগণ উল্লাসে ও আনন্দে ফেটে পড়ল কিছুক্ষণ। করতালির পর করতালি শোনা যেতে লাগল। কিছু লোক তারকেশ্বরজীর দিকে ছুটল তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। ওদিকে অনেকক্ষণ ধরে—'জয় গণেশজী কী জয়', 'জয় তারকেশ্বরজী কী জয়'—ধ্বনি শোনা যেতে থাকল। জনসভা সমাপ্তির শেষে বহু লোক অদৃশ্য গণেশজীর দিকে একটা প্রণাম ঠুকে যে-যার বাড়িতে ফিরে গেল।

॥ চার ॥

গঙ্গাধর সকালে কাগজটা পড়ছিলেন। পুরোনো অনেক কথাই মনে পড়ে। ১৯৩৬ সাল। সারা দেশে কোথাও চাকরী নেই। ১৯২৯ সালের বিশ্বজোড়া মন্দা এদেশের গোটা অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। তার জের চলেছিল ১৯৩০-৩৪ সাল পর্যন্ত। ভারতীয় রেলওয়েতেও ৫১ হাজারেরও বেশী কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়। সমবেদনা ও সান্ত্বনা জানিয়ে অমৃত-বাজার পত্রিকায় সে-সময় যে মন্তব্য করা হয়েছিল তাতেই তখনকার আসল অবস্থার কথা জানা যায়। 'বেকার যুবকেরা এখন একের পর এক আত্ম-হত্যা করছে···। ঘটনা কি চিরদিন এইভাবেই ঘটতে থাকবে?···তারা কি আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোন প্রতিকারের পথ খুঁজবে না?'

ব্রিটিশ আমলে এমনিতেই চাকরী-বাকরী সীমিত ছিল। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ইচ্ছামত গড়ে তোলা যেত না। সরকারী কাজ বলতে তখন প্রশাসন, রেলওয়ে, ডাকবিভাগ ও রেভিনিউ। শিল্প বলতে চা, সুতিবস্ত্র আর পাট, লোহা-ইস্পাত, কয়লার খনি, কাগজ ও সিমেন্ট। সর্বত্রই শ্রমিকদের মাস মাইনে ১০ থেকে ১৫ টাকার মধ্যে। চাকুরী না পেয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে ভারতীয়রা; সাত-আট টাকার বিনিময়ে ভাল চাকরীর লোভ দেখিয়ে গ্রাম থেকে মানুষ ধরে এনে মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আরও অনেক দেশে চালান দিচ্ছে আড়কাঠিরা। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত আড়-কাঠিদের পাল্লায় পড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল ৩০ লাখের ওপর সাধারণ মানুষ, কৃষক, ভূমিহীন শ্রমিক। তারপর অবশ্য মানুষ পাচারের গতিবেগ ধীরে ধীরে কমে আসে, কিন্তু কোনদিনই থামেনি। এখনও যেমন এক একটা মানুষ-খেকো দল, নানা দেশে, বিশেষ করে মধ্য এশিয়ায়, ক্যানাডায় ও অন্যান্য দেশে হাজারে হাজারে লোক পাচার করে প্রচুর অর্থ লুটছে, কেউ কেউ আবার ধরাও পড়ছে।

তখন মানুষ পাচার করার ব্যবসাটা আরও ভয়ংকর ছিল। বড় বড় শিল্পপতিদের প্রয়োজন মেটাতে [এখন আবার মালটিন্যাশনাল] সর্বদেশে, সর্বকালে সরকারী নিয়মকানুন শিথিল হয়ে যায়। হিসেব মত ৩০ লাখ ভারতীয়কে নানা প্রলোভন দেখিয়ে তখন পাচার করা হয়েছিল, কিন্তু তারপরেও কত লাখ লোক পাচার করা হয়েছে, তার হিসেব কে রাখে! তাদের অনেকেই এমনকি তাদের বংশধরেরাও এখনও ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলছে —কোন দেশেই স্থিতিস্বস্তি পায়নি তারা। এদের মধ্যে অনেকেই তো শ্রীলঙ্কার মত দেশে শুধু একটু স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচবে বলে জীবনপণ লড়াই করে যাচ্ছে। ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী কেনিয়াবাসীদের হাল দেখে কার না আফসোস হয়।

দেশের বাবুরা আর শিক্ষিত লোকেরা তখন শুধু কেরানীর চাকরী খুঁজত। শিল্প-ব্যবসার বাজার ছিল তখন মন্দা। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী বস্ত্রের প্রচলন—জাতীয় পর্যায়ে কংগ্রেসের এই নীতির ফলে ১৯০৮ সালের আগেই গড়ে উঠেছিল নানা দেশীয় শিল্প—সাবান, তেল, কালি, রাসায়নিক দ্রব্য, প্রসাধনিক জিনিসপত্র, কাগজ, চিনেমাটির জিনিস ইত্যাদি। খাদির প্রচলন শুরু হোল। মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই অঞ্চলে সেই থেকে সুতিবস্ত্রের উন্নতির সূত্রপাত। এরপর দেশের নানা শিল্পোদ্যোগীদের নজর পড়ে ব্যাঙ্কিং, ইন্সিওরেন্স ও ঐ জাতীয় শিল্পের ওপর, এখানে পুঁজির প্রয়োজন সীমিত, ঝুঁকিও কম। এই পরিস্থিতিতে দেশীয় ইঞ্জিনীয়ারদের চাকরীর সুযোগ খুবই কম ছিল। যা ছি' তা বিদেশে পাশ করা মেধাবী ইঞ্জিনীয়ার-দেরই।

গঙ্গাধর চ্যাটার্জী ইঞ্জিনীয়ার হয়ে ঘরে বসেছিলেন। সব কটা কাগজ তন্ন তন্ন করে দেখেন কোথাও চাকরী খালি আছে কিনা। দু-একটা যা চোখে পড়ে, অ্যাপ্লিকেশন ছাড়েন। জবাব আসে না। দু-চারটে কোম্পানী যা আছে, তারা সবাই বিদেশী ডিগ্রিধারী ভারতীয়দের চায়। ঘন ঘন অ্যাপ্লিকেশন করতেও তো অনেক খরচ। বাবার কাছে টাকা চাইতে লজ্জা করে। অত কষ্ট করে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়িয়েছেন, সেটাই যথেষ্ট। এখন আর হাত পাততে মন সরে না। ছোট বোনটার বিয়ে দিতে হবে, বাবার অবস্থা বোঝেন। তাই কোন কথাই কাউকে বলেন না, শুধু চেষ্টা চালিয়ে যান।

একদিন টাটার একটা কোম্পানীর কাছ থেকে ইন্টারভিউ লেটার এল। বড় ঘরের বড় ছেলেরা সব ইন্টারভিউ দিতে এসেছে—কেউ পড়েছে গ্লাসগো ইউনিভারসিটিতে, কেউ শেফিল্ড, কেউ বা ব্রিসটলে। এদের সবাইকে

লাইনে দাঁড় করান হয়েছে। একজন অফিসার তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে একটা কাগজে কি যেন সব লিখে যাচ্ছিলেন। গঙ্গাধর অনেক-ক্ষণ ধরেই ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। মানুষকে খুঁটিয়ে দেখার ভদ্রোচিত সীমানাও ক্রমাগত লঙ্ঘন করা হচ্ছিল। গঙ্গাধরের আর যেন সহ্য হল না; মাথায় তাঁর আগুন জ্বলে উঠল। তিনি ভাবলেন, চাকরী করতে এসেছি ঠিকই, তাই বলে ত ভিক্ষে করতে আসিনি।

অফিসারটি তখন গঙ্গাধরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। মাথায় তাঁর কোঁকড়ান চুল সেটা বোধ হয় তিনি লিখে নিলেন; দৃষ্টিতে প্রতিবাদের আগুন, সম্ভবতঃ সেটা নজরে পড়ল না। অফিসারটি সেই একই ভঙ্গীতে একবার করে দেখেন, কি যেন লিখে যান।

গঙ্গাধরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তিনি বিদ্রূপে ফেটে পড়লেন—শ্যাল আই টার্ন অ্যারাউণ্ড, স্যর?

—হোয়াট ডু ইউ মীন? অফিসারটি গর্জে উঠলেন।

—আই মীন হোয়াট আই সে, স্যর, গঙ্গাধরের গলা সামান্য মাত্রও কাঁপল না।

বিদেশী ডিগ্রিধারী ভারতীয়রা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল; এর মধ্যে প্রতিবাদের কিছু থাকতে পারে তাদের মাথায় আসেনি। বিদেশী এই কুলীনদের চোখে এই নেটিভ তরুণের আত্মশ্লাঘা, কৌতুক ও করুণার উদ্রেক করল। ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা দেখার জন্য তারা প্রত্যেকে দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে থাকে।

মাথায় তখন রক্ত চড়ে গেছে গঙ্গাধরের। অপমানে গলা কাঁপছে। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ যেন জ্যা-মুক্ত তীরের মত মুখ থেকে বেরিয়ে এল—আই ওয়াণ্ডার ইফ ইট ইজ আ ফ্যাশন প্যারেড!

ক্রোধে জ্বলে উঠে চিৎকার করে উঠলেন অফিসার—চীকি ইয়ংম্যান, ডোন্ট ফরগেট, ইউ হ্যাভ কাম ফর এ জব!

গঙ্গাধরের শ্লেষোক্তি আরও যেন তীব্র হল—হোয়াট আর ইউ রাইটিং স্যর, ইফ আই মে নো?

দেশী ছোঁড়ার এত বড় আস্পর্ধা দেখে অফিসারটির চোখ-মুখ দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছিল। এখুনি গঙ্গাধরের ওপর যেন তিনি চাবুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। মন্দার বাজারে চাকরীর উমেদারী করতে এসে এত বড় বেয়াদবী কার বা সহ্য হয়! ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তিনি আবার গর্জে উঠলেন—ইউ কাম আউট অব দ্য লাইন।

গঙ্গাধরকে নড়তে-চড়তে দেখা গেল না, যেমন দাঁড়িয়ে ছিলেন, তেমনি

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। পশুর মুখোশধারী এমন একজন মানুষকে অবজ্ঞা করা ছাড়া মনের জ্বালা যেন কিছুতেই মেটে না।

সোরগোল-চেঁচামেচি তখন তুঙ্গে উঠেছে। একেবারে ক্ষ্যাপা বাঘের মত অফিসারটি কেবল গর্জাচ্ছেন ; আবার আহত শিয়ালের মত হুক্কাহুয়া রব ছাড়ছেন। ইন্টারভিউর শান্ত পরিবেশ রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিদেশী ডিগ্রিধারী আধা-সাহেবরাও গঙ্গাধরকে বিদ্রূপ করতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড গোলমাল শুনে বড় কর্তাই এবার বেরিয়ে এলেন—হোয়াটস দ্য ম্যাটার ?

গঙ্গাধর তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে ইনি তখন থেকে কি সব লিখে যাচ্ছিলেন—যাকে আমি মনে করি এবং আপনিও হয়ত স্বীকার করবেন, মোস্ট হিউমিলিয়েটিং। আমি প্রতিবাদ জানাতেই তিনি চিৎকার শুরু করেছেন। আমার সম্পর্কে যখন কিছু লেখা হচ্ছে, আপনিই বলুন, কি লিখছেন সেটা জানার অধিকার কি আমার নেই ?

প্রতিবাদের মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেয়ে তিনি হুকুম দিলেন—স্টপ দিস ননসেন্স !

পঞ্চাশজনের ভেতরে সেবার পাঁচজনকে নেওয়া হয়েছিল। তাতে দেখা গেল গঙ্গাধর চ্যাটার্জীর নাম সর্বাগ্রে।

এবার ট্রেনিং-এর পালা। ক্লাস হচ্ছে। ক্লাসের প্রথম দিনেই আবার মহা হুলুস্থুল। ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপ্যাল 'দারুণ সাহেব', যদিও দেশী। দেশী না হলে অবশ্য কেউ 'দারুণ' সাহেব হয়ে উঠতে পারে না। তিনি প্রত্যেক ছাত্রকে দাঁড় কর্‌িয়ে কে কোথায় পড়েছে জিজ্ঞাসা করছেন। কেউ বলছে গ্ল্যাসগো, কেউ শেফিল্ড, কেউ বা আবার ব্রিসটল। গঙ্গাধরের দিকে আঙুল দেখিয়ে তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন—অ্যাণ্ড ইউ ইয়ংম্যান ?

গঙ্গাধর দাঁড়িয়ে উঠে বেশ গর্বিত স্বরে একটি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করলেন।

তাচ্ছিল্যের স্বরে প্রিন্সিপ্যাল বললেন—ও, আই সী, সীট ডাউন। যেন দেশী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যত কম আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। একটু থেমে তিনি মন্তব্য করলেন—ইয়োর ডিগ্রী ইজ নট ওয়ার্থ দ্য পেপার ইটস রিটন্ অন।

গঙ্গাধরের আঁতে লাগল। দেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কি এত নগণ্য যে, সেখানে বলার মত কিছু শেখানই হয় না ? তার প্রমাণ ত তিনি হাতে-নাতে দিয়েছেন। পাষণ্ডদের কিছুতেই চোখ খোলে না।

আবার প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন গঙ্গাধর—প্লিজ, উথড্র ইয়োর রিমার্ক স্যার, অর আই ওনট অ্যালাউ দ্য ক্লাস টু প্রসীড। যদি প্রমাণ করতে পারেন

আমি কিছু জানি না, এখুনি আমি ক্লাস ছেড়ে চলে যাব। আর চাকরী? এরকম চাকরীও আমি চাই না। আমার বিশ্ববিদ্যালয়কে অপমান করার অধিকার কারুর আছে বলে আমি মনে করি না। প্লিজ, উথড্র ইয়োর রিমার্ক, স্যর।'

প্রিন্সিপ্যালের মনে পড়ে গেল পার্সোন্যালিটি টেস্টের সময় এই তরুণ তুলকালাম কাণ্ড করেছিল। তা সত্ত্বেও তিনি একেই প্রথম স্থান দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। একে বেশী ঘাঁটান বিপজ্জনক। তাই প্রচণ্ড রাগ ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি বললেন—ওয়েল, ও. কে., আই অ্যাপলজাইস। উড ইউ নাও সীট ডাউন?

প্রতিমুহূর্তের এই অপমানকর পরিস্থিতির সঙ্গে আপোষ করে গঙ্গাধর চ্যাটার্জী বেশীদিন ওখানে থাকতে পারেননি। চমক লাগান অত বড় টাটার চাকরীও এক কথায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় হিসেবে যেখানে সম্মান নেই, মাথা উঁচু করে থাকলে যেখানে প্রতিমুহূর্তে অপমানিত হতে হয়, সেরকম চাকরী তাঁর ধাতে পোষাবে না। জীবনের প্রারম্ভে অতটা আপোষ করতে তিনি রাজী নন।

আবার চাকরীর জন্য অ্যাপ্লিকেশন ছাড়তে লাগলেন। সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বসলেন। পাশ করলেন; সরকারী চাকরী জুটে গেল। কাজে নেমে পড়লেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় হয়। সরকারের তরফ থেকে রেলওয়ে কমিউনিকেশন ঠিকঠাক আছে কি-না তা দেখবার ভার পড়ল তাঁর ওপর। তিনি নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে সেই কাজই করছেন। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, কখনও বা পূর্ব বাংলা থেকে বর্মা পর্যন্ত—দিন নেই, রাত নেই, শুধু কাজ। কাজ পেলে আর রক্ষে নেই। একেবারে মশগুল, তাল রাখা মুশকিল।

কর্মীরা সবাই কিন্তু তাঁকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে। গঙ্গাধরের পাল্লায় পড়ে তাদের যে এত কাজ করতে হত, তাতে কেউই বিরক্ত হত না, কখনও বলত না—'পারব না বাবু'। আসলে নিজে ত হাত গুটিয়ে থাকতেন না, কর্মীরা কাজে তাই এত উৎসাহ পেত। কাজে যত ঝুঁকিই থাক না কেন, টু-শব্দটি করত না। বর্মার জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে গঙ্গাধর কর্মীদের সঙ্গে একত্রে থেকেছেন, অফিসারী-সুলভ মনোভাব নিয়ে নিজেকে অসূর্যম্পশ্যা করে রাখার নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। কাজকর্ম হয়ে গেলে ওদের সঙ্গে হাসি-গল্প-তামাসা করতেও ভালবাসতেন। হয়ত কুড়ি-পঁচিশটা টাকা দিয়ে বললেন—এই সাদিক, একটা কাজ কর, ভাল দেখে তিনটে মুরগী নিয়ে আয়। তোদের মত ঝালফাল দিয়ে রান্না করত—সবাই মিলে মজা

করে খাব। তখন ওদের কি উৎসাহ। তাঁবুতে হ্যাজাক লন্ঠন জ্বালিয়ে মুসলমান কর্মীদের সঙ্গে একাসনে বসে খাবার যে আনন্দ তিনি তা কোন-দিন ভোলেননি। পরেও অনেক সময় রগড় করে এইসব গল্প ফেঁদে বসতেন। অনেক সময় রাতের আবছা আলোয় জমজমাট আসর বসত। গঙ্গাধরের কাছে কর্ম ও কর্মী আলাদা নয়, এবং সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কোন তফাৎ আছে, তিনি বিশ্বাস করতেন না।

তখনও তিনি তাঁবুতেই আছেন ; দিন-রাত কাজ, আর খানাপিনা এদেরই সঙ্গে। ততদিনে গঙ্গাধর এদের আপনজন হয়ে গেছেন। রোজ শুক্রবারে মুসলমান কর্মীরা নামাজ পড়ে। দেখে দেখে ওনারও একদিন শখ হল, এদের সঙ্গে নামাজ পড়বেন। বলার সঙ্গে সঙ্গে এদের উৎসাহ আর ধরে না। কিন্তু মুসলমান ফোরম্যান বেঁকে বসল--তা কী হয় কর্তা? হিঁদুর সঙ্গে একাসনে বসে নামাজ পড়া ··।

আর শুনতে চাইলেন না গঙ্গাধর। ধীর পদক্ষেপে সরে গেলেন। কোন কর্মীই আর সেদিন নামাজ পড়ল না। বড় আঘাত পেয়েছিল ওরা—কর্তা কি শুধু হিঁদু? কর্তা আমাদের আপন মানুষ, কর্তা আমাদের বন্ধু।

পুরনো এসব কথা গঙ্গাধরের মনে পড়ে। ইন্‌ড্রাস্‌ট্রিয়াল পলিসি রিঅ্যাপ্রাইজালের নোট্‌টা আর একবার দেখে নিলেন। আজই দিতে হবে। পুরনো কথা ছায়ার মত ঘিরে থাকে মানুষকে! ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ বছর পরে সেই অতীতটা যেন আর চেনা যায় না। কত বদলে গেছে, কত রূপান্তর ঘটেছে। কিন্তু কর্মীদের ওপর তাঁর এ বিশ্বাস এখনও পাল্‌টায়নি। তাঁর বিশ্বাস কাজ করিয়ে নিতে পারলে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে। কাজ করিয়ে নিতে কি আজকাল কেউ চায়? ব্রিটিশ আমলেও ত কতভাবে পরীক্ষা দিতে হয়েছে, এখনও দেশ গড়ার কাজে সেই একই রকম পরীক্ষা। তবে এত সহজে আমাদের পদচ্যুতি ঘটে কেন? ব্যক্তিগত সুবিধেটাই কেন আগে দেখি, শুধু নিজের সুখ ও আরামটার কথাই চিন্তা করি, একদিন হয়ত নিজেকে বিক্রি করেও ফেলি? কেন প্রলোভন এড়িয়ে যেতে পারি না এও এক মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ।

সেবার বড় কঠিন এক পরীক্ষায় পড়েছিলেন গঙ্গাধর। যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্র পৌঁছবার দায়িত্ব পড়েছে বড় বড় চাঁইদের ওপর। রাঘব-বোয়ালেরা তখন সব লুটতরাজে ব্যস্ত। দিনে-দুপুরে লুটতরাজ চলছে; তা বন্ধ করতেই বোধ হয় গঙ্গাধরকে দায়িত্ব দেওয়া হল। ততদিনে অনেস্ট অফিসার হিসেবে গঙ্গাধরের সুনাম হয়ে গেছে। চুরি-জোচ্চুরির জায়গায় গঙ্গাধর যেতে চাননি, কিন্তু সরকারী চাকরীতে 'না-হ্যাঁ' বলার কোন উপায়

নেই। বুঝতে পারলেন চুরিটুরি বন্ধ করলে সরকার খুশী হবেন কিন্তু রাঘব-বোয়ালেরা তাঁকে ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু চ্যালেঞ্জ নিয়ে একবার কাজে নেমে পড়লে গঙ্গাধর কোনদিন পিছপা হতে জানেন না, তা যত বড় বিপদই আসুক।

কয়েকদিন দেখে-শুনেই বুঝলেন সবাই একজোট হয়ে অসাধ্য সাধন করে যাচ্ছে। শক্ত হাতে হাল না ধরলে এ চুরি বন্ধ করা মুশকিল। চুরি বন্ধ করতে গিয়ে নিজের জীবন সংশয়ও হতে পারে। দু-চোখ খুলে তখন দেখেছিলেন কায়েমী স্বার্থ কাকে বলে, অদৃশ্য হাতগুলো কিভাবে ধোঁকা দেয় মানুষকে। রাতের পর রাত জেগে লক্ষ্য রাখেন, কে কোথায় যায়, কে আসে, কে-কার সঙ্গে দেখা করে, কোন রাতের অন্ধকারে কে-কার সঙ্গে হাত মেলায়। যখন তখন, অনেক সময়ে রাত দুপুরেও একটা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, হাতে শুধু একটা টর্চ। যুদ্ধের বাজারে যা হয়, প্রকৃত যা সরবরাহ হয়, তার দশগুণ চুরি যায়। একদিন দেখেন একটা তামা বোঝাই ট্রাক গেটের মধ্যে গিয়ে একটু থামছে আর বার বার ঘুরে ঘুরে আসছে, আর লেখা হয়ে যাচ্ছে এক থেকে দশ ট্রাক। সেই রাতদুপুরে সবকটাকে ধরে সঙ্গে সঙ্গে সাসপেণ্ড করলেন, আর কিছু লোককে ব্ল্যাকলিস্ট্। এরা দলে ভারী; নিজেদের বাঁচাতে গঙ্গাধরকে শেষ করে দিতে পারত। এদের হাতেনাতে ধরার সময় গঙ্গাধরের কিন্তু একথা মনে ছিল না যে এরা অনেক বেশী শক্তিশালী ও দলে ভারী; কারুর সর্বনাশ ঘটাতে এদের এক মুহূর্ত সময় লাগে না। আসলে এরা গঙ্গাধরকে অত রাতে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল, গঙ্গাধরের সাহস ও ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি তাদের ছিল না। সেবার অনেক বড় বড় রাঘব-বোয়াল গঙ্গাধরের জালে ধরা পড়েছিল।

মৈত্রেয়ী তখন রোজই বলতেন--দেখো গঙ্গাধরবাবু, পা-পিছলিয়ে পড় না যেন।

আর থাকতে না পেরে একদিন গঙ্গাধর বললেন--রোজ তুমি ঐ একই কথা বল কেন?

মৈত্রেয়ীর জবাব দিতে একটুও দেরী হয় না, বলেন, আমাদের সংসারে যে বড় অভাব-অনটন! মাস-মাইনায় পনেরো দিনের বেশী চলে না। বাবা বৃদ্ধ, ননদের বিয়ে হয়ে গেলেও তার ধার আছে, সে ধার শোধ করতে হচ্ছে। ছেলেটাকে একটু ফলও খাওয়াতে পারি না।

গঙ্গাধরের সময়টা তখন খুব খারাপ যাচ্ছে। একদিকে এরা নিত্য-নতুন প্রলোভন দেখাচ্ছে, হাত করার নানা ফন্দি-ফিকির চলছে অফিসে; অন্য-

দিকে গঙ্গাধরকে যে আর বিশ্বাস করা যায় না, তা প্রমাণ করতে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে। সেসব কথা কিছুই তিনি মৈত্রেয়ীকে খুলে বলতে সাহস পান না। নিজেকে মুক্ত রাখার প্রচণ্ড চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি। মুখের হাসি কবে নিভে গেছে। তার ওপরে মন্ত্র-উচ্চারণের মত মৈত্রেয়ীর মুখে রোজ একই কথা শুনতে শুনতে তিনিও বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। সেদিন আর থাকতে না পেরে বললেন--অনেক সময় আমারও আজকাল মনে হয়, কিসের জন্য এত অভাব-অনটন সইছি, চাইলেই ত সুখে থাকতে পারি। জানি, পা-পিছলতে এক মিনিটও লাগবে না--তাও তুমি ও-কথাটা রোজ আমাকে বল কেন? জান, আমার টেলিফোন ট্যাপ করা হচ্ছে, আমার ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে? আমি কোথায় যাই, কার সঙ্গে কথা বলি--সব এরা লক্ষ্য রাখছে। যারা পেছন থেকে এসব করাচ্ছে তারা যদি কোন কারণে জানতে পারে স্ত্রী পর্যন্ত গঙ্গাধরকে সন্দেহ করে এবং সন্দেহ করে বলেই রোজ এ-কথাটা বলে, তাহলে তুমিও ওদের হাতে আরও একটা শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দেবে একথাটা কি ভেবে দেখেছ?

--হ্যাঁ, মৈত্রেয়ী দৃঢ় স্বরে বললেন--আমি জানি যা আমি করছি, ওরা যদি একবার জানতে পারে তোমার ক্ষতি হবে। তবুও আমি বলব। বলব, কারণ, আমরা অতি সাধারণ মানুষ, গঙ্গাধরবাবু। রাগ কোরো না। ভেবে দেখো, যারা পা-পিছলিয়ে পড়েছে, তারা আমাদের চেয়ে যে বেশী দুর্বল বা অভাবগ্রস্ত এটা ভাবার কোন কারণ নেই। হঠাৎ-ই একদিন তাদের পা-পিছলিয়ে গিয়েছিল, শত চেষ্টা করেও আর তারা উঠতে পারেনি। আমি তাই রোজই তোমাকে স্মরণ করাব যেন পা-পিছলে পড়ে যেও না, গঙ্গাধরবাবু!

গঙ্গাধর কঠিন স্বরে বললেন--ওটা তুমি কোরো না, আমি বলছি ওতে আমার ক্ষতি হবে।

মৈত্রেয়ীর যেন জেদ্ চেপে যায়। গঙ্গাধরের অনুনয়েও তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না। বললেন--তুমি চাইছ না, আমি জানি। তোমার আপত্তি সত্ত্বেও আমি বলব।

মৈত্রেয়ীর মনের জোর পরীক্ষা করতেই যেন গঙ্গাধর জিজ্ঞাসা করলেন--যদি পা-পিছলিয়েই যায়, তুমি কী করবে শুনি?

--ছেলের হাত ধরে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে সোজা চলে যাব।

--কেন?

--ওরকম বাপের কাছে ছেলেকে আমি কিছুতেই রাখব না; ছেলে মানুষ হবে না।

গঙ্গাধর অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। একটু হেসে মৈত্রেয়ীকে আশ্বস্ত করলেন--বাপ্‌-রে-বাপ! আচ্ছা বেশ, রোজই তুমি ঐ কথা বলো, দোহাই ছেলের হাত ধরে যেন পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেও না।

অফিসে গঙ্গাধরকে কোনমতে যখন কাৎ করা গেল না তখন রাঘব-বোয়ালেরা অন্য পথ ধরল। এক একদিন জিনিসপত্রে বাড়ি-ঘর ভরে যেতে লাগল। দাতা-কর্ণদের তিনি গেট থেকেই বিদায় দিতেন। একদিন ফ্রিজ সমেত ট্রাক-ভর্তি জিনিস সোজা দোতলায় উঠিয়ে আনা হয়েছে; বাইরে দাঁড় করান আছে নতুন ফিয়েট গাড়ী, ছেলের নামে রেজিস্ট্রেশন্‌ করা। তিনি পাগলের মত সেইসব জিনিস ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। মৈত্রেয়ী বাধা দিয়ে বলেছিলেন--জিনিস না নাও সেটা তোমার মরাল রাইট, কিন্তু ওভাবে জিনিস নষ্ট করার অধিকার ত তোমার নেই।

গঙ্গাধর অধৈর্য হয়ে বললেন--তুমি জান না মৈত্রেয়ী, ওদের সামনে আমাকে প্রমাণ করতেই হবে, অ্যাই অ্যাম এ ভেরী ন্যাস্টি পারসন্‌--ভয়ানক রগচটা ও মেজাজী। নয়ত এদের হাত থেকে বাঁচবার আর কোন উপায় নেই। তুমি যখন ছেলের হাত ধরে চলে যাবে বলে শাসিয়েছ, তখন এদের হাত থেকে রেহাই পাবার উপায় ত আমাকে ভাবতেই হবে।

দশ বছর পর্যন্ত ঐ লোকগুলো গঙ্গাধরের পিছু লেগে ছিল। সব যখন চুকে গেছে গঙ্গাধর তখন বোম্বাইতে বদলী হয়েছেন। সেই সময় মিথ্যা অভিযোগ এনে গঙ্গাধরের বাড়ি-ঘর সার্চ করা হল। চূড়ান্ত অপমানিত হয়েছিলেন গঙ্গাধর। তাঁর মুখে হাসি ছিল না, চেহারা প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। মৈত্রেয়ী বোঝাতেন, তিনি বাধা দিয়ে বলতেন--তোমরা সবাই আমাকে করুণা করছ, আমি কারুর করুণা চাই না। প্রায় বছরখানেক গঙ্গাধরের মনের এ অবস্থা ছিল। পরে অবশ্য সরকার ভুল বুঝতে পেরে এপলজি চেয়েছিল, বলেছিল--'এ কেস্‌ অব ওভারসাইট।' মৈত্রেয়ীর বাড়ীর সবাই তখন চাপাচাপি করেছিল--সরকার যখন রিটন্‌ অ্যাপলজি চেয়েছে, তখন সরকারের বিরুদ্ধে কেস্‌ ঠুকে দাও। যে মানসিক নির্যাতন তিনি মুখ বুঁজে সহ্য করেছিলেন, তার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বভাবতই মনে হতে পারে--এবার সরকারকে বেকায়দায় ফেলি। কিন্তু তিনি রাজী হননি, বলেছিলেন, চাকরী ছেড়ে দেবার রসদ যদি থাকত, তাহলে নিশ্চয় সরকারের বিরুদ্ধে কেস্‌ করতাম। তা যখন পারব না, সরকারের অ্যাপলজিটা গুড ফেইথে নিতে হবে। ও-নিয়ে তোমরা আর জোর কোরো না। তখন একমাত্র শ্বশুরমশায় তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন--তোরা শুধু কেস্‌ করতে বলছিস্‌। ওর যুক্তিটা তোরা কেউ শুনলি না। কি ট্রিমেনডাস্‌

লয়েলিটি থাকলে ও-কথা বলা যায়—তোরা সেটা একবার ভাবলি না?

—কিগো, তোমার শরীর খারাপ নাকি? সেই তখন থেকে চোখ বুঁজে বসে আছ যে! মৈত্রেয়ী হেসে ড্রইংরুমে এসে বসলেন। ভেবেছিলেন, কাজ করছেন, কিন্তু তখন থেকে বসে বসে যে ঝিমোচ্ছেন, তা খেয়াল করেননি।

গঙ্গাধর নড়ে-চড়ে বসলেন, কাগজটা হাতে নিয়ে পড়বার ভঙ্গীতে বললেন --না, পুরনো কথা ভাবতে ভাবতে বোধ হয় একটু চোখ লেগে গিয়েছিল।

ধীরেন দু-জনের জন্যে চায়ের পেয়ালা রেখে যায়।

মৈত্রেয়ী নিজেরটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন--নাও, চা খাও। কি এত ভাব আজকাল? হ্যাঁ, অলকা ফোন করেছিল। জিজ্ঞেস করছিল আসতে পারে কি না; বললাম—এসো, এখন আমরা বুড়োবুড়ি, হাতে অনেক অবসর।

গঙ্গাধর বললেন--আমার চেয়ে তোমার কাছে অলকা অনেক ফ্রী। ছোটবেলায় কলকাতার বাসায় চন্দ্রভানুর হাত ধরে যখন আসত, তুমি ওকে দু-তিন দিন নিজের কাছে রেখে দিতে—মনে আছে?

মৈত্রেয়ী হেসে সায় দিলেন--খুব মনে আছে। সন্দীপটা যেমন ওকে ভালবাসত, তেমনি শাসনও করত। কথা না শুনলে ধরে মারও দিত। অথচ কেমন চাপা মেয়ে দেখ, কোনদিন মুখ ফুটে নালিশ করেনি।

গঙ্গাধর বললেন—বিলেতে যাবার আগে ওরা যেবার ব্যাঙ্গালোরে এসেছিল সেবারই অলকাকে অনেকদিন পরে দেখলাম। খুবই সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত। যেদিন ফ্যাক্টরি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম, চন্দ্রভানুর চেয়ে অলকাই বেশী প্রশ্ন করেছিল, খুব রেলিভ্যান্ট্ সব প্রশ্ন। খুব ভাল লেগেছিল। ওর একটা অনুসন্ধিৎসু মন আছে আমি লক্ষ্য করেছি।

মৈত্রেয়ী হেসে বললেন--সেটা আমিও দেখেছি। আজকাল তোমার কাছে বিশেষ ঘেঁষে না, আমাকেই যত রাজ্যের প্রশ্ন করে। আসলে ও জানে ত, তুমি কিছু-না-কিছু নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাক, ডিস্টার্ব করতে চায় না।

—হ্যাঁ, খুব খেয়াল-টেয়াল রেখে চলে। এই কমন্সেন্সটা আছে বলেই আমার মনে হয় ও নেহেরু ইউনিভারসিটিতে লেকচারার হিসেবে নাম করেছে।

মৈত্রেয়ী বললেন—হিস্ট্রি নিয়ে পড়লে মানুষের কমন্সেন্সটা এমনিতেই বাড়ে। তার ওপর ও আবার বিলেতে রিসার্চ করেছে, খুব শক্ত একটা সাবজেক্ট নিয়ে। ব্রিটিশ আমলে 'নেটিভদের অ্যাটিটিউড্ নিয়ে ভাল

লিখেছিল নিশ্চয়, নয়ত বিলেতের পি-এইচ.ডি. পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা ?

—বিলেতে কি নিয়ে রিসার্চ করেছে তা অবশ্য আমি জানতাম না ; আমি জানতেও চাইনি, ও নিজেও কোনদিন বলেনি। আমি খুব একটা কৌতূহল দেখাইনি ; কারণ বিলেত-আমেরিকায় ত আজকাল সবাই যায়, ওটা কোন নতুন ব্যাপার নয়।

—ঠিক বলেছ। সমাজ কত পাল্‌টে গেছে দেখ। আমার বাবা যখন বিলেতে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গিয়েছিলেন, সবাই ভাবত, এই বুঝি বাবা গোল্লায় গেল। অসৎ সঙ্গের পাল্লায় পড়েছেন কিনা তাই জানতে দাদু ত রীতিমত 'ফিলার' পাঠিয়ে যেতেন। দেশে ফিরে আসার পরও কত যে তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছিল, ভাবলে কষ্ট হয়। যাবার সময়—মৈত্রেয়ী ভুলে যান, একই গল্প তিনি বেশ কয়েকবার গঙ্গাধরকে শুনিয়েছেন, গঙ্গাধর তাও বাধা দেন না। পুরনো কথা বার বার শুনতে ভাল লাগে। ছেলে অত ভাল রেজাল্ট করেছে বলে বিলেতে পাঠাবার অনুমতি আদায় করতে স্যর আশুতোষ প্রায় রোজই একবার দাদুর কাছে আসতেন। দাদু ত ছেলেকে কিছুতেই বিলেতে পাঠাবেন না ; ওনার ধারণা ছিল বিলেতে গেলে ছেলে একেবারে গোল্লায় যাবে। দাদু বিরক্ত হয়ে বলতেন--তোমার পোলারে পাঠাও না কেন্, আমার কবুতরটারে ধইরা টানাটানি করতাস ক্যান ? বাবার খুব যাবার ইচ্ছা, তাই অনশন শুরু করেছিলেন। বাড়িতে আমাদের এক বিধবা পিসি ছিলেন, তিনি বাবার হয়ে ওকালতি করতেন, কখনও ভয় দেখাতেন, কখনও-বা ঝগড়া। তখন অনশনের যুগ। তাতেই বোধ হয় কাজ হয়েছিল। পিসিমা ত জানতেন না অনশনও আজকের দিনের মতই ; শ্বশুরবাড়িতে বাবাকে জোর করে খাইয়ে দেওয়া হত।

বাইরে কলিং বেল বেজে উঠল। মৈত্রেয়ী দরজা খুলে অলকাকে দেখে হেসে বললেন—এসো।

অলকা ঘরে ঢুকে হ্যাণ্ড ব্যাগটা সোফার এক পাশে রেখে গঙ্গাধর মেসোর কাছে গিয়ে বলল—আপনি কেমন আছেন ?

গঙ্গাধর অলকাকে কাছে বসিয়ে বললেন--আমার কথা পরে হবে। আগে তুমি কেমন আছ, বল ? লেকচারার হিসেবে তুমি নাকি বেশ নাম করেছ ?

--ঐ আর কি। বদনাম করার সুযোগ দিই না, তাই নাম। গঙ্গাধর-মৈত্রেয়ী দু-জনেই হেসে উঠলেন।

গঙ্গাধর বললেন—চন্দ্রভানুর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। সেদিন অবশ্য টেলিফোনে কথা হয়েছিল। কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত আছেন নিশ্চয়।

--বাবা, গণেশ টাওয়ার নিয়ে খুব ব্যস্ত।

মৈত্রেয়ী কৌতূহলী হলেন--গণেশ টাওয়ার ব্যাপারটা কি বল ত?

--আমিও ঠিক জানি না মাসিমা। তবে রাজধানীতে এ নিয়ে খুব হৈ-চৈ পড়েছে। বড় বড় বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, দেখেছেন নিশ্চয়। চারটে দেশ থেকে স্থপতিরা এসেছেন, আর যা হয়, বিদেশী এক্সপার্টরা এলে দেশী শিল্পীরা ঠিক যেন পাত্তা পায় না।

গঙ্গাধর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন--তোমার বাবা এর মধ্যে গেলেন কেন? ওনার যা স্বভাব, অপছন্দ হলে ত দু-কথা শুনিয়ে দেবেন।

--কেন গেলেন বলতে পারব না। বাবার ঐ বিষ্ণু দিগম্বরের কাজটা পরাঞ্জপের মানে ঐ গণেশ ফাউণ্ডেশনের হর্তাকর্তার খুব পছন্দ হয়েছিল, তাই বোধ হয় তিনি ছাড়েননি। তবে বাবার আপত্তি ছিল আমি জানি।

গঙ্গাধর বললেন--চন্দ্রভানুর ঐ কাজটা আমিও দেখেছি। খুব বলিষ্ঠ কাজ। বিষ্ণু দিগম্বরের মুখে যে সৌম্য ও শান্তির ভাবটা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, ভেতরে আনন্দ না থাকলে পাথরে ও-জিনিস আনা যায় না।

মৈত্রেয়ী বললেন--আমিও সেটা জানি। সুন্দর কাজ ওনার।

অলকা বলল--বাবাকে দেখে আমি ভাবি, কাজ করে কি লাভ? যারা নাম পায়, তারা কিন্তু অত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে না বলে আমার ধারণা।

গঙ্গাধর আপত্তিসূচক হাসলেন--ওটা খুব কন্ট্রোভ্যারশ্যাল টপিক। আর একদিন এর জবাব দেব।

অলকা বলল--নিজের সম্বন্ধে আজ দেখি কোন কথাই বলতে চাইছেন না, নিশ্চয়ই আপনি মুডে নেই।

মৈত্রেয়ী হেসে বললেন--উনি সকাল থেকেই গম্ভীর হয়ে আছেন। ভারতীয় কর্মীদের ভবিষ্যৎ নিয়েই বোধ হয় সারাক্ষণ ভাবেন। কাজের লোক ছিলেন ত, তাই আজকালকার কাজে অনীহা দেখলে খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। নিজেও যখন কাজ করতেন, দেশের কাজ ভেবেই করতেন। আমাকে কতদিন বলেছেন--মৈত্রেয়ী, এরা বোধ হয় পারবে না। যতটা পারত, তার কিছুই হয়ত করতে পারবে না। বড় গণ্ডগোল পাকিয়ে ফেলছে। কষ্ট হয় ভাবলে।

অলকা আগ্রহ দেখিয়ে বলল--আপনি যদি পুরনো দিনের কথা বলতে রাজী থাকেন, আমি রোজ আসতে রাজী। অতীতের কথা শুনতে আমারও খুব ভাল লাগে। বই পড়ার চেয়ে তা অনেক বেশী ইন্টারেস্টিং। জানেন, ঐতিহাসিক কার-এর [Carr] কথাটা আমি খুব মানি, শুধু ডকুমেন্ট বা

এভিডেন্স ইতিহাস নয়। সেগুলো জড়ো করাও নয়। ইতিহাস হল প্রাণবন্ত অতীতের সঙ্গে প্রাণবন্ত বর্তমানের সংযোগ স্থাপন—এ লিঙ্ক্ বিটউইন্ দ্য লীভিং পাস্ট এ্যাণ্ড দ্য লীভিং প্রেজেন্ট। এ ব্যাপারে যে যত সফল, সে তত বড় ঐতিহাসিক।

গঙ্গাধর জিজ্ঞাসা করলেন—তার মানে ঐতিহাসিক কার সাবজেক্টিভ ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছেন।

—খুব। মাসিমা জানেন, প্রথম যখন কার-এর বই 'হোয়াট্ ইজ হিস্ট্রি' পড়ি, অবাক হয়েছিলাম। আমার থিসিসের যে বিষয় ছিল, তাতে ব্যক্তিগত ধারণা ও বিশ্বাস এসে পড়তে বাধ্য। হঠাৎ কার-এর বইটা পড়ে, কলেজ জীবনেও পড়েছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা নিয়ে যখন আবার পড়লাম, দেখলাম অনেক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আছে এতে। আমারও সাহস বেড়ে গেল, যা-তা লিখে থিসিস্-এ প্রশংসা পেয়েছিলাম।

মৈত্রেয়ী হাসলেন—যা-তা লিখে পাওনি, ওটা ওদেশে হবার উপায় নেই। চীন-রাশিয়া বাদ দিলে আমরাও দুনিয়াটা ঘুরে একটু দেখেছি।

অলকা একটু অপ্রস্তুত হল। বলল—আপনাদের অতীত কত গ্ল্যরিয়াস্ ছিল, ভুলে যাই। এখানে এলে নিজের কথাই বেশী বলি। আসলে আমার অনেক বলার আছে, আপনাদের জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাই অথবা যা ভাবছি, আপনাদের কাছ থেকে তার সমর্থন খুঁজি, ঠিক জানি না।

ধীরেন তিন কাপ কফি দিয়ে গেল।

অলকার হাতে কফির পেয়ালাটা তুলে দিয়ে মৈত্রেয়ী বললেন—আজ খেয়ে যাও। রান্না অবশ্য কিছুই করিনি।

—না মাসিমা, লাঞ্চ আওয়ারে একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা। তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ করব। আজ থাক—আর একদিন আসব।

অলকা শুনেছিল সন্দীপ আসবে কদিনের মধ্যে। কিন্তু তার লক্ষণ দেখছে না। জিজ্ঞেস করতেও কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে।

মৈত্রেয়ী সেই কথাটাই তুললেন—জান ত সন্দীপ পরশু আসছে।

—পরশু ? আমি ভাবলাম এতদিনে বোধ হয় এসে গেছে।

মৈত্রেয়ী বললেন—না, কদিন দেরী হচ্ছে কারণ এবার আসছে অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে। সিভিলিয়ান লাইফটা কিরকম দেখবে; ও আর নেভীতে থাকতে চাইছে না।

অলকা খুশী হল—তাহলে খুব ভাল হয়।

গঙ্গাধর কোন উত্তর দিলেন না।

মৈত্রেয়ী বললেন—আবার নতুন করে জীবন শুরু করা, একটু মুশকিল ত বটেই।

অলকা আশ্বাস দিল—সন্দীপের কোন অসুবিধা হবে না, দেখবেন। বলেই উঠে পড়ল।

মৈত্রেয়ী বললেন—আবার এসো।

॥ পাঁচ ॥

চন্দ্রভানু ভর্মাকে দেখলে একজন গণ্যমান্য ভাস্কর বলে মনেই হয় না। এ-যুগে গণ্যমান্য হতে গেলে যে পরিমাণ পাবলিক রিলেশন, ছুটোছুটি আর তোষামোদ করতে হয় ওটা চন্দ্রভানুর ধাতে নেই। কালচারের চাঁই ব্যক্তিদের সুপ্রসন্ন রাখতে যেসব অদৃশ্য কর্মকাণ্ডে প্রতিনিয়ত গলদঘর্ম হতে হয় লোকেদের শুধু একটু নাম-যশ-প্রতিপত্তি বা বিদেশ ভ্রমণের জন্য, অতটা করতে তিনি রাজী ছিলেন না। তাই যতটা জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে পারতেন, তা পাননি। এজন্য চন্দ্রভানুর এতটুকু রিগ্রেট নেই; কারুর ওপরে অভিমান বা রাগও নেই। আর্টকে তিনি সুখের জন্য পণ্যবস্তুতে পরিণত করতে রাজী নন; নিজের সৃষ্টির একপেশে মূল্যায়নেও তিনি বিচলিত নন। আশেপাশের প্রতিষ্ঠাবান লোকেদের কলরব অবশ্য লেগেই থাকে; সেই কলরব তিনি কখনও বা নিজেই শোনেন, কখনও বা স্ত্রী নির্মলার 'ভায়া-মিডিয়া' হয়ে কানে আসে। চন্দ্রভানু শুধু একটু হাসেন।

চন্দ্রভানুর কাছে আর্ট অন্তরের জিনিস; জীবনকে শান্তিতে ও আনন্দে ভরে রাখার জন্যই আর্ট। এখানে-ওখানে যান-না কেন তা নিয়ে সুহৃদরা পীড়াপীড়ি করলে তিনি ঠাট্টা করে বলেন—বেশী অর্থ, বেশী যশ হলে উপলব্ধির ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটে। চুপচাপ, বনে-মনে-কোণে থাকাই ভাল।

চন্দ্রভানু-চরিত্রের আরও একটা বৈশিষ্ট্য, তিনি কখনও গায়ে পড়ে নিজের কথা বলেন না। তাঁর শিল্পকাজ ও ভাস্কর্য যে কোথায় কিভাবে ছড়িয়ে

আছে, নিজে না জানলেও নির্মলার সেদিকে কড়া নজর। চন্দ্রভানুর সামাজিক প্রতিপত্তি হয়নি বলে নির্মলার কতটা দুঃখ সে ফিরিস্তি নির্মলা অত দেন না বটে, কিন্তু বোঝা যায় যে অতটা নির্বিকার ও সহনশীল মানুষকে নিয়ে ঘর করতে তাঁর বিড়ম্বনার অন্ত নেই। স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সব সময় একমত না হতে পারলেও চন্দ্রভানুর সঙ্গে চিরকাল একাত্ম হবার চেষ্টা করেছেন। চন্দ্রভানুর সব কাজে সব সময় সহায়তা করতে তিনি সচেষ্ট। পার্টিতে বা আসরে গেলেই যা একটু বিপদ হত ; চন্দ্রভানুর সম্পর্কে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর দিতে গিয়ে নির্মলার হঠাৎ চোখে পড়তো চন্দ্রভানুর আপত্তি-ভরা মুখের দিকে। তিনি বলতে গিয়েও মাঝপথে থেমে যেতেন। এতে শ্রোতাদের কৌতূহল আরও বাড়ত। কিন্তু নির্মলা আর বেশীদূর এগুতে সাহস পেতেন না। আর্টকে ভাঙিয়ে নির্মলাও সামাজিক স্টেটাস্ চাননি, চাইলেও কোন লাভ হত না।

চন্দ্রভানুর সহনশীল ও অচঞ্চল স্বভাবের মাশুল নির্মলাকে অবশ্য সদা-সর্বদাই দিতে হয়। শকুন্তলা বড়, অলকা ছোট—এই দুই মেয়েকে মানুষ করতে তাঁর কম গলদঘর্ম হয়নি। সংসারের খুঁটিনাটি ঝক্কি, আদর-আব্দার পোয়াতে হলে ছেলে-মেয়েদের কাছে সব সময় আদর্শ হয়ে থাকা যায় না ; বাপকে আদর্শ স্থানীয় মানুষ হিসেবে খাড়া করতে ঘরের মানুষের ওপর কত যে ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে যায়---স্বামীরা তার হিসেব রাখতে চায় না। শকুন্তলা ও অলকা যখন মাকে ছেড়ে চন্দ্রভানুর আদর্শের কথা বেশী বলে বেড়ায়, তখন নির্মলার কষ্ট হয়। সে কষ্টটুকুর মধ্যে এত দিনের এত আত্মত্যাগ ও আত্মবঞ্চনা জড়িয়ে আছে যে ও-ব্যথাটুকু মনের মধ্যে চেপে রাখতেই ভালবাসেন নির্মলা ; বলতে গেলেও দেখেছেন মেয়েদের সমর্থন বাপের ওপরেই বেশী। এক্ষেত্রে আর্ট মানে যদি চন্দ্রভানুকে শ্রদ্ধা করা বা ভালবাসা বোঝায় অথবা চন্দ্রভানু নিজে যা সব সময় বলেন - 'নীরব একটা প্রার্থনা'—তবে নির্মলা তাকে কাজে লাগিয়েছেন শকুন্তলা ও অলকাকে মানুষ করার ব্যাপারেই।

শকুন্তলা আর্কিটেক্ট্—বড় একটা কন্সালট্যান্সি ফার্মে কাজ করে। মাঝে মাঝে ট্যুরে যেতে হয়। শকুন্তলা বিয়ে করেনি, একা থাকার অভ্যাসটা পার্টি আর ট্যুরের মধ্যে সামঞ্জস্য করে নিয়েছে। দেখাশোনা বা পরিবারের নানা রকম সোশ্যাল সার্ভিসেও শকুন্তলা বেশ স্বাবলম্বী। বিয়ে করেনি বলে নির্মলার মনে একটু কষ্ট থাকলেও তিনি মেয়ের স্বাধীনতায় কখনও হস্তক্ষেপ করেননি। বিলেতে থাকতে শকুন্তলা এডওয়ার্ড নামে একজন বিদেশীর প্রেমে পড়েছিল! এডওয়ার্ডের দাদু স্যর রবার্ট এডওয়ার্ড ব্রিটিশ

আমলে বড় অফিসার ছিলেন। তিনি প্রচুর খেতাব, সুখ্যাতি এবং প্রচুর অর্থ নিয়ে ইংল্যাণ্ডে বাড়ি করে ক্ষয়িষ্ণু অ্যারিস্টোক্র্যাসি নিয়ে নব্বই বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা বললে বোঝাই যেত না ভারতবর্ষ এখন এক স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজেকে গড়ায় ব্যস্ত। ইংল্যাণ্ডের সাহায্য ছাড়া ভারত কিভাবে এগোবে স্যর এডওয়ার্ড তা বুঝে উঠতে পারতেন না।

বলতেন—ইট্‌স্ সীমপ্লি নট্ পসিব্‌ল্ উইদাউট্ আওর অ্যাসিসট্যানস্।

ছেলে নিকলসন একজন ব্যাঙ্কার। তিনি হেসে বলতেন—দে আর ডুইং ইট্। দে আর ডুইং ইট্ ভেরী ওয়েল আণ্ডার নেহ্‌রু।

—সে কী? অবিশ্বাস কঠিন হয়ে উঠত স্যর এডওয়ার্ডের মুখে। বলতেন—নেহেরু ত কোন সিদ্ধান্তই নিতে পারতেন না। হী'স্ সোশ্যালিজম্ ওয়াজ এ বিগ্ জোক। ইট্ ওয়াজ গান্ধী, উই ফিয়ার্ড!

দ্যাট ওয়াজ এ ডিফারেন্ট ইণ্ডিয়া আণ্ডার ইউ ফাদার। সে ভারত, এ ভারত নয়।

ছেলে নিকলসন আর তাঁর বাপ স্যর এডওয়ার্ডের মধ্যে এ-ধরনের আরও অনেক কথা হত। সে-সব কথার মধ্যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের কিছু আভাস, সুখ-স্বপ্নের কিছু বিলাস আর অনেকটাই আফসোস লুকিয়ে থাকত। এরকম একটা পরিবেশে অ্যালেন এডওয়ার্ড বড় হয়ে বেশ একটু আত্ম-অহমিকায় ভুগত। ও কিছুতেই মেনে নিতে পারেনি যে শকুন্তলা ইংল্যাণ্ডে ওরই সঙ্গে আর্কিটেক্‌ট হতে যাচ্ছে। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন মেয়ে শকুন্তলা। দু-জনের অত গভীর ভালবাসা সত্ত্বেও কোথায় যে ওদের বোঝা-পড়ার অভাব হয়েছিল, কি কারণে মধুর সম্পর্কের মধ্যে অকারণ ভুল বোঝাবুঝি জট পাকিয়ে গিয়েছিল, সে ইতিহাস অলকাও জানে না। ইংল্যাণ্ডে ওদের দু-জনকে অলকা ঘুরতে দেখেছে, পার্টি ও রেস্তোরাঁয় যেতে দেখেছে, অনেক সময় নিজেও ওদের সঙ্গে গেছে। কিন্তু ভালবাসার রঙিন আকাশে কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে হঠাৎ কাল মেঘ জমে তা জানার কৌতূহল অলকার কিছু কম ছিল না; জানতে চাইলেও হয়ত দিদি বলত না। দিদি মাকেও সে-সব ঘটনা খুলে বলেনি।

শকুন্তলা স্বাধীন পরিবেশে মানুষ হয়ে উঠেছে বলেই বোধ হয় ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধারণার ব্যাপারে অনমনীয়। একটু সুখ বা একটু আরামের স্বার্থে নিজের মতামত পাল্‌টাতে চিরকালই গররাজি, অনেকটা চন্দ্রভানুর মতই। পুরনো কথা ভুলতেই শকুন্তলা হয়ত নিজের কাজ নিয়ে একটু বেশী মেতে থাকে। মাঝে মাঝে শকুন্তলার কথায় বিদেশীদের সম্পর্কে ওর মনের জ্বালা বা ঝাল হয়ত প্রকাশ হয়ে পড়ে নিজেরই অজ্ঞাতে। বিদেশীদের উদারতা বা

গুণ সম্পর্কে কেউ যদি অতিমাত্রায় মুগ্ধ হয়ে কিছু বলতে শুরু করে [যা ভারতবর্ষের ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল মহলে খুব হতে দেখা যায়] শকুন্তলা কিছুক্ষণ নীরবে শুনে হঠাৎ একটা মন্তব্য জুড়ে দেয়, বলে—হ্যাঁ, ওরা আমাদের মতই ভাল, আবার আমাদের মতই ন্যাস্টি। প্রয়োজনে ওরাও ভয়ানক ন্যাস্টি হতে জানে। দেয়ার ইজ্‌ নাথিং স্পেশাল এ্যাবাউট দেম্‌।

অনেক সময় অলকার মনে হয় ভাগ্যিস্‌ দিদি বিয়ে করেনি, এতটা স্বাধীনচেতা হলে আজকাল কোন পুরুষের সঙ্গে ঘর বাঁধা যায় না। যদিও পুরুষসিংহেরা পার্টিতে বা সামাজিক আসরে আজকাল প্রায়শঃই বলে বেড়ায়, তারা সম-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। ওটা পুরুষ-শাসিত সমাজেরই অন্য এক রূপ। পুরুষের মন পেতে হলে এখনও ঘর-বার যেমন সামলাতে হয়, তেমনি রান্না-বান্নায় সুপটু না হলে চলে না ; ছেলেমেয়ে মানুষ করার দায়িত্বটাও পুরুষের অত নয়, যতটা মেয়েদের। এছাড়া আত্মীয়-স্বজনকে দেখাশোনা ত আছেই। ঘন ঘন পার্টির আয়োজন করাও মস্ত বড় দায়িত্ব। এর কোনটায় ঘাটতি পড়লে পুরুষ তার চিরাচরিত স্বভাবে গর্জে ওঠে। তখন দিদি হয়ত ততোধিক গর্জন করে নিশ্চয় বাপের বাড়ি ফিরে আসত। এ বরং ভাল, দিদি ও-পথই মাড়ায়নি। দিদির পরিবর্তন অবশ্য অলকার চোখে পড়ে না, হাসি-গল্পে তেমনি জমজমাট আর প্রয়োজনে বিজ্ঞের মত কথা।

শকুন্তলার সঙ্গে অলকার তফাৎ এখানেই, অলকা যাচাই না করে কোন জিনিস গ্রহণ করতে রাজী নয়। অলকার যাচাই করা মানে ঐতিহাসিক পটে ফেলে শুধু যে কার্যকারণ বিচার করা তাই নয়, একটার সঙ্গে অন্যটার সম্পর্কের মূল সূত্র কোথায় তার শেকড় ধরে টানাটানি করা। এক কথায়, সব কিছুর গভীরে গিয়ে অলকা তলিয়ে দেখতে চায় ; এই তলিয়ে দেখার ব্যাপারের সঙ্গে মিলেছে জানার আগ্রহ ও স্বভাবজাত কৌতূহল। সেজন্য অলকা অনেক বেশী প্রাণবন্ত, প্রতিবাদে সোচ্চার।

চন্দ্রভানু ভর্মা মাটির একটা নৃত্যরত গণেশের মডেল তৈরী করছেন। ওঁর স্টুডিও বলতে গ্যারেজের একটা ঘর ; সেটাকে ভেতরের বারান্দার সঙ্গে এমনভাবে মিশ খাইয়ে দেওয়া হয়েছে যে, বারান্দার যে-কোন লোক, এমন কি ঝি-চাকরও গ্যারেজের স্টুডিওতে ঢুকে পড়তে পারে। কিন্তু চন্দ্রভানু যখন আপনমনে একাগ্রে কাজ করেন, তাঁর ধারে-কাছে কেউ ঘেঁষতে সাহস করে না। বাইরের কাউকে তিনি স্টুডিওতে ডাকেন না, দেখার মত কিছু নেই বলেই। একটা বড় টেবিলে যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম রাখা ; তার ওপরে গণেশের মডেলটি প্ল্যাস্টিকের চাদর দিয়ে

ঢাকা। যখন স্টুডিওতে কাজ করেন, প্ল্যাস্টিকের চাদরটা খুলে নিয়ে মডেলটাকে নানাভাবে নিরীক্ষণ করেন। সামনে অন্য একটা টেবিলে মাটি রাখা আছে। হাতে মাটি তুলে নিয়ে মুখের ভাব-ভঙ্গী বা আদলের নানা সংস্কার ও সংশোধন করেন। কখনও একটু মাটি তুলে ফেলে দেন গণেশের মুখের আদল থেকে, সেই মাটির পিণ্ডটা গণেশের পেটে লেপে দেন বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে, জল ছিঁটিয়ে বাঁশের পাত দিয়ে মুখ বা পেট চেঁচে দেন। গণেশের বহু ছবি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা, একটা বিশেষ গণেশের ড্যানসিং পোজের ছবি—যা দেখে তিনি গণেশের মডেল তৈরী করছেন, সেটা চোখের সামনে স্ট্যাণ্ডে ক্লিপ্ দিয়ে আটকে রাখা আছে।

মেঘ করে আছে আকাশটা। ভেজা আকাশটার দিকে একবার তাকিয়ে লাইটটা জ্বালিয়ে চন্দ্রভানু গণেশ মডেলটার ওপরে কাজ করছিলেন। কখনও দাঁড়িয়ে দেখছেন, কখনও গণেশের নাভিদেশ বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ঘষে নিয়ে, চ্যাপ্টা, সরু ও নানা ধরনের কাঠের তৈরী ছুঁচল পাত দিয়ে গণেশের গায়ের রেখা ও কাপড় টেনে-টুনে জীবন্ত করে দিচ্ছেন। সবচেয়ে বেশি কাজ করছেন মুখটায়, কারণ নৃত্যরত ভঙ্গীতে গণেশকে ফুটিয়ে তোলা বেশ একটু শক্ত কাজ। তার সঙ্গে মিলিয়ে মুখের ভঙ্গী আনা। ঠিক করেছেন মুখের ভঙ্গীতে থাকবে স্মিত হাসি—প্রশান্তি ও আনন্দ—যে আনন্দ ও প্রশান্তি আমরা জীবন-ভর খুঁজে বেড়াই।

এই গ্যারেজের স্টুডিওতে একটা পাখা রাখা আছে বটে কিন্তু পাখাটা চালালে এত বিশ্রী শব্দ হয় যে তিনি সেটাকে বন্ধই রাখেন। শীতের সময়েও একই অবস্থা ; কাজ ছাড়া নিজেকে গরম রাখার কোন উপায় নেই। চন্দ্রভানুর এখন আর অতটা অর্থকষ্ট নেই ; চাইলেই তিনি আধুনিক সাজ-সরঞ্জামে-ভরা স্টুডিও ও কাজের ফাঁকে নিজের বিশ্রামের জন্য বিলাসকক্ষ তৈরী করাতে পারেন। কিন্তু কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে তা তিনি চান না। আসলে এসব অসুবিধা ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। এর মধ্যে ওঁর জীবনের সাধনা ও ফিলোসফি লুকিয়ে আছে কি না তাও বোঝা যায় না।

স্টুডিওতে অলকাই মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায়। কি চন্দ্রভানু ফোটাতে চাইছেন তা জিজ্ঞাসা করে নিয়ে কতটা তা ফুটেছে, বা কেন ফোটেনি, কোথায় গণ্ডগোল মনে হচ্ছে, অলকার এ-ব্যাপারে যেটুকু বোধ বা বুদ্ধি, ওটুকু সম্বল করেই নানা মন্তব্য করে এবং খুবই আশ্চর্য চন্দ্রভানুর তাতে রাগ ত হয়ই না বরং সে-সব কথা তিনি খুব মন দিয়ে শোনেন। বাড়ির লোকেরা ঠাট্টা করে বলে—অলকাকে বাবা বেশি ভালবাসে বলে অলকার উদ্ভট মন্তব্যেও বাবা চটে না, বরং ভেবে দেখে অলকা কি বলল। চন্দ্রভানু

শুনে একটু হাসেন, কিছু বলেন না।

অলকা স্টুডিওর এক কোণে দাঁড়িয়ে চন্দ্রভানুর কাজ দেখছিল। অনেক-ক্ষণই দাঁড়িয়ে আছে। বাবার সেদিকে কোন হুঁশ নেই। অন্যদিন হলে হয়ত চলে যেত। কিন্তু কাল বিদেশী স্থপতিরা ও বাবার বন্ধু দু-জন স্থপতি মডেলটাকে দেখতে আসবেন। অথচ জিনিসটা এখনও তৈরী হয়নি। শেষ করার কোন গরজ নেই দেখে অলকা একটু বিচলিত হয়। অলকা একবার ভাবল কাজটা বুঝি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু বাবার কাজ করার নমুনা দেখেই মনে হচ্ছে তিনি যা চাইছেন তা ফুটছে না বলে বেশ অধীর, বোধ হয় একটু অশান্তও। হয়ত ভাবছেন কোথায় যেন একটা ছন্দপতন ঘটছে, মিল হচ্ছে না। বাবার অস্থিরতা দেখে মনে হয় তিনি সেটা বুঝতে পারছেন কিন্তু ফোটাতে পারছেন না। বার বার তাই স্প্রে করে জল ছড়িয়ে দিচ্ছেন গণেশের মুখে, দূরে সরে এসে দেখছেন, আবার মুখের কাছে গিয়ে একটা পাত হাতে তুলে নিয়ে কিছুটা মাটি তুলে ফেলে সেটা ঘষে দিচ্ছেন আঙুল দিয়ে, আবার পাত দিয়ে কয়েকটা রেখা টানছেন।

অলকা আর থাকতে পারল না, বলল—তোমার কাল যে মিটিং আছে বাবা।

চন্দ্রভানু একবার অলকার মুখের দিকে তাকিয়ে গণেশের মুখের ভঙ্গীটা নিরীক্ষণ করলেন; হেসে নিশ্চিন্ত স্বরে বললেন—তাই বুঝি তুই দেখতে এলি কতটা আমি এগোলাম শেষ করতে পারলাম কিনা।

—হ্যাঁ, অলকা বাপের ওপর জোর খাটাতে অভ্যস্ত—অপরের বিচারের ব্যাপারে তুমি চিরকালই নির্বিকার, কিন্তু এখানে, একটা কম্‌পিটিশনের প্রশ্ন আছে, তা কি তুমি জান?

কম্‌পিটিশন্ এটুকুই যে, রাম দেওধর আর একটা গণেশের মডেল করছে। হয়ত তারটাই শেষ পর্যন্ত সবার পছন্দ হবে, আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না, ওরকম কম্‌পিটিশনে আমি বিশ্বাসও করি না। এই সুযোগে আমারও কিছু কাজ হয়ে যাচ্ছে, এটাই বড় কথা।

—কাজে নেমে পড়েও তুমি এতটা নির্বিকার থাকতে পার কি করে, আমি ভেবে পাই না।

—আধুনিক যুগের এই বিশ্রী রকম মারকাট কম্‌পিটিশনের মাপকাঠিতে আমাকে যদি বিচার করিস, তবে নিশ্চয় মনে হতে পারে সব ব্যাপারেই আমি নির্বিকার। তা কিন্তু আমি নই। ব্যাপারটা কি জানিস, আমার মধ্যে ঐ ছোটাছুটি নেই—আধুনিক জীবনের অশান্তির যা মূল কারণ। কিছুর জন্য ছোট, না হলে মাথা ঠোক। ওটা আমাদের কাল্‌চারের মধ্যে ছিল

ন্য বলেই আমার বিশ্বাস। ইদানীংকালে এর আবির্ভাব ঘটেছে।

—কি ছিল, বা কি ছিল না তা আমি শুনতে চাই না। অলকা অনেকটা আদেশের সুরে বলল। আমি চাই তেইশ-তলা যে গণেশ টাওয়ার শহরের বুকে উঠ্ছে—তার মডেল তুমিই তৈরী কর।

চন্দ্রভানু একটু হাসলেন, বললেন—তা কি হয় পাগলী? দশজনকে নিয়ে কাজে নামলে কেউ কি বলতে পারে আমারটাই নিতে হবে? তবে ফুল পার্টিসিপেশনে আমি বিশ্বাসী। তাছাড়া রাম দেওধর আমার অনুজের মত, আমি ত মনে করি এটা ওরই কাজ। গণেশের মুখভঙ্গী বা বিন্যাস কিংবা আমার কোন আইডিয়া যদি এদের কাজে লাগে, আমি তাতেই খুশী।

অলকা হার মানার পাত্রী নয়, অনেকটা জেদের বশেই বলল—তাহলে তুমি গণেশের মডেলটা তৈরী করছ কেন?

রাম দেওধর গণেশ টাওয়ারের মডেল করছে, কারণ তাকে বলা হয়েছে, আর আমি করছি এই জন্যে যে আমি এক্সপার্টদের বোঝাতে চাই গণেশ বলতে আমি কি বুঝি। গণেশ হল সেই আদি অনন্ত এনার্জি, শক্তি। গণেশ আমাদের সূচনা, গণেশ আমাদের পরিসমাপ্তি। 'নামেই জাগহ তুমি, নামেই বিশ্রাম।'

অলকা এ যুক্তির মধ্যে কোন অর্থ খুঁজে পায় না, তাই বলে—তুমিই বা গণেশের কন্‌সেপশন্‌টা ওদের মধ্যে ইন্‌জেক্‌ট করতে চাইছ কেন?

—না, ঠিক তা নয়। তবে এটা বুঝতে পারছি ব্যাপারটা ওরা ঠিক ধরতে পারেনি। তাই উল্টো-পাল্টা কথা বলছে। সেটা বন্ধ করাও বড় কাজ।

অলকা বাবার ভালমানুষি দেখে না হেসে পারে না, বলল—বুঝতে পারছে না যদি বল, সেটাই ত ভাল। লোকেরাও জানুক, এগ্রিকাল্‌চারাল এক্সপার্ট বা নিউক্লিয়ার এক্সপার্ট হওয়া এক জিনিস আর বিদেশী চোখ নিয়ে এ-দেশের আর্ট রাতারাতি বুঝে ফেলা অন্য জিনিস। আমি কিছুতেই মানতে পারি না, যাদের কোন কন্‌সেপশন্ নেই, তারা কেন তোমার কাজের বিচার করবে?

—না, তা ঠিক নয়রে। ওদের ওভাবে দোষ দিস না। আমরাই ত ওদের ডেকে এনেছি। আমরা যে এখনও স্বাবলম্বী হতে পারিনি অলকা। আত্মবিশ্বাসী হতে পারিনি। ওরা যদি আমাদের কাল্‌চার বোঝে, আমাদের সাহিত্য ও আর্টের মধ্যে প্রাণশক্তি খুঁজে পায়, তবে সেটা ত আমাদেরই লাভ।

—আমি তোমার এ যুক্তিও বাবা মেনে নিতে পারছি না। পৃথিবীর চারটি সমৃদ্ধ দেশ—আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইতালীর স্কাল্‌প্‌চার ও

আর্কিটেক্‌চার‍্যাল্‌ এক্সপার্টরা এসেছেন—যাঁদের কথা তুমি একদিন খুব করে বুঝিয়েছিলে; তাঁরা যদি কিছু না বুঝে উচ্চৈঃস্বরে বলতে শুরু করে দেন—'ওয়াণ্ডারফুল', 'এক্সেলেন্ট্‌'—তাহলেই কি রাতারাতি আমাদের আর্ট বিরাট হয়ে যাবে?

চন্দ্রভানু বুঝলেন অলকা কি বলতে চাইছে, কিন্তু ওদিক দিয়েই তিনি গেলেন না। শুধু অন্য একটা দিক ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন—তুই ভুলে যাস না, আজকের পৃথিবীতে সেলিং-এর একটা বাজার খুব বড় হয়ে উঠেছে। সেটা ত দেখবি—উই মাস্ট সেল্‌ ওয়েল ইন্‌ দ্য ওয়ার্ল্ড মার্কেট।

অলকা ধরতে পারলো বাবার দুঃখ কোথায়। তাই সুযোগ বুঝে আরও একটু উস্কানি দিল। এ ত ইকনমিকে বাহবা দেওয়া নয় বা খাদ্যশস্যে তোমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছ, যা তৃতীয় বিশ্বের কেউ বিশেষ পারেনি। ওরকম কিছু ব্যাপার এটা নয়। এটা যে আর্ট, সমৃদ্ধ দেশের আর্টের মূল্যও বেড়ে যায়—সেটা জেনেই কথাটা বলছি। ভারতীয় আর্টের প্রকৃত অ্যাপ্রিশিয়েশন্‌ করতে হলে তার উপযুক্ত ব্যাকগ্রাউণ্ড থাকা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

—সেখানেই ত আমার বক্তব্য। খুবই দুর্ভাগ্য যে, যে দেশগুলোর প্রতি-নিধিরা এসেছেন, তাঁদের মন্তব্যের ওপরই এখনও আমাদের আর্ট বা সাহিত্য বিচার হয়। ভাল হলে, বা ভাল মনে করলে, ওরাই আবার কেনে, আমরা নই। অথচ দেখ্‌, আমাদের স্কাল্প্‌চার, আমাদের সিম্বল্‌, আমাদের ধারণা-বিশ্বাস আগে যা ছিল, আমি মানি তার ওপরে এখন আরও অনেক কাজ হয়েছে। মূলে কিন্তু একই রয়েছে। খুব কি বদলেছে মনে হয়? হ্যাঁ, এইটুকু বদলেছে, আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আমাদের সিম্বল্‌, আমাদের আর্টের বিচিত্র রূপ ও ফর্ম নিয়ে আগের চেয়ে অনেক বেশী বই লেখা হচ্ছে। শুনতে পাই, সে-সব বই বিদেশে আজকাল খুব বিকোয়। সবচেয়ে মজার কথা, ভারতীয় পাব্‌লিশাররা চমৎকার সব কালার্ড ছবি অফসেটে ছাপছে এবং দাম রাখছে ৫০০/৬০০ টাকা। ভারতীয় কাল্‌চার বিক্রি করে এরা সব লাল হয়ে যাচ্ছে। যা বিক্রি হয় বা ছাপে সেগুলো কিন্তু এরা কেউ পড়েও দেখে না। তাই বলছিলাম—

অলকা বাধা দিল—তাই বুঝি তুমি ভাবছ, গণেশ যখন বিকোচ্ছে তখন ওদের একটু গাইডেন্স দেবে, না?

—না, তা ঠিক নয়। গাইডেন্স দেবার মত যোগ্যতা আমার কোথায় হয়েছে? আলোচনা করে দেখেছি—ওঁরা গণেশ সম্পর্কে ভীষণ উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন; এখানে এসে অনেক কিছু দেখছেন, পড়ছেন। জানিস ত

ওরা যেটা নিয়ে একবার পড়ে, তার গভীরে যেতে চায়। আসলে ইন্টে-লেক্চুয়ালি জানা আর কোন সিম্বল্ কেন এবং কিভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে এল এটা বোঝা বা হৃদয়ঙ্গম করা, ঠিক এক জিনিস নয়। সেটাই আমি বোঝাতে চাইছি—কিন্তু এঁরা কিছুতেই তা ধরতে পারছেন না। আসলে কি জানিস, ভারতীয় কাল্চার-এ এনার্জিকে খুব প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন ধর, ক্রিয়েটিভ এনার্জি। এটা বললেই ওঁরা বোঝেন সেক্সুয়াল এনার্জি। সেক্স-টা আর্টের মাধ্যমে সাব্লাইম হতে পারে, সেটা ওঁরা কিছুতেই বোঝেন না। আমি চাইছি, গণেশের মুখে একটা প্রশান্তির ভাব থাকুক, আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক গণেশের ঐ বিশাল মুখ। ওঁরা বোধ হয় দেওধরের কথা শুনেই বলছেন, গণেশের মধ্যে অদ্ভুত একটা ট্রাইব্যাল ফর্ম আনা হোক কিংবা তারই ট্রান্সফরমেশন্ বা ঐ ধরনের ট্রাইব্যাল অন্য কিছু একটা। যদি তা করা হয়, বিশ্বজোড়া অ্যাপ্রিসিয়েশন পাবে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না ; অ্যাবসার্ড।

অলকা বুঝল বাবার সঙ্গে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোথায়। এ নিয়ে পরে যদি একটা মতবিরোধ হয় বাবা নিশ্চয় রণক্ষেত্র থেকে সরে পড়বেন, যা চিরকাল তিনি করেছেন। লড়াই করতে না পারাও এক ধরনের কম্প্রো-মাইজ। অলকা ভেবেছিল কথাটা বলবে, কিন্তু বাবা কষ্ট পাবে ভেবে ঘুরিয়ে বলল—তুমি ওঁদের মতামত অতই বা শুনতে চাইছো কেন ? ইউ আর নট্ আণ্ডার দেম্।

—ইট্স্ নট্ এ কোশ্চেন অব হু ইজ আণ্ডার হুম্। কে কার আণ্ডারে কাজ করছে সেভাবে আর্টের বিচার হয় না। বোকারাই ওভাবে আর্টকে দেখে। দেওধর ত খুব ভাল কাজ করে, কিন্তু ছোটখাট কাজ ওর দ্বারা হয় না। ম্যাসিভ ব্যাপার হলে ও লড়ে যেতে পারে। এমন কি, ম্যাসিভ ব্যাপার হলে কিছুটা কম্প্রোমাইজ করতেও রাজী। আমার আবার মেটিকিউলাসনেসের দিকে ঝোঁক। আমার কাছে গণেশ কিভাবে তাকাবেন সেটা যতটা প্রয়োজনীয়, গণেশের মুখে কতটা হাসি ফুটবে ততটাই ইম-পর্টান্ট। ড্যানসিং গণেশ হোক, এটা আমি চাইনি। ওটা ঐ পরাঞ্জপের আইডিয়া।

—পরাঞ্জপে কার শক্তিতে এত মাতামাতি করছে ?

—কি জানি, গণেশ টাওয়ারের পেছনে প্রকৃতপক্ষে কার বা কাদের যে মাথা, বোঝা যাচ্ছে না। সে যারই হোক, আমি বা আমরা ত পরাঞ্জপকেই চিনি ; কিন্তু কি অদ্ভুত লোক—এতদিনেও মানুষটাকে ঠিক চিনতে পারলাম না। পরাঞ্জপে নিজে পলিটিশিয়ান কি না বা পলিটিশিয়ানদের খেলায় এত

ওস্তাদ বলেই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন কি না, বলতে পারব না--তবে এটা বুঝতে পারছি, ইদানীংকালে রাজধানীর এবং সম্ভবত গোটা দেশেরই কাল্‌চারাল ব্যাপারে ইনিই একমাত্র পুরোধা; পুরোধা না বলে আজকাল কাল্‌চারাল ব্যাপারে যা হয়েছে, 'কিং-মেকার' বলা ভাল। কিছু বললেই বলেন—আচ্ছা জিজ্ঞেস করে দেখব। কাকে যে জিজ্ঞেস করবেন, কে সিদ্ধান্ত নেবেন, কিছু জানার উপায় নেই। এদিকে হাবেভাবে ত দেখিয়ে বেড়ান—আ ম্যান অব গ্রেট আইডিয়াস। সব সময় উল্টো-পাল্টা ব্যাপার করছেন। ওতে আমার ইরিটেশ্যান হয়। যদি কোন সাজেশন দি, মিষ্টি করে বলবেন--নিশ্চয়, নিশ্চয়, দিন, দিন—আপনারাই ত পথ দেখাবেন। যে পথটা দেখাই, ঠিক উল্টো পথটাই তাঁর চোখে পড়ে। কার কথায় যে উনি চলছেন, জানি না; ওঁর আবার দেওধরের ওপর বেশী নজর। দেওধরের ত সব সময় ম্যাসিভ ব্যাপার। দেওধর কি করছে, না করছে আমিও ঠিক জানি না, নর অ্যাম আই বদারড্‌ ইন্‌ দ্য লিস্ট! আমি ভাবছিলাম গণেশের মুখে আমি যে একটা প্রশান্তির ভাব ফোটাতে চাইছি, সেই প্রশান্তি জিনিসটা কি?—তা যদি আমি এক্সপার্টদের বোঝাতে পারি, তবেই কাজ হত। অত খেটেখুটে তাই গণেশের মডেলটা তৈরী করছি। ভাবছি, যা আমি বলতে চাই তা যদি এক্সপার্টদের বোঝাতে পারি তবে পরাঞ্জপে অন্ততঃ আজেবাজে কথা বলতে পারবে না।

গণেশ টাওয়ারের পেছনে এত সব ব্যাপার ঘটে গেছে বা ঘটে যাচ্ছে অলকা তার কিছুই টের পায়নি। কদিন ধরে চন্দ্রভানু তাই বোধ হয় একটু যেন গম্ভীর ছিলেন। অলকার কষ্ট হল। বাবার ভালমানুষি দেখলে রীতিমত ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সারা জীবনই বাবার এভাবে কেটে গেল। নিজের মতামতটাকেও যে জোর দিয়ে সময় মত বলতে হয় এবং প্রয়োজনে নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করতে হয়, সেটা বাবাকে বলে লাভ নেই। তবুও বলল—কালকে যে মিটিং হবে, সেখানে কি তুমি গণেশের মডেলটা নিয়ে যাবে, না ওঁরা আসবেন দেখতে।

—কালকে পরাঞ্জপে আমাদের ডেকেছেন। আজকে আমরা ঘরোয়া-ভাবে আলোচনা করব।

অলকা একটু বিব্রত হয়ে পড়ল--আজকে? কোথায়?

—আমাদের বাড়ী।

অলকা বলল--কোথায় বলনি ত? মা জানে?

—ব্যস্ত হবার কিছু নেই, জানে বোধ হয়। তা যা বলছিলাম, তুই ত ইতিহাস ঘাঁটছিস; নিশ্চয়ই জানিস, আগের দিনে রাজা-রাজড়ারা বড় বড়

শিল্পীদের ভাস্কর্যের কাজে লাগাত। ইটালীতে ছিল বড় বড় পোপ। এখন কারা আমাদের কাজে লাগায় বলত? এখন সেই পোপ নেই, রাজা-রাজড়ারাও নেই—আছে পলিটিকস্ আর তার বিরাট শক্তি।

বলেই চন্দ্রভানু আবার কাজে মন দিলেন। অলকা ভাবল, চন্দ্রভানু আবার কাজে ডুবে যাবার আগে গঙ্গাধর মেসোর কথাটা একবার জানিয়ে দেওয়া দরকার। তাই বলল—বাবা, কাল গঙ্গাধর মেসোর বাড়ি গিয়েছিলাম।

—উনি কেমন আছেন? আই লাইক টু সী হিম ওয়ান ডে।

—তোমার খুব তারিফ করছিলেন!

—গঙ্গাধর আমার তারিফ করছিলেন, কেন, কি ব্যাপার?

—তোমার কাজের কথা বলছিলেন।

—ওঃ, তাই বুঝি। কে ওঁকে তারিফ করে তার ঠিক নেই। এ লাইফ অফ ডেডিকেশন ফর দ্য গুড অফ দি কানট্রি। মানুষটাকে ওটুকু স্বীকৃতি পর্যন্ত আমরা দিলাম না। আমি সেই ভাগ্যবানদের দলে যারা ওঁকে কাজ করতে দেখেছি।

অলকা বলল—জান বাবা, মাসিমা যখন পুরনো কাহিনী বলে যান, যার অনেকখানিই গঙ্গাধর মেসো জুড়ে থাকেন, অনেক সময় ভাবি, যদি এঁদের কথা লিখতে পারতাম, কাজ হত; কারণ এঁরা দু-জনেই একটা বিশেষ সময়ের সাক্ষী।

চন্দ্রভানু বললেন—হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে মুশকিল কি জানিস অলকা—এখানে আবার ভারতীয় সংস্কৃতির কথাটা ওঠে। কর্মের ভেতরে যাদের ডেডিকেশন্ আছে, তাঁরা কেউ তা নিয়ে ঢাক পেটাতে চান না। ওঁদের নিয়ে লেখার সবচেয়ে বড় বাধা ওঁরা নিজেরাই বোধ হয়, কারণ ওঁরাই লিখতে দেবেন না। দেখ কতটা পারিস। ইট্স্ ওয়ার্থ ট্রায়িং। সন্দীপ কেমন আছে?

—কাল আসছে; সিভিলিয়ান লাইফে ফিরে আসতে চায়।

—খুব ভাল, তা যদি হয় ওঁদের নিঃসঙ্গ জীবনের দুঃখ কিছুটা ঘুচবে। গঙ্গাধর কিছু বলছিলেন?

—না, উনি নীরব। তবে মাসিমা বলছিলেন, ঠিক করেনি এখনও, তবে ভাবছে। আসছেও এই কারণে।

—চন্দ্রভানুর মুখখানা খুশীতে ভরে উঠল। বললেন—সন্দীপের মধ্যে একটা জানার আগ্রহ আছে। এখানে আগে যখন আসত, আমার কাজ-কর্ম খুঁটিয়ে দেখত। কোন প্রশ্ন করত না। ওর ভাল জিনিসকে গ্রহণ

করার একটা মন আছে।

নির্মলা এসে তাড়া দিলেন। বললেন—তোমাদের কথা কি ফুরবে না? আজকে ওঁরা এখানে আসবেন, খেয়াল আছে? অলকা যা মা, ড্রইংরুমটা একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখত।

অলকা উঠে গেল, বাগান থেকে ফুল এনে ঘর সাজিয়ে রাখল। চাকর ডেকে ঘরদোর সাফ করাল। অলকার একটু স্পর্শে ড্রইংরুমটা যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। নির্মলা ঘরে এসে বললেন—বাঃ; বেশ হয়েছে!

॥ ছয় ॥

সকালে উঠে মেঘে-ঢাকা আকাশটার দিকে তাকালেন মৈত্রেয়ী। কাল সন্দীপ এসেছে এ-দুর্যোগ মাথায় করে। হাসি-গল্প-আনন্দে বোঝাই যায়নি কি ভয়ানক দুর্যোগের রাত ছিল কাল। জলখাবার করে রেখেছেন মৈত্রেয়ী, এক্ষুণি খেয়ে বেরিয়ে যাবেন গঙ্গাধর ও সন্দীপ। হিমাংশু গুপ্তকে যখন কথা দিয়েছেন, আকাশটা মেঘ করে এলেও তার নড়চড় হবার উপায় নেই। কথা আছে হিমাংশুকে তুলে নিয়ে যাবেন। ততক্ষণে যদি মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় হিমাংশুর হয়ত আলসেমি ধরবে, হয়ত বলবে—আসুন বাড়িতেই কাজটা সেরেনি। পরে আকাশটা পরিষ্কার হলে হয়ত বেরুবে। আধুনিককালের ম্যানেজমেন্টের ম্যাজিকে এরা ভারতকে গড়ে তুলতে চাইছে। যেটুকু সাধ্য তার বেশী কেউ কাজ করতে রাজী নয়; ওতে ভারত এগোলে এগোবে, থেমে থাকলেই বা কার কী! গঙ্গাধরকে এই কথা বোঝান যায় না, এখানেই ত মুশকিল!

টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি মাথায় করে গঙ্গাধর সন্দীপকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ওরা যাবার কিছুক্ষণের মধ্যে ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। যা একবার করবেন ভেবেছেন, করবেনই। যেমন বাপ তেমনি ছেলেটাও হয়েছে। মানুষটা সারা জীবনই এভাবে একা ঝড়-বাদল সামলালেন; কারুর পরোয়া করলেন

না, কারুর জন্যে তিনি একটু থামতেও রাজী নন। সারা বাড়ীতে মৈত্রেয়ী এখন একা ; এতদিন পরে ছেলেটা এল, ওকে একটু কাছে পেতে চেয়েছিলেন তিনি। কাজ থাকলে বাপের মতই অস্থির হয়ে পড়ে।

বৃষ্টি আরও বাড়ল—তার সঙ্গে বাতাস, কলকাতা হলে এতক্ষণে রাস্তায় নিশ্চয়ই জল জমে যেত, তিলক লেনের দিকে হিমাংশু থাকে, জল জমার ভয় নেই। সন্দীপ গাড়ী চালাচ্ছে, তাই কিছুটা নিশ্চিন্ত। ওর ওপর মৈত্রেয়ীর গভীর বিশ্বাস। বৃষ্টির ছাঁট আসছে ঘরের মধ্যে, জানালা দিয়ে গাছের ফাঁকে আকাশটাকে একবার তাকিয়ে দেখলেন মৈত্রেয়ী। বৃষ্টি থামার লক্ষণ নেই। বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়। বৃষ্টির জল, ভেজা আকাশ, ঘন সবুজ পাতা, হাল্‌কা ম্যাটমেটে আলো—সব কিছু খুব নিঃশব্দে দিল্লীর প্রকৃতির রূপান্তর ঘটাচ্ছে। স্বভাব পাল্টায়, রঙ পাল্টায় ; আবার প্রকৃতিরও সেই একইভাবে যে রূপান্তর ঘটছে নীরবে ও গভীরে—আমাদেরই স্বভাবের মত, তা কেউ ভাবে না। প্রকৃতিও আমাদের মতই পরিবর্তনশীল এবং তার পরিবর্তন আমরা দ্রুত ঘটাচ্ছি—তা নিয়ে বিশেষ কারুর মাথা ব্যথা নেই। এই শুকনো দেশে—বাংলার মাঠঘাট, পুকুর ও বাঁশঝাড় কাঁপিয়ে বৃষ্টি পড়ে না যদিও ; কিন্তু গত দু-বছর ধরে এত বৃষ্টি পড়ছে যে, মৈত্রেয়ীর কেন জানি মনে হল এই ভেজা স্যাঁতসেতে আকাশ আর সবুজ পাতার ঘন গভীর আলিঙ্গনবদ্ধ বৃষ্টি—এরকম হতে থাকলে কোনদিন হয়ত দিল্লীর মাটির রঙই পাল্টে যাবে। দিল্লীর মাটির রঙ কী ? মনের মধ্যে দিল্লীর মাটির রঙ খুঁজতে থাকেন মৈত্রেয়ী। হঠাৎ মনে পড়ল সে রঙ ধূসর, জং-ধরা লোহার রঙের মত।

মৈত্রেয়ী উঠে গিয়ে শোবার ঘরের জানালাটা বন্ধ করে দিলেন। ধীরেনকে ডেকে বললেন—আর কোথায় কি জানালা খোলা আছে দেখত। ধীরেন সারা বাড়িতে ছুটে ছুটে দেখছে কোন্ জানালা বাতাসে আওয়াজ তুলছে, কোন্ জানালা দিয়ে জল এসে ঘর ভিজিয়ে দিচ্ছে। যেখানে জল জমেছে মোছার কাপড় দিয়ে সে জল মুছতে লেগে গেল—মা দেখলে বিপত্তি করতে পারেন। মাকে বড় ভয় পায় ধীরেন ; ছোটখাট ব্যাপারেও মার বড় তীক্ষ্ণ নজর। ওদিকে শোবার ঘরের জানালা বন্ধ করতে গিয়ে মৈত্রেয়ী ভাবলেন, একটা জানালা খোলা না থাকলে গঙ্গাধর কেমন যেন ঘুমুতে পারেন না ; ওঁর ঘরে-বাইরে-অন্তরে আলো চাই। এত আলোয় মশগুল লোক খুব কম দেখা যায়। অথচ বিদেশীরা যেমন কোন কিছু বলার না থাকলে 'আজকের তাপমাত্রা কি' বা 'আকাশটা কি প্লেজ্যান্ট' ইত্যাদি দিয়ে আলাপ জমাতে ভালবাসেন, গঙ্গাধরের মুখে সেটা কখনো শোনা যায় না, দিনটা অন্ধকার বা

দিনটা কত আলোতে ভরপুর--এ আবিষ্কারটুকু শোনার অধিকার শুধু মৈত্রেয়ীর, আশেপাশে কারুর নয়, এমন কি সহকর্মী বা বন্ধুবান্ধবদেরও নয়। সেদিন যখন একটা ইন্‌ড্রাস্ট্রির জটিল কসটিং করছিলেন, মৈত্রেয়ীকে কাছে পেয়ে হঠাৎই বলে উঠলেন--'দিনটা ত ভারী চমৎকার', দিনটা সুন্দর কিনা মৈত্রেয়ীর খেয়াল ছিল না--বর্ষার সময় আকাশের রঙ ত মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টায়। রান্নাঘর, ড্রইংরুম ও অফিসের প্রয়োজন মিটিয়ে মৈত্রেয়ীর সব সময় সেটা খেয়াল থাকে না। মৈত্রেয়ী তাকিয়ে দেখলেন আকাশের রঙ গঙ্গাধরের মুখখানাকে উজ্জ্বল করে রেখেছে--গঙ্গাধরের খুশী-ভরা মুখখানা দেখেই বললেন--'বাস্তবিক, কি সুন্দর দিনটা'। আর একদিন, যন্ত্রের সূক্ষ্ম একটা ডিজাইন নিয়ে ভাবছেন, একটার পর একটা ড্যায়াগ্রাম এঁকে যাচ্ছেন, মৈত্রেয়ী চা নিয়ে এসেছেন, বলে উঠলেন গঙ্গাধর--'সূর্যটা ডুবল'। 'মেঘ করে আছে, কোদালে-কুড়ুলে মেঘ, নিশ্চয় বৃষ্টি ঝরাবে'; 'একটু আগে আকাশটা সিঁদুরমাখা হয়ে ছিল--তুমি দেখলে না'--'এটা কি শরৎকাল মৈত্রেয়ী, শিউলি ফুল টুপ্ টাপ্ পড়ছে যে'--'চল রোদ্দুরে বেরিয়ে পড়ি'--'এই নিয়ে তিনদিন সূর্যের মুখ দেখতে পেলাম না'--'এবার যেন একটু বেশী বৃষ্টি পড়ছে--গতবার ত অত দেখিনি', 'স্বাধীনতার পরে এই চল্লিশ বছরে এরা প্রচুর গাছ লাগিয়েছে--তারই বোধ হয় সুফল।' ইউক্যালিপ্‌টাস গাছ দিল্লীতে ভরে গেছে, ওতে কি লাভ? নিম, জাম, অর্জুন গাছ লাগিয়েছিল ব্রিটিশরা--কত ছায়া দিচ্ছে দেখ। ইউক্যালিপ্‌টাসের অবশ্য তেল হতে পারে--এরা করছেও কিছু কিছু, কানে আসে। কিন্তু ইউক্যালিপ্‌টাসের ধারে কাছে কিছু হয় না, চাষবাসের ক্ষতি হয়--হর্টি-কাল্‌চার বিভাগ সেটা ভাবে কি না জানি না। 'আজ নিয়ে তিনদিন মেঘ করে আছে--রোদ কি আর উঠ্‌বে না, মৈত্রেয়ী'? মৈত্রেয়ীকে যেন রোদ কানে কানে বলে যায় কখন তার আবার আবির্ভাব ঘটবে। তবে মৈত্রেয়ী এটুকু জানেন, অনেক সময় একা বসে বসে ভাবেনও যে এরকমভাবে প্রকৃতি দিল্লীবাসীর স্বভাবটাকেও হয়ত একদিন পাল্টে দেবে নিজেরই অলক্ষ্যে। যেমনভাবে পাল্টেছে ওঁদের দু-জনের জীবন। সেই ঘর-ভরা মানুষজন ত এখন আর নেই। জীবনে কম লোক আসেনি; কেউ এসেছে আশ্রয়ের আশায়, কেউ এসেছে সাহায্যের জন্য, কেউ বা চাকরীর উমেদারী করতে। কেউ বা চাকরীর ভরসায়। কেউ ডেকেছেন বৌদি, অল্পবয়সী তরুণ ডেকেছে মা, কেউ কেউ এখনও সম্পর্ক রাখে, হরিদ্বারের কমল, এখনও মায়ের সাহচর্য পেতে দু-একদিন কাছে এসে থাকে; সমস্যা হলে সমাধান খুঁজতে পরামর্শ করে--দু-একজন বিদেশে চলে গেছে, একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে

মানুষ করেছিলেন, আমেরিকায় একজন বিদেশী ডাক্তারকে বিয়ে করে এখন মস্ত ধনী লোক তারা, তাও 'মা' বলে চিঠি দেয় মাঝে মাঝে। ওঁর সহ-কর্মীদের মধ্যে, দু-একজন মারা গেছে। যারা কাছের লোক যেমন অধর লাহিড়ী এখনও 'বৌদি' বলে চিঠি দেন মাঝে মাঝে। দিল্লীতে কন্‌ফারেন্সে এলে মৈত্রেয়ীর কাছে ওঠেন। বলেন, আরবানাইজেশন নিয়ে, এন্‌ভ্যায়রন্‌-মেন্ট নিয়ে এত যে কাজ করছি আজকাল, একাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন বৌদি। বৌদি, দাদার চেয়ে কোন অংশে কম নন। কত নিরক্ষরকে পড়াশুনা শিখিয়ে স্বাবলম্বী করেছেন। মাঝে মাঝে চিঠি পান, ছেলেমেয়ে সব দাঁড়িয়ে গেছে। ভাল করছে সবাই--বিধবা মাকে সুখে রেখেছে। এছাড়া ছিল নিত্যনতুন লোক। ছোট-বড়-নামী-পদস্থ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, মন্ত্রী সেক্রেটারীদের সান্নিধ্য, তাঁদের বাড়িতে সমস্যা হলেই ডাক পড়ত মৈত্রেয়ীর, মনে পড়ে সেক্রেটারী মিশ্র সাহেবের আর্তনাদ, 'অত করেও ছেলেটাকে বাঁচাতে পারলাম না, মৈত্রেয়ী। সারা ঘরে ওর স্মৃতি, আমাকে বাবা-বাবা বলে ডাকে'। ওনার সঙ্গে শত্রুতা করছে এমন সহ-কর্মীর মেয়ের বাচ্চা হবার সময় পর্যন্ত ডেকে নিয়ে গেছে মৈত্রেয়ীকে। এখন মেয়েরা-বউরা কত সময় পায়--কিভাবে সময় অপব্যবহার করে--কিন্তু কারুর কোন সামাজিক চেতনা নেই ; কত সুখে-আয়াসে থাকে তারা, কোন কাজ এদের দ্বারা হয় না। চাকর-বাকরে-ভরা বাড়ি--কিছু দায়িত্ব পড়লেই যেন মাথায় বাজ পড়ে। অতিথি এলে কতক্ষণে অতিথি বিদায় হবে সেই দুশ্চিন্তা। কোনদিন বিশেষ চাকর-বাকর ছিল না মৈত্রেয়ীর। অথচ অতিথি সমাগম লেগেই থাকত। অনেকে ঠাট্টা করে বলত, মৈত্রেয়ীর বাড়িটা যেন গেস্ট হাউজ। কত যোগাযোগ, কত কথা, কত আলোচনা, কত কাজ, কত সোসাইটি, অনুষ্ঠানের জন্য কত রিহার্সাল, স্কুল স্থাপন, আর তা নিয়ে কত ত্রুটি, কত অভিযোগ, কত আব্দার, আবার কত তৃপ্তি, কত আনন্দ !

মনে পড়ে ব্যাঙ্গালোরের টাউনশিপের চারপাশে বড় বড় গাছ লাগাতে হবে। হর্টিকাল্‌চার ডিপার্টমেন্টের শিবারাওকে ডেকে অসংখ্য গাছ লাগিয়েছিলেন। শিবারাও হেসে বলেছিলেন--গাছ লাগান ত সোজা, ম্যাডাম। জলের অভাবে, গরু-ছাগলের দৌরাত্ম্যে দেখবেন সব সাফ-সুতর হয়ে গেছে। যাবার সময় শিবারাও ব্যঙ্গোক্তি করেছিল--কত দেখলাম, ম্যাডাম ! শুরুতেই উৎসাহ থাকে। ওতে হয় না। গাছ বাঁচান খুব পরিশ্রমের কাজ। মৈত্রেয়ীর মনে কেমন যেন জেদ্‌ চেপে গিয়েছিল, জোর দিয়ে যেন অনেকটা প্রতিজ্ঞার মত বলেছিলেন--না শিবারাও, প্রায় পাঁচ কিলোমিটার টাউন-

শিপের কোন গাছ মরবে না। মৈত্রেয়ী রোজ সেই গাছগুলোর তদারক করতেন। মহিলার কাণ্ডকারখানা দেখে লোকেরা হয়রান হয়ে যেত। শুধু জল দেওয়া নয়, শুধু তদারকী করা নয়--আশেপাশের লোকজন ও বাড়ির মেয়ে-বউদের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি তাদের রীতিমত সজাগ করে তুলেছিলেন। গাছগুলো বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোও যেন সজাগ হয়ে উঠেছিল। তারাই খবর পাঠিয়েছে গাছগুলো এখন মহীরুহ হয়ে গেছে।

বাইরের দিকে আবার চোখ পড়ল, গাছ-গাছড়ার শরীর বেয়ে বৃষ্টির জল পড়ছে। মৈত্রেয়ীর মনে হল এরকম মুষলধারে যখন বৃষ্টি পড়ে, সেই বৃষ্টি মাটির গভীরে নিভৃত সত্তায় কত আলোড়ন সৃষ্টি করে, অনুভূতির দরজায় গিয়ে ধাক্কা দেয়। এরকম একটা দিনে যখন নিজের জীবনের কথা ভাবেন, প্রায়ই তখন মনে হয়, এই ঝিরঝির বৃষ্টি আর সজল প্রকৃতি মাথায় করে তিনি যেন সেই অতীত বাংলার মাটি দিয়ে হেঁটে চলেছেন-- কোথা থেকে কতদূর চলে যাচ্ছেন, তা যেন অনেক সময় স্বপ্নের মত মনে হয়। দিল্লীকে তার শত আত্মভোগ, আত্মযন্ত্রণা, অর্থের দাপট, রাহাজানি আর পণপ্রথার আধুনিকতম সংস্করণ নিয়ে কেমন যেন বড় অপরিচিত ঠেকে। আর দিল্লীর করিডর অব পাওয়ারের অদৃশ্য সিঁড়ি বেয়ে চোখের সামনে কতদূরে উঠে যায় আত্মগর্বে সমুন্নত বুরোক্র্যাসির শত হাত-পা-- যা শত শত ফাইল নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান। ফাইল নামক বিবেকহীন রূপক কবন্ধের মত বিশাল হাত বাড়িয়ে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে মানুষ নামক জীবকেই একদিন খেয়ে ফেলে। সব কিছু শুষে নিয়ে যেটুকু জীবনীশক্তির উদ্বৃত্ত তা নিয়েই এখানে সাহিত্য, নাটক, এক-আধদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান; ওতে চমক দেওয়া যায় কিন্তু ও-সাহিত্য ও-শিল্প মানুষের আন্তরিক রূপান্তর ঘটাতে পারে না। ভয়ানক নৈর্ব্যক্তিক দিল্লীর কাছ থেকে তখন মৈত্রেয়ী চলে গেছেন অনেক দূরে, অতীতের বিস্মৃত কোন পথে--যেখানে শেষ পদক্ষেপ তুলে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ-ই যেন বলে ওঠেন--যাই গো মা, যাই। কে ডাকে, কে আমাকে ডাকে?

বাবার বাঁধ তৈরীর এক্সপার্ট হিসেবে সুনাম ছিল। ব্রিটিশ আমলে যত বাঁধ হয়েছে, তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। ওরা স্বদেশী করে, দেশের জন্য প্রাণ দেয়; বাবা ব্রিটিশ আমলের বড় বাঁধ অফিসার, যা তিনি করেন, তাও ভাবেন দেশের কাজ করছেন। কেউ বাহবা দেয় না—কেউ চেনে না তবুও বাবার কাজের বিরাম নেই। বাড়িতে কত আত্মীয়-স্বজন, পোষ্য—রোজ কত লোকের কত পাতা পড়ে তার হিসেব থাকত না; মা-ই নীরবে সবার বায়নাক্কা, সবার দায়িত্ব, সবার অসুখ-বিসুখ, সবার দাবী মেটাতেন।

কাজেই মায়ের কোনদিন বিশ্রাম ছিল না—বারোমাস মায়ের একই অবস্থা। এত বড় সংসারে একটা না একটা ঝক্কি সামলাতে হত বলে কোন সময়ে কোথাও তিনি বেরুতে পারতেন না। সেবার ঠিক হল রাঁচী যাওয়া হবে। সেখানে একটি বাড়ি ভাড়া করা হল। বাবা ছিলেন উদার মানুষ, ছুটি কাটাতে রাঁচীতে যাচ্ছেন, এখনকার মত শুধু ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাবেন, তা কি হয়? অন্যরা চলুক না—বেশ মজা হবে। আত্মীয়-স্বজনকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,—এই শোন্, রাঁচীতে বেড়াতে যাচ্ছি—তোরা যাবি? বাবার খেয়াল থাকে না কলকাতা বাসার ভিড়টা যদি রাঁচীতে গিয়ে ওঠে তবে মার যে এতটুকু বিশ্রাম হবে না। আধুনিক যুগে এ মানসিকতার যে কি আমূল পরিবর্তন হয়েছে, ভাবলে অবাক লাগে মৈত্রেয়ীর। কলকাতার ভিড়টাও রাঁচীতে গিয়ে উঠল। কাকা নামী ঐতিহাসিক ছিলেন, কাকা যাচ্ছেন শুনে তাঁর এক ছাত্র—সে পাগলাগারদের ডাক্তার—জানিয়েছে পাগলাগারদ দেখার যাবতীয় বন্দোবস্ত হয়ে আছে, চিন্তার কোন কারণ নেই। সেদিন সবাই সেজেগুজে পাগলাগারদ দেখতে যাচ্ছে। মা, বাবা ও আমি তিনজনেই কি করে যেন শুধু বাড়িতে রয়ে গেলাম। বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বললেন—না, ওখানে যাব না রে। অল্প-বয়সী মেয়ে আমি, আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কতটুকু আর মূল্য! আমি যখন বেঁকে বসলাম, বললাম—যাব না, শুনতে হয়েছিল, বাবা আদর দিয়ে দিয়ে আমার মাথাটা নাকি খেয়েছেন। একান্নবর্তী পরিবারে যা হয়—ছোট ছোট ঘটনা অকারণে বড় হয়ে দেখা দেয়। কে কি বলল, বা কে কি দোষারোপ করল, কোনদিনই তাতে কান দিইনি। ওরা সবাই চলে গেলে বাবা আস্তে করে আমার পিঠে হাত রেখে একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, তুই যে বড় গেলি না?

—ইচ্ছে করল না।

চা তৈরী করে এনে বাবার হাতে কাপটা এগিয়ে দিয়ে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলাম—তুমি কেন গেলে না, বাবা?

সহানুভূতির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন—কি ভেবে তুই গেলি না, ঠিক জানি না। কিন্তু আমি কেন গেলাম না সেটা আমি জানি, এ ব্যাপারে অনেক ভেবেছি।

বাবার মনটা জানতে তখন আমি অধীর। জিজ্ঞেস করলাম—ওখানে কেন যেতে চাইলে না, বাবা? কাকাও ত কত করে বললেন—কিন্তু তুমি নড়লে না?

চায়ে চুমুক দিয়ে বাবা যা বলেছিলেন,.তা অনেক দিনকার কথা কিন্তু

মৈত্রেয়ীর এখনও মনে আছে। কালের হাত এড়িয়ে, কাজের অবকাশে বর্ষা-মুখর এইরকম একটা সকালে বাবার সেই কথাগুলো মনে ভেসে আসে। বাবা বলেছিলেন—দেখ্, ঈশ্বর বা প্রকৃতি যে নামেই ডাকিস্, পরম-শক্তি যে একটা আছে, তুই কি তা মানিস ?

বললাম—হ্যাঁ, বাবা, বিরাট একটা শক্তি, অদৃশ্যভাবে যে আমাদের জীবনকে ছুঁয়ে আছে, তা আমিও বিশ্বাস করি।

বাবা বললেন -ঠিক বলেছিস। এ বিশ্বাস শুধু যে ভারতবাসীর মনের গভীরে তা নয়, এ বিশ্বাসের সুর শুনবি চলতে-ফিরতে, মাঠে-ঘাটে, বনে-মনে। নদী-নালা-গাছ-পাথর মানুষের মত ভাববার শক্তি পায়নি। পশু-পক্ষী কিংবা জন্তু-জানোয়ার, এই বিরাট বিশ্বকে নিজের করে দেখতে পারে না, অন্তরে গ্রহণ করতেও তারা অক্ষম। জগতে ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় সৃষ্টি এই মানুষ— আর তার এই মস্তিষ্ক। এই কারণেই হয়ত গাছ-পালার শেকড় থাকে মাটিতে আর মানুষের মস্তিষ্কে। এই মস্তিষ্ককে সম্বল করে দেখ্, মানুষ জগতে কি কাজ করে বেড়াচ্ছে—বিজ্ঞানের জগতে কত এগিয়ে যাচ্ছে, আরও এগোবে নিশ্চয়ই, ম্যান একদিন হবে 'সুপারম্যান'। সামান্য একজন ইঞ্জিনীয়ার আমি, তবে সারা জীবন বিজ্ঞান নিয়েই কারবার করছি। তাই বলছি, দেখবি, এই বিজ্ঞানের বৈভবে মানুষের স্বভাব একদিন পাল্টাবে, মানসিকতারও পরিবর্তন হবে, কিন্তু তার যে মৌলিক স্ট্রাক্‌চার তার কিন্তু কোন পরিবর্তন হবে না। সেই মেধাকে সম্বল করেই আমরা কিন্তু ভাবতে পারি, ঈশ্বরকে অস্বীকার করেও তার সপক্ষে যুক্তি দিতে পারি; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ঈশ্বর বা শক্তি অথবা এনার্জি বলে কোন বস্তু আছে কি-না আমরা জানতে চাই, জানতে চাই কোথা থেকে এসেছি আমরা, মৃত্যুর পরে কোথায় যাব ? সেই মস্তিষ্ক যখন বিকল হয়ে যায়, সেটা যে কী ভয়ংকর ট্র্যাজেডি কখনও কি ভেবেছিস ? অত আনন্দ করে ওটা দেখার কী আছে বল ?

একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। পরপার, ঈশ্বর, মানসিকতা, অনুভূতি, জীবনের অভিজ্ঞতা—কত বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে কত আলোচনা হত। বাঁধ বিশেষজ্ঞ ছিলেন বলে, কত গোপন কথা তিনি আমাকে বলতেন। কলকাতার গঙ্গার পলিমাটি-পড়া দেখে একবার আঁতকে উঠে বলেছিলেন—অতীতে বাংলার নদী-নালার প্রবাহ অনেক পাল্টেছে, অনেক সময় নদীর প্রবাহ একেবারে শুকিয়ে গেছে। গঙ্গার এ প্রবাহ একদিন দেখবি শুকিয়ে যাবে। সে আক্ষেপ, সে সাবধানবাণী, আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। টাটার জাহাঙ্গীর গান্ধীর কন্সালটেন্ট হিসেবে কাজ করার সময় দুঃখ করে

বলেছিলেন—এত রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠান, এত ফ্যাক্টরী এমন নির্বিকার-ভাবে গঙ্গাকে পল্যুট করছে যে গঙ্গার জল একদিন বিষাক্ত হয়ে উঠবে—এখন এরা কেউ বুঝতে পারছে না কিন্তু যখন বুঝবে, তখন কোটি কোটি টাকা খরচ করেও লাভ হবে না। এতদিন পরে দেখছি বাবার অনেক কথাই ফলে যাচ্ছে কিন্তু যা আজ বললেন, তা ত পরিপূর্ণ দরদী মনের পরিচয়। এই দরদী মানুষটাই মৈত্রেয়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি একেবারে স্তব্ধ। বললাম—বাবা, আমি অত গভীরভাবে ভাবিনি। তবে পাগলদের দেখতে আমারও কেমন যেন লাগে। ছন্নছাড়া, বিষণ্ণ, ভয়ানক যেন এক ট্র্যাজেডি বলে মনে হয়। ভাবি দেখার কি আছে?

ধীরেন এসে বল্‌ল—মা, কফি। চিন্তার সুর কেটে গেল।

—হ্যাঁ, দে। ভেতরের সব জানলা-দরজাগুলো বন্ধ আছে ত, ধীরেন?

—হ্যাঁ, মা। কি রান্না করব, মা?

মৈত্রেয়ী বললেন—আমার আজকে রান্নাঘরে যেতে ইচ্ছে করছে না, তুই এক কাজ কর—খিচুড়ি বসিয়ে দে। ফ্রিজে ইলিশ মাছ আছে, ভেজে ফেল। ওরা খুব ভালবাসে। পারবি, না উঠব?

ধীরেন বলল—খিচুড়ি! করে নিতে পারব। আপনার কি শরীর খারাপ মা, এত চুপচাপ বসে আছেন?

—না-রে, শরীর ভালই আছে। বয়স হয়েছে ত, তাই ভাবনা বেড়েছে। তুই ওসব বুঝবি না। টেবিলের ওপর ঐ বইটা দে ত রে, তারাশঙ্করের রচনাবলীর একখণ্ড।

ধীরেন বইটা মৈত্রেয়ীর হাতে দিয়ে বলল—আমিও আজকাল খুব ভাবি মা, মেদিনীপুরের গ্রামে এবার খুব বন্যা হয়েছে। সব শস্য কি তবে নষ্ট হয়ি গ্যাল—কাগজে কিছু বেরিয়েছে, মা?

—কেন, তোর বউয়ের চিঠি পেয়েছিস নাকি?

—সে-ই যে পনেরো দিন আগে লিখিছিল, আর লেখেনি। আপনি ত এখানি লিখি দাও, ওখানি চিঠি লিখিবার কেউ ল্যাই। পাড়ার মাস্টারটি ঘন ঘন কলিকাতায় যায়। তারি আর পাওয়া যাচ্ছিনে, মা।

ধীরেনকে কথায় পেলে আর রক্ষে নেই। মৈত্রেয়ী তাই বললেন—তুই এখন যা, তোকে গল্পে পেলে রান্নাবান্না পড়ে থাকবে।

—হ্যাঁ, যাই মা। বলে ধীরেন ভেতরে চলে গেল।

অচলার আজও দেখা নেই। একদিন এলে তিনদিন আসে না। কৈফিয়ৎ হিসেবে মায়ের অসুখটা ত আছেই। এখন আবার মায়ের পেস্‌ মেকার বসান হয়েছে। এর জন্যে বেশ কিছু ধারও নিয়েছে অচলা।

সহজে কি আর আসবে? নির্বিকার এই মানুষটা নিজের হাতে সব কিছু করে নেন, দেখে কষ্ট হয়। এখন অবশ্য সন্দীপ কিছুটা সাহায্য করে, বাবার চিঠিপত্তর টাইপ করে দেয়। এইসবের জন্যই ত লোক রাখা। তাই অচলা না এলে মনটা অশান্ত হয়ে ওঠে। বাপ-হারা অল্পবয়সী অচলার কাজে এত অনীহা আর অহরহ কারণে-অকারণে মিথ্যে বলা মৈত্রেয়ীর একেবারে পছন্দ হয় না। অচলার কথা ভাবতে তাঁর ভাল লাগে না। ভাবছিলেন মাস্টারটির কথা। ধীরেন বলে গেল, মাস্টার এখন ঘন ঘন কলকাতায় যায়। পরিবর্তনের চাকায় ঘুরছে মাস্টার, সে এখন দ্রুত পাল্টাতে থাকবে, আর তাকে পাওয়া যাবে না। যারা সচেতনভাবে দেশ ও দশের পরিবর্তন আনতে সক্ষম, এমন মানুষ কিংবা নেতা পৃথিবীতে গোণা গুণতি; বাকি সবাই ত পরিবর্তনটাকেই দেখে। পরিবর্তনের পেছনে যে কত বড় একটা চাকা ঘুরছে, তার খবর কেউ রাখে না। রূপান্তর কেউ টের পাক না পাক, অলক্ষ্যে রূপান্তর নিরন্তর ঘটে যাচ্ছে।

আকাশ এখন পরিষ্কার। গাড়ির আওয়াজ। মৈত্রেয়ী ভাবলেন, ওরা বুঝি ফিরে এল। দরজা খুলে দেখেন, অলকা। বললেন—ভেতরে এসো, বৃষ্টির দিনে বেরিয়েছ?

সারা মুখে হাসির ঝলক ছড়িয়ে অলকা বলল—আজ সকালে ক্লাস নিয়ে দেখলাম মাঝখানে অনেক সময়, ভাবলাম একটু গল্পগুজব করে যাই।

—খুব ভাল করেছ, মৈত্রেয়ী হেসে বললেন। আজ লাঞ্চ করে যেও—খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজা।

—ওঃ লাভ্‌লী।

—মাঝে মাঝে আমাদের কথা তোমার মনে পড়ে।

—আমারই স্বার্থ। এখন যে কাজটা হাতে নিয়েছি, তার জন্যে মাঝে মাঝে আসতে হবে, নয়ত কাজ এগোবে না।

—কী নিয়ে কাজ করছ? বই লিখবে?

অলকা মাথা নাড়ল--কাজ করছি পাবলিক সেক্টর নিয়েই। কিন্তু শুধু আর্থ-সামাজিক দিক থেকে নয়—ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রোথ-এর, প্ল্যানিং-এর ব্যাপারটা দেখাতে চাই। আমি প্রমাণ করতে চাই, স্বাধীনতার আগে বা পরে প্রাইভেট সেক্টরের হাতে যদি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারটা ছেড়ে দেওয়া হত, তাহলে পাকিস্থানকে নিয়ে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ-গুলোতে যা হয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হত। ১৮৬৫ সাল

থেকে দেশে বার বার দুর্ভিক্ষ হয়েছে—তার জন্যে অর্থলোভী ও স্বার্থলোভী ব্রিটিশ সরকারকেই আমি দায়ী করি। লোকেদের দুর্দশায় প্রাইভেট সেক্টর আঙুল পর্যন্ত নাড়েনি। তারা এখনও একটিমাত্র মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ঃ মুনাফা। দেশ জাহান্নমে যাক্, তাদের কি? অনেক কিছু দেখছি, ভাবছি—কতদূর কি করতে পারব জানি না। আমার খেয়ালই ছিল না যে দেশে পাবলিক সেক্টরের সূচনাকাল থেকেই গঙ্গাধর মেসো এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাবাই একথা আমায় মনে করিয়ে দিলেন।

—দেশে এখন প্রায় আড়াইশোর মত পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং গড়ে উঠেছে। মেসোমশাই যখন এতে হাত দেন, তখন মাত্তর চার-পাঁচটা ছিল। প্রত্যেকটার তখন নাভিশ্বাস ওঠার অবস্থা। আসলে তখন সরকার শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছিলেন সরকারী ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান খাড়া করে ওয়েল্থ্ জেনারেট করা যায় কি না। তবে উনি যে তোমাকে খুব বেশী সময় দিতে পারবেন, মনে হয় না। এখন ত আবার সন্দীপ এসেছে, ওকে নিয়েও কিছুটা হয়ত ঘোরাঘুরি করতে হবে।

—সন্দীপ এসে গেছে? অলকার মুখখানা হাসিতে ভরে গেল।

—দেখ না, কাল এসেছে, আজই বৃষ্টি মাথায় করে বাপ-ব্যাটা বেরিয়ে গেল। কতদূর কাজ হবে আমার খুব সন্দেহ! কাজ-পাগল মানুষদের একটু মাথা খারাপ থাকে, জান ত?

খিল খিল করে হেসে ওঠে অলকা। বলে—আর সেই পাগল মানুষদের নিয়ে গৃহিণীদেরও মুশকিল। আজকাল আমার কি হয়েছে জানেন—একঘেয়ে মানুষদের সঙ্গে মিশে একেবারে বিরক্ত হয়ে গেছি। এখন আমি অন্য কিছু খুঁজি—একটু এডভেঞ্চার। শুধু বই-রিপোর্ট-অর্থনীতিবিদদের মান্ধাতা আমলের দৃষ্টি নয়। এ কাজের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের একটু সান্নিধ্য। আমার লেখার মধ্যে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির ছোঁয়াচ যেন পড়ে।

—আচ্ছা। তুমি দেখছি অনেক কিছু একই সঙ্গে করতে চাইছ—তা বেশ। কী খাবে, কফি না চা?

—কফি

—বস, ধীরেনকে বলে আসি। মৈত্রেয়ী উঠে গেলেন।

অলকা একটু ভেবে নিল, মৈত্রেয়ী আসতেই বলল—মনের মধ্যে যা ওঠে, সব কথা সবাইকে বলাও যায় না। আপনি চিরকাল সোশ্যাল সার্ভিস করেছেন, লোকেদের দুর্দশায় সাহায্য করতে এগিয়ে গেছেন, স্কুল করেছেন, ম্যাটারনিটি সেন্টার করেছেন, টেক্নিক্যাল স্কুল তৈরী হলে

কর্মীরা যাতে স্কিল্‌ড্ হয়ে ওঠে—তা ভেবে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অনেক সময় ইচ্ছে করে, আপনাকে সব কথা খুলে বলি।

—আমি এখন শোনার মুডে আছি, তুমি বলে যেতে পার। মৈত্রেয়ী হেসে উৎসাহ দিলেন।

—গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনকে আমি তিনটে ভাগে ভাগ করেছি, এ ব্যাপারে সুপ্রকাশ রায়ের মত কয়েকজন অনন্যসাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তি আমার সহায়। ১৯২১-২২ সালে, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে দেশ যখন তোলপাড়, সেই সময় চৌরিচৌরা সংগ্রামে ২০ জন পুলিশ হতাহত হওয়ার খবরে তিনি একেবারে মুহ্যমান হয়ে আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। এত বড় দেশের এত শত সংগ্রামী মানুষ যদি বার বার মার খেয়ে মরিয়া হয়ে একবার মার দেয়, গান্ধীজী অমনি বলে ওঠেন, দেশবাসী এখনও অহিংস পথে চলার উপযুক্ত হয়নি। তিনি তখন অনশন করে সবার হয়ে আত্মশুদ্ধি করেন। সংগ্রামী কৃষক যখন মোপলা বিদ্রোহে ফেটে পড়ে তিনি তখন শ্রেণীগত স্বার্থ রক্ষায় মরিয়া হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ১৯৩১-৩২। তখনও দেখলাম জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে বাধা দিতেই গান্ধীজী এগিয়ে গিয়ে আবার পিছিয়ে এলেন। উত্তরপ্রদেশের কৃষকদের কাছ থেকে জমিদারগোষ্ঠীর অন্যায়ভাবে কর-আদায়, ব্রিটিশদের সমর্থনে তাদের উচ্ছেদ, নানা টানাপোড়নে জওহরলাল সমেত অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারা যখন কৃষকদের নেতৃত্ব দিতে অপারগ—তখনকার অবস্থা একবার ভাবুন। কৃষকরা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে অথচ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কর-না-দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করতে সে কি বিপত্তি। গান্ধীজী তখন রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্সে যোগ দিয়ে দেশটাকে নেতৃত্বহীন করে রেখেছেন। দেশে থাকলেও খুব যে সুবিধে হত, মনে হয় না। কংগ্রেস আগেই কৃষকদের যতটা পার খাজনা দিতে বলেছিল এবং তা করতে গিয়ে তারা হাজারে হাজারে মার খেয়েছে। ১৯৪১-৪২ সালে সংগ্রামটাকে আর ব্যাক্‌গিয়ারে নিয়ে যাবার উপায় ছিল না বলে তার সাত বছরের মধ্যে দেশ-ভাগ মেনে নিয়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বারবারই মহাত্মা 'পর্বত প্রমাণ' ভুল করে গেছেন। তিনি সংগ্রামী মানুষকে পথ দেখাতে বারবার অনশন করেছেন—কিন্তু দেশ-বিভাগ থামাতে অনশন করতে রাজী হলেন না কেন? এটাই আমার প্রশ্ন।

মৈত্রেয়ী বললেন—প্রফেসর রাধাকৃষ্ণণের আমি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলাম। সে গল্প তোমাকে একদিন করব। কথাটা তুললে বলে ছোট্ট একটা ঘটনার কথা তোমাকে বলছি। তোমার জিজ্ঞাসার হয়ত

উত্তর পাবে। পার্টিশনের তখন সব ব্যবস্থা পাকা। প্রফেসর রাধাকৃষ্ণণ ভেবেছিলেন, দেশকে ভাগ করার ব্যাপারটা অন্যরা মেনে নিলেও গান্ধীজী নিশ্চয় মেনে নেবেন না। কিন্তু গান্ধীজী যখন মেনে নিলেন—তখন রাধাকৃষ্ণণ গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেন, যার জন্যে আপনি সারা জীবন ধরে সাধনা করলেন, সেই দেশ ভাগ এখন হতে যাচ্ছে, আপনি কেন তা মেনে নিচ্ছেন?

গান্ধীজী বলেছিলেন—আমি কি করব? এরা চাইছে, আমার কথা কেউ শুনল না।

প্রফেসর বলেছিলেন—কেন, আপনার ত একটাই ধারাল অস্ত্র—অনশন, দেশ-ভাগের বিরুদ্ধে অনশন করুন না কেন।

গান্ধীজী মাথা নেড়েছিলেন।

প্রফেসর চেপে ধরলেন—বারবারই আপনি অনশন ধর্মঘট করেছেন নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এখন এত বড় একটা সর্বনাশ হতে যাচ্ছে, সেটা কেন তবে ঠেকাবেন না?

গান্ধীজী চুপ করে রইলেন।

অলকা বলল—ইতিহাসের পাতায় এরকম আরও অনেক রহস্যজনক নীরবতা আছে। ১৯৩৮ সালে সুভাষ বসু যখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট, তিনি প্ল্যানিং কমিটি গঠন করে তার চেয়ারম্যান হতে জওহরলালকে আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু কি এক দুর্বোধ্য কারণে প্ল্যানিং-এর কোন ব্যাপারে সুভাষবাবুর নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয় না। প্রফেসর হীরেন মুখার্জী তাঁর বই 'জেন্‌টল্‌ কলোসাস'-এ স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন যে দেশের প্ল্যানিং-এর কথা বলতে গেলে দু-জনের কথা সমানভাবে উচ্চারিত হওয়া উচিত, যদিও নেহেরুজী তাঁর আত্মজীবনীতেও কোথাও এ-ব্যাপারে সুভাষবাবুর নাম করেননি। আমি দেখাতে চাই, কংগ্রেসের আন্দোলন, যে-কারণে কৃষক, শ্রমিক ও সমাজের দুর্বল শ্রেণীর স্বার্থ থেকে বরাবর দূরে ছিল, সেই একই কারণে রাইটিস্ট ফোর্স সামন্ততন্ত্র, জমিদার-গোষ্ঠী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর কথা ভেবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে যে প্ল্যানিং, তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। ১৯২৬ সালের পরে জওহরলালই তখন কংগ্রেসের মধ্যে একমাত্র সোশ্যালিস্ট, তাঁকে মাঝে মাঝে গান্ধীজীও তিরস্কার করতে ছাড়েননি। প্ল্যানিং কমিটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করতে পারেনি। চার বছরের মধ্যে জওহরলালকে বেশ ক-বার জেলে যেতে হয়েছিল। প্ল্যানিং সাব-কমিটি যেসব রিপোর্ট দিয়েছিল—তাতে স্পষ্টভাবে

বলা হয়েছিল 'হেভী ও কী ইন্‌ড্রাস্‌ট্রিস্' সরকারী হাতে গড়ে তোলা ছাড়া অন্য উপায় নেই। রাইটিস্ট ফোর্স তখন চেয়েছিল দেশটাকে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রেখে পরনির্ভরশীল করে রাখতে, পাবলিক সেক্‌টরের ইতিহাসের মধ্যে আমি সেই ষড়যন্ত্রটাই দেখাতে চাই।

মৈত্রেয়ী মন দিয়ে শুনছিলেন। বললেন—বড় কাজ, দেশের কাজ ভণ্ডুল করে দেবার অনেক ষড়যন্ত্র ওঁর জীবনেই আমি দেখেছি। ছোট আকারে হলেও তার মধ্যে তুমি বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের বীজ খুঁজে পাবে। কিন্তু সেসব কথা বলে কি লাভ?

অলকা বলল—না, না, আপনি বলুন, যদি সুবিধে হয় আমি প্রশ্ন করতে পারি। দেশের যেসব নেতাদের কথা আমরা বইতে পড়েছি—চোখে দেখিনি, তাঁদের কথা যা জানেন, বলুন না, শুনি।

—ওরে বাবাঃ তুমি যে আমাকে ইন্‌টারভিউ করতে শুরু করলে। আচ্ছা, তুমি যখন সুভাষ বোসের কথা তুললে, তখন তাঁর কথাই বলি। সুভাষবাবুকে আমরা অনেকবার দেখেছি—দেখেছি মানে, সুভাষবাবুর বাড়ির সঙ্গে আমাদের খুবই যোগাযোগ ছিল। আমার বাবা যখন বিলেত থেকে ইঞ্জিনীয়ার হয়ে আসেন, মনে আছে, বাবা ফিরে এলে সুভাষবাবু দেখা করতে এসেছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছিলেন—বিলেত ফেরৎ ইঞ্জিনীয়ারকে দেখতে কেমন লাগে, দেখতে এলাম। আসলে বাবা ও শরৎ বোস একই সঙ্গে পড়েছিলেন।

অলকা উল্লসিত হয়ে ওঠে। বলে—এসব কি বই পড়লে জানা যায়? এক একজন মানুষ এক একটা সময়ের প্রতীক। তাই সে ইতিহাস। তারপর—?

—একটু আগে তোমাকে প্রফেসর রাধাকৃষ্ণণের কথা বলছিলাম। ক্যালকাটা ইউনিভারসিটির ভাইস্-চ্যানসেলর হবার পর স্যর আশুতোষ মুখার্জী সারা ভারতে ঘুরতে বেরুলেন ভাল টিচার ও রিয়েল স্কলারের অনুসন্ধানে। তাঁর মন ত খুব অনুসন্ধিৎসু ছিল। প্রফেসর রাধাকৃষ্ণণ তখন ব্যাঙ্গালোরে ছোটখাট একটা কাজ করতেন। আশুতোষ মুখার্জীই তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। প্রফেসরের সঙ্গে সেই সময় থেকেই আমাদের আলাপ; আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। আমি তখন সবে বি. এ. পড়ি। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর পারসোনাল্ সেক্রেটারী হয়ে গেলাম। প্রফেসরের যখন যা মনে পড়ে যেত, হয়ত কোন কিছু চিন্তা করছেন বা হঠাৎ কোন আইডিয়া এসেছে মাথায়, হাতের কাছে যা তিনি পেতেন, তাতেই লিখে রাখতেন। অনেক সময় দেখেছি, খবরের কাগজের মাথায় লিখে লিখে একটা খামে তা গুঁজে গুঁজে রাখতেন; পরে সেগুলো নিয়ে বসে

লিখতে শুরু করতেন। কোথাও আটকে গেলে আমার ডাক পড়ত। বলতেন—টক্ করে বল ত 'প্লসিব্‌ল্'-এর সমার্থক শব্দ কি? আমি হয়ত বলতাম—কেন, পসিব্‌ল্। রাইট—আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতেন তিনি। হেসে বলতেন,--সাধে কি আর তোমাকে আমার সেক্রেটারী করেছি। বলেই আবার লিখতে শুরু করতেন।

—তারপর? অলকা আরও শুনতে চায়।

—তখন প্রফেসরের খুব নাম-ডাক। চিরকাল শিক্ষায়তন ও শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েই ভেবেছেন। নেহেরু তাঁকে ১৯৪৯ সালে রাশিয়াতে অ্যামবা-সাডার এক্সট্রাঅরডিনারী করে পাঠাতে চাইলেন। মনে আছে, প্রফেসর সেই প্রথম বড় দ্বিধায় পড়েছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কী করব? আমি প্রথমে বলতে চাইনি, কেন না, আমি যা বলব তাতে প্রফেসর হয়ত আঘাত পাবেন। চুপ করে আছি দেখে খুব জোর করতে লাগলেন। বাধ্য হয়ে তখন বললাম--চিরকাল শিক্ষা নিয়েই আপনার কাজ-কারবার, শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্যি কিছু করার সময় এখন এসেছে, এখন আপনি যদি লাইন চেঞ্জ করেন, মনে হয়, মস্ত বড় ভুল হবে। সত্যিকারের কাজ যদি কিছু ক'রে যেতে চান, তবে দেশের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়েই করুন। তাতে দেশের লোক চিরকাল আপনাকে মনে রাখবে। পলিটিকস্ আপনার অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করবে। যখন গদি ছাড়বেন, আপনার দিকে হয়ত কেউ ফিরেও দেখবে না।

বর্তমানের নিক্তির ওজনে অতীত ইতিহাসকে এক পলকে বিচার করে অলকা বলে উঠল--আপনি ত ঠিকই বলেছিলেন, তাহলে?

--তাহলে আর কি! আমার মনে হয় পলিটিকস্ করা বা পলিটি-শিয়ান্‌দের সঙ্গে থাকার মধ্যেও একটা গ্ল্যামার আছে--নয়ত সব জেনেশুনে উনি তা গ্রহণ করলেন কেন? পাশ্চাত্য দেশের মত এদেশে চিন্তাশীল ব্যক্তি, স্কলার বা ফিলসফার আখ্যা পেয়েও ত কোনো লাভ হয় না। এখানে রামকৃষ্ণের মত রিঅ্যালাইজড্ সোল-এরই কদর বেশী।

অলকা বলল—আসলে, সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি না বলেই ত আমরা আমাদের বাস্তব জগৎ থেকে দূরে সরে যাই। খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

মৈত্রেয়ী বলে চলেন। ১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ। কী দিন যে গেছে! সন্দীপ তখন পেটে। পুষ্টিকর ভালো সব খাবার আমায় খেতে হত। একদিন খেতে যাবো, শুনতে পেলাম বাইরে আকুল ক্রন্দন, একটু ফ্যান দে, মা। আমি ঠেলে ফেলে দিই সব। খুব রোগা হয়ে যাচ্ছি, কিছু খেতে পারি না, অথচ এদের জন্যে কিছু করার সামর্থ্যও

আমার তখন নেই। লোকেরা না খেতে পেয়ে মরছে, র‍্যাশনের বিরাট লাইন। সরকার যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত। এদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে কিছুই বিশেষ করছে না। সুরাবর্দী তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তাও আমরা অত অসহায়। ব্রিটিশ সরকার সৈন্যসামন্তের জন্য প্রচুর খাদ্যশস্য জমা করে রাখছে, মুনাফাখোরী ও কালবাজারীদের কুচক্রে দেশের শোচনীয় অবস্থা। তোমার গঙ্গাধর মেসোর সেই সময় এক অদ্ভুত ট্র্যাজিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। র‍্যাশনের দোকানে বিরাট লাইন। অর্ধনগ্ন, ভুখা লোক ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছে। রুগ্ন, পেট ফোলা, অনেক দিন কিছু খায়নি, ধুঁকছে। একদিন তোমার মেসো আমার বৌদিকে রাস-বিহারী এ্যাভিনিউ দিয়ে গাড়ি করে ছেড়ে আসতে গেলেন। বাড়িতে ফিরে দেখি গুম্ হয়ে বসে আছেন। আমার মা ওনাকে নিজের ছেলের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন। গুম্ হয়ে বসে আছেন দেখে মা গিয়ে বললেন--গঙ্গাধর, তোমার কি শরীর খারাপ? এসে যে শুয়ে পড়লে? কি হয়েছে কিছুতেই বলবেন না। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর বললেন--না মা, যাবার সময় দেখলাম ছেলের হাত ধরে তার মা রাস্তা পার করাচ্ছে। বোধ হয় মুড়ি কিনে আনতে বলেছিল। ছেলেটা রাস্তায় চাপা পড়েছে, সে এক বীভৎস মর্মান্তিক দৃশ্য। মা একবার তার মৃত ছেলের কাছে এল, একবার শুধু ডুঁকরে কেঁদে উঠল, তারপর অন্য ছেলেদের হাত ধরে র‍্যাশনের লাইন দিতে চলে গেল। আমি ভাবলাম--কি ভয়ংকর দুর্দিন। মৃত ছেলের জন্যে মায়ের কান্নার অবসরটুকু পর্যন্ত নেই। তাই বড় মন খারাপ লাগছে। আমার মা তোমার মেসোকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলেন। উনি বলছেন, আর কাঁদছেন। জান, ওনাকে দেখে আমিও একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হত বড় কঠোর মানুষ--কিন্তু ভেতরটা যে এত কোমল সত্যিই আমি জানতাম না। প্রফেসর তখন বেনারস হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর--সেখানে আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

অলকা বাধা দিয়ে বলল--অত বড় একজন মান্যগণ্য পরিবারের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন, কিন্তু এই যে শুনি গঙ্গাধর মেসোর ওপর অনেক অন্যায় করা হয়েছে, অত কাজ করেও তিনি কোন স্বীকৃতি পাননি। কখনও কি সেসব প্রফেসরের কানে তোলা হয়েছিল?

--ওরে বাবা! বললে রক্ষা ছিল নাকি? ওসব কথা বললে, তোমার মেসোর সঙ্গে হয়ত বিচ্ছেদই হয়ে যেত। তখন ব্যাঙ্গালোরে ওঁর ওপর-ওয়ালা এম. ডি. রূপেশ্বর খুঁটির জোরে অত বড় অন্যায় করল--অথচ কারুর কাছে কোন কথা বলার জো ছিল না। আসলে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হবার

পর থেকেই আমি তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থেকেছি। প্রফেসর দুঃখ করে বলতেন--মৈত্রেয়ী আমাকে ভুলে গেছে, আমার কাছে আর আসে না। তোমার মেসোর যা কাজ, আর যেরকম কাজ-পাগলা লোক উনি, ওনার সঙ্গে তাল রাখতেই ত আমার সময় চলে যেত। এরকম একজন মানুষের সঙ্গে ঘর করে কারুর সঙ্গে কি আর যোগাযোগ রাখা যায়? যোগাযোগ রাখার সরকারী ও সামাজিক বাধাও কম ছিল না। অনেক সমস্যা, অনেক ঝঞ্ঝাট তিনি মাথায় নিয়েছিলেন। যদি প্রফেসরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম, লোকেরা বলত, প্রফেসরের দৌলতেই সব জট্ ছাড়াচ্ছেন। তাতে যেমন প্রফেসরের সম্মান থাকত না, তেমনি ওনারও। এইসব নানা কারণে প্রফেসরের সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি।

অলকা সায় দিয়ে বলল--আজকের দিনে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করলে লোকে বোকা বলে, তাই না?

--হ্যাঁ, তা হয়ত ঠিক।

বাইরে কলিং বেল্ বেজে উঠল। গঙ্গাধর ও সন্দীপ ঘরে ঢুকল।

অলকার কাছে এসে গঙ্গাধর বললেন--কখন এলে?

--অনেকক্ষণ।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সন্দীপ প্রশ্ন করে--কে কথা বলছে, মা?

—তোমার কি মনে হয়? অলকা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সন্দীপের দিকে তাকায়।

--আজেবাজে কথা বলার ত তোমার অসাধারণ ক্ষমতা—অন্যে তা শুনুক বা না শুনুক।

--তাই বুঝি?

--হ্যাঁ, ঠিক তাই। ভারতবর্ষ বেঁচে আছে, কি মরে গেছে, তা নিয়ে ক্ষোভ কিংবা প্রচণ্ড মনের অশান্তি, নয়ত ইতিহাস, আর, আর কত কী সব যেন--যত সব গুরুগম্ভীর কথা!

মৈত্রেয়ী বললেন—না-রে, ও-ই বরং বোরড্ হয়েছে--আমিই ত এক নাগাড়ে বকে যাচ্ছি। আর আমার যা, একবার বলতে আরম্ভ করলে—।

—সে ব্যাপারে অলকা কিন্তু তোমায় ছাড়িয়ে যায়, হাজার হলেও মাস্টারনি!

অলকা উঠে গিয়ে সন্দীপের পিঠে ছোট্ট একটা কিল মেরে বলল—সিভিলিয়ান না হতেই বড় যে সাহস বেড়ে গেছে--অবাধ্যপনা।

গঙ্গাধর ভেতরে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বললেন—মৈত্রেয়ী, টেবিল লাগাতে বল। বড় খিদে পেয়েছে। কাজ ত হলই না—অকারণে বৃষ্টির

মধ্যে হয়রানি। আজকাল এ্যাপয়েন্টমেন্ট্ বোধ হয় ক্লাইমেট্ ভাল-খারাপের ওপরে নির্ভর করে, তুমি ভাবতে পার মৈত্রেয়ী? হ্যাঁ, অলকা, তুমি আমাদের সঙ্গে না হয় খেয়ে যাও। জানি না, মৈত্রেয়ী কি রান্না করেছে।

মৈত্রেয়ী হেসে বললেন—ওকে আমি আগেই খেয়ে যেতে বলেছি। তবে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা।

সন্দীপ বলে উঠল—ফ্যান্ট্যাসটিক্। অলকা, তোমার ভারতবর্ষের চেয়ে নিশ্চয় মুখোরোচক।

অলকা এক গাল হেসে বলল—পেটুক মানুষকে স্বাদের কথা জিজ্ঞাসা করা অকারণ পণ্ডশ্রম। আমার হাতে অত সময় নেই।

—খাওয়ায় অত অরুচি বলেই ইন্‌টেলেকচ্যুয়ালরা কিছুই করে উঠতে পারে না। তারা শুধু অন্যদের গেলাবে। কথায় আর ভাষণে, নয়ত বই লিখে। অরুচি যে আমাদের কোথায়, নিজেরা খায় না বলেই বোঝে না।

মৈত্রেয়ী সন্দীপের কথা শুনে হাসছিলেন। গঙ্গাধর বাথরুমে চলে গেলেন।

অলকা হেসে বলল—তোমার আস্পর্ধা বার করছি, দাঁড়াও। মাসিমা দেখেছেন! চলুন মাসিমা, আমিও রান্নাঘরে গিয়ে একটু সাহায্য করি।

॥ সাত ॥

পুরন্দরে পরাঞ্জপে কোন্ সিঁড়িগুলো কিভাবে কাজে লাগিয়ে ইদানীং জাতীয় কালচারের প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন, তা বোঝা মুশকিল। মুশকিল বলেই নানা লোকে নানান কথা বলে। পরাঞ্জপে মানুষটাকে বোঝা যাক বা না যাক, তিনি যে কত অসাধ্য সাধন করতে পারেন, দিল্লীবাসী তা ত স্বচক্ষেই দেখছে। গণেশ টাওয়ার সম্পূর্ণ হলে মানুষটার ক্ষমতা সম্পর্কে কারুরই আর কোনো সন্দেহ থাকবে না। শোনা যায়, যারাই আজকাল কালচারাল ক্ষেত্রে কেউকেটা হয়ে উঠতে চায়—'মস্তক সঞ্চালন' ছাড়া ওটা হবার উপায় নেই। অল্প একটু মস্তক সঞ্চালন ঘটলে সঙ্গীতজ্ঞ

আখ্যা পাওয়া যায়, সাহিত্যিক হিসেবেও হয়ত পুরস্কার জুটতে পারে। কিন্তু টেলিভিশনের সিরিয়াল পেতে হলে সঞ্চালনটা একটু তীব্র হওয়া দরকার। ফেস্টিভেল অব ইণ্ডিয়ার মত বড় কিছু করতে চাইলে পরাঞ্জপের মত করে হাসতে হবে। মুশকিল হল পরাঞ্জপে হাসেন বড় কম। আধুনিক যুগে 'কালচার' করতে নেমে কথায় কথায় অত হেসে ত আর গড়াগড়ি দেওয়া যায় না! অমাবস্যার রাতে জ্যোৎস্না ফোটাবার মত শক্ত কাজ হলেও, শোনা যায়, ঘাঘু লোকেরা পরাঞ্জপের মুখেও হাসি ফোটাতে পারে। ঐরকম এক ঝলক হাসির গুণেই প্যারিস ও নিউ ইয়র্কে ফেস্টিভেল অব ইণ্ডিয়ার মত অত বিশাল একটা ব্যাপার হয়ে গেল। ভারতীয় ২৬টা অমূল্য ভাস্কর্য জখম হওয়া সত্ত্বেও, পার্লামেন্টে ও কাগজে এ নিয়ে এত চেঁচামেচি, এত লেখালেখির পরেও, পরাঞ্জপে বিদেশ থেকে এক লাফে দেশে ফিরে এলেন। গায়ে ধূলোটি পর্যন্ত লাগল না।

অমন করিৎকর্মা লোকেরই গণেশ টাওয়ারের মত আন্তর্জাতিক ব্যাপারের মাথা হয়ে থাকা উচিত। অন্য কিছু হলেই বরং লোকে বলত এত বড় একটা কাজ অযোগ্য লোকের ওপর বর্তেছে। পরাঞ্জপে অবশ্য কোন ব্যাপারেই কিছু বলেন না। স্থপতিরা কোন ভাইট্যাল সিদ্ধান্তের জন্যে যখন তাঁর সম্মতির অপেক্ষা করেন, তিনি অনুত্তেজিত কন্ঠে বলেন--এত বড় একটা ব্যাপার, ওভাবে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? জিজ্ঞেস করে দেখব। তিনি কাকে জিজ্ঞেস করবেন তা অবশ্য কিছুই বোঝা যায় না; স্পষ্ট করে কিছু বলেনও না।

নৃত্যরত গণেশের মডেলের সঙ্গে সঙ্গে তাই গণেশের ট্রাইব্যাল ফর্মের মডেলও তৈরী করা হচ্ছে। কোন্‌টা যে কে তৈরী করছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। যে-যেটা তৈরী করছে, সে শুধু সেটুকুই জানে। কোন্‌টা শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পাবে, কোন্ কাজটা অথরিটির পক্ষে গ্রহণযোগ্য হবে, তা নিয়ে একটা সাস্‌পেন্স্। কোন্‌টা যে সত্যিকারের চাহিদা, পরাঞ্জপে সত্যি কি চান, সে সম্বন্ধে কিছুই তিনি বলেন না। বলতেও চান না। এতে কাজের ক্ষতি হচ্ছে। স্থপতিরা বিরক্ত হয়ে জানতে চাইছেন কোন্‌টা করবো, বলুন? পরাঞ্জপে হাসেন, বলেন, আপনি যা করছেন, করে যান না, কিছু করে যেতে কি আমি বারণ করেছি; ঠিক কোন্‌টা করবেন, সে এক মস্ত বড় সিদ্ধান্ত, সে সিদ্ধান্ত কি অত সহজে নেওয়া যায়? দেশী স্থপতিরা তাই ভাবেন যে বিদেশী এক্সপার্টদের মতামত নিয়েই হয়ত পরাঞ্জপে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এদিকে বিদেশীরা জানে যে কোন একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধির মতামতের ওপর তিনি নির্ভর করেন না। ফলে,

বিদেশী এক্সপার্টরাও ভেবেচিন্তে কথা বলেন, অনেক সময় কিছু বলেনই না। ভারতীয় স্থপতিদের মতামত কি, তা তাঁরা আগে জানতে চান। অথচ ভারতীয় স্থপতিরা ভাবেন, তাঁদের চেয়ে বিদেশীদের মতামতের মূল্য যখন বেশী, তখন তাঁরাই বা অত সহজে ধরা দেবেন কেন। যেখানে মতামত দিয়ে লাভ নেই সেখানে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। ফলে, বুরোক্র্যাসির শত ফাঁসের মত সব কাজই ঝুলতে থাকে, কোন কিছু এগোয় না।

আজ বিদেশী এক্সপার্টদের চন্দ্রভানু ভর্মার বাড়িতে নৃত্যরত গণেশের মডেল দেখার কথা ছিল। কিন্তু তা আর হল না। পরাঞ্জপে হঠাৎ খবর পাঠালেন তাঁর অফিসে জরুরী মিটিং। এপয়েন্টমেন্ট বাতিল করে দেবার হ্যাঁপা যদি পরাঞ্জপেকে সামলাতে হত তাহলে ওরকম কিছু করার আগে তাঁকে দুবার ভাবতে হত। কিন্তু পরাঞ্জপের কপাল ভাল, এসব সামলায় অন্যেরা। জরুরী তলব পেয়ে বিদেশী ও ভারতীয় স্থপতিরা সব ছুটে এলেন। কিন্তু কোন জরুরী ব্যাপারে তিনি আলোচনা করতে চেয়েছিলেন বা হঠাৎ কোন জরুরী সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজনে এই মিটিং—মিটিং-এর পরেও তা বোঝা গেল না। বিদেশী এক্সপার্টদের সঙ্গে শুধু কারট্সি বিনিময় হল। একমাত্র চন্দ্রভানু ভর্মাই এতে বিরক্ত হলেন। কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করলেন না। তিনি কথা বলতে যে নারাজ তাঁর ভাবে ও ভঙ্গীতে এইটুকুই শুধু প্রকাশ পেল।

নৃত্যরত গণেশ কে তৈরী করবেন? চন্দ্রভানু ভর্মা না রাম দেওধর, এ মুহূর্তে সঠিক করে তা বলা মুশকিল। ভারতীয় আর্কিটেক্ট ও স্থপতিদের মধ্যে দু-একজন ঘোরাঘুরি করছে। এদের একজনের নাম পুলকেশ গোস্বামী। মনে হয়, পরাঞ্জপের একে বেশ পছন্দ। এরা কোন মডেল তৈরী করছে কিনা জানা যায়নি। ভবিষ্যতে এদের আগমন-নির্গমন আরও বাড়বে কিনা বলা শক্ত। প্রখ্যাত ব্রিটিশ আর্কিটেক্ট ও স্কাল্পটার স্যর উইলিয়ম জোনস্ চন্দ্রভানু ভর্মা ও রাম দেওধরের মধ্যে কাকে যে বেশী পছন্দ করেন তাও ঠিক ঠাহর করা যায় না। জোর করে এদের মতামত আদায় করার ব্যাপারেও পরাঞ্জপে কেমন যেন উদাসীন; এটা ভদ্রতা না ইচ্ছাকৃত, বোঝা যায় না। এমনও হতে পারে যে অপরিচয়ের ব্যবধানটা অদৃশ্য প্রাচীরের মতো সুরক্ষিত রাখতে চান বলেই হয়ত বিদেশীদের বেশী ঘাঁটান না। অথবা সবার মুকুট হয়ে থাকতে গেলে সবাইকে সমানভাবে দেখতে হয়, এ ভাবনাটাও হয়ত তাঁর মনে কাজ করে। পরিচয়ের নানা পর্যায়ে এ ব্যবধানটা বজায় রাখার যে কারণই থাকুক, এর মস্ত বড় সুবিধে, তিনি একদিকে যেমন মুক্ত বাতাবরণে চলে ফিরে বেড়াচ্ছেন,

তেমনি অন্যদিকে বিদেশীদের পরস্পরের মধ্যে পছন্দ-অপছন্দ বা পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গীর সূক্ষ্ম ব্যবধানের দিকগুলো অস্পষ্ট আলো-ছায়ার মতো দেখতে পাচ্ছেন। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী স্থপতি জাঁ পল মলিয়েরকে স্যর উইলিয়ম জোনস্ খুব সুনজরে দেখেন না। এর অনেক কারণ থাকতে পারে। এর মধ্যে একটা ব্যক্তিগত কারণ, অন্যটা অবশ্য ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিক কারণের একটা হচ্ছে এই যে, ভারতে এসে স্যর উইলিয়ম জোনসের হয়ত অতীতের ব্রিটিশ 'রাজ'কে মনে পড়ে যায় নয়ত বাপ-ঠাকুরদার ঐ নস্টালজিয়ার ভাবানুভূতি তাঁর পক্ষে ভুলে থাকা একটু দুষ্কর হয়ে ওঠে।

মলিয়েরের মতে, স্থাপত্যের ব্যাপারে ব্রিটিশদের এখনও বহু বছর ফরাসীদের পায়ের কাছে বসে তালিম নিতে হবে। ওরা একরকম জোর করে ভুলে থাকতে চায় যে য়ুরোপের রেনেসাঁসের বড় অংশীদার হচ্ছে ফরাসীরা, ব্রিটিশরা নয়। ব্রিটিশরা অর্থ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকেই সেদিন বেশী মন দিয়েছিল ; প্রকৃত শিক্ষাদীক্ষা কি, তাও ঠিক জানত না। যেমন বীজ, তেমনি ফসল। পরবর্তীকালে ওরা 'ট্রেডার' জাত বলে পরিচিত হয়। যাদের ইতিহাস এই, তারা স্থাপত্যের কি বোঝে? কলোনীর এখন ত আর সেই দাপট নেই যে, তারা যা বলবে, সমস্ত ইউরোপ তা মেনে নেবে। এসব অবশ্য বিদেশী স্থাপত্য শিল্পীদের নিজস্ব ধারণা ও বিশ্বাস। বাইরের ভদ্রতার মুখোসের আড়ালে এসব চাপা থাকে। কথাবার্তায় কেউ টের পায় না।

আগে ব্রিটিশদের শাসনকালে ডিফেন্সের খরচ কমান নিয়ে ও আরও অন্যান্য অনেক প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, সেক্রেটারী অব্ স্টেট্ ও বিভাগীয় জাতভাই 'হেড'-দের মধ্যে তুমুল মতবিরোধ দেখা দিত, তুমুল তর্ক ও মন কষাকষি চলত, চিঠি লেখালেখি হত, একে অপরকে গালাগালি দিতেও কার্পণ্য করত না--এসব ত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রাখা চিঠিপত্র ও নোট্স্ ঘাঁটলেই ধরা পড়ে। অথচ এই সব ব্যাপার সেদিন কাকপক্ষীও টের পেত না। সেই রকম, এই বিদেশী এক্সপার্টদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর যত পার্থক্যই থাক, বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই। রাম দেওধর ও চন্দ্রভানু ভর্মা অবশ্য এর কিছুটা টের পাচ্ছেন। ঐ ঐতিহাসিক মত-পার্থক্য ও পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে দেওধর ও চন্দ্রভানু ভবিষ্যতে আরও যে কত বিপদে পড়বেন, তার পূর্বাভাস দেওয়া মুশকিল।

আমেরিকান এক্সপার্ট হেনরী কিসিঞ্জারের ব্যক্তিত্বের আড়ালে অবশ্য আমেরিকার সমৃদ্ধি ও অর্থের সূক্ষ্ম দাপট খেলা করতে দেখা যায়। এতে

মার্কিন সরকারের সমর্থনও কিছুটা আছে। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারে কিসিঞ্জারের মতামতটাই প্রাধান্য পাবে কি না, তা নির্ভর করছে স্যর উইলিয়ম জোনস্-এর ওপর। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রভুত্ব কতটা তিনি বজায় রেখে চলতে পারবেন; তাঁর জ্ঞানগরিমার শ্রেষ্ঠত্ব অন্যদের কাছে কতটা তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবেন। ভারতে আসবার আগে স্যর উইলিয়াম জোনসকে কন্‌গ্রাচুলেট্ করার জন্যে যে বিশিষ্ট সভা ডাকা হয়েছিল, তাতে ব্রিটিশ গভর্মেন্টের কালচারাল রিলেশন্সের একজন চাঁই বলেছিলেন—ইংল্যাণ্ডের প্রেসটিজ্ আপনার ওপরই নির্ভর করছে। ইদানীং আর্থিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পরনির্ভরতা ভারত জোর করে অস্বীকার করলেও, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এখনও ব্রিটিশ এক্সপার্ট, ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সমালোচক ও জার্নালিস্টদের মতামতকেই ভারতীয়রা বেশী মূল্য দেয়। এটা অনেকটা ঐতিহাসিক কারণে। সেটা স্যর জোনস্ আপনি জানেন, আপনাকে একথা বলাই বাহুল্য।

ভারতে পদার্পণ করার পর থেকে স্যর জোনস্ তাই এই অ্যাসাইন্‌মেন্ট-টাকে বেশ সিরিয়্যাসলি নিয়েছেন। এদেশে আসার পর থেকেই তিনি পরাঞ্জপকে খুব খাটাচ্ছেন। লক্ষ্ণৌ থেকে শুরু করে মাদুরাই-এর মীনাক্ষী মন্দির, রামেশ্বরম থেকে কর্ণাটকের যেসব মন্দিরে গণেশের মূর্তি রাখা আছে সে-সব জায়গা ও আরও অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে তিনি গণেশের নানা মূর্তি দেখেছেন। পরাঞ্জপের খাতিরে গণেশের কিছু কিছু ছবি তোলাও সম্ভব হয়েছে। যেখানে তা সম্ভব হয়নি, সেখানে তিনি আর্টিস্ট ডেকে, অনেক সময় নিজেই, সেই সব অমূল্য গণেশের স্কেচ্ করিয়ে নিয়েছেন। সেইসব স্কেচ্ ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে ভারতবর্ষের তখনকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস জানবার জন্যে, বিশেষ করে, লোকেদের অবস্থা, জীবনধারণ ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে গিয়ে নানা বই থেকে নোট্স নিয়েছেন স্যর জোনস্। এসব ব্যাপারে উদারতা দেখান পরাঞ্জপের স্বভাবজাত। জাতীয় পর্যায়ে যে-কোন প্রচেষ্টার জন্যে তিনি শত হাতে যেন এগিয়ে আসেন, সম্মতি ও প্রসন্নতার হাসি নিয়ে। যা তিনি দেশের কাজ মনে করেন, তার জন্যে উদার হস্তে খরচ করতেও তিনি রাজী। দেশের স্বার্থের প্রয়োজনে যা-কিছু তোমরা চাও, তোমরা প্রয়োজন মনে কর—সেসব দাবী মেনে নেওয়া হবে এই রকম একটা উদার ভাব। এঁদের সবার দাবী একবাক্যে পূরণ করার সময় পরাঞ্জপে একবার ভেবেছিলেন স্যর জোনস্‌কে বলবেন (যদিও তা বলেননি) যে, তোমাদের শাসনকালে

শুধু সংস্কৃতির স্বার্থে এত বড় এলাহি ব্যাপার কি স্বপ্নেও তোমরা ভাবতে পারতে? পারতে না। দেশের সম্পদের সিংহভাগ তোমাদের দেশে পাচার করে দিয়ে, অর্থের সামান্য যা উদ্বৃত্ত থাকত তা দিয়েই দেশের প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি ইত্যাদি খাতে ব্যয় করতে। এরপরেও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তারও শতকরা এক ভাগও তোমরা সাংস্কৃতিক উন্নতিসাধনে লাগাতে পেরেছিলে কি না সন্দেহ! এখন বুঝতে পারছ ত দেশের সম্পদ যদি দেশেই থাকে, তাহলে ভারত কতটা ভার বইতে পারে?

স্যর জোনস্ কি এক অদৃশ্য আকর্ষণে সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন ইটালীর এক্সপার্ট রবার্টো অ্যাসকারীকে। আসলে—প্রশান্তি, আনন্দ, ঈশ্বর, কস্‌মিক্ এনার্জি ও তার ভারতীয় ব্যাখ্যা, আত্মোপলব্ধি, ঈশ্বরানুভূতি, তাঁকে ভালবেসে তাঁর সঙ্গে একাত্মতা, শাশ্বত অনুভূতি, পরজন্ম, মৃত্যুর পরে অমরত্ব—এসব গালভরা শব্দের অর্থ বোঝা বিদেশীদের পক্ষে সত্যিই একটু দুষ্কর। অ্যাসকারীর ধারণা ছিল, সারা ভারতে ঘুরে বেড়াবার কষ্ট যদি স্যর জোনস্ স্বীকার করতে রাজী থাকেন, তাহলে এতগুলো শব্দ না হোক দু-একটা শব্দের তাৎপর্য হয়ত উপলব্ধি করতে পারবেন। সেটা যদি একান্তই না পারেন, তবে ভারতীয় দেবদেবী, মন্দির ও স্থাপত্যের নিদর্শন, সৃষ্টির মূল প্রেরণা বা মোটিভেশন, চিত্রাঙ্কনের তাৎপর্য, কন্‌-সেপ্‌শন ও ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু ও সিম্‌বলের গভীর অর্থ ও ইতিহাসের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হতে পারলে, দু-একটা বই লিখে ফেলাও শক্ত ব্যাপার হবে না। অবশ্য, বই লেখার যা হাঙ্গামা, ততটুকু পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেখাতে যদি স্যর জোনস্ রাজী থাকেন।

স্যর জোনস্ ভারত দর্শন করে প্রকৃতপক্ষে কতটা উপকৃত হচ্ছেন, তা তাঁর উক্তি থেকে সঠিক বোঝা যায় না। কথাবার্তা বা আচরণে উচ্ছ্বাসের নামগন্ধ নেই। এদিকে অ্যাসকারী যা দেখেন পাগলের মত উচ্ছ্বাস-উক্তি করে যান। ছোট-বড় নানান ভঙ্গীর গণেশ দেখে অ্যাসকারী বলে ওঠেন, স্যর জোনস্, দেখুন, ফ্যানট্যাসটিক, জাস্ট ফ্যানট্যাসটিক। কখনও বা মন্দিরের স্থাপত্য-শিল্প দেখতে দেখতে দাঁড়িয়ে পড়েন, নড়তে চান না, বলেন —এ-ধরনের স্থাপত্য-শিল্পকে আমি ক্যাজুয়ালী বিচার করতে রাজী নই। আমাকে মাপ করবেন, বেশ কিছুদিন ধরে ঘুরে না দেখলে, এর এপ্রিশিয়েশন সম্ভব নয়। তিনি তন্ময় হয়ে শিল্প-সৌন্দর্যে যেন ডুবে যেতে থাকেন। এ-ধরনের ছেলেমানুষি বা উচ্ছ্বাসোক্তি স্যর জোনস্-এর ঠিক পছন্দ হয় না। কিন্তু মুখ ফুটে তিনি কিছু বলেন না। সারা ভারতবর্ষের নানা মন্দিরে এ

নাটক স্যর জোনস্ দেখতে বাধ্য হয়েছেন, অনেক কষ্টে অ্যাসকারীকে সামলেছেন স্যর জোনস্। কিন্তু মীনাক্ষী মন্দিরের স্থাপত্য-কারুকার্য দেখে অ্যাসকারী বলে বসলেন, 'আমি চোখ ফেরাতে পারছি না স্যর জোনস্, সাত দিনের আগে এখান থেকে নড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়'। যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা!

স্যর জোনস্ ভাবেন লিওনার্দো দ্য ভিন্সি বা মাইকেল এঞ্জোলোর মত সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতিনিধি হয়ে ভারতীয় যা-কিছু অ্যাসকারী দেখে তাতেই এত মুগ্ধ হয়ে যায় কেন? তবে কি ভারতবাসীরা যা বলে—জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী, সেরকম কিছু একটা ব্যাপার ঘটছে নাকি? অ্যাসকারী কি কোনকালে ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন? নানান জায়গায় ঘোরার সময় সেই সবই কি স্মৃতিতে ভেসে উঠছে। নয়ত অ্যাসকারীর এ অদ্ভুত ভারত-প্রেম কেন? অ্যাসকারীকে ত সামলান দায়, রীতিমত ইললজিক্যাল। স্যর জোনস্ একটু হেসে শুধু মাথা নাড়েন, কখনও একটু চাপা বিস্ময়ে বলেন, ডু ইউ থিঙ্ক সো? এই ছোট্ট একটু ডিপ্লোম্যাটিক উক্তির মধ্যে যতটা না বিস্ময় ও অনুরাগ প্রকাশ পায়, তার চেয়ে বেশী প্রকাশ পায়, 'এতে অবাক হবার কি আছে'।

ভারতবর্ষকে মিস্টিক কান্ট্রি বলার একটা বড় কারণ এই যে এখানে যে দেবদেবীর কথা বেশী ভাবা হয়, সেই দেব কিংবা দেবী নাকি ভূতে পাবার মত মানুষের ওপর ভর করে। যেরকম স্যর জোনস্ দেখেছেন আফ্রিকার অনেক জায়গায়। নারী বা পুরুষের ওপর যখন প্রেতাত্মা ভর করে, তখন তারা অভাবনীয় কাণ্ডকারখানা করার শক্তি পায়। অ্যাসকারীর ওরকম 'ভর-জাতীয়' কিছু ব্যাপার হয়নি ত। নিশ্চয়।

মীনাক্ষী মন্দিরের আনাচে-কানাচে গণেশ মূর্তি দেখে একটা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে অ্যাসকারী বলে উঠলেন—স্যর জোনস্, গণেশের মুখে চন্দ্রভানু ভর্মা যে সমাহিত প্রশান্তির ভাব ফুটিয়ে তোলার কথা বলেছিলেন, এই মূর্তির মুখে সেই ভাবটাই কি দেখতে পাচ্ছেন না? স্যর জোনস্ এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে সেরকম কিছু বুঝলেন না। কিন্তু সমাহিত ভাবটা না বুঝলেও এই মিস্টিরিয়াস ভারতবর্ষে তার অস্তিত্ব থাকতে পারে, এ বিশ্বাসে বললেন—ডু ইউ থিঙ্ক সো? অ্যাসকারী তখন রীতি-মত ক্ষেপে উঠেছেন—ইট্স জ্যাস্ট দ্য আইডিয়া ভর্মা ওয়ানট্স্ টু কনভে। রামলীলা গ্রাউণ্ডে যে গণেশ মূর্তি হবে তাতে এই রকম একটা আইডিয়া যদি প্রতিফলিত হয়, আমি খুব খুশী হব। অ্যাসকারীর ইমপালসিভ ভাব দেখে স্যর জোনস্ বলে ওঠেন—আমি হেনরী কিসিঞ্জারের সঙ্গে এ-ব্যাপারে

একটু পরামর্শ করতে চাই। দেখি, উনি কি বলেন। এসব ক্ষেত্রে স্যর জোনস্-এর মুখ দিয়ে কখনও ফরাসী স্থপতি মলিয়ের-এর নাম বেরোয় না। অ্যাসকারী পাল্টা জবাব দেন—অ্যাই লাইক টু কন্সাল্ট জাঁ পল মলিয়ের। হি হ্যাস এ প্রোফাউণ্ড নলেজ অ্যাবাউট ইণ্ডিয়ান স্কাল্প্চারস। নিজেকে একটু সংযত করে নিয়ে স্যর জোনস্ বললেন—ডু ইউ থিঙ্ক সো?

ওদিকে হেনরী কিসিঞ্জার জাঁ পল মলিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে সারা ভারতবর্ষে শুধু পাথর খুঁজে বেড়াচ্ছেন। গণেশ টাওয়ারের জন্যে কি ধরণের পাথর চাই? রাম দেওধর বলেছেন, গ্রানাইট-ই সবচেয়ে ভাল, তাতে আলোছায়ার খেলা খুলবে বেশী। তবে গণেশ টাওয়ারের মত অত বিশাল ব্যাপারে গ্রানাইট পাথরে খুব যে সুবিধে হবে তা এই মুহূর্তে ঠিক বলা যাচ্ছে না। 'ইট্ ওনট্ লুক নাইস।'—রাম দেওধরের এই কথাটা মনে মনে একটু যাচাই ক'রে নিয়ে মলিয়ের বললেন—দিল্লীতে চার মাসের ওপর প্রচণ্ড রোদ্দুর। বর্ষাকালে গড়পড়তায় বৃষ্টি প্রায় ২০ ইঞ্চির মত। ভূমিকম্পের জোনের মধ্যেই দিল্লী। অবশ্য টাওয়ার গড়ে তোলার পক্ষে সেটা বিপজ্জনক হয়ত নয়। স্টাডি করে ঠিক করতে হবে কোন পাথর স্যুট্ করবে। দক্ষিণ ভারতে দেখছি গ্রানাইটের প্রেফারেন্স।—আই উড লাইক টু ডিসকাস্ অ্যাবাউট ইট উইথ চন্দ্রকান্ত ভর্মা।

কিসিঞ্জার বললেন—ভর্মার মুশকিল কি জানেন, হি সিমস্ টু বী এ ম্যান অব দি আদার ওয়ার্ল্ড। স্বপ্ন ও বাস্তব যদি শিল্পীর মনে একাকার হয়ে যায় তবে তাকে দিয়ে আর কোন এক্সপেরিমেন্ট হয় না। রাম দেওধরের বাস্তববোধ আছে বলে সে ম্যাসিভ কিছু করে ফেলতে পারবে। মলিয়ের একটু ভেবে দেখবেন, এতেই আমাদের ইজ্জত থাকবে। জাঁ পল মলিয়ের মাথা নাড়েন, বলেন—প্রকৃত স্কাল্পটার যে শুধু দক্ষ হবে তাই নয়, তাকে নানা বিষয়ে জানতে হবে। ইতিহাসের গহ্বর থেকেই বড় স্থপতির জন্ম হয়।

উৎপাদন ও সামাজিক সম্পর্ক খুঁজে বার করাই যদি মার্ক্সীয়ান ইতিহাস হয়, তবে আমি বলব, ভর্মার দৃষ্টিভঙ্গী তার থেকেও একটু ওপরে, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয় দর্শনতত্ত্বে সমাহিত। গণেশ যতদূর মনে হয় এ দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে। অনেক সময় আমার মনে হয় যে ভারতবর্ষের আচার-ব্যবহার, তার ট্রাইবাল কালচারের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে গণেশের ইমেজ ও সিম্বলকে ঠিক বোঝা যায় না। ভর্মার মতামতকে তাই আমি এত মূল্য দিই।

চন্দ্রভানু ও রাম দেওধরকে নিয়ে দু-জন এক্সপার্টের মধ্যে নানা কথা

হয় ; তাঁদের গুণাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মতান্তর। কিসিঞ্জার মলিয়েরকে স্মরণ করিয়ে দেন, একটা কথা আপনি সব সময় মনে রাখবেন—দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ থাকলেও আমি আপনার সঙ্গে একমত যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কে দু-জনের অ্যাটিটিউড-এর মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। কে কার চেয়ে ভাল কাজ করে, কার অ্যাচীভমেন্ট বেশী, এটা বিচার করতে আমরা এখানে আসিনি। সেটা করবেন মিঃ পরাঞ্জপে। আমাদের মতামতকে তিনি বেশী মূল্য দিচ্ছেন, আমাদের যোগ্যতায় ইম্‌প্রেস্‌ড্‌ হয়ে তিনিই আমাদের এদেশে ডেকে এনেছেন। দু-জনের কাজ দুরকম জেনেও তাদের আমরা কাজে লাগাইনি, লাগিয়েছেন মিঃ পরাঞ্জপে। আমি জানি, আপনি কি বলবেন, বলবেন—ভারতীয় স্থপতিদের কাজকর্ম বেশ উঁচুদরের। সেটুকু বলার জন্যে আমরা এখানে আসিনি, এসেছি, কাকে দিয়ে কোন্‌ কাজটা তাড়াতাড়ি হবে সেটা দেখতে এবং সময়মত কাজটা করাতে। শুধু কাজকর্ম দেখতে আমাদের উপস্থিতির প্রয়োজন আছে, এ আমি মনে করি না, মনে করি না বলে আমাদের উপস্থিতি নিজেদের কাছে কিভাবে জাস্টিফাই করব, তা ত আমি বুঝতে পারছি না।

মলিয়ের বললেন—আজকে মিটিং-এ হয়ত মিঃ পরাঞ্জপে একটা আইডিয়া দেবেন যে তিনি কি করতে চান। আমার ত মনে হচ্ছে তিনি গণেশ টাওয়ারটার মধ্যে এমন একটা কিছু করতে চাইছেন যা ভারতবাসীর কাছে অভিনব বলে মনে হবে, নয়ত গণেশের মত এত ইন্টারেস্‌টিং ফর্ম ও কন্টেন্ট তিনি বেছে নিতেন না। তা নিয়ে পরে কথা হবে। ব্লু-প্রিন্ট অনেকগুলো তৈরী হয়েছে। মডেলও তৈরী করছেন দু-জনে। এসব জেনেশুনেই বলছি ভর্মার কাজকর্ম খুব ভাল, কন্‌সেপ্‌ট্‌চুয়্যালি স্ট্রাইকিংলি ডিফারেন্ট্‌।

কিসিঞ্জার একটু কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে মলিয়েরকে একবার দেখে নিয়ে বললেন—ভর্মার মডেল আর কদিনের মধ্যেই আমরা দেখব, দু-জনের মডেল নিয়ে আরও আলোচনা হবে। কিন্তু ভর্মা যে 'প্রশান্তি'র কথা বলছেন, তেইশ তলার গণেশ টাওয়ারে সেটা কতটা খাটবে আমাদের ভাল করে বিচার করে দেখতে হবে। আমি ভাবছিলাম রাম দেওধরকে দিয়ে যদি গণেশের একটা 'ম্যাসিভ্‌' মডেল করান যায়। এখানে যদি 'ম্যাসিভ্‌' কিছু আমরা না করতে পারি, আমি বারবার বলছি মিঃ মলিয়ের, তাহলে ব্যাপারটা খুব শোভনীয় হবে না। ওরকম কিছু আপনি ভাবুন, ড্যানসিং গণেশের ফর্ম আমাদের খুব একটা চোখে পড়েনি ; যে দু-একটা দেখেছি, যার ব্লু-প্রিন্ট আমরা খুব কষ্ট করে নিয়ে এসেছি, তাকে হুবহু খাড়া করা যাবে না ;

কিছু হয়ত অ্যলট্যার করতে হবে গণেশ টাওয়ারের স্ট্রাক্‌চারের কথা ভেবে। তবে একটা পয়েন্টই আপনাকে আমি ইম্‌প্রেস্‌ করতে চাইছি --লেটস্‌ গো ইন ফর সামথিং ম্যাসিভ্‌। এব্যাপারে আমরা মিঃ পরাঞ্জপেকে কিরকম কি আইডিয়া দিতে পারি, সেটাই ভাবুন।

মলিয়ের বাধা দিয়ে বললেন--মিঃ পরাঞ্জপে স্পষ্ট করে কিছু বলেছেন বলে ত আমি মনে করতে পারছি না। তিনি কি ভাবছেন, তার আইডিয়া কিছুটা পেয়েছি বটে। কিন্তু তিনি সত্যিই কি চান, স্পষ্ট করে কিছু না বললে আমাদের পক্ষে কিছু বলা মুশকিল। উই উইল বেটার ডিস্‌কাস্‌ এমাঙ্গস্ট আওয়ার সেলফস্‌ হোয়েন উই নো মিঃ পরাঞ্জপে'স মাইনড্‌।

কিসিঞ্জার হেসে বললেন--মিঃ পরাঞ্জপেকে আমি যতটা বুঝেছি, তাতে উনি কিছু বলছেন না, বোধ হয় কিছু বলতেও চান না। হয়ত ভাবছেন, সারা ভারতের হালচাল দেখে আমরা কোন নতুন আইডিয়া দেব। ওঁর ইনটেন্‌শন বুঝে নিয়ে দেওধর ও ভর্মাকে কাজে লাগাতে হবে। ওঁদের দু-জনের মধ্যে যদি একবার কম্‌পিটিশনের ভাব জাগে, তাহলে নতুন নতুন আইডিয়া উদ্ভাবনের ব্যাপারে ওঁরা আমাদের কাজে লাগতে পারবে।

মলিয়ের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন--চলুন, সময় হয়েছে, মিঃ পরাঞ্জপের গাড়ি এসে গেছে, বেরুনো যাক। ও'বেরয় হোটেলের অন্য দুটো কামরা থেকে স্যর জোনস্‌ ও অ্যাসকারী বেরিয়ে এলেন--চারজনে গিয়ে গাড়িতে বসলেন।

চন্দ্রভানু তাড়াহুড়ো করে কিছু ভাবতেও পারেন না, করতেও নারাজ। যা ঠিক হয়ে আছে তাকে হঠাৎ পাল্টে দিতে যারা চায়, সেইসব অস্থিরমতি মানুষদের তিনি কালচারের প্রতিভূ ভাবতে নারাজ। পরাঞ্জপের ভাবখানা এই যে, এরকম বড় কাজে রদবদল হয়েই থাকে, তা নিয়ে অযথা বিব্রত হওয়া চন্দ্রভানুর মত জ্ঞানী লোকের শোভা পায় না। ওরকমই একটা কথা লিখেছেন চিঠিতে। বড় ব্যাপারেও মনের ও কাজের একটা শৃঙ্খলা না থাকলে কোন কিছুই এগোবে না। পরাঞ্জপে সেটা চাকতেই এইসব উল্টোপাল্টা কাজ করেন। ভেবেছিলেন যাবেন না, মনের রাগটা এখনও প্রশমিত হয়নি, অলকার জবরদস্তিতেই তিনি যাচ্ছেন। যদিও পরাঞ্জপে সম্পর্কে তাঁর মনের ক্ষোভটা বাড়তেই থাকে; অঘটন পটীয়সী মায়ার জাল বিস্তার করার শক্তি নারীজাতিরই একচেটিয়া অধিকার, সে অধিকারে পুরুষ ভাগ বসাতে চাইলে সেটা আহাম্মকি বলেই গণ্য হয়; আহাম্মকি আবার চন্দ্রভানুর ঠিক বরদাস্ত হয় না।

রাম দেওধর তাঁর মডেল তৈরীর কাজের শেষ টাচ্‌টা ঠিক দিতে যাবেন, এমন সময় বেয়ারা গিয়ে হাজির। তিনি যাবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে নিলেন।

সাত সকালেই তিনি তাঁর বিরাট স্টুডিওতে চলে যান। ব্যাঙ্ক কলোনীতে বিরাট জমি নিয়ে তাঁর স্টুডিও। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যত স্থাপত্য ও বড় বড় নেতাদের ফিগারওয়ার্ক করেছেন, তার ছোট বড় মডেল স্টুডিওতে যাবার পথে বাইরের চত্বরে লাইন করে সাজান। রোজ সকালে নানা মডেল ও নানা নেতার মুখভঙ্গী দেখেই তিনি স্টুডিওর মধ্যে কাজ করতে ঢোকেন। বাঁদিকে ছোট ঘরের সঙ্গে লাগোয়া ভেতরের উঠোন; সেখানে গান্ধীজীর বিরাট একটা মডেল তৈরী করছেন। বড় একটা প্ল্যাস্টিক্ দিয়ে তা ঢাকা। আগে ধূপ-ধুনো জ্বালিয়ে স্বর্গীয় পিতার স্মরণ নিয়ে প্যান্ট-সার্ট খুলে ফেলেন; একটা গাউন পরে তারপর কাজে নেমে পড়েন। স্টুডিও-এর সবচেয়ে কোণের ঘরটায় তৈরী হচ্ছে গণেশের মডেল। দু-চারজন লোক আশেপাশে কোথায় থাকে টের পাওয়া যায় না; প্রয়োজনে তারা এসে দাঁড়ায়। তিনি কারুর চুল দেখেন, কারুর মুখের আদল, চোখের রেখা—হাত; এক মুহূর্ত মাত্র। হঠাৎ এক একটা লোক এসে দাঁড়ায় স্ট্যাচুর মত; সামনে দাঁড়ায়, কিংবা তাকে পেছন-করে দাঁড় করিয়ে তিনি এক পলক দেখে নেন। অমনি মডেলের ঘাড়, চুল, মুখের আদলের কিছুটা মাটি চেঁচে ফেলে দেন, একটু মাটি তুলে থুতনিতে লেপে দেন। একটা লোক এসে জল স্প্রে করার যন্ত্রটা ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে টেবিলে রেখে যায়। তিনি তা নিয়ে মুখে বা ঘাড়ে বা পেটে জল স্প্রে করে দেন। সামনের বড় ইজেলে ক্লিপ দিয়ে আঁটা ড্যানসিং গণেশের একটা বড় ছবি। তিনি সেই ছবি একবার দেখেন আবার ভুঁড়িতে মাটি লেপে দেন। দুপুর দুটো পর্যন্ত কাজ করেন। তারপর বিশ্রাম কক্ষে এসে বসেন; কেউ একজন খাবার নিয়ে আসে। খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি একটু বিশ্রাম নেন। আধ ঘন্টার মধ্যে আবার স্টুডিওতে গিয়ে কাজ শুরু করেন। রাম দেওধরের সারাদিনের রুটিনটা যেন ছকে বাঁধা; সকালে নটার মধ্যে স্টুডিওতে আসেন, বাড়ি ফিরতে অনেক সময় নটাও হয়ে যায়।

গাড়িতে যেতে যেতে রাম দেওধর তাঁর বিদেশীদের সঙ্গে কাজ করার এক অভিনব অভিজ্ঞতার কথাই ভাবছিলেন। শুধু অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারই বাড়ছে না, মজাও লাগছে। এঁরা সব এক একজন পৃথিবীর সেরা গুণীজন; এঁদের দেখবার দৃষ্টি শুধু যে আলাদা তাই নয়, এঁরা জ্ঞানের আলোয় ভাস্বর; রাম দেওধরের কাছে এঁদের মতামতের বিশেষ

মূল্য আছে, প্রত্যেকটি কাজ এঁরা খুঁটিয়ে দেখে যেসব মন্তব্য করেছেন, সেরকম গভীর সমালোচনা তিনি ভারতীয় কোন সমঝ্দারের মুখে শোনেননি। এঁদের সঙ্গে মিশে, রাম দেওধরের চিন্তার একটা নতুন দিগন্ত যেন খুলে যাচ্ছে।

এব্যাপারে চন্দ্রভানু ভর্মার মত কিন্তু অন্য; এই ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার তাঁর নিশ্চয় আছে। কিন্তু তাঁর মতামত শুনে রাম দেওধর তাঁর ধারণা ও বিশ্বাস পাল্টাতে রাজী নন। তাছাড়া, এই ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতার যুগে চন্দ্রভানুর আদর্শ মেনে চলা মানে একা নির্বাসিত হয়ে থাকা; কাজ করতে নেমে সেরকম কোন নির্বাসনের জীবন কাটাতে রাম দেওধর রাজী নন। তিনি সংগ্রাম করে বাঁচতে চান, বাঁচতেও জানেন। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের ক্ষমতায় তিনি আস্থাশীল ও আত্ম-বিশ্বাসী। নিজের সৃজনশক্তিকে দশজনের সামনে তুলে ধরতে যদি নীতি বা আদর্শকে কালের দাবীর সঙ্গে এক-আধটু অ্যাড্জাস্ট্ করতে হয়--সেটাকে তিনি পরাজয় হিসেবে দেখেন না। অ্যাসাইনমেন্ট্ পাবার পরে তিনি তন্ময় হয়ে কাজ করেন; সেখানে অন্য কাউকে নাক গলাতে দেন না।

চন্দ্রভানুর সঙ্গে রাম দেওধরের তফাৎ এইখানেই। চন্দ্রভানুর কাছে যা প্রিয় নয়--যা নিয়ে তিনি মশগুল হতে পারেন না, মনের মধ্যে যা বাধ-বাধ ঠেকে, তা নিয়ে তাঁর কোন চিন্তার বালাই নেই। সে-দিকটায় তাঁর মনের দরজা-জানলা বন্ধ রাখতেই তিনি অভ্যস্ত। যা অপ্রিয়, তা নিয়ে মাথা ঘামাব কেন?

রাম দেওধর আবার এতদূর যেতে রাজী নন। পরাঞ্জপের হাতে গণেশ টাওয়ার গড়ে উঠছে, কিন্তু কি করে এটা একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার হয়ে উঠল, এর পেছনে সরকারের কতটা হাত অথবা রুলিং পার্টির কারা এর পেছনে আছে, এসব তত্ত্বকথা নিয়ে রাম দেওধর তাঁর সময় নষ্ট করতে রাজী নন। চন্দ্রভানুর মত এ নিয়ে তিনি কখনও ভাবেনও না; এত বড় একটা ব্যাপারের সঙ্গে তিনি যুক্ত হতে পেরেছেন পরাঞ্জপের জন্যে এটাই তাঁর জীবনে একটা বড় সুযোগ। এত ডালপালার হিসেব রাখতে তিনি নারাজ; শুধু আমটি খেতে চান।

এই জিনিসটাই কিন্তু চন্দ্রভানু অন্য চোখে দেখেন। রাম দেওধরের মনে পড়ে, সেদিন পরাঞ্জপের কাজ করাবার এলাহী কাণ্ডকারখানা সম্বন্ধে চন্দ্রভানুর মন্তব্য--পরাঞ্জপে যে গণেশ টাওয়ারের বিশিষ্ট প্রতিনিধি, তা কী অস্বীকার করার উপায় আছে? নেই। চন্দ্রভানু বললেন, তাই তাঁকে সন্তুষ্ট না করে কাজে এগোনোও যাবে না, এটাও তাহলে নিশ্চয় সত্য।

তা যদি হয়—যদিও সঠিক কিছুই বোঝার উপায় নেই—এত এলাহী ব্যাপার হচ্ছে কিভাবে? কোত্থেকে টাকা-পয়সাই বা আসছে? সে কথা যাক। তবু কাজ করতে এগিয়ে কোন একটা পর্যায়ে যদি নীতিকে বিসর্জন দিতে হয়, তাহলে সেখানে বেশীক্ষণ ধর্না দিয়ে পড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। একটু থেমে চন্দ্রভানু আবার বললেন—তখন যদি, রাম দেওধর, তুমি আমাকে বোঝাতে আস, যে-কাজটা করা হচ্ছে—সেটা দেশেরই কাজ, ওটা না করলে দেশেরই ক্ষতি—ক্ষতি ত কারুর না কারুর হবেই—তবে যা নিয়ে এগিয়ে যেতে বাস্তবিক বাধা, সেখানে আমি নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে পারি না। এতে শেষ পর্যন্ত লাভের চেয়ে ক্ষতিই হয় বেশী। অসন্তোষও জীবনবোধের বিকাশে কম বাধা নয়। রাম দেওধর এসব কথা শুধু শোনেন কোন মন্তব্য করেন না। যা চন্দ্রভানুর অন্তরের বিশ্বাস, তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাওয়া অর্থহীন। মানুষের স্বভাবই মানুষকে মোটিভেট্ করে, মানুষকে কাজে নিবৃত্ত করে, আবার উদ্বুদ্ধও করে।

রাম দেওধরের কাছে চন্দ্রভানুজী অগ্রজের মত। রাম দেওধর কোন কথা না বললেও ভাবছিলেন, পরাঞ্জপে খুবই শক্তিশালী, তবে তিনি পাখা বিস্তার করে ইদানীং ঈগল পাখির মত আকাশে উড়ছেন কেন আবার ওদিকে ভাগাড়ের দিকেই বা নজর রাখছেন কেন! আর এসবের পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে, কাজে নামার আগে, এসব রহস্যের গিঁট-গুলো খোলা খুবই জরুরী—এত সব 'উৎপাদন-রহস্য' ও তার হাজারো সামাজিক ও আর্থিক সম্পর্কের সঙ্গে রাম দেওধর জড়িয়ে পড়তে চান না; তিনি তাঁর কাজটাই বোঝেন এবং কাজ করার আগে কিংবা পরে একটি-মাত্র তিনি প্রশ্ন রাখতে চান—পরাঞ্জপে কাজের ব্যাপারে কি ঘন ঘন বাধা দেন? যদি তা না দেন, তবে পরাঞ্জপে একই কাজ দশজনকে দিয়ে করাচ্ছেন কেন। আর সেটাতে ন্যাশনাল ওয়েলথের অপচয় হচ্ছে কি না, সে প্রশ্নও তিনি করতে রাজী নন। ওটা তাঁর ব্যাপার, তাঁর ওপরেই ছেড়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে হ্যাঁ, একটা প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়—কাজটা কে করবে? কার মডেল গ্রহণ করা হবে? এটা ঠিক, গণেশ টাওয়ারের মত বড় ব্যাপার না হলে, রাম দেওধর সবার ব্যাপারে যা করেন তাই হয়ত করতেন। কাজটা দেবার আগে দশজনের মডেল ও ছবি নিয়ে আগেই বিচার হয়ে যেত, কত টাকা দেবে আর কে কাজটা করবে। তারপরে তিনি কাজে হাত দিতেন, তার আগেও নয়, পরেও নয়। এটা অবশ্য অন্য অভিজ্ঞতার ব্যাপার। এখানে কাজটা শেষ পর্যন্ত কে করবে সেটা আগে থেকে বলা মুশকিল—কারণ দশটা লোক যেখানে কাজ করছে

--যাদের মধ্যে বিদেশীরাও আছে--সেখানে, কার 'রিলিফ' বা কার মডেল মত গণেশ টাওয়ারের কাজ হবে আগে থেকে তা বলা সম্ভব নয়। তাই এই লম্বা দৌড় দিতে হচ্ছে প্রতিযোগিতার ময়দানে--এটা বরং বুদ্ধিমানের মত কাজ করছেন পরাঞ্জপে।

তবে একথা চন্দ্রভানু যেন না ভাবেন যে বিদেশীদের আস্কারায় রাম দেওধর তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছে। তবে সেটা খুব লজ্জার ব্যাপার হবে। ঠিক এই কারণেই রাম দেওধর বিদেশীদের কাছে নিজের সম্বন্ধে লম্বা-চওড়া ফিরিস্তি দিতে চাননি। যা তাঁরা জিজ্ঞাসা করছেন তাঁর উত্তরে দু-চারটে কথা বলেছেন। নিজে কি কি কাজ করেছেন তার একটা লিষ্টি অবশ্য বিদেশীদের দিয়েছেন। শুনেছেন বিভিন্ন জায়গা ঘুরে তাঁর কাজ বিদেশী এক্সপার্টরা দেখে এসেছেন। অমৃতসরে ঘোড়সওয়ার রঞ্জিত সিং, রাজস্থানের চম্বল নদীর মূর্তি--যা কন্‌ক্রিট পাথরের চাঁই। জট কেটে চিকনাই করা হয়েছে--সব ঘুরে ঘুরে দেখে এসেছেন তাঁরা। অমৃতসরে ঘোড়সওয়ার রঞ্জিত সিং-এর কাজটা নাকি রাম দেওধরের মাস্টারপীস্, কিসিঞ্জারের এ মন্তব্য শুনে মলিয়ের মাথা নেড়েছিলেন। নির্দ্বিধায় মানুষের গুণ দেখার মতো যে উদারতা, এটা মনে হয় ভারতীয়দের মধ্যে অতটা নেই--রাম দেওধর তাই ভাবেন; ভেবে নিরাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু চন্দ্রভানুজীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামার কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না; বিদ্যায়-বুদ্ধিতে ও আদর্শে তিনি সবার কাছে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি হয়ত রাম দেওধরের মতো রঞ্জিত সিং-এর ঘোড়সওয়ার তৈরী করার সুযোগ পাননি, কিংবা কে জানে করতে দিলেও তিনি করতেন কিনা। রাম দেওধরের ধারণা যে গণেশ টাওয়ারের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি অনেক কিছু শিখতে পারছেন, সেটাই তাঁর কাছে বড় কথা। রাম দেওধরের সব ব্যাপারে কম কথা বলাটা চন্দ্রভানু ভুল ব্যাখ্যা করেন কিনা--সেটা রাম দেওধর ঠিক জানেন না।

বড় একটা টেবিলে পরাঞ্জপে বসেছিলেন। কোটা হাউসের নীচের তলায় কোণের দিকে একটা বড় ঘর। এটাই গণেশ টাওয়ার ফাউণ্ডেশনের অস্থায়ী অফিস। আরও একটা অফিস আছে রামলীলা গ্রাউণ্ডে। কোথায়, কখন, কারা আসবেন--সেটা আগে থেকে বলা থাকে। কোটা হাউসে ঢোকার মুখেই তার মাথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের খোদাই করা সিম্বল। স্যর উইলিয়ম জোনস্ তা দেখে একটু খুশীই হয়েছিলেন মনে হয়। একটু দাঁড়িয়ে একবার ভালভাবে দেখে তিনি এগিয়ে গেলেন অফিসের দিকে, কোন মন্তব্য করলেন না। তিনজনের মধ্যে মলিয়েরের কিন্তু নজর

এড়াল না।

পরাঞ্জপের ঘরে লাইন টু লাইন কার্পেট বিছানো। লাইট জ্বলছে। শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিরাট এক হল-ঘর।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পরাঞ্জপে। হেসে স্বাগত জানিয়ে সবার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক্ করে বললেন—জেন্টল্‌মেন, ওয়েলকাম অল্ অব ইউ।

পরাঞ্জপে মধ্যবয়সী। চলাফেরা ও কথা বলার মধ্যে একটা আন্তর্জাতিক ভাব, টিপ্‌টপ্, সফিস্‌টিকেটেড়্, এককথায় চোস্ত্। দামী সাফারী স্যুটেও পরাঞ্জপের মেদবহুল শরীর ঢাকা পড়েনি। সামনের দুটি দাঁত বাঁধান, হাসিটা দেখে চমক লাগে--আসল না মেকী--ঠিক বোঝা যায় না। মানুষ-টাকে একটু রহস্যজনক লাগে। সবার কথাই তিনি খুব মন দিয়ে শোনেন। ভাবটা এই যে যিনি কথা বলছেন, তাঁর অস্তিত্বই পরাঞ্জপের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। কথা শেষে তাঁর কি রিঅ্যাকশন বোঝা যায় না। হাতীর চলার পথে হাতীকে কেউ স্নেহে বা ক্রোধে স্পর্শ করল কিনা, কিংবা কোন আঘাত করল কিনা—তাতে হাতীর যেমন চলার বেগে সামান্যমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না, তেমনি বিশাল পরাঞ্জপের শরীরের আধার। পরাঞ্জপেকে কেউ কখনও রাগতে দেখেনি, কথাবার্তায় অতি নম্র ও অমায়িক। কোথায়, কখন, কতটুকু বলতে হয় বা বলতে হবে তা যেন সব নখদর্পণে।

প্রথমেই পরাঞ্জপের একটি ছোট্ট ভূমিকা। আপনাদের এখানে ডেকে এনে আপনাদের অসুবিধায় ফেললাম বলে আমি দুঃখিত। আজ চন্দ্রভানু ভর্মার বাড়িতে আপনাদের যাবার কথা ছিল, তা বোধ হয় আর হল না। কি এক দুর্বোধ্য কারণে মিঃ কিসিঞ্জারের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চন্দ্রভানু ভর্মাকে সম্বোধন করে বললেন—হঠাৎ একটা জরুরী কাজে আপনাদের ডাকতে হল। ভবিষ্যতেও হয়ত এরকম অঘটনীয় ব্যাপার ঘটতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার এই রকম আব্দারে আপনাদের সহমত থাকবে, অসুবিধা হলেও আশা করি মেনে নেবেন।

চন্দ্রভানু ভর্মার দিকে আবার একটু তাকিয়ে তাঁর মনের অবস্থাটা বুঝে নিয়ে বললেন—আমি ঘরোয়া আলোচনার পক্ষপাতী। অফিশিয়্যাল কলারে দেখেছি কৃষ্টি ও কালচারের ক্ষতি হয়। এটাই আধুনিক ম্যানেজমেন্টের মূল কথা—যেটা মিঃ কিসিঞ্জার সারা পৃথিবীকে শেখাতে চান—আমরা যা এখনও শিখে উঠতে পারিনি। এটা স্বীকার করে নিতে আমার লজ্জা নেই। আশা করি এটা বুঝেই আপনারা সবাই মন খুলে কথা বলবেন, যার যা অসুবিধা, জানাতে দ্বিধা করবেন না।

এবার মলিয়েরের দিকে তাকিয়ে বললেন—হ্যাঁ, মিঃ মলিয়ের, আপনি

আগে বলুন, ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় ত ঘুরলেন, আপনার কি ইম্‌-প্রেশন্‌?

মলিয়ের হেসে বললেন—কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। যত দেখছি, তত দেখার তৃষ্ণা বাড়ছে।

হেসে সায় দিলেন পরাঞ্জপে। --আর মিঃ অ্যাসকারী—আপনি?

অ্যাসকারী স্যর জোনস্‌-এর মুখের দিকে একবার একটু তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন--অ্যাই অ্যাম ওভারহোয়েলমেড্‌।

অ্যাসকারীর উক্তি শুনে স্যর জোনস্‌ সবায়ের মুখ একবার দেখে নিলেন। বিদেশীদের মুখে এইসব অতিরঞ্জিত উক্তি শুনে কার মুখে কি ভাবান্তর হয়,—সেটা লক্ষ্য করা যে বিশেষ জরুরী-- স্যর জোনস্‌ সেটা ভাবেন। অ্যাসকারীর কথার ত মাত্রা থাকে না, বাঁধ-টাধ ভেঙে বন্যার মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এতে অন্যের যে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে সে-দিকে তার কোন খেয়ালই থাকে না। এ ব্যাপারে অনেকবার তিনি অ্যাসকারীকে সাবধান করে দিয়েছেন, কিন্তু কোন কাজ হয়নি, সেটা আজ আবার টের পেলেন।

অ্যাসকারী কথা বলতে বলতে একটার পর আর একটা যেন বোমা ফাটিয়ে যান, বললেন--অল্‌ দ্যাট্‌ উই নো অ্যাবাউট্‌ দিস্‌ কান্‌ট্রি ইজ সো লিটল্‌ দ্যাট আই অ্যাম এফ্রেড অ্যানলেস্‌ উই স্পেন্ড সাম মোর টাইম হিয়ার—উই ওন্ট বী অব মাচ্‌ ইউস্‌। [এ দেশ সম্বন্ধে এত আমরা কম জানি যে আরও কিছুদিন এখানে না কাটালে আমার মনে হয় কোন কাজেই আমরা আসব না।]

স্যর জোনস্‌-এর কথাটা একেবারেই পছন্দ হয় না। তাই তিনি কথাটা ঘুরিয়ে বললেন—হোয়াট মিঃ অ্যাসকারী ওয়ানটস্‌ টু সে—ইজ দ্যাট্‌ হী উইল কন্‌টিনিউ টু বী হিয়ার হোয়াইল্‌ উই অল্‌ হ্যাভ লেফট্‌। [অ্যাসকারী হয়ত এটাই বলতে চেয়েছেন, আমরা যখন সবাই চলে যাব, তখনও তিনি এখানে থাকবেন।]

হো হো করে সবাই হেসে উঠলেন। স্যর জোনস্‌ ভাবলেন—যাক, অ্যাসকারীর বোমায় বিশেষ কেউ হতাহত হয়নি, আপাতত ফাড়াটা কাটল।

পরাঞ্জপের সবদিকেই তীক্ষ্ণ নজর। পৃথিবীব্যাপী আমেরিকার ঐশ্বর্যের, বিদ্যার ও সুযোগের যে বিস্তার, তা তিনি স্বচক্ষে বহুবার দেখেছেন। কিসিঞ্জার সেই দেশেরই প্রতিনিধি। তাঁর যথোপযুক্ত মর্যাদা না দিলে আমেরিকার সম্মান থাকে না। প্রথমে কিসিঞ্জারের অভিজ্ঞতার কথাই জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। ভুল হয়ে গেছে, এখন কিছু করার নেই। পরাঞ্জপে তাই বলে উঠলেন—মিঃ কিসিঞ্জার, আপনিই বরঞ্চ কিছু বলুন।

মিঃ কিসিঞ্জার কিছু বলার জন্যে তৈরী ছিলেন না। মান বাঁচাতে তাই যতটা সম্ভব গুছিয়ে একটা 'মিশাইল' ছোঁড়ার মত আস্তে করে বটন্ টিপলেন—উই হ্যাভ সো লিটল্ স্কোপ টু নো ইণ্ডিয়া দ্যাট্ আই উড বেটার লীভ দ্য কান্ট্রি নাউ। [ভারতকে জানার সুযোগ আমাদের এত কম যে আমার মনে হয় এখনই এদেশ ছেড়ে আমার চলে যাওয়া উচিত।]

পরাঞ্জপে হাসিতে ফেটে পড়লেন। বাকী সবাই হেসে উঠলেন। চা-কফি-কেক্-বিস্কুট—পর্যাপ্ত পরিমাণে রেখে গেছে ধোপদুরস্ত খান-সামারা। খেতে খেতে সবাই এবার নানান ধরণের গল্প-গুজব করতে লাগলেন।

চা-পানের পরে সবাই আবার আলোচনার জন্যে তৈরী হলেন। সবাই ভেবেছিলেন, অনেক সমস্যা ও ভবিষ্যতের ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে পরাঞ্জপে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। কিন্তু তিনি ও পথ দিয়েই গেলেন না। অনেকে ভেবেছিলেন এমন কিছু আজ পরাঞ্জপে বলবেন যা গণেশ টাওয়ারের পক্ষে খুবই জরুরী। কিন্তু তাঁর হালকা মেজাজে আর হালকা চালে কথা বলার ধরণে সেরকম কিছুই প্রকাশ পেল না। কিছু বক্তব্য আছে বলেও মনে হল না।

বলার কিছু নেই বলেই পরাঞ্জপে, চন্দ্রভানু ভর্মাকে উদ্দেশ করে বললেন—আপনি বরঞ্চ গণেশ সম্বন্ধে কিছু বলুন। আমাদের কিছু উপকার হয়।

শুনেই চন্দ্রভানু যেন দপ্ করে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু খুব সংযতভাবে বললেন—আমার এখন কিছু বলার নেই, আমি শুধু শুনতে এসেছিলাম।

পরাঞ্জপে বললেন—যে কোন বিষয়ে বলতে পারার মত অগাধ পাণ্ডিত্য আপনার আছে, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। বিদেশী এক্সপার্টদের কাছ থেকে সম্মতিসূচক ইসারা পেয়ে তিনি আবার শুরু করলেন—দেখুন, এঁরাও চাইছেন, আপনি কিছু বলুন, 'গণেশ-কথা' শোনান।

চন্দ্রভানু কথাটা এড়িয়ে যান, বলেন—আপনারা সবাই আমার কথা শোনার জন্যে উদ্গ্রীব—সেজন্যে ধন্যবাদ। আসলে, যখন-তখন যে-কোন পরিস্থিতিতে যাঁরা বলতে পারেন তাঁদের সঙ্গে কম্পিটিশনে আমি পাল্লা দিতে পারব না। আশা করি, মিঃ পরাঞ্জপে আমাকে মাপ করবেন।

বেগতিক দেখে পরাঞ্জপে রাম দেওধরকে ধরলেন। আপনিই তাহলে কিছু শোনান।

রাম দেওধর হেসে জবাব দেন—বরঞ্চ এনারা কিছু বলুন, আমরা শুনি এবং শুনে উপকৃত হই।

কথাটার মধ্যে কি যে গূঢ় অর্থ পেলেন তা পরাঞ্জপেই জানেন। রাম

দেওধরের কথাটা লুফে নিয়ে বিশেষণের পর বিশেষণ বর্ষণ করতে থাকলেন পরাঞ্জপে—দ্যাটস্ রাইট--আপনারা কিছু বলুন, আমরা শুনি। দ্যাট্ ইজ এ প্র্যাফাউগুলি অরিজিন্যাল্ আইডিয়া, এটাই আমি অনেকক্ষণ থেকে বলব ভাবছিলাম। অ্যাণ্ড দিস্ ইজ অলসো এ হিস্টরিক্যাল নিসেসিটি। মেথড, কাজ করার ক্ষমতা, সংঘবদ্ধ কাজ, চিন্তাশক্তি, ক্রিয়েটিভিটি, পাণ্ডিত্য, মুখ বুঁজে দেশের স্বার্থে কাজ করে যাওয়া, দেশপ্রেম, আর্টের সৃষ্টি ও তার সংরক্ষণ—এই সব ক্ষেত্রে—আমার বলতে দ্বিধা নেই--আপনাদের কাজ থেকে আমাদের এখনও অনেক কিছু শেখার আছে। সো, লেট্ আস্ লেন্ড্ আউর ইয়ার্স্ টু ইউ—হোয়াট্ ডু ইউ সে, পুলকেশ গোস্বামী?

পুলকেশ গোস্বামী এক কোণে বসেছিল। সে কথাবার্তা বলতে ভালই বাসে। কিন্তু ভাল করে পরিচয় কারুর সঙ্গে এখনও হয়নি। তাই কথা বলা সাজে না ভেবেই সে এতক্ষণ চুপ করেই ছিল।

--লেট মি ইনট্রোডিউস্ পুলকেশ গোস্বামী, দ্য রিনাউণ্ড স্কাল্পটার, এ্যণ্ড এ আর্কিটেক্চারাল ইঞ্জিনিয়ার। ইনিও আমাদের কাজে অফ্ লেট সামিল হয়েছেন। সবার সঙ্গে এত দেরীতে পুলকেশকে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে পরাঞ্জপে যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয়েছেন তা বোঝা গেল না।

সবচেয়ে তরুণ পুলকেশ গোস্বামী। এগিয়ে এসে সবার সঙ্গে হাত মেলালো। নিজের সীটে এসে বসে বলল--অ্যান্ আন্-ইনট্রোডিউসড্ প্যারসন্ শুড্ রিমেইন মাম্--। দ্যাট্ ইজ এ প্রোপার কন্ডাক্ট। তাই বক্তব্য থাকলে আমি এখন শুনবার জন্যেই উন্মুখ।

কথাটা হজম করে নিয়ে পরাঞ্জপে অকারণে খুশীর ভাব দেখালেন। বললেন--তাহলে আমি বরঞ্চ এক এক করে প্রশ্ন করি সেটাই ভাল হবে। স্যার উইলিয়ম জোনস্, আপনি কি কিছু বলবেন?

—ওয়েল, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরী মাচ্। অ্যাই অ্যাম এফ্রেড্ অ্যাই হেড্ নাথিং টু সে' অ্যাট্ দ্য মোমেন্ট। [আমি দুঃখিত, এই মুহূর্তে আমার বলার কিছু নেই।]

—মিঃ মলিয়ের, ইউ?

—থ্যাঙ্ক ইউ ফর মেনি এড্জেক্টিভস্ বেস্টোড্ অন্ আস্। উই হোপ্ ইউ মে ডিজার্ভ দেম্।

—মিঃ কিসিঞ্জার—ইউ?

—ওয়েল, আমেরিকা ইজ এ ইয়ংগ কান্ট্রি—। উই মাস্ট লার্ন বিফোর উই ক্যান স্পীক্। [আসলে আমেরিকা নতুন ও তরুণ দেশ—কিছু বলার আগে আমাদের শেখা উচিত।]

সবাই একটু হাসলেন।

—মিঃ অ্যাসকারী?

অ্যাসকারী প্রস্তুত ছিলেন না, হেসে বললেন—অ্যাই ক্যান্ট্ গো অন্ স্পীকীং বাট্ টু হোয়াট্ অ্যাভেইল্! সো আই রিসার্ভ দ্য অপরচনিটি ফর এ ফিউচার অকেশন্। [বলতে বললে আমি অনেক কথাই বলতে পারি। কিন্তু কি লাভ? তাই ভবিষ্যতের কোন শুভ অবসরের জন্যে এই সুযোগ আমি তুলে রাখার পক্ষপাতী।]

নিরুপায় হয়ে পরাঞ্জপে বললেন—ওয়েল, দেন্ উই মাস্ট গো টু দি সাইট্ টুমরো, অ্যাট্ টেন্ ইন দি মরনিং, আই, মীন দ্য রামলীলা গ্রাউণ্ড। লেট্ আস্ হ্যাফ এ লুক অ্যাট্ দ্য প্লেস্। আশা করি আপনাদের কোন আপত্তি হবে না। আমার গাড়ি আপনাদের প্রত্যেককে হোটেল বা বাড়ি থেকে সময়মত তুলে নেবে। আই মাস্ট থ্যাঙ্ক অল অফ্ ইউ ফর ইওর অগাস্ট প্রেসেন্স্।

সভা ভঙ্গ হল। সবাই পরাঞ্জপের দিকে এগিয়ে গেলেন। রাম দেওধর নিজের গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন—তিনি আগেই বেরিয়ে গেলেন। বাকী সবাই একে একে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। পুলকেশ গোস্বামীকে পরাঞ্জপে ড্রাইভারের সামনের সীটে বসতে বলে ড্রাইভারকে গাড়ি স্টার্ট দিতে বললেন। গাড়ি এগিয়ে চলল।

॥ আট ॥

ব্যাঙ্গালোর ফ্যাক্টরির এখন যিনি মাথা, তিনি ভারত সরকারের জামাই-বাবুটির মত সেজে বসে থাকেন। এরকম জামাইবাবু তখন অনেক ছিল। কথায় মিষ্টি, কাজে নেতি। খুঁটির জোরে প্রবল শক্তিশালী। বিলাতী কোন কিছু অথবা ইংরেজ হলেই হল। জামাইবাবুদের কাছে তাদের সাত খুন মাপ। হাজার হলেও এককালের শাসক জাত ত! যেন অন্য গ্রহের মানুষ ওরা; চিরকাল অন্যায় করেও মাথায় বসে চাটি

মারার অধিকারী। এহেন জামাইবাবুদের সুনিপুণ কর্মক্ষমতায় ফ্যাক্টরি যখন যায় যায়, ভারত সরকারের গোটা এক্সপেরিমেন্ট্‌টাই যখন প্রায় ধসে পড়বার উপক্রম, তখন ওটা বন্ধ করে দিলেই পার্লামেন্টে সরকারের মুখ রক্ষা হয়, তখন গঙ্গাধরের খোঁজ পড়ল।

গঙ্গাধর সবে মাত্র দিল্লীতে বদলি হয়ে এসেছেন। দিল্লীতে থিতু হয়ে বসার কথা জীবনে এই প্রথম তিনি ভাবছেন। চিরটাকালই চরকি পাকের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন, কখনও পরোয়া করেননি। এবার তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তিন-চার বছরের মধ্যে আর কোথাও বদলি করা হবে না ; এবার দিল্লীতেই তিনি থিতু হতে পারবেন।

সেক্রেটারী সুরেন্দ্রমোহন মিশ্রের সঙ্গে মৈত্রেয়ীর এক পার্টিতে দেখা। কথায় কথায় মৈত্রেয়ী গঙ্গাধরের বদলি হবার ব্যাপারটা তুলে বলেছিলেন—ট্রান্সফার হলেই ত উনি একটা ব্যাগ নিয়ে চলে যান। ছেলেটারই পড়াশুনার ক্ষতি হয়। মিশ্র সাহেব হেসে জবাব দিয়েছিলেন--কাজের লোকের অভাব থাকলে যা হয়। তার মাশুল দিচ্ছেন আপনি। আমাদের যত অসুবিধা থাকুক--মিঃ চ্যাটার্জীকে এবার দিল্লীতে পোষ মানাবার চেষ্টা করছি। কতটা সফল হব, তা অবশ্য জানি না। বলে মিশ্র সাহেব রহস্য-জনক হাসলেন। সেক্রেটারী মিশ্র সাহেবের ধারণা, কিছুদিন দিল্লীতে কাজ না করলে সারা দেশের পারস্পেক্‌টিভ্‌ কারুরই গড়ে ওঠে না। গঙ্গাধর আবার দিল্লীতেই কাজ করতে চান না, বলেন—এখানে কাজের চেয়ে 'অকাজ'ই হয় বেশী। কিছুদিন আগে গঙ্গাধরকে নিয়ে দুই মন্ত্রী এস, কে, পাতিল ও জগজ্জীবন রামের মধ্যে বিপুল টাগ্‌-অব্‌-ওয়ার হয়ে গেছে ; পাতিল তাঁকে বোম্বেতে রাখবেনই আর জগজ্জীবন তাঁকে দিল্লীতে আনবেনই। জগজ্জীবনেরই জয় হয়েছিল।

দিল্লীতে একটি অনুষ্ঠানে জগজ্জীবন রামের সঙ্গে মৈত্রেয়ীর দেখা। চমৎকার বাংলা বলেন। মৈত্রেয়ী কিছু বলার আগেই তিনি বললেন--জানি, আমি জানি, আপনি কি নিয়ে ইদানীং বিব্রত। আমি মিশ্রকে বলে দিয়েছি আপনার কর্তাকে নিয়ে কিছুদিন যেন আর টানাহেঁচড়া না করা হয়। মুশকিল কি জানেন, দিল্লীতে গঙ্গাধর সম্ভবত থাকতে চায় না। কি ব্যাপার বলুন ত ?

মৈত্রেয়ী হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলেন—এখানে মনে হয় বেশী 'পলিটিকিং' চলে, ওটা ওঁর পছন্দ নয়।

—তা ত বটেই, রাজধানী বলে কথা! কিন্তু সরকারী চাকুরে হয়ে, এটা করব না, সেটা করব না--এটা বলা কি ঠিক ?

কোনরকম দ্বিধা না করেই মৈত্রেয়ী জবাব দিলেন--কাজের মানুষের পক্ষে ঐ এক মুশকিল, অকাজ দেখলেই তাদের মাথা গরম হয়ে যায়।

জগজ্জীবন রাম মাথা নাড়েন--হ্যাঁ, গঙ্গাধরের সেই এক রেপ্যুটেশন্। আমিও ওঁর কথা অনেক শুনেছি। আসলে অসুবিধাটা কোথায় জানেন, কাজের লোক তৈরী না করে সরকারী ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরি খাড়া করা বা প্রডাকশন্ নিয়ে মাথা ঘামান আমাদের উচিত ছিল না। আমরাই বা কি করব, বলুন। দেশবিভাগে যে এত লোকক্ষয় হবে, আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের তাড়নায় আর ভিড়ে আমরা তখন দিশেহারা। এদিকে দেশটাকে ত গড়তে হবে। প্রাইভেট সেক্টরের ওপরে আমাদের যে আস্থা ছিল না, তা নয়; কিন্তু তখন আমাদের অপেক্ষা করার সময় ছিল না। নেহেরুজীর কথাবার্তায় আমরা সেই আভাসই পেয়েছিলাম। যোগ্য-অযোগ্য লোকের কথা ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখার সময় তখন আমাদের ছিল না। এখন কাজের নানান ঝামেলা দেখে মনে হয়, মানুষ-গড়ার কারখানা আগে আমাদের গড়ে তোলা উচিত ছিল।

মন্ত্রীমশায়ের মুখের ওপর সত্য কথাটা বলতে একটুও ইতস্তত করেন না মৈত্রেয়ী, মানুষ-গড়ার ফ্যাক্টরিও ফেল করত। দেশের কথা ভাবলে আপনারা এর মধ্যে থেকেই নিশ্চয় যোগ্য লোক বেছে নিতে পারতেন। নিজের মামা-চাচাদের মধ্যে কি সব সময় যোগ্য লোক পাওয়া যায়? সে যাক, আমি মিশ্র সাহেবকে বলেছি সরকারী চাকরীতে এই নিয়ে দশ-বারোবার ত উনি বদলি হলেন। ছেলেটার এখন নাইন্ স্ট্যাণ্ডার্ড, তাই যা একটু ভাবনায় পড়েছি।

জগজ্জীবন রাম আশ্বাস দিয়েছিলেন--আপনার ছেলের সিনিয়র ক্যাম্ব্রিজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আর গঙ্গাধরকে ট্র্যান্সফার করা হবে না, আমি কথা দিলাম।

নতুন নতুন জায়গায় বদলী হতেন গঙ্গাধর। ব্যাগ হাতে নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। জিনিসপত্রের গোছগাছ, প্যাক্ করে সেগুলো পাঠান, স্টেশন থেকে তা ছাড়ান, বাড়ি দেখা, বাড়িতে নিয়ে এসে আবার বাড়ির সাফসুতর, গোছগাছ, ছেলের ভর্তি সবই মৈত্রেয়ীর দায়িত্ব। কাজের মধ্যে একবার ডুবে গেলে গঙ্গাধরকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। চট্টগ্রামে যেবার বদলী হয়েছিলেন, মৈত্রেয়ীর মনে পড়ে, একদিন লাঞ্চ আওয়ারে গঙ্গাধর এসে বললেন--মৈত্রেয়ী, জিনিসপত্র এসে গেছে, তুমি কি জিনিসগুলো স্টেশন থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে? একটা জরুরী কাছে আপিসে আটকা পড়েছি। আমি যেতে পারছি না। নতুন বিয়ে হয়েছে, গঙ্গাধরকে

আর কতটুকু চেনেন মৈত্রেয়ী? তাই 'না' বলতে সাহস হয়নি। রাজী হয়ে গিয়েছিলেন। জিনিসপত্র যখন স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছেন তখন শাশুড়ী ঠাকরুন বলেছিলেন—ও ভালমানুষের বেটী, এ্যাই যে জিনিসগুলা তুমি নিয়া অ্যাইলা এ তো আমার ছ্যেইলা দেইখ্যা নিল। সে বুইঝা নিল তুমি এ কাজ দিব্যি পার। আর ত সে এ্যাইতে মাথা দিব না। স্টেশন থিক্কা জিনিসপত্র নিয়া আসা কি তোমার ক্যাম্? কওয়ার ছিল, ও আমি পারুম না, তুমি যাও। আর ত সে সারা জীবন এ্যাইতে মাথা লাগাইব না। তোমারে দিয়্যাই করাইব।

সত্যিই, সারা জীবনই গঙ্গাধর 'তারে দিয়্যাই করাইল'। প্রতিবার বদলীর সময় যখন সত্যি সত্যি সব কাজ মৈত্রেয়ীকে করতে হত, আর গঙ্গাধর কাজের জায়গায় গিয়ে লম্বা একটা ডুব সাঁতার মারতেন, তখন মৈত্রেয়ী ঠাট্টা করে বলতেন—শাশুড়ী ঠাকরুন যদি প্রথমদিন কাজটা করার আগে ঐ উপদেশটা দিয়ে আমাকে সাবধান করে দিতেন, তাহলে সারা জীবন ধরে এই বোঝা আমাকে টানতে হত না। কাজটা হয়ে যাবার পরেই তিনি এই মহামূল্যবান উপদেশটা দিয়েছিলেন, এটাই আমার মস্ত দুর্ভাগ্য।

সব শুনে গঙ্গাধর এক গাল হাসতেন, বলতেন—আমার মা কত বুদ্ধিমতী দেখ, এখনকার ডিপ্লোম্যাট্‌রাও হয়ত মায়ের বুদ্ধির সঙ্গে পেরে উঠত না। আগের দিনে শাশুড়ীরা বউকে খাটতে দেখলেই খুশী হতেন, আর আমার মা তোমাকে বিনা কাজে ঘরে বসিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তুমি কথা শুনলে না, আমি কি করব? হাঃ হাঃ হাঃ করে হাসলেন গঙ্গাধর।

কিছুদিন যেতে না যেতেই মৈত্রেয়ী বুঝতে পারেন, অত আশ্বাস, অত প্রতিশ্রুতি সবই ফাঁকা।

হঠাৎ একদিন গঙ্গাধর এসে বললেন—দেখো মৈত্রেয়ী, এরা আমাকে ব্যাঙ্গালোর যেতে বলছে।

মৈত্রেয়ী হঠাৎ খুব চটে গেলেন—তা সেদিন যে মন্ত্রীমশায় অত আশ্বাস দিলেন যে তিন বছরের মধ্যে আর—

—হ্যাঁ, তাই ত ওরা অত বিব্রত বোধ করছে। মিশ্র সাহেব তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান। খুব চ্যালেঞ্জিং কাজ। বলছিলেন যদি না যাই, ব্যাঙ্গালোরের ফ্যাক্টরিটা হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে। এর ইম্প্লিকেশন্ বুঝতে পারছ ত? একেই ত গড়ার কাজে আমরা নেই, তারপরে তৈরী ফ্যাক্টরি যদি যোগ্য লোকের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে দেশের কত বড় ক্ষতি হবে, তুমি ভেবে দেখেছ কি?

—দেশ, শুধু দেশ, বলি দেশের কথা ভাবছে কে, শুনি?

—আমার কথা কি জান? কে ভাবছে না-ভাবছে আমি জানি না। জানবার প্রয়োজনও বোধ করি না। আমরা কতটুকু করতে পারছি, আমি কতটুকু পারব, আমাদের সামনে যে সুযোগ আসছে, তার সদ্ব্যবহার করছি কি না, আমি শুধু এটুকুই ভাবি। তুমি ত জান মৈত্রেয়ী, আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশী পড়েছ, দেখেছ, এমন কি প্ল্যানিং-এর ইতিহাসটাও তোমার জানা। আমার মনে আছে শ্বশুরমশায় ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা করেছিলেন ২৬ বছর আগে, সেই পরিকল্পনা রূপায়িত করলেন সরকার। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তখন বেঁচে। ডাঃ রায় শ্বশুরমশায়কে ডেকে বলেছিলেন —আপনার নিজের পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে, একবার চোখে দেখবেন না? চলুন। শ্বশুরমশায়ের সেটাই সর্বশেষ কাজ।

পুরনো কথা মনে করাতেই মৈত্রেয়ীর সব রাগ-অভিমান যেন এক নিমেষে ধুয়ে-মুছে জল হয়ে গেল। যেন অতীতের সঙ্গে বর্তমানের মিল খুঁজে পেয়েছেন। বললেন—সত্যি, তোমার ওপর অন্যায় করা হচ্ছে জেনেও বাধা দিতে পারি না। শুধু এই কারণেই। বাবাকেও আমরা ঠিক এভাবেই কাজ করতে দেখেছি। বাবার এসব ব্যাপারে কি ভয়ানক কমিটমেন্ট ছিল—তা স্বচক্ষে দেখেছি। তুমিও যখন সেরকম কর, অনেক সময় ভাবি, এ কি করে সম্ভব হল? দুটি মানুষ দুই জেন্যারেশনের অথচ তারা একই কাজের, একইভাবে ভাবিত হয়, উদ্বুদ্ধ হয়, কী করে? জানো, বাবার সম্পর্কে একটা জোক্ প্রচলিত ছিল, কেয়ার অফ্ ফ্লাড্। চারদিকে বন্যা, বাবার ডাক পড়ছে। সবে ফিল্ড থেকে ফিরেছেন, আবার ডাক পড়ল। যে-অবস্থাতেই থাকুন, চলে যেতেন। তখন এঁরাই ছিলেন ন্যাশনালিস্ট—দেশ-প্রেমিক। সরকারের চাকরী করতেন, কিন্তু যা গড়ে তুলতেন, তা দেশেরই কাজ ভাবতেন। ফোর্ট উইলিয়মে একবার খুব জরুরী মিটিং বসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তখন শেষ ভাগ। জাপানীরা ইম্ফল্, আসামে এসে গেছে। ব্রিটিশ সরকার নানান জায়গায় মাইন বসিয়েছে। প্ল্যান হচ্ছে, যদি ব্রিটিশ সরকারকে পিছিয়ে আসতে হয়, তাহলে ড্যাম-ট্যাম সব উড়িয়ে দেবে। আর্মি থেকে অর্ডার হয়েছে, ইরিগেশন্ ডিপার্টমেন্ট যেন এ-ব্যাপারে সৈন্যবাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা করে। বাবা ন্যাশনালিস্ট, এরকম একটা অবস্থায় পড়ে দু-লাইনের একটা রেজিগ্-নেশন্ লেটার দিয়ে বাবা সোজা চলে এলেন। বাড়িতে এসে বললেন—চাকরী ছেড়ে এলাম। সবাই আমরা চেপে ধরলাম, কেন? বাবা ধীর কন্ঠে বললেন—প্রাণপাত করে এতদিন যা গড়ে তুললাম, এখন এরা বলে কিনা

সব ভাঙতে হবে। আমি প্রাণ গেলেও তা পারব না। তাই রেজিগ্‌নেশন্‌ দিয়ে এলাম। সেই প্রথম বাবার মুখে গালাগালি শুনলাম যা আগে কোন-দিনও শুনিনি। বলেছিলেন—এ হারামজাদাদের এবার দেশ থেকে মেরে তাড়াবার সময় এসেছে, এরা এখন সব কিছুই ভাঙতে চায়।

ক্লার্ক রেজিগ্‌নেশন্‌ লেটার পেয়ে বলেছিলেন—সে কি? তোমার রিটায়ার করতে এখনও ন'মাস বাকি। এখনই কি যাবে?

বাবার স্পষ্ট জবাব—মিঃ ক্লার্ক, এতদিন ধরে গড়ে এসেছি। এখন যদি সেগুলো ভাঙতে বল, অ্যাই অ্যাম্‌ এ্যফ্রেড্‌, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড্‌ সাম বডি এলস্‌ টু ডু ইট।

গঙ্গাধর বললেন—জগজ্জীবন রাম ত সেকথাই বলছেন—অকর্মণ্য লোকগুলো অকাজের মাইন বসিয়েছে, বিস্ফোরণ ঘটার আগে প্লিজ কিছু কর। এঁরা সব কিরকম জান ত, এঁরা আজকের সমস্যা নিয়ে ভাবেন, দূরেরটা ভাবার শক্তি এঁদের কারুর নেই। তবু এঁরা যখন একটা শক্ত কাজ দেন, আমিও তোমার বাবার মত স্থির থাকতে পারি না। তবে তোমার আপত্তি থাকলে এবার আমি 'না' বলব।

—না, তুমি যাও, যখন বলছে।

ব্যস্‌, হাতে একটা ব্যাগ নিয়ে গঙ্গাধর সোজা ব্যাঙ্গালোর।

সেদিন নবীন ফোন করেছে—বৌদি, দাদাকে একটু সামলান ত?

—কেন, কী হল? মৈত্রেয়ী হাসছিলেন।

—আর বলবেন না। নিজের অত বড় একটা ঘর, সেই ঘরে আজকাল থাকছেনই না। কেবল সারা ফ্যাক্টরি ঘুরে ঘুরে বেড়ান। ওকে একটু ঘরে বসে থাকতে বলুন না। আমি ওয়ার্কস্‌ ম্যানেজার, প্রডাক্‌শনের আমি যতটা জানি, ইনি দেখছি তার দশগুণ জানেন। কাল তর্ক করতে গিয়ে একেবারে নাজেহাল। একটু সামলে নিতে দিন। করবো, আমি সব করবো। মানুষটাকে দেখলে কেমন যেন ঘাবড়ে যাই। জানা জিনিসগুলোও তখন ভুল হয়ে যেতে থাকে।

মৈত্রেয়ী সুযোগ বুঝে একদিন গঙ্গাধরকে বললেন—নবীন ফোন করেছিল। আজকাল তুমি নাকি তোমার ঘরেই বস না? কী ব্যাপার?

গঙ্গাধর জবাব দেন—আরে বুঝতে পারছ না কেন, ডিপেণ্ড করে করে এরা নিজেরা কোন ডিসিশন্‌ নিতে পারে না। ডিসিশন্‌ নিতে গিয়ে ভুল হোক না, বুঝব এরা নিজেরা কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাজের কোন পারস্পেক্‌টিভ্‌ নেই। একটার সঙ্গে আরেকটা যে জড়িয়ে আছে, একটা না ভাবলে যে অন্যটা করা যায় না, এটুকু পর্যন্ত ভাববার শক্তি নেই। নিজের

নিজের শপে কত প্রডাক্‌শন্‌ হচ্ছে বা তাতে কোন্‌ কোন্‌ ফ্যাক্‌টর ও হিউমান ফেইলিং বাধা দিচ্ছে, কিছু ভাবে না, তলিয়ে দেখে না। এদের সঙ্গে থেকে আমি এদের দিয়েই ডিসিশন্‌ নেওয়াই, এদের প্রব্লেম্‌ ও সল্যুশন্‌ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দি', তবেই একটু ভরসা পায়। কাজ করতে এগিয়ে আসে। নিজের ঘরে বসে থাকলে এদের আত্মবিশ্বাস আসবে না। এরা যেটুকু বুঝতে পারছে, তাও পারবে না, যেটুকু করতে পারছে, তাও করবে না।

ম্যানেজিং ডাইরেক্‌টর রূপেশ্বর সিংহ গঙ্গাধরকে আনাবার জন্যেই দিল্লীকে পীড়াপীড়ি করছিলেন; তাঁর চাপেই দিল্লী প্রতিশ্রুতি ভেঙে গঙ্গাধরকে পাঠিয়েছে। রূপেশ্বর সিংহ তাঁর চাকরী জীবনে দু-একবার গঙ্গাধরের সান্নিধ্যে এসেছেন, গঙ্গাধর যে কাজের লোক সেটা তিনি ভাল করেই জানেন। কাজ করতে নেমে গঙ্গাধর যে আর অন্য কোনদিকে তাকায় না, বাধা-বিঘ্ন ও কোন ওজর-আপত্তি মানে না--এটাও কিন্তু রূপেশ্বর ঠিক পছন্দ করেন না। এছাড়া, মিনিস্ট্রিতে কাজ করা আর ফ্যাক্‌টরিতে কাজ করার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। খুঁটির জোরে রূপেশ্বর আজ বড় পদে আসীন, সেখানে তাঁর কর্মক্ষমতার বিচার না করাই শ্রেয়। গঙ্গাধরকে চেয়ে পাঠাবার আগে রূপেশ্বর এ নিয়েও ভেবেছেন। কোন কোন ব্যাপারে গঙ্গাধর যে কারুর কথাই শুনবে না সেটা রূপেশ্বর জানেন, তার মনঃপুত নাহলেও তা মেনে নেওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই, তাও বোঝেন। ফ্যাক্‌টরিকে এখন দ্রুত এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, যাতে দিল্লী আর না বলতে পারে যে, ওটা বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। গঙ্গাধর ছাড়া এ কাজ কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। গঙ্গাধরের আর সব কিছুই সহ্য হয়। কিন্তু ও যখন ক্ষেপে গিয়ে দিগন্ত কাঁপিয়ে ঝড় নিয়ে আসে, তখন রূপেশ্বরের কেমন যেন ভয় হয়। গঙ্গাধর ছাড়া যখন গতি নেই তখন ওর কিছু কিছু জেদও মেনে নিতে হবে।

গঙ্গাধর ও মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জীর আপ্যায়নে রূপেশ্বর কোন ত্রুটি করেননি। তারা যেদিন আসেন, রূপেশ্বর নিজেই স্টেশনে ছিলেন, নেমন্তন্ন করে বাড়ীতে খাইয়েছেন, ফ্যাক্‌টরির বর্তমান হাল-চাল নিয়ে দু-চার কথাও বলেছেন। অন্যান্য ব্যাপারে রূপেশ্বর যে গঙ্গাধরের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করেন তার প্রমাণও তিনি দিয়েছেন। ফ্যাক্‌টরি ঘুরিয়ে দেখাবার সময় গঙ্গাধর অনেক প্রশ্ন করেছেন, তার সব উত্তর দিতে না পারলেও কিছু কিছু উত্তর তিনি যতটা পেরেছেন দিয়েছেন।

সাত দিনের মাথায় গঙ্গাধর রূপেশ্বরের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

গোটা ফ্যাক্টরির প্রডাক্শন্ বাড়াবার পথে যেসব সমস্যা আর তার কি সমাধান, সব লিখে নিয়ে গেছিলেন গঙ্গাধর, তার একটা কপি রূপেশ্বরকে দিয়ে গঙ্গাধর বললেন--ফ্যাক্টরির সব দায়িত্ব আমার। আসার আগে আমি যে শর্ত দিয়েছিলাম--আশা করি তা আপনার মনে আছে।

--তখন সব শর্ত মেনে না নিলে তুমি তো আসতে না, গঙ্গাধর।

--তার মানে? সেই শর্তগুলো আসলে আপনি মেনে নেননি, আমাকে এখানে নিয়ে আসার জন্যে শুধু 'হ্যাঁ' করেছিলেন। ঠিক আছে, আপনিও ভেবে দেখুন, আমিও ফিরে যাবার কথা ভাবি।

কিরকম 'একরোখা' লোক গঙ্গাধর, রূপেশ্বর তা ভাল করেই জানেন, তাই আশ্বাস দিয়ে বললেন--আগে বুঝে শুনে ত নাও, তারপরে একদিন কথা হবে।

--তাহলে আপনাকে খুলে বলি, গঙ্গাধরকে একটু অধৈর্য দেখায়। এখানে আসবার আগে ফ্যাক্টরি কি কারণে চলছে না, পার্লামেন্টারী কমিটির কি রিপোর্ট, দু-তিন বছরের অ্যানুয়াল রিপোর্ট, মিনিস্ট্রির মন্তব্য, বোর্ড মিটিং-এর কপি--সবই আমি খুঁটিয়ে দেখেছি। এই সাত দিনে প্রত্যেক শপের প্রব্লেমটা কি, তা বিচার করে, আলোচনা করে যা বুঝেছি তাতে আমাকে যদি কাজ দেখাতে হয়, ত কিছু হার্ড ডিসিশনও নিতে হতে পারে। ফ্যাক্টরি ঠিক মত চলুক, এতে আপনার স্বার্থও জড়িয়ে আছে। তাই যদি হয়, তবে আমি যা করব, তাতে আপনি বাধা দেবেন না, বিশেষ করে ফ্যাক্টরি ও প্রোডাক্শনের ব্যাপারে। কী, রাজী?

--তোমাকে আমি স্বাধীনভা~ কাজ করতে দিতে রাজী নই, একথা বলে লাভ নেই। চিরকাল দেখেছি তুমি স্বাধীনভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত। তুড়ি মেরে দিল্লীর ওজর-আপত্তি তুমি উড়িয়ে দিতে পার। তোমার সাহস দেখে আমিও মাঝে মাঝে অবাক হই। কিন্তু গঙ্গাধর, ফ্যাক্টরি চালাতে গেলে তোমার পলিসি কি সব সময় খাটবে? তুলকালাম করলে দিল্লী কি আমাকে ছেড়ে কথা বলবে? যা আমি বলতে চাই তা হল--তুমি নিশ্চয় এমন কিছু করবে না যা সমর্থন করা আমার পক্ষেও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

রূপেশ্বরের সঙ্গে গঙ্গাধরের একদা ঘনিষ্ঠতা ছিল। মাঝখানে বেশ কয়েক বছরের ব্যবধান। গঙ্গাধর টের পেলেন, বড় বড় পদ পেয়ে রূপেশ্বরের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিধা বেড়েছে, সংশয় এসেছে, প্রচুর মোসাহেব-দের নিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। যারা সরকারী পদকেই মূল্য দেয়, কাজকে নয়, এমন সব লোক এঁর চারপাশে ঘোরে। দিল্লীতেও একটি

চক্র এঁর সমর্থক। অকর্মণ্য হয়ে চুপচাপ বসে থাকা আর রাজনীতির নানা চাল খেলা এখন এঁর স্বভাবজাত। ফ্যাক্টরি অচল হয়েও যদি এই চক্রটাকে বাঁচিয়ে রাখা যেত, তাহলে হয়ত গঙ্গাধরের ডাক পড়ত না। অন্য একটা ব্যাপারেও হয়ত রূপেশ্বরের আঁতে ঘা লেগেছে; গঙ্গাধরের মনে হয়। দিল্লী স্পষ্ট লিখেছে যে রূপেশ্বরের অনুরোধেই গঙ্গাধরকে পাঠান হল। ইনি যোগ্য লোক। ফ্যাক্টরি ঠিকমত চালু করতে তিনি যা যা করবেন, সেদিকে নজর রাখা দরকার। চিঠিটা দিল্লীর সেই মহলের লেখা যারা রূপেশ্বরের পলিটিক্যাল্ সাপোর্টকে উপেক্ষার চোখে দেখে।

এই শক্তিই একদিন হয়ত চাইবে রূপেশ্বরকে সরিয়ে গঙ্গাধরকে ফ্যাক্টরির সর্বময় কর্তা হিসেবে নিযুক্ত করতে। এই সম্ভাবনায় রূপেশ্বর প্রথমে একটু জ্বলে উঠেছিলেন, যদিও সেটা তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায়নি। রূপেশ্বর কোথায় কাকে দিয়ে কি আঁটঘাট বেঁধে রেখেছেন, সেটা গঙ্গাধর একটু খেয়াল করলেই হয়ত বুঝতে পারতেন। কিন্তু ওসব 'অকাজের' মধ্যে গঙ্গাধর নেই; এতে গঙ্গাধরের বহুদিনের সঞ্চিত একটা ঘৃণা। তিনি এটুকু বোঝেন, কাজে যদি স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয় তবে প্রয়োজনবোধে রূপেশ্বর মাঝে মাঝেই তার গুপ্ত সুতোগুলোতে টানটুন দেবেই। এগিয়ে দিয়ে পিছিয়ে যাবে। অকারণে জট পাকাবে। ফ্যাক্টরির স্বাস্থ্য আবার যদি ফিরে আসে, এই পদ সামলানোর ব্যাপারটা তখন যে কত জটিল হয়ে উঠবে তার আভাস পেয়েও গঙ্গাধর ওদিক দিয়েই গেলেন না, বললেন—আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

—বল, আমি তোমার কথা শুনব বলেই ত সব কাজকর্ম ফেলে, সব মিটিং ক্যান্সেল্ করে সকাল থেকে তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। বল, তুমি যা বলবে, আমি তা শুনব।

—আপনি কী চান, ফ্যাক্টরি আবার ভাল মত চলুক?

—এ কি কথা বলছ গঙ্গাধর? তুমি দিল্লীতে ছিলে, এ ফ্যাক্টরি সম্পর্কে হেডকোয়ার্টারের কি ধারণা, আশা করি আমার চেয়ে তুমিই বোধ হয় বেশী জান।

—গঙ্গাধরকে আপনি এককালে চিনতেন, এটা আমি ধরে নিতে পারি।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। শুধু চিনি না, অ্যাডমায়্যারও করি। তোমার কাজ করার শক্তিকে আমি চিরকাল শ্রদ্ধা করে এসেছি। তুমি হয়ত জান না গঙ্গাধর, দিল্লীকে আমিই জানিয়েছিলাম, যদি ফ্যাক্টরি তোমরা বাঁচাতে চাও, তবে গঙ্গাধরকে পাঠাও, ওকে আমার চাই।

—কোন একজনকে চাইলেই কি সমস্যা মেটে। সে মানুষটা কি চাইছে

সেটাও ত দেখা দরকার, সে যা চায় তা তাকে করতে দেওয়া হচ্ছে কি না সেটাও ম্যানেজমেন্টের দেখা দরকার। আমি অনেক ভেবে চিন্তে নতুন একটা কর্মপ্রণালী তৈরী করেছি। আমার প্ল্যান অনুযায়ী ফ্যাক্টরি কিছুদিন চলতে দিন, দেখা যাক কি হয়। আপনাকে শুধু আমি একটা কথা বোঝাতে চাই যে আপনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর। আমি যা করব, তাতে আপনার সমর্থন না পেলে আমি কিভাবে কাজে এগোব, বলুন?

—সেটাই ত আমি ভাবছি। যা তুমি করবে, সেটা যদি আমার মনে হয়, তুমি বড় তাড়াহুড়ো করছ, তখন? তখন কী ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে আমি তোমাকে বাধা দেব, না, জেনে-শুনে আমি চুপ করে থাকব —বল, সেটা কী সম্ভব? তুমি তোমার শর্তটা বদলাও। শুধু এটাই বল যে সব ব্যাপারে আমাকে পরামর্শ করে কাজ করবে। তাতে ত আমি কোন বাধা দেখি না। আমাদের দু-জনের একই ইন্টারেস্ট। আমরা দু-জনেই চাই ফ্যাক্টরি আবার চলুক, আমরা আবার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখি।

গঙ্গাধর ধীর স্বরে বললেন—সব ব্যাপারটা আপনাকে আমার জানান উচিত। এম. ডি. হিসেবে সে দাবী করার অধিকার আপনার আছে। কিন্তু আমার কর্মক্ষেত্রে কর্মের সূচনাতেই কেন আমি স্বাধীনতা চাইছি, তার সপক্ষে যা বলতে চাইছি তা একটু বোঝবার চেষ্টা করুন। ধরুন না কেন, আপনি যেভাবে চাইছিলেন সেইভাবেই এতদিন ফ্যাক্টরি চলেছে। তাতেও ফ্যাক্টরির এই অবস্থা। সোজা কথা, আপনি যেমন-ভাবে চালাতে চেয়েছিলেন, তেমনভাবে চলেনি। আমি এখন সেটাকেই চালাতে চাইছি। কিছু মনে করবেন না যদি বলি, আপনি যাদের দিয়ে আর যাদের মন জুগিয়ে ফ্যাক্টরির প্রডাকশন্ বাড়াতে চাইছিলেন, তাতে ফ্যাক্টরি চলেনি। আমাকে এবার অনেক ওলোট-পালোট করতে হবে। সেটা করতে হবে শক্ত হাতে, কঠোর ও নির্মম সিদ্ধান্ত নিয়ে। যেহেতু আপনি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আমি আশা করব, আপনি তাতে আপত্তি করবেন না। বরঞ্চ আমাকে সাপোর্ট করবেন। আপনি ত চান ফ্যাক্টরি আবার চলুক। নানা লোকের প্রেসারে ও স্বার্থের সংঘাতে যদি আপনি হঠাৎ বলে বসেন, তুমি যা করছ গঙ্গাধর, ও আমি মানি না, তখন আমি কিন্তু মাঝ পথে আপনার কথা মেনে নিতে পারব না। তখনই কিন্তু দু-জনের মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি শুরু হবে। সেটা কারুর পক্ষেই শোভনীয় নয়। অনেক সময় কর্মীরাও এই ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়ে কাজে শৈথিল্য দেখাবে। মনে রাখবেন, সেই একই মানুষ, সেই

একই কর্মী, সেই একই ফ্যাক্টরির বাতাবরণ, কিছুই পাল্টায়নি। আমি শুধু দেব মোটিভেশন্। মোটিভেশন্ কিভাবে জেনারেট্ করতে হয় তা আমি জানি, আর ওটাই আমার কাজ।

—কিন্তু গঙ্গাধর, রূপেশ্বর এসব কথার মর্মার্থ কিছুই বুঝতে না পেরে অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন—স্বাধীনতা মানে কি এই যে, যা তুমি করবে তা। আমি কিছুই জানতে পারব না? লোকেরা এসে বলে যাবে তুমি কি করছ, অথচ এম ডি. হিসেবে তা জানার কোন অধিকার আমার থাকবে না। এটা ঠিক মেনে নিতে পারছি না। মেনে নিতে পারছি না, কারণ ওতে এম ডি হিসেবে আমার প্রেস্টিজ্ ধূলোয় লুটিয়ে যাবে। জেনে-শুনে তা আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না।

গঙ্গাধর একটু হতাশ হয়ে পড়েন। বোঝাবার শেষ চেষ্টা করে বললেন—আপনিই বা ব্যাপারটাকে প্রেস্টিজ্ ইস্যু করছেন কেন, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না। এতে প্রেস্টিজের কি আছে? একটু বোঝবার চেষ্টা করুন। ইঞ্জিনিয়ারদের মোটিভেট্ করতে হবে। এখানে শুধু ত কাজ করলেই হবে না, ইনডিভিজুয়াল অ্যাটিটিউড্এর সঙ্গে জড়িত। আমি যখন নিউ অ্যাটিটিউড্ ডেভেলপ করব তখন যদি আপনি হঠাৎ একদিন বলে বসেন—এটার অর্থ কি আমাকে বল, তখন তা আমার পক্ষে বুঝিয়ে বলা সম্ভব হবে না। কোন একটা পার্টিকুলার অ্যাটিটুডের সঙ্গে কি কি কাজ জড়িত, আর এর প্রয়োজনই বা কেন, আমার শত ইচ্ছে থাকলেও আপনাকে আমি জানাতে পারব না। মোটিভেশন্ পুরোপুরি এফেক্টিভ না হলে মাঝ পথে তার এ্যাসেস্মেন্ট সম্ভব নয়। তাই যে চিত্র তখন অস্পষ্ট তাকে স্পষ্ট করে আপনাকে আমি কিভাবে বোঝাবো, বলুন। ওগুলো নিয়ে আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে একটা নতুন এক্সপেরিমেন্ট করছি—ফ্যাক্টরিকে নতুনভাবে চালানোর। আমি বারবার বলছি, যে এলিমেন্টকে দিয়ে এতদিন কোন কিছুই করা সম্ভব হয়নি, সেই একই এলিমেন্টকে দিয়েই আমাকে এবার অসাধ্য সাধন করতে হবে। আপনি চাইলেই ত আর সব জিনিসটা ঢেলে সাজানো যায় না। এদের দিয়েই আমাকে কাজ করিয়ে নিতে হবে, ভাল কাজ দেখাতে হবে। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কাজে স্বাধীনতা কেন দরকার। কাজে স্বাধীনতা না পেলে আমি কাজ দেখাতে পারব না, এইটুকু স্বাধীনতা দিতেও আপনার এত আপত্তি কেন? আপনার কাজ ত আমাকে একটু কাজে স্বাধীনতা দেওয়া, আমার কাজ আরও বড়। এদের প্রত্যেকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। ওটা যে আরও কঠিন কাজ একথা নিশ্চয় আপনাকে

বুঝিয়ে বলতে হবে না।

রূপেশ্বর এত গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে বেশীক্ষণ আলোচনা চালিয়ে যেতে অভ্যস্ত নন। এর মধ্যেই তিনি যেন হাঁপিয়ে উঠলেন—ঠিক আছে, ঠিক আছে, অ্যাই হ্যাভ্ ফুল্ সাপোর্ট ফর্ ইউ। বলে ফেলেই ভাবলেন এতটা 'লঙ রোপ' দেওয়া বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না, অমনি কথার সুর পালটিয়ে রূপেশ্বর বললেন—কাম্ ত করো—আগে ত বাড়ো। যে প্রস্তাবগুলো তুমি আমাকে দিয়েছ, আমিও সেগুলো দেখি। তুমিও আরও তলিয়ে দেখ। আমিও ভাবি তোমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি, বিশেষ করে দিল্লী যখন আমাদের আর একটা চান্স দিতে রাজী।

আলোচনা তারপর আর এগোয়নি। কাজ শুরু হল। গঙ্গাধর আর কোন আলোচনা করেন না। গঙ্গাধরের প্রস্তাবগুলো নিজের মধ্যে তোলপাড় করে আর 'পোষ্যবর্গদের' সঙ্গে আলোচনা করেও রূপেশ্বর ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না যে এতে ফ্যাক্টরিতে গঙ্গাধরের প্রেস্টিজ্ কতটা বাড়বে আর নিজের ইমেজ কতটা কমবে। এই প্রস্তাবগুলোর প্রতি পর্যায়ে কি পরিমাণ সিদ্ধান্ত ও আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন—সেটা রূপেশ্বর বুঝতে পারলেন না। গঙ্গাধরের ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রূপেশ্বরের ক্ষমতা যদি কমতে থাকে অথবা গঙ্গাধরের কর্মক্ষমতার পরিচয় পেয়ে যদি কর্মীরা রূপেশ্বরকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে, তবে সেই নব-পর্যায়ে কিভাবে কলকাঠি নাড়াতে হবে, কতটা আরও বেশী দিল্লীর সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে হবে, কোথায় কোথায় যোগাযোগটা আরও সুরক্ষিত রাখতে হবে, সেটা একবার ভাল করে ভেবে নিলেন রূপেশ্বর। রূপেশ্বরের ক্ষমতা সম্পর্কে গঙ্গাধরের অজ্ঞতা দেখে রূপেশ্বর একটু হাসলেন। চোখের সামনে গঙ্গাধরের প্রস্তাবগুলোর বহর দেখে তিনি মনে মনে বললেন—কাজে নাম গঙ্গাধর, কাজে নাম। যে রূপেশ্বর থিতু হয়ে তোমার সামনে বসে আছে তার কোন খবর-টবর রাখ না বলে তুমি আমার জালে ধরা পড়েছ—এখন সামলাও। তোমাকে কখন আর কোথায় বাধা দেব, সব আমি জানি। তার জন্যে আমিও প্রস্তুত থাকব, গঙ্গাধর।

সেই থেকেই যখন ফ্যাক্টরির চাকাটা বন্‌বন্ করে ঘুরতে লাগল, রূপেশ্বরের মাথাটাও কেমন যেন ঘুরতে থাকে। তিনি আবার মোসাহেবদের নিয়ে আসর বসাতে শুরু করলেন, চিঠি লেখেন আর সই করেন আর বসে বসে গল্প করেন ; কখনও বা নিজে একা বসে কোন্ খুঁটির কত জোর তা নিয়ে ভাবেন, জল্পনা-কল্পনা করেন। কাজের লোক যখন এবার এসে গেছে তখন আর ভাবনা কি। তিনি ঘনঘন দিল্লী যাওয়া শুরু করলেন।

মনে মনে ভাবেন, যে রূপেশ্বর রাশ টেনে ধরতে জানে, তাকে গঙ্গাধর এখনও চেনে না।

॥ নয় ॥

অলকা নিজেকে আয়নায় দেখছিল। নিজের মুখ দেখার সময় বড় একটা পায় না। সাজ-সজ্জার দিকে খুব একটা নজর নেই। যারাই বিদেশে যায়, অলকার জন্য পারফ্যিউম, নেইল-পলিশ, হাতের বালা কিংবা দুল নিয়ে আসে। ভূর হয়ে আছে বাক্সে। একটা পারফ্যিউম খুলে শাড়িতে লাগায়। হালকা মেরুন রঙের শাড়িটা পরল। মুখে লাগাল নিভিয়া। বৃষ্টি পড়ছে, আলসেমীর একটা আমেজ, তার স্নান সারা। সন্দীপ আসবে বলেছে, মা তাকে খেতে বলেছেন। আসবে ত?

নিজের চেহারাটা অলকার মোটেই ভাল লাগে না। চোখের দু-কোনে নাকি তার বিদ্যুতের ছটা। নিজের তা মনে হয় না। তবে কি আমরা যা, সবই অন্যের চোখের সৃষ্টি? তা যদি হয়, তবে ব্যক্তিত্ব কাকে বলে? গম্ভীর, ভদ্র, রয়ে-সয়ে কথা বলে, এটাই কি ব্যক্তিত্ব? না, ভেতরের একটা জিনিস, যা গভীর কোন বোধ থেকে মানুষের চোখেমুখে, কাজে রঙ ছড়ায়? কলেজে, ইউনিভারসিটিতে, সেমিনারে, লাইব্রেরীতে কত মানুষের সঙ্গে আলাপ হয় অলকার; ওরা বলে আমি নাকি সুন্দর কথা বলি, যা বলি স্পষ্ট বলি, আমার মধ্যে অস্পষ্টতার কোন চিহ্ন নেই। শুধু প্রশংসা, পুরুষজাতটা সুযোগ পেলেই প্রশংসায় ভরে দিতে চায় মেয়েদের, বিশেষ করে অলকাকে। কারুর কারুর প্রশংসা মন্দ লাগে না অলকার; ফুলের রূপ আর সৌরভের মত কিছুটা গ্রহণও করে। কিন্তু কাছে এসে ফুলটা তুলে নাকের কাছে নিতেই কামনার কেমন যেন তিক্ত অগৌরব প্রকাশ পায়। অলকা সরে দাঁড়ায়; ওর চৈতন্য হয়। দূরে থাকে।

মেয়েদের ভ্রূ-আঁকা অলকা পছন্দ করে না। এতে ওর সিমপ্যাথিও আছে। আহাঃ কি করবে, ঈশ্বর যদি এত কৃপণ, ভাল একজোড়া ভ্রূ

দিতে কোন পর্যায়ে যদি কৃপণতা থেকে থাকে, ভদ্র সমাজে তাকে পরিবেশিত করতে উদার হাতের আঁচড় ত পড়বেই। জন্মের অসংগতি মনের ঔদার্যেও পূরণ হবার নয়।

অলকা নিজেকে দেখে, হঠাৎ আবিষ্কার করে, ওকে কেউ সুন্দরী বলবে না। তবে হ্যাঁ, কটা সৌন্দর্য যেন প্রখর সূর্যের উত্তাপ, ঝলসে যায়। এর চেয়ে ওর যে গায়ের রঙ--লঘু হরিদ্রাভ, এ নাকি গভীরভাবে টানে! শরীরের আনাচে-কানাচে যৌবনের চিহ্ন ফুটে উঠলে তা পুরুষের মনে নাকি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। অলকার ধারণা, সব পুরুষই মুখের চেয়ে অন্য দিকে তাকায় বেশী। অলকা শাড়ির আঁচল টেনে নেয়, কথা বলতে বলতে নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। এরা সবাই ত চিন্তাশীল, দেশের নানা সমস্যা নিয়ে সারাক্ষণ ভাবছে। মেয়েরা কিছু ভাবছে দেখলেই অযথা এত সহানুভূতি কেন? কেন মেয়েদের মন ছোঁয়ার চেয়ে শরীর ছোঁয়ার অত চেষ্টা! পুরুষের এ লোভকে অলকা ঠিক ঘৃণা করে না, তবু কেন যেন মনে হয়, ওর জীবন একটু অন্য রকম। শুধু সংসার করে ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য ওর জীবন নয়। দশজন ত করছেই, আমি না হয় একটু অন্যরকম হলাম। পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে বলে ত মনে হয় না।

অলকা নিজেকে দেখতে আবার আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়। নিজেকে দেখা মানেই কি নিজের ভাবনা? সূর্য উঠল; বৃষ্টির ভেজা শরীরে সূর্যের রঙ পড়লে কি সুন্দর যে লাগে! সেই রঙের একটু রঙবাহার এসে পড়ল ঘরের জানলায়। বাইরের এত রঙে মনের ভাবনাগুলোর কেন অন্ধকার কাটে না? সেমিনারের ডাঃ মহিন্দরের বক্তব্যটা ভেসে আসে, তার ভেতরের কথাটাও--চলুন না, বাইরে একটু বেড়াই। অলকা বলেছিল--কেন? এখানেই ত বেশ জমিয়ে কথা বলছি, কথা বলছি মানে ঝড়ের বেগে নিজের মতামতই শুনিয়ে যাচ্ছি। ডাঃ মহিন্দরের মুখে শয়তানির একটা হাসি খেলে যায় যেন। বাইরের দিকে তাকিয়ে বলেন--দেখুন, কি সুন্দর রোদ্দুর, অনেকটা আপনার হরিৎ-রঙা মুখের মত। বলেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বোকার মত হাসছিলেন ডাঃ মহিন্দর। এতে অলকার কী রিঅ্যাকশন হবে, রেগে যাবে না খুশীতে ভরপুর হবে আগে থেকে তিনি যেন তা জানেন। অলকা অবাক হয়ে ভাবছিল, ডাঃ মহিন্দর এত জ্ঞানী-গুণী তবে কেন এত সহজে তিনি মেয়েদের রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন, একটু সঙ্কোচও হয় না! এরকম ত হবার কথা নয়। সেমিনারের বিষয় নিয়ে তখন আরও গভীর কোন আলোচনায় মেতে ওঠা যেত, অলকাও দ্বিগুণ উৎসাহীত হয়ে উঠত তাতে। কিন্তু ডাঃ মহিন্দর, তিন ছেলেমেয়ে তাঁর--সবাই বেশ বড়,--তিনিও এখন নিভৃতে

অলকার সূর্যালোকিত সঙ্গ চান! এ নিভৃত আবেদন এতবার এত রঙ ছড়িয়েছে যে, অনেক সময় অলকার মনে হয়, এখানে, ভারতে একা স্পিনস্টার থাকার বিস্তর অসুবিধা; বিদ্যার আলো ভাবনায়-বুদ্ধিতে এদের কারুর কোনরকম আলো ছড়ায়নি; অনেকটা যেন অন্যের কাছে ধার-করা সব অনুভাবনা। নয়ত গুরুগম্ভীর যে বিষয় নিয়ে একটু আগে আলোচনায় যে অধীর হয়েছিল নিভৃতে সে এসে হাত চেপে ধরতে চায় কেন? বিদ্যার যে বিচ্ছুরিত একটা আলো, সেটা তবে কি বাজে ব্যাপার!

বেশ লাগছে অলকাকে। কে যেন বলল। এটা নিজের কথা কিংবা কামনাদীপ্ত কোন পুরুষের উক্তি, এই মুহূর্তে ঠিক মনে করতে পারল না অলকা। মনে মনে তারই যাচাই চলছিল। চোখ দুটো যেন হরিণনয়না, না, এটা অতিরঞ্জন। চোখের মণিটা ঘন কাল নয়; কাল রঙের সঙ্গে একটু ম্যাজেন্টা রঙ মেশালে যেমন হয়; লালচে কাল চোখের আড়ালে বড় বড় চোখের পাতা। টানা ভ্রূ, বিস্তর খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর। ফুলে-ফেঁপে-ওঠা চুল। যেন কাশ-ফুল। কথাটা কে বলেছিল মনে পড়ছে না, পাঞ্জাবী কোন সহকর্মী নিশ্চয় নয়, হয়ত-বা কোন বাঙালী স্কলার। বাঙালী কবির সঙ্গে দেখা হলেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়নি, লেখকের সঙ্গেও নয়; ঘনিষ্ঠ হলে তারা অলকাকে কি বলত, বলা শক্ত। অতি-রঞ্জনের সুর একটু বেশী থাকত নিশ্চয়। তাদের উক্তি অনেক সিন্‌সিয়্যার, যা এই মুহূর্তে ভাবছে--তারই কাব্যিক প্রকাশ।

সন্দীপ চাঁছাছোলা ছেলে। দেশের-দশের কথা অত বলতে-কইতে পারে না। কি যেন এক দুর্বার আকর্ষণ। হয়ত ওর ভেতরের সেই জিনিস, যাকে আমরা ইন্‌নার পারসোন্যালিটি বলি। পুরুষালি চেহারা, প্রায় ছয় ফুট লম্বা। মুখটা লম্বাটে; চোখ দুটি বাঙালী বলেই হয়ত অত সজল, ভদ্র। কথায় কথায় হাত ধরতে চায় না, কিংবা বলে না, চলুন এক কাপ চা খেয়ে আসি, আমি ওমুক হোটেলে অত নম্বর স্যুট-এ আছি, আজকে সন্ধ্যায় আপনার আমন্ত্রণ রইল। হ্যাঁ, পাবলিক সেক্‌টর নিয়ে আমি গভীর-ভাবে স্ট্যাডি করেছি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির দিক থেকে। আই থিঙ্ক অ্যাই উড বী এ্যাবল্‌ টু থ্রো সাম লাইট্‌ অন্‌ দ্য কশ্চেন দ্যাট্‌ ইজ এজিটেটিং ইউ। অর্থাৎ আমাকে সঙ্গ দাও তাহলে যা জেনেছি, সেই সিক্রেট তোমাকে জানাব। কেমন যেন নির্লজ্জ এসব বিদ্বান ও বুদ্ধিমানের দল, ইদানীং-কালের প্রফেসর কিংবা স্কলাররা। সন্দীপ কিন্তু কোনদিন বলেনি, চল অলকা, বেড়িয়ে আসি। কেন বলেনি? সন্দীপ কি অলকাকে ভয় পায়? ভাবে, বিদ্যায়-বুদ্ধিতে অলকা অনেক এগিয়ে আছে? বিশ্বাস কর সন্দীপ, তোমার আড়ালে একটা সত্য উক্তি করে নিই—এই যে দেখছ, চারিপাশে এত পণ্ডিত ও বিদ্বানদের সংখ্যা বেড়ে গেছে, এরা সব 'ভাল

করছে, করে খাচ্ছে' দলের। অরিজিনালিটি কিন্তু এদের কারুর নেই, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সই ভাঙিয়ে খাচ্ছে। ধর, তোমাকে হঠাৎ কেউ বেশ কিছু টাকা ধার দিল, তুমি সুদ খাচ্ছ, আসলটা কিন্তু অন্যের। এবার বুঝলে, বাঙালীবাবু? সমাজের যে-পর্যায়ে আমরা থাকি সন্দীপ, সেখানে বাঙালী কিংবা পাঞ্জাবী বলে কোন কথা নেই। তবে এটা অনেকটা ঠিক যে, জাতীয় কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের রক্তে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে, শত শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও তা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি না। তোমার সঙ্গে সন্দীপ, কথা বলতে আমি ভারি আনন্দ পাই। যদি এ কথা বলি, তুমি হয়ত হাসবে। ভাববে, আমি বাড়িয়ে বলছি। তোমার বোধ আছে, বৈশিষ্ট্য আছে, বাঙালী বলে আর ঐ ফ্যামিলির ছেলে বলে হয়ত একটু বেশী--এটার সঙ্গে পি-এইচ. ডি. কিংবা বিলেত-যাত্রার কোন সম্পর্ক নেই। বিলেত-ফেরৎ, আমেরিকা-হলাণ্ড-রিটার্ণ কত ঐতিহাসিক, কত স্কলারই দেখলাম। সন্দীপ, তোমাকে একটা গোপন কথা বলি ; অন্তর যদি খোলে, ভেতরের মানুষ যদি একবার জাগে, কেউ যদি একটা রঙিন হোরাইজন্ খুঁজে পায়, তবে তার সঙ্গে কথা বলে অনেক সুখ ; তার সঙ্গ লাভে লাভবান হবারও একটা ব্যাপার থাকে। বাকি সবাইকে এক পর্যায়ের মানুষ বলে তুমি ধরে নিতে পার। তারা সব একঘেয়ে ও মার্কামারা, দূরে সরিয়ে দিতে তোমার খুব একটা অসুবিধা হবার কথা নয়। অবশ্য সন্দীপ, আমার একটা সুবিধে আছে। ভারতবর্ষে যা চিরকাল ছিল, ইদানীং যা একটু বেশী। ক্যারিয়ার গড়তে এখানে মেয়েদের, বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে--অনেক 'কিছু' করতে হয়, যাকে দুর্নীতি বলতে আমার বাধে না। মেয়েরা অনেকে তা নির্দ্বিধায় করছে। দ্বিতীয় কথা, যেহেতু আমার 'ওসব' করতে হয়নি, বিদেশেই পি-এইচ. ডি.-টা করেছি, তার জন্যে এদেশে, এমন কি স্কলারদের মধ্যেও আমার বিপুল সম্মান ; বিলেতে থাকাকালীন আমি কি বিষয়ে রিসার্চ করেছি, সেটা যত চাউর হয়, তত দেখি আমার ইজ্জত বাড়ে। যেন ওখানকার একটা ডিগ্রি থাকলে এখানে এসে বিনাদ্বিধায় চড়-চাপড় মারা যায়, প্রথম থেকেই বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকা যায়। আসলে সাড়ে সাতশো বছর পরাধীন থেকে আমরা একেবারেই স্ল্যাভিশ্ হয়ে গেছি, সন্দীপ। ভাগ্যিস, তুমি অত পড়াশুনার ঝামেলার মধ্যে যাওনি, তোমার মধ্যে তাই মনুষ্যত্বের পরিচয় পাই, অনেকের মধ্যে সে উত্তাপ নেই--সে যাক। আমার কোন কথাই বিশ্বাস করে না সন্দীপ, ভাবে, আমি জন্মের থেকেই মস্ত বড় ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল, দেশের-দশের কথা ছাড়া আমার মুখে আর যেন কোন কিছুই মানায় না। একবার একটা ছাপ পড়ে গেলে তার থেকে আর পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই, মানুষ রেপ্যুটেশন্‌কে এইজন্যে এত মূল্য দেয়।

এই দেখো, নিজের দিকে তাকিয়ে থাকলেও নিজেকে অনেক সময় দেখা যায় না। নিজেকে দেখা মানেই কি আত্ম-চিন্তা? সেটা কি স্বপ্ন? কতটুকু স্বপ্ন আর কতটুকু রিয়্যেলিটির অভিব্যক্তি নিয়ে এই মানুষ? কোন্‌টা বেশী থাকলে আমরা তাকে মানুষ বলি? শুনতে পাই 'রিভিলেশ্‌ন্ অব ডিভিনিটি উইদিন্ ম্যান্', এই বিষয়টা নিয়ে বিদেশে ইদানীং খুব চর্চা হচ্ছে। এই যে তোমার মধ্যে আমি আরও একটা কিছুর আভাস পাই, মার্ক্সিস্টরা এ বিচার শুনলে আমাকে আবার পাগল বলবে, দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি, মানুষ তার গভীর ভাবনারাজ্য নিয়ে সত্যিই কি ডিভাইন্ হতে পারে? প্রেমে পড়লে মানুষ তবে অত ওড়ে কেন, জগৎ-সংসার কার যাদুস্পর্শে তখন রঙিন মনে হয়? বিশ্বভুবন তবে কি চিরকালই আনন্দে ভরপুর, আমরা শুধু উপলব্ধি করি মাত্র, আমাদের শুধু হোরাইজন্ খোলে? দরজা খোলে, একটার পর আরেকটা শুধু দরজা খোলে?

আজকে আর নিজেকে দেখা হবে না। ও কাজটা পুরুষের হাতে ছেড়ে দিলেই মেয়েরা নিশ্চিন্ত হয় বেশী। আমার অবশ্য সেরকম কোন বিশেষ পুরুষ নেই, হলে মন্দ হত না! ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল জগৎটা এমনিতে খুব নীরস, কারুর সাহচর্যে না হয় একটু রসসিক্ত হল। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে আপন মানুষটার সরস মুখ কিংবা অভিব্যক্তি না হয় একটু দেখে নিতাম, বেশ মজা হত। মুশকিল হল, পুরুষজাতটা আবার ঝগড়া করতেও ওস্তাদ; ওরা বিস্তর 'ইগো' প্রবলেমে ভোগে। কত শুনি, এই সবে বিয়ে হল, আবার দু'বছরের মধ্যে ডিভোর্স। কী হল? না, থাকা অসম্ভব। অত যদি 'মা--মা' করা, তবে বিয়ে করেছিলে কেন? দাঁড়াও ভেবে দেখি, বলেছিল অলকা। একটু ভেবে বলেছিল—'মা--মা' করছে--তাই বলে ত তোমাকে মা বানিয়ে ফেলেনি।--তুমি জান না অলকা, রঞ্জনা চৌধুরী নিজের সাফাই গেয়েছিল--ভয়ানক ন্যাস্টি আমাদের এই পুরনো সংস্কারকে নিয়ে চলা। অত বিদ্বান, আর অত র‍্যাশন্‌ল্ হয়েও মাকে ভক্তি করবে; মুখে বলে আমি মার্ক্সিস্ট, আবার মন্দিরের সামনে গিয়ে হাত জোড় করে প্রণাম করবে। সমাজের বিভিন্ন সম্পর্ক ও তার বিবর্তন নিয়ে অদ্ভুত সুন্দর লেকচার দেবে, কিন্তু বউয়ের কি অসুবিধা হচ্ছে, একবার তাকিয়েও দেখবে না। এইসব থিঅ্যারিটিশিয়ান্ লোকদের সঙ্গে ঘর করা কী যে কষ্টের, তা তুমি জান না, অলকা। বেঁচে গেছ। বিয়ে করনি বলে তুমি এখনও তবু কিছু করতে পারছ। আসলে আমাদের দেশের প্রবলেমটা কি জান অলকা, আমরা পুরনোকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নতুনকে খোলা মনে এখনও গ্রহণ করতে শিখিনি।

অলকা শুধু বলেছিল—নতুন মানে তুমি কি ওয়েস্টার্ন্ আইডিয়া বলছ? নিশ্চয় তাই, এ প্রশ্নের উত্তর অলকা নিজেই দিয়েছিল। ওদের পিট্‌ফল

কোথায় জান? কেন ওরা এত হাহাকার করে, একটু সঙ্গের জন্য মরে? সেটাও ত ভেবে দেখবে?—না অলকা, রঞ্জনা বলেছিল—ইট্ ইজ ইম্পসব্‌ল্ টু লিভ উইথ হিম্। রঞ্জনা যে জগতের স্বপ্ন গড়েছিল বিয়ের আগে, এখন অন্য অবস্থায় পড়ে আর সেটা বরদাস্ত হচ্ছে না; রঞ্জনা ডিভোর্স করেছে, নিশ্চয় তার পেছনে আরও কোন গভীর এইলমেন্ট্ ছিল, যা রঞ্জনা বলতে চায়নি আমাকে। সমাজের আর একটি চিত্র অঞ্জনা। সে একাই থাকে, স্বামী একদিকে মার্ক্সিজম আওড়ায়, বড় বড় কথা বলে, আর ঘরের কোন কাজ করে না, অফিসেও যায় না। ঠিকমত সংসারও করবে না, আলাদাও যে থাকবে, তাও নয়। এর ওপর আছে ননদ ও শাশুড়ীর অত্যাচার। অঞ্জনার তাই বড় কষ্ট। তারই মধ্যে রিসার্চ করছে। বড় সিমপ্যাথি হয়। পারলে ওকে একটু বেশী সাহায্য করি। ওদের সমস্যা সমাধান করার সাধ্য আমার নেই। ওরা গোটা সমাজেরই আধুনিক নানা রূপ। আমার সাহচর্যে এসেছে বলে আমি জানতে পেরেছি মাত্র। আরও শুনবে সন্দীপ, অজস্র কাহিনীর মালমশলা দিতে পারি আমি, আমার এক আঁচড়ে অনেক থিসিস্ পার হয়। সে যাক, অহংকার করা খুব বোকামি। মনুষ্যত্বের দিক থেকে আমি এমন কিছু এখনও করে উঠতে পারিনি যে শুধু একটু বিদ্যার গুণে আমি মানুষকে সুদে-আসলে হয়রানি করব।

মা ডাকছে। যাই, বলল অলকা। সন্দীপকে খাওয়াবে। ও আমাদের পরিচিত, কিন্তু ঘরের ছেলে ত নয়, তায় আবার বাঙালী। তাই মা ডাকছেন, কোন্‌টা দিয়ে কোন্‌টা রান্না করলে খেয়ে বলবে, বাঃ। যেন পুরুষের এই বাহবা না পেলে মেয়েদের গোটা জীবনটাই বৃথা। ডাকছে যখন, তখন যেতেই হবে, যদিও রান্না সারা, তবু আমি পরিবারের একজন ইম্-প্যরটন্ট্ মেম্বার, আমার মতামত তাই ভয়ানক জরুরী। মনে হয়, বাবাই বলেছেন কথাটা। মা অনেক বেশী আত্মবিশ্বাসী মানুষ, আমার মতামত শোনার ইচ্ছা তাঁর নিশ্চয় ছিল না; বাবার সম্মানার্থে রান্নাঘরে আমার ডাক পড়েছে।

ভাবছিলাম, নিজেকে আরও একটু দেখব, নিজের ঘরে একা থাকলেও তা সব সময় হয়ে ওঠে না। সারাক্ষণই অন্যের চোখেই নিজেকে আমরা দেখছি, কলেজে, সেমিনারে আবার বাড়িতে এসেও। আত্ম-মানুষটা তাই বড় একা, নিরালায় পড়ে থাকে। বাবার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে একবার আলোচনা করতে হবে।

—হ্যাঁ মা, ডাকছ?

—এই যে রান্না করেছি, দেখ। ছোলে-মটর, পনির মটর, পেঁয়াজ ও মাংসের টুকরো দিয়ে রাজমা, ছোলার ডাল আর পোলাও। আর কিছু লাগবে?

—খুব বেশী আইটেম্ করেছ, মা। অত দরকার ছিল না। মিষ্টি নেই? বাঙালীদের মিষ্টি ছাড়া খাওয়াটা ঠিক সম্পূর্ণ হয় না।

চন্দ্রভানু ভর্মা কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মনে হয় মা-মেয়ের কথা শুনতেই এ-পথ দিয়ে য্যাওয়ার প্রয়োজন পড়েছিল, একটু দাঁড়িয়ে মন্তব্য করলেন—পায়েস করলে ভাল হত। মন্তব্যটা নির্মলার পছন্দ হল না। তিনি ভেবেছিলেন, রুটি বানিয়ে ঘি মাখিয়ে গরম গরম দেবেন, সন্দীপ সার্ভিসে আছে। ওর ওখানে বাঙালী খাওয়া কি জোটে যে বাঙালী খানার জন্য সে মরে যাচ্ছে? মেয়ে-বাপের অদ্ভুত সব আব্দার। অকারণ হয়রানীও বটে।

নির্মলা অলকাকে বললেন—অলকা, তা বাপু, তুই না হয় পায়েস কর, উনি যখন চাইছেন। আমি ভাবছিলাম পায়েস না করে ডিজ্যার্ট্ করব। সন্দীপ নিশ্চয় ডিফেন্স সার্ভিসে ওসবই খায়।

অলকা বলল—যা রোজ খায়, তাই-যে আমাদের বাড়িতে খেতে হবে, এমন ত কোন কথা নেই। তাছাড়া বুঝতে পারছ না কেন বাবা সন্দীপকে খাওয়াচ্ছেন গঙ্গাধরের গুণধর পুত্র হিসেবে। গঙ্গাধর মেসো খাবেন না সন্দীপ খাবে, বাবার গুলিয়ে গেছে।

চন্দ্রভানু ভর্মা কথাটা শুনে হাসতে হাসতে নিজের ঘরে চলে যান।

অলকা পায়েসটা সবে নামিয়েছে, দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল। অলকাই দরজা খুলতে চেয়েছিল কিন্তু রান্নাঘরে থাকতেই টের পেল, হুকুম সিং দরজা খুলে ড্রইংরুমে বসাল সন্দীপকে। রোমিও-জুলিয়েট নতুন লোক দেখলে একটু যেন বেশী লাফঝাঁফ শুরু করে দেয়। সারা বাড়ি ছুটোছুটি করে এখন রোমিওটা ঘেউ ঘেউ বন্ধ করেছে। সন্দীপ কুকুর খুব ভালবাসে, তাই পোষ মানিয়ে ফেলল এক মুহূর্তে। জুলিয়েট একবার ঘরে ঢুকছে, আগন্তুকের পায়ের গন্ধ শুঁকছে আবার অলকার কাছে রান্না-ঘরে ছুটে যাচ্ছে, হয়ত বলতে চাইছে, দেখে যাও, তোমার কাছেই এসেছে বোধ হয়।

এক মুখ হাসি নিয়ে অলকা বলল—বাবুর এতক্ষণে সময় হল?

—সময় নয়, ওটা বড় সাধারণ কথা, বল অবসর।

—দুটোর মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য আছে বলে ত মনে হয়না, তবে মিলিটারী অফিসারদের সবটুকুই সময়, অবসর বলে কিছু নেই মনে হয়।

—আসছিলাম অনেক আগে, আমার এক বন্ধু, ইউ পি-র ছেলে, তেলের ব্যবসা করে—।

—ও, বুঝেছি সে-বুঝি এতক্ষণ তেল দিচ্ছিল। হাসে অলকা। আড় চোখে দেখে নিল সন্দীপকে। সন্দীপ প্যান্টের ওপর হালকা ছাই রঙের পলো-নেক্ ফুল্-স্লিভ্ পরেছে। বৃষ্টি-ভেজা শীতেও কোট পরেনি;

শীতকালে বৃষ্টি পড়লে ঠাণ্ডাটা একটু জাঁকিয়েই পড়ে। সন্দীপের মুখে কৌতুকের আভাস। সন্দীপের কাছে অলকার গোটা ব্যক্তিত্বটাই একটা বিস্ময়, পুরোটা কৌতুকময় না হলেও।

—নেভিতে তেল খেতে খেতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাই ভাবছি সিভিলিয়ান লাইফটা বুঝি-বা কি দুর্বিষহ। সন্দীপ একটুও হাসলী না। বলল—চন্দ্রভানু আঙ্কেল বাড়ি আছেন ত, আর আণ্টি?

—হ্যাঁ, বাবা বাড়িতে, তাঁর কাজের ঘরে। চল, আগে মা-র সাঙ্গে দেখা কর। তারপর না হয় বাবার কাছে যাবে। অলকা জানে, বাবার সঙ্গ পেলে সন্দীপ ওখানেই জমে যাবে। আজকে অবশ্য অন্য মুডে আছে, ভারি ঝকঝকে লাগছে ওকে।

নির্মলা হেসে বললেন—কি সন্দীপ, ভালো আছো তো? সন্দীপ এগিয়ে এসে প্রণাম করলো।—থাক বাবা, থাক। নির্মলা সন্দীপকে দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করেন। বললেন—জান বাবা সন্দীপ, তুমি কি ভালবাস, না ভালবাস, এনিয়ে আজ বাপ-বেটির মধ্যে মস্ত রিসার্চ চলছিল। শুনেছি, আজকাল নেভিতে বেশী খাবার খেতে দেয়, সত্যি কি?

অলকা ঠাট্টা করে বলে—দেশকে রক্ষা করতে বেশী খাবারই দরকার। আজকাল ওরা যুদ্ধ করতে ভুলে যাচ্ছে। দেখনা, কতদিন যুদ্ধ হয় না বলে যে কি আপসোস।

মা-মেয়েতে একসঙ্গেই হেসে ওঠে।

—অলকা, দু-দুটো যুদ্ধ করেছি, ভুলে যেও না। প্রথমবারের যুদ্ধে যুদ্ধ-জাহাজের প্রয়োজন না পড়লেও সারাটা কোস্ট লাইন অষ্টপ্রহর পাহারায় থাকতে হয়েছে। দ্বিতীয়বার ত জাহাজ নিয়েই যুদ্ধ। এনিয়ে গপ্প শুরু করলে, অনুযোগ আসবে আমি যুদ্ধবাজ। অভিজ্ঞতা যা হয়েছে, তোমার মত রিসার্চ করার ঝোঁক থাকলে হয়ত একটা বই-ই লিখে ফেলতাম।

—ভাগ্যিস করনি। এদেশে যুদ্ধ-লিটারেচার বলতে তো জেনারেল কউল, বি. এল. মল্লিক। ওয়ার-লিটারেচার যাকে বলে তার কতটুকু আভাসই বা ওতে আছে।

—একটাই কারণ, সন্দীপ চ্যাটার্জী এখনো কলম ধরেনি।

হেসে ওঠে অলকা, —লেখনা কেন, আমি রিসার্চ মেটিরিয়াল যোগাড় করে দেব।

—তালেই হয়েছে। পাঠকরা বলবে, কি এক অসাধারণ 'এলিট্‌দের' বই লিখেছে সন্দীপ চ্যাটার্জী।

—তুমি নাকি নেভি ছেড়ে দেবে? নির্মলা প্রশ্ন করে।

—এখনো কিছু ঠিক করিনি, ভাবছি, জানেন তো, একবার যোগ্যতা

প্রমাণ করতে পারলে ভারত সরকার সহজে ছাড়তে চায় না। ছাড়াও এক মহা ঝামেলা। তদ্বির ও সুপারিশ না হলে সহজে ছাড়া পাওয়া যায় না। ছাড়ার ব্যাপারটা স্বপ্নেই থেকে যায়।

নির্মলা মাথা নাড়েন। ভেতরে যেতে যেতে বললেন--তোমরা গল্প কর, আমি যাই, খাবার দিতে বলি। খাওয়া দাওয়া সেরে নিলেই হয়, সাড়ে বারোটা বাজে।

—এক্ষুনি! সন্দীপ অবাক হয়। হাসতে হাসতে বলে—আমাদের বাড়িতে দেড়টার আগে ও নিয়ে কেউ ভাবেই না।

নির্মলা হাসলেন—বেশ, আজকে না হয় আমরাও দেড়টার সময়ে খাব। খাবার রেডী। খিদে পেলে কিন্তু বোল, আগেও টেবিল লাগাতে পারি।

অলকার সঙ্গে চন্দ্রভানুর ঘরে যেতে যেতে সন্দীপ বলল--দিদি কই?

—দিদি একটা কাজে সাতদিনের জন্য জয়পুরে গেছে। যদি জানত, তুমি আসবে, তাহলে এখন ট্যুরে যেত কিনা সন্দেহ। তোমার সঙ্গটা দিদির ভারি পছন্দসই।

—ওঃ তাই বুঝি, আর তোমার? সন্দীপ রহস্যভরা হাসি হেসে অলকাকে এক পলক দেখে নেয়।

রোমিও কোত্থেকে ঘুরে এসে সন্দীপের গায়ের গন্ধ আবার শুঁকছিল। অলকার বকা খেয়ে পালায়। জুলিয়েট বুদ্ধিমতী, আদর খাবার আশায় পথ দেখিয়ে চলল। অলকা তাকে কোলে তুলে নিয়ে বলে--দেখলে, জুলি তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আমার কি যে সুইট্ লাগে ওকে।

সন্দীপ মুচকি হাসে--তোমার মত।

মিটি মিটি হেসে অলকা জবাব দেয়—সাহস বড্ড বেড়ে গেছে, দেখছি।

—জীবনযুদ্ধে সাহসই ত আমাদের একমাত্র অস্ত্র!

—ও, তাই বুঝি? অলকা আবার হাসে।

চন্দ্রভানু হাতের কাজ ফেলে রেখে 'এসো, এসো' বলে সন্দীপকে ভেতরে আসতে বললেন। চন্দ্রভানু তখন গণেশ মডেলে শেষ টাচ্ দিচ্ছিলেন। বিদেশী এক্সপার্টরা আবার কবে হঠাৎ এসে পড়বে ঠিক নেই। ভেবেছিলেন, এই সুযোগে গণেশের মুখের এক্সপ্রেশানটা আরও সার্প করবেন, তাই ছুরি দিয়ে চাঁচছিলেন গণেশের কপাল।

—তুমি এসেছ খবর পেয়েছি।

—কি করছেন? সন্দীপ জিজ্ঞেস করে।

—আর বল কেন? শহরে একটা গণেশ টাওয়ার হচ্ছে এ খবর নিশ্চয়ই জান। আজকাল যা হয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা কম্পিটিশনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি, অনেকটা অলকার জন্যেই। নয়ত ওসবে আমার বিশ্বাস নেই।

সন্দীপ কোন কথার উত্তর দিল না। জিজ্ঞাসুনেত্রে গণেশের মডেলটা

দেখতে লাগল।

কার সঙ্গে কিভাবে মিশতে হবে, কি কথা বলতে হবে, এই টেকনিকটা সন্দীপ মিলিটারীতে ভালোই শিখেছে, অলকা তা জানে। কেমন সুন্দর শান্তশিষ্ট অল্প বয়সী যুবক হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

ঘুরে ঘুরে খুব মন দিয়ে সব দেখে সন্দীপ, কিছুই বলে না। চন্দ্রভানু তাতেই উদ্বুদ্ধ হন বেশী। আর্ট পীস্ দেখে কিছু না বললেই বোধহয় বেশী বলা হয়। শিল্পী মনে করে আর্ট পীসের গভীরে যেতে না পারলেও, বোঝার অন্তত চেষ্টা করছে। অলকার স্বভাব এর ঠিক বিপরীত। চন্দ্রভানু কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই তার যা মনে হয়, বলতে থাকে। সন্দীপের নীরবতা এই জন্যই ওকে বেশি আকর্ষণ করে, অলকা হকচকিয়ে যায় নিজের মুখরা স্বভাবে।

—ওসব ছাড়, চন্দ্রভানু বললেন, করতে হয় তাই করা, নয়ত এখন আমাদের রিটায়ারমেন্টের সময়। কিছু একটা নিয়ে থাকা। গঙ্গাধর কেমন আছেন ? অনেক দিন দেখা হয়না, দিল্লীতে সবাই আমরা নিজেদের নিয়েই সব সময়ে ব্যস্ত। তুমি আসার পরে সেদিন টেলিফোনে কথা হল, বড় চাপা মানুষ ত, তুমি যেসব প্ল্যান করছ, কিছুই বললেন না।

—যতক্ষণ না হয়, বাবা মুখ খোলেন না, আপনি ত তা জানেন।

—আলবাৎ জানি। তোমার বাবা যে কত বড়, আমরা সেটা এক রকম ভুলেই রইলাম, সন্দীপ। আমার আক্ষেপ হয়, জীবনে যে প্রতিষ্ঠা ওনার প্রাপ্য তা উনি পেলেন না।

—সে আপনি বাবাকে অত শ্রদ্ধা করেন বলেই, আজকাল আর সেই দৃষ্টি নেই, আঙ্কেল।

—ঠিকই বলেছ, চন্দ্রভানু একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। খানিক পরে বললেন—ড্রইংরুমে গিয়ে বোস, খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলি ?

—এখুনি নয়, আপনি বরঞ্চ কাজটা শেষ করুন, আমিও একটু সুস্থির হয়ে বসি, তারপর না হয় খাব। আসলে জানেন ত সার্ভিস জীবন থেকে এসে আমি বাঙালী হয়ে থাকতে ভালবাসি। আজ যেমন ধুতি পরে আসতে ইচ্ছে করছিল। নেহাৎ ঠাণ্ডার দিন, তার ওপর বৃষ্টি পড়েছে, তাই বাধ্য হয়ে কজ্‌মোপলিটন্ হতে হয়েছে।

—ভাগ্যিস বলনি, এখানে এলে বুরোক্র্যাট্ হতে ইচ্ছে হয়। চন্দ্রভানু হাসছিলেন।

—ভারতবর্ষে ‘পোষ্যপুত্র’ হবার ভাগ্য ক-জন করে আসে, আঙ্কেল ? এখন এদের মধ্যে অনেকে আবার ট্রেনিং পিরিয়ডেই দেড় লক্ষ থেকে পনেরো লক্ষ টাকা ডাউরি হাঁকাচ্ছে, কাগজে দেখেছেন নিশ্চয়। খেটে-খাওয়া মানুষের কাছে ওসব এখনও স্বপ্ন।

চন্দ্রভানু একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। গোটা দেশের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার খুব ভাবতে ভাল লাগে যে তুমি তা হওনি। চারিদিকে এই যে এত লুটতরাজ ও দুর্নীতি, এর কারণ কি জান ত? অনেকে বলেন, একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে সবাই এখন যে যার গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। আমার কিন্তু মনে হয়, পুরনো মূল্যবোধকে একেবারে জলাঞ্জলি দিচ্ছি বলেই এ হাল। আয়াসই সবাই চায়, কে আর বিকাশ চায় জীবনে? দ্বিতীয়টা খুব সাধনার জিনিস কি না। তাই বলছিলাম দশ জনের মত না হয়ে তুমি তোমার মত হও।

অলকা অলক্ষে সন্দীপকে আর একবার দেখে নেয়। সন্দীপ হেসে নিঃশব্দে যেন বলে, কথাটা নোট্ করে নাও। অলকা তার মুখের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল।

সন্দীপ সোফায় পাশাপাশি বসে বলল—এবার বল, তোমার রিসার্চের কত দূর?

—কিসের রিসার্চ? অলকা না বোঝার ভান করে।

—এই যে শুনলাম, পাবলিক সেক্টর ভ্যার্সাস প্রাইভেট সেক্টরের কন্ট্রোভার্সি নিয়ে কি সব করছ, আর তার জন্যে আমার বাবা ও মা-র কাছে প্রায়শই ধর্না দিচ্ছ।

—যা শুনেছ সবই ভুল। কন্ট্রোভার্সি আমি তুলিনি, কন্ট্রোভার্সিটা কিছুটা ঐতিহাসিক, অনেকটা কায়েমী স্বার্থ। দ্বিতীয় কথাটার বিষয়ে কিছু বলার আগে প্রথম কথাটাই আর একটু বলতে হবে। সংক্ষেপেই বলি,—১৯০৩ থেকে ১৯০৮ সাল, সারা ভারতে তখন বিদেশী কাপড় বর্জন আন্দোলন তুঙ্গে। সাধারণ মধ্যবিত্ত ছাড়াও বহু ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি ঐ আন্দোলনের পেছনে ছিলো। অনেকে সক্রিয়ভাবে এ আন্দোলনকে উস্কানি দিয়েছিলো—দেশের স্বার্থের কথা ভেবে নয়। নিজেদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে। এখন কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেছে বেশীর ভাগ লোকই এগিয়ে এসেছিল নিজেদেরই ব্যবসার খাতিরে। দেখে-শুনে এখন আমার অনেক সময় মনে হয়, এরা যখন কিছু করে, দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজেদেরই স্বার্থ প্রাধান্য পায় বেশী। ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। ১৯০৮ সালের মধ্যে দেশীয় শিল্প গড়ার বিপুল আয়োজন শুরু হয়েছে। ব্রিটিশরা কলোনী গড়তে এসে অনেকটা বাধ্য হয়েই লিবারেল আইডিয়া ও শিক্ষা-দীক্ষা যেমন দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি নির্লজ্জের মত এমন সব কাণ্ড করেছে, যা ভাবা যায় না। বহুদিন পর্যন্ত নিজেদের স্বার্থ ছাড়া তারা আর কিছুই ভাবতো না। এ রকম পরিস্থিতিতে এগুতে গেলে ব্রিটিশদের যে-কোন উপায়ে জব্দ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। দেশীয় শিল্প গড়ার প্রয়াসে ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৮ সালের মধ্যে শিল্পোদ্যোগীদের জাপান,

জার্মানী ও নানান দেশ ঘুরিয়ে এনে তাদেরই দিয়ে দেশে কাপড়ের কল, সাবান, সেন্ট, কালি, নিব, কাগজ, চিনে মাটির কাপ-ডিস তৈরীর কারখানা ও ঐ ধরনের আরো অনেক কলকারখানা স্থাপন করা হয়। নানা স্থানে এক্‌জিবিশন-কাম-সেলস্ ভাণ্ডার খুলে হাতের জিনিস, হাতে বোনা তাঁতের কাপড় ও খাদিবস্ত্র প্রচুর বিক্রি করা হলো, কিন্তু ট্রেডার্সের মধ্যে কোন ট্রাডিশন গড়ে উঠলো না। বিদেশী স্বার্থের সংঘর্ষে আর একনাগাড়ে লেগে না-থাকার অভাবে সেই ক্ষেত্রগুলোই খোলা রইলো যেখানে বেশী পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না, স্বল্প পরিশ্রমে পয়সা আসে। যেমন--ব্যাঙ্কিং, ইন্সিওরেন্স আর অন্তর্দেশীয় পরিবহণ ব্যবস্থা, কিছু ওষুধের কারখানাও।

সন্দীপ সব চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। আর থাকতে না পেরে, হেসে বললো--শান্তশিষ্ট মনোযোগী ছাত্র পেয়ে তুমি যে দেখছি গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসটা আমাকে গিলিয়ে ছাড়বে। আমন্ত্রিত হয়েও যদি ওভাবে আমি শুনতে বাধ্য হই, তাহলে আমার কিন্তু ভীষণ খিদে পেয়ে যাবে।

অলকা হেসে ফেলে--না থাক। চল, মা-কে খেতে দিতে বলি।

--না, না। বেশতো হচ্ছিল, বল শুনি। সন্দীপ ধৈর্যের আশ্বাস দিল।

অলকা আবার শুরু করে--১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এই পোড়া দেশে কিছুই তৈরী হতো না। নাট-বল্টু ত নয়ই, এমন কি পিনও নয়; সেফ্‌টিপিনও বিদেশ থেকে আসতো, সূচও। আর চল্লিশ বছরের মধ্যে আমরা এটমিক পাওয়ার তৈরী করছি, উপগ্রহ পাঠাচ্ছি মহাকাশে। আর ডিফেন্স-এর কথা, সে-ত তুমিই জান। শতকরা পঁচাশিভাগ প্রতিরক্ষার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দেশেই আমরা তৈরী ক'রছি। আমি শুনেছি নৌ-বাহিনীর বেশীর ভাগই এখন কম্‌পিউটারাইজড হয়ে গেছে। সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য এশিয়া ও আফ্রিকার দিকে একবার দেখ, তারা আমাদের সঙ্গেই স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু তাদের অন্য অবস্থা। অত দূরে যাবার কি দরকার, পাকিস্তানকেই দেখ না, ধার করে তারা এটম বোমা তৈরী করবেই। করাচীতে মাত্র একটা ইস্পাত কারখানা ছিল, হালে রাশিয়া আর একটা ইস্পাত কারখানা তৈরী করে দিচ্ছে। ওদেশে সব কিছুই আমদানী করা হয়, এতদিন ওখানে মারুতি আমদানী করা হতো, সবেমাত্র আমাদের দেশের মতো এসেম্বল্ করা হচ্ছে। এগিয়ে যেতে দেওয়া হয় না, পৃথিবীজোড়া সেই কায়েমী-স্বার্থ ও ষড়যন্ত্র। দেশের অভ্যন্তরেও তারাই এ্যাক্‌টিভ্। আমরা কিন্তু পেরেছি। পারতাম না, যদি প্রাইভেট সেক্‌টরের ওপরে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমরা বসে থাকতাম। আমরা কোন কথা না শুনে, সমস্ত বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করে পাবলিক সেক্‌টর গড়ে তুলেছি। তাই আমরা পেরেছি। এটাই আমার মূল বক্তব্য।

সন্দীপ নিবিষ্টমনে শুনছিল। তোমার কথা শুনে বুঝতে পারছি যে স্রেফ স্ক্র্যাপ থেকে এইসব বড় বড় ফ্যাক্টরী যারা গড়ে তুলেছেন, সত্যিই তারা কি অসাধারণ কাজই না করেছেন। বাবাকে দেখছি বলেই এটা অনুভব করতে পারি। নেপথ্যে থেকে এঁরা দেশের কত বড় কাজ করেছেন।

উৎসাহে প্রাণবন্ত অলকা বলে চলে--এটাই তো আসল কথা। গত চল্লিশ বছরে অনেকটা নিঃশব্দেই, ভারতের যে উন্নতি ঘটেছে, সেই বিস্ময়কর ঘটনা সম্পর্কে আমরা একটা কথাও বলতে রাজি নই। দেশের অভ্যন্তরে যে কি ভয়ানকভাবে এই কায়েমী-স্বার্থ কাজ করে এই নীরবতাই তার প্রমাণ। অথচ এটা যদি ইংল্যাণ্ডে বা আমেরিকায় হতো, আমরা শতমুখে বলতাম, ওরা 'ম্যাজিক' ঘটিয়ে ছেড়েছে। ইংল্যাণ্ড এই কাজ করতে গোটা একটা মহাদেশের সহায়সম্বলকে নিজের দেশের উন্নতির কাজে লাগিয়েছে। সময় নিয়েছে দুশো বছরেরও বেশী। তার চেয়ে কত কম সময়ে আমরা উন্নতির পথে মিরাক্‌ল্‌ ঘটিয়েছি। কিন্তু তার সামান্য মাত্র স্বীকৃতি নেই। জান, এও আমাদের সেই স্ল্যাভিস্‌ মেন্টালিটির পরিচয়। তখন যারা পাবলিক সেক্টর থেকে সর্বপ্রকারে সুবিধে নিয়েছে বা এখনও নিচ্ছে তারাও সময়মত বিপক্ষ দলে গিয়ে হাত তোলে।

সন্দীপ সায় দেয়—এটা আমি খুব দেখেছি। যারা সাহায্য পায় কিংবা সাহায্য নেয়, কি এক দুর্বোধ্য কারণে তারাই শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সাহায্যকারীর নাম উচ্চারণ করাও তখন বারণ।

কথাটা শুনে অলকা একটু হাসে। বলল--শুধু যে বারণ, তাই নয়; দেশের কিছু উন্নতি হয়নি এমন একটা স্লাইটিং ভঙ্গী। শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পাবলিক সেক্টরের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রাইভেট সেক্টর ও কায়েমী-স্বার্থান্বেষী লোকেরা যে সব মন্তব্য করে যাচ্ছে, খুঁটিয়ে যদি দেখ ত দেখবে ফিফ্‌টিজে যা বলেছে, এইট্‌টিজেও সেই একই কথাই বলে চলেছে। আড়াই-শোর ওপর সরকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা খাটছে সেখানে। দশ/বারোটা ছাড়া সবই যখন লুজিং কনসার্ন তখন অকারণে ওগুলোকে পোষা কেন? এই বই লেখার জন্যে যাঁদেরই আমি ইন্টারভিউ করেছি, তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই বলেছেন, যে সব জায়গায় এই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে, সে সব ছিলো জঙ্গল, অনুন্নত। লাইট, রাস্তা-ঘাট কিছুই ছিল না। যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাও ছিল না। এ সব গড়ে তুলে তবে পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হয়েছে। এইভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছে বলে, এগুলো অনুন্নত এলাকার 'গ্রোথ-সেন্টার' হয়ে উঠেছে। প্রায়শই আমরা বলে থাকি--এদেশের প্রাইভেট সেক্টরের হাতে দেশের উন্নয়ন ছেড়ে দিলে দেশ নাকি আরো অনেক বেশী এগিয়ে যেত। এরাই এখন প্রাইভেটাইজেশন্‌ ও লিবারেলাইজেশনের

দাবী জানিয়ে বড় বড় কথা ও সংবাদপত্রে আর্টিক্‌ল্‌ ছাপছেন। এই ষড়যন্ত্রে কয়েকজন মন্ত্রীও সামিল আছেন। প্রাইভেট সেক্টর কি এসব অনুন্নত জায়গায় গিয়ে স্টিল ফ্যাক্টরী গড়ে তুলত? নিজেদের স্বার্থ আর মুনাফা ছাড়া যারা কোন কালে দেশের কথা ভাবেনি,—তারা হঠাৎ কি করে এটা ভাববে। ম্যানেজমেন্টের আধুনিক রীতি-নীতি নিয়ে কত কথা হয়। একমাত্র টাটা ছাড়া অন্য কটা প্রাইভেট কোম্পানীকে তুমি দেখেছ কর্মীদের জন্যে টাউনশিপ গড়ে তুলতে? মুনাফা তো এরা প্রচুর করছে। কিন্তু কটা লোকাল লোককে চাকরী দিয়েছে? পঙ্গু, অক্ষম লোকেদের ঠাঁই হয়েছে কি কোথাও? বরং উল্টোটাই দেখবে। এরা অনেক শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে শুষে তাদের শেষ নির্যাসটুকু নিয়ে 'সিক্‌ ইউনিট' করে ছেড়েছে। সেগুলোকে এরা এখন সরকারের হাতে তুলে দেবার ফন্দি-ফিকির করছে। কর্মীদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে সরকার এইসব সিক্‌ ইউনিট নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এগুলো চলেনি কেন, কেন বন্ধ হয়ে গেল, কারা বা কোন নীতি এর জন্য দায়ী, এ নিয়ে কখনো কি কোন জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে? দুর্ভিক্ষের সময় এরাই আঙুল নাড়েনি। হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে লোক মারা গেছে। নিজেদের আয়াস, সুখ-সম্ভোগ কিন্তু এরা ছাড়েনি; দেশের এত বড় বেকার সমস্যা, সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। ফ্যাক্টরীর পর ফ্যাক্টরীকে শুষে নিঙড়ে নিয়ে বেকারী বাড়িয়ে তুলছে, সরকারকে বাধ্য করাচ্ছে সেই সব রুগ্ন সন্তানকে কোলে তুলে নিতে। কোন কিছু কোন দিন করেনি বলেই পাবলিক সেক্টরে একটা কিছু গণ্ডগোল হলেই এরাই সবচেয়ে হৈ চৈ তোলে।

সন্দীপ মাথা নাড়ে। বলে—সব মানলাম। তুমি যা বললে, অতো গভীরভাবে আমি অবশ্য কোনদিন তলিয়ে দেখিনি। তবে একটা কথা কিন্তু থেকেই যায়—বলছ, সরকার সবকিছু বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছে বা করছে। কিন্তু যতো বাধাই আসুক, তার জন্যে লড়ে যাব, এরকম কোন প্রচেষ্টাওতো দেখিনা। পার্টিশনের ধাক্কার পরেই নেহেরুর সোস্যালিজম-এর ফিলসফি পাল্টে গেল। তাঁর মত—প্রাইভেট সেক্টর, আছে, থাকুক; তার কাজ সে করুক। সরকারী ক্ষেত্রে আমরা শুধু মূল শিল্প-গুলো গড়ে তুলবো। এইভাবে সোস্যালিজমের মধ্যে প্রথম ভেজাল ঢুকলো পার্টিশনের চাপে। শিল্প গড়া হলো, কিন্তু তার জন্যে আলাদা কোন ইনফ্রা-স্ট্রাকচার বা 'ট্রেইণ্ড পিপ্‌ল' তৈরী করা হলো না। সেই ব্যুরোক্রেসি আর সেই মামা-চাচার দল দিয়েই যেটুকু যা গড়ে উঠেছে, তাকে যদি বিরাট একটা 'গ্রোথ' বলো, আমি বাধা দেব না। প্ল্যানিং-এর ইতিহাস আমি অতো জানি না, জানি না বলেই প্রাইভেট সেক্টর

কতটা করতে পেরেছে বা পারেনি তার হিসেব রাখা আমার সাধ্যের বাইরে। নেই বলেই আমি প্রাইভেট সেক্‌টরের পক্ষে। এর দুটো কারণ—[১] ওদের কল্যাণে টেলিভিশনে আজকাল সব খেলা বিশেষ করে সকার ওয়ার্ল্ড কাপ, প্রুডেন্সিয়াল বা রিলায়েন্স ক্রিকেট দেখবার সুযোগ পাই। আর [২] যতোই কন্‌জিউমারইজম্‌কে গালাগালি দাও, তার কল্যাণে যা চাই বাজার থেকে পছন্দ মতো জিনিস তা-ই কিনতে পারি। রাশিয়ার মতো 'সমাজবাদ' এদেশে এলে আমাদের মত লোকেদেরই সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হতো। জুতোর সোল্‌ নিতে তখন আমাদেরও দৌড়াদৌড়ি করতে হতো।

অলকা হাসে, বলে—তা হয়তো কিছুটা ঠিক। কিন্তু যা ঘটনা, তাকে বিকৃত করার শক্তি যাদের হাতে, তারা যে আজকাল শুধু অস্ত্রধারণ করে আছে তাই নয়, অস্ত্র নিক্ষেপ করতেও ওস্তাদ। জওহরলালের সোস্যা-লিজম্‌-এর মধ্যে তাই কম্প্রোমাইজ ঢুকেছিল। ১৯২৬ থেকে যখন তিনি বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে সমাজবাদের গুণগান করতে শুরু করলেন, তখন কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই তা পছন্দ করেনি। কংগ্রেসের মধ্যে অনেক নেতারই বিশ্বাস ছিল সমাজবাদ মানেই সাম্যবাদ। যেমন সিক্সটিজে কমিউনিজমের ভূত তাড়াতে আমেরিকা উঠে পড়ে লেগেছিল। কংগ্রেসের মধ্যে এই রাইটিস্ট গ্রুপ অতো শক্তিশালী না হলে জওহরলাল হয়তো আরো অনেক কিছু করতে পারতেন। ডেমোক্রেসির স্বার্থে অনেক কিছুর সঙ্গে তাঁকে আপোষ করতে হয়েছিল। তাই আমরা কুড়ি/পঁচিশ বছরের মধ্যে দেশের শিল্পভিত্তি গড়ে তুলতে পেরেছিলাম। আর এই কারণেই সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির নানা ষড়যন্ত্র ও ম্যানুভ্যারিং—যাকে আজকাল আমরা ডিস্ট্যা-বিলাইজেশন্‌ বলছি, তার দাপট—সহ্য করতে পারছি। এর মূলে কিন্তু আছে পাবলিক সেক্‌টর।

সন্দীপ জানতে চায়, এসব কথা বলার জন্যেই কি তুমি বই লিখবে?

অলকা একটু কাষ্ট হাসি হাসে। বলে—সে বই কেউ ছাপবে কিনা সন্দেহ। বুক ট্রেডটা এখনো কিন্তু কায়েমী-স্বার্থের হাতে। প্রয়োজন-বোধে বইটা নিজেই ছাপবো।

সন্দীপ সোচ্ছ্বাসে বলে ওঠে—আর সেই অসাধারণ বই আমি নিজে বগলদাবা করে ফিরি করে বেড়াবো। কেউ না কিনলেও নিজেই কিনে বলব, একশো কপি বই হট্‌ কেকের মত বিক্রি হয়ে গেছে।

—যারা বই কেনে বই পড়ে তার হিসাব নিলেই বুঝবে কেন সিরিয়াস্‌ বই বিক্রি হয় না। বিক্রি না হলে নিরাশ হবার কিছু নেই।

নিরুৎসাহ না হয়েই সন্দীপ বললো—সাকসেস্‌ হোক্‌ বা না-হোক্‌ তাকে তুমি পরোয়া কর না, এই ত। যা একদিন তোমার কাছেই শুনেছিলাম,

যদি অনুমতি কর ত সেটাই তোমাকে শোনাই। কালিদাসের যখন রমরমা অবস্থা, নাম-ধাম-ঐশ্বর্য ছড়িয়ে পড়ছে, চারিদিকে লোকজন-শিষ্যপোষ্য, তখন সমসাময়িককালের ‘উত্তররামচরিত’ রচয়িতা বিখ্যাত সংস্কৃত কবি ভবভূতির লেখা কেউ পড়ে না, কেউ তাঁর কাছে যায়ও না। ভবভূতি অতি দুঃখে বলেছিলেন--মানুষের মন যেদিন উন্নত হবে, যখন প্রজন্মের মানুষ গভীরতার মূল্য দিতে শিখবে, সেদিন সেইসব সুসভ্য মানুষই আমার বই পড়বে, তার আগে নয়।

অলকা খুশী হয়ে বলল--এবার দেখছি, তোমার মুখে কথা ফুটেছে।

--কেন, আগেরবার কি দেখেছিলে?

--তখন আমাকে খুব সমীহ করে চলতে।

--সমীহ না করে উপায় আছে। বিশেষ করে মেয়ে ডিগ্রিধারীদের। আমি এদের ভয় পাই।

--তাই নাকি? তাহলে আমার স্কোপ্ আছে বল।

--স্কোপ্? স্কোপ্ আগে কতটা ছিল জানি না, তবে ইদানীং খুব বেড়েছে।

--কার কার কাছে স্কোপ্ বাড়ল সেটাই চিন্তার কথা।

--যারা কথা দিয়ে লোক ভোলায়, তাদের ত দুশ্চিন্তা হতেই পারে। আবার তোমার বক্তৃতা শুনতে হবে? ভেবে সত্যিই আমার এবার দুশ্চিন্তা হচ্ছে।

--কেন?

--এতসব শুনে রীতিমত খিদে পেয়ে গেছে যে।

অলকার মুখখানা আলোকময় হল। বলল--চল, মা তখন থেকে ডাকছেন।

--একটু আগে ডাক দিলে আমার কষ্টের কিছুটা লাঘব হত।

--সেটা তোমার কপাল, কি করবে বল।

--বাস্তবিক কপালটা আমার চিরকালই বড় মন্দ। ওরা দু-জনে হাসতে হাসতে খাবার টেবিলে এগিয়ে যায়।

॥ দশ ॥

গণেশ টাওয়ার যেখানে উঠবে, সেখানে বাঘা-বাঘা চার-পাঁচজন আর্কি-টেক্ট। অন্য দিন তারা ছুটোছুটি করে কিনা সন্দেহ, কিন্তু আজ করছে।

পরাঞ্জপে আসবেন, সঙ্গে আসবেন সাহেব এক্সপার্টদের দল। এই জন্যেই ত এতো ছুটোছুটি। কাজ না করে যারা কাজ দেখাতে চায় তাদেরই মাতামাতি ও দাপাদাপি আজ বড্ড বেশী। আর্কিটেক্টরা আজ কন্ট্রাক্টরদের পুতুলনাচ নাচাচ্ছে। যতো তম্বি আজ আর্কিটেক্দের।

লাল পাগড়ি-পরা দু-জন সর্দার কন্ট্রাক্টর দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে। কারণ কি, বোঝা দায়। অন্য আর একজন মোটা ভুঁড়িওয়ালা কন্ট্রাক্টর হাত-পা নেড়ে খালি হাঁক-ডাক ছাড়ছে। কেন, সেই জানে। রোগা কন্ট্রাক্টর সাহেব হয় বিহারী, না-হয় রাজস্থানী। তার আবার কদমছাঁট চুল, এক মুখ দাড়ি, পরনে পরিষ্কার ধবধবে কাপড়, তার সঙ্গে মান্ধাতা আমলের একটা কোট। অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মনে হয় একেবারে বেসামাল, কোন কিছুরই খেয়াল নেই তার। শুধু ইশারা, ইশারাতেই কাজ সারছে। এতগুলো দুঁদে কন্ট্রাক্টরদের ছুটোছুটি ও হাঁক-ডাকেতে মেহনতি মানুষগুলোও যেন চনমনে হয়ে উঠেছে।

হাজারে হাজারে কুলি-মজুরনী কাজ করছে, আরও কত হাজার নেওয়া হবে কেউ জানে না। পলকা কাঠ যেভাবে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে, গণেশ টাওয়ারে লোকও সেরকম হুড়মুড় করে আসে। গ্রাম থেকে এক-একটা ঘাসের চাপড়ার মত যেন লোক উঠে আসছে। সরকারী রেট থেকে এখানকার মজুরী অনেক বেশী। শোনা যায়—বদরপুরের পাথর কুচি করার মিলগুলোতে আর লোক পাওয়া যাচ্ছে না। কথায় কথায় চালু হয়ে গেছে যে এখানে সব সাহেব, ইংল্যাণ্ড-আমেরিকা থেকে কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা আসছে, যত পারিস হাঁকবি। টাকার গরমে এরা দিলদরাজ; কল্পতরুর মত মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে।

সারা দেশেই গণেশ টাওয়ারের কর্মকর্তাদের কথা ছড়িয়ে পড়েছে। কেরল, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার থেকে দলে দলে মজুররা আসছে; তল্পিতল্পা নিয়ে সোজা রামলীলা গ্রাউণ্ডে হাজিরা দিচ্ছে। মজুরনীরা রঙ্চঙে কাপড়-চোপড় পরে হাসি হাসি মুখে আসছে; কাজ পাবে কি পাবে না, তার ঠিক নেই।

আগে থেকে হাসি ছড়ালে কন্ট্রাক্টরদের নজরে পড়া যায়। টাকার মায়া এত যে বউয়েরা, বাচ্চাদের এক জায়গায় বসিয়ে রেখে লাইনে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। বাচ্চারা সুর তুলে কাঁদছে। সেদিকে কারুর কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। কে কার বাচ্চা, কেন কাঁদছে, কি তাদের দরকার, সেসব দেখার কেউ নেই। একটা রুগ্ন লোক বাচ্চাগুলোকে শান্ত করার বৃথা চেষ্টা করছে; খানিকটা গুড়, নয়ত বা এক আধটা লজেন্স, মাঝে মধ্যে একটু জল দিয়ে লোকটা এদের ভোলাতে চাইছে। সুডোল, সুগঠনা মজুরনীদের মধ্যে রীতিমত কম্পিটিশন্ লেগে গেছে। খয়া, রুগ্ন মজুরনীদের

চোখে মুখে আশঙ্কার ছায়া। মজুররা তাদের খুব উৎসাহ দিচ্ছে, এখানে একবার লেগে গেলে, বেশ কিছুদিন আর নতুন কাজের দরকার হবে না। দিব্যি দিন গুজরান্ হবে, সেটা কি কম কথা! রামলীলা ময়দানে এদের মধ্যে মারামারি, কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে।. ঠিক যেমন যুদ্ধের দিনে কাজের লোকেদের নানা সুবিধে আর অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভিড় বাড়ানো হত, আড়কাঠিরা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে লোক ধরে আনত, তেমনি এখানেও লোক ধরে আনার আড়কাঠিদের অভাব নেই। আড়কাঠিরা সর্দারদের সঙ্গে ইশারায়-ইঙ্গিতে ফিসফাস কিসব কথা কইছে; মাঝে মাঝে মজুরদের কাছে এসে লাইন দিতে বলছে। লাইনে দাঁড়ালেই কিছু না কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, গণেশ জেগেছেন, কেউ আর অভুক্ত থাকবে না। লাল পাগড়ী-পরা দু-জন সর্দার, মজুর-মজুরনীদের লাইন ঘুরে ঘুরে দেখছে, দু-একজনকে লাইন থেকে বেড়িয়ে আসতে বলে। বুঝি বা ভাগ্য খুলল, পরের দিন থেকে হয়ত কাজে লেগে যেতে হবে। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ভাগ্য অনিশ্চিত মজুর-মজুরনীদের দিকে তারা বিজয়গর্বে তাকায়।

পরাঞ্জপের হুকুম, গণেশ টাওয়ারের আদর্শ ঃ দল নিরপেক্ষ সব রাজ্যের লোকেদেরই এখানে কাজ পাবার সমান অধিকার। শুধু কাজ বুঝে রেট্। রাজমিস্ত্রিদের লাইন আলাদা, তারা কোথা থেকে আসছে সেই বুঝে তাদের টাকা রফা হবে। পরাঞ্জপে যদিও মুখ ফুটে কিছু বলেননি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রের লোকেরাই একটু যেন বেশী সুযোগ পাচ্ছে; জয়পুর-যোধপুরের সার্টিফিকেট দেখাতে পারলে দেড় গুণ রেট্; ১৯২৪ থেকে ৩৪ সালের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভাইসরয় হাউস, নর্থ ব্লক, সাউথ ব্লক ও আরও অনেক ম্যাসিভ বিল্ডিং বানিয়েছিল; বেশীর ভাগই ছিল রাজ-স্থানের হিণ্ডোল ও করৌলীর লোক। সূক্ষ্ম কাজে এরা ওস্তাদ কারিগর। রাজস্থানের স্যাণ্ডস্টোনের কাজে এদের হাত পাকা, বিচিত্র দক্ষতা দেখাতে পারে। তামিলনাড়ু ও কর্নাটকের কারিগররাও রাজস্থানীদের কাছাকাছি রেট্ পাচ্ছে। সাহেবরা এদের কাজের খুব প্রশংসা করেছেন। রাজমিস্ত্রিদের মধ্যে যারা সর্দার, বেশীর ভাগই তারা বিদেশ ফেরত।

দিল্লীর কন্ট্রাক্টরদের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়েছে, ঝগড়াও বেধে গেছে। রামলীলা ময়দানে গেলে তা টের পাওয়া যায়। শহরের আশেপাশে যে সব বাড়ী উঠছে, সেখানে নাকি মজুর-মজুরনী ও মিস্ত্রিদের বেশ অভাব দেখা দিয়েছে। সবাইয়ের এক কথা, গণেশ টাওয়ারে যাব বাবু। সেখানে কাজ না জুটলে এসে যাব। আসতে আসতে এগারোটা হয়ে যাবে। এও তো ভারি জুলুম, রেট্ চাইবে বেশী আবার কাজের বেলায়ও দেরী! মামার বাড়ীর আবদার নাকি? গণেশ টাওয়ার কর্ম-

কর্তাদের সবাই গালাগালি দেয়। মজুরদের রেট্ খামোখা বাড়িয়ে দিচ্ছে, যত সব বিকিয়ে যাওয়া সি. আই. এ.-র দল। বেআদব কোথাকার।

গণেশ টাওয়ার শেষ পর্যন্ত কি রকম কি দাঁড়াবে তা কারুর কাছে এখনও স্পষ্ট নয়। আর্কিটেক্টরা নতুন নতুন ব্লু-প্রিন্ট নিয়ে ছুটোছুটি করছেন। পরাঞ্জপে কাউকেই নিরাশ করেন না। সবার ব্লু-প্রিন্টই তাঁর সুবৃহৎ ড্রয়ারে গোঁজা থাকে। কেউ কেউ এ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে পরাঞ্জপের পেছনে ঘোরাঘুরি করেন। ভাগ্যে থাকলে তাঁকে ধরতে পারেন, নতুবা নয়। আজ যাচ্ছেন জয়পুরের কাছে হিণ্ডোলে ও করৌলীতে স্যাণ্ডস্টোন দেখতে ; কালকে যাবেন সাহেবদের সঙ্গে মীনাক্ষী মন্দির হয়ে রামেশ্বরমের পথে। তাই অপেক্ষা করতে হয়। এদের মধ্যে আরেক অশান্তি দেখা দেয়। জানা যায় সাহেবদের তত্ত্বাবধানে দু-চারজন আর্কিটেক্টও নাকি কাজ করছেন। গুজব, তাঁদের ব্লু-প্রিন্টগুলোর মত ইনাকি কাজ হচ্ছে। তাহলে অন্যদের ব্লু-প্রিন্টই বা পরাঞ্জপে কি কাজে লাগাবেন ? এ প্রশ্নের উত্তর তারা খুঁজে পায় না। মনে নানা অশান্তি দানা বাঁধছে। কিন্তু কোন আর্কিটেক্টরেরই কিছু বলার নেই ; প্রতিবাদ করারও কিছু নেই। কেননা, যার-যা প্রাপ্য ঠিক সময় মত সবাই পেয়ে যাচ্ছে। ও-ব্যাপারে পরাঞ্জপে মুক্ত হস্ত। কোন অভিযোগ তোলার সুযোগ দেন না। ব্লু-প্রিন্ট কাজে লাগাবো কি লাগাবো না সেটা আমার ব্যাপার, তাতে তোমাদের কি ? পয়সা তো পেয়ে গেছ। ব্যস।

আইফেল্ টাওয়ারের মত কি গণেশ টাওয়ার উঁচু হবে, না, স্ট্যাচু অব লিবার্টি'র মত ? এক একজন আর্কিটেক্ট এক এক রকম বুঝে কাজ করছে, শেষ পর্যন্ত কি শেপ্ নেবে, তা পরাঞ্জপে ছাড়া কেউ জানে না। লোহা কিংবা পাথরের যেন কমতি না পড়ে। টাওয়ারটা পাথরের হলে, স্যাণ্ড-স্টোনে হবে, না গ্রানাইটে, না ব্যাসাল্টে সে-সব কথা তোমাদের জেনে কি লাভ ? তোমরা সেগুলো আনাতে চাও, আনাও, বাধা দিচ্ছে কে ? টাকাটা লাগবে ত, দেবে গৌরীসেন। গ্রানাইট্ থেকে শুরু করে স্যাণ্ডস্টোন, ব্যাসাল্ট সারা ভারতের সব পাথর নানান দিক থেকে রামলীলা গ্রাউণ্ডে এসে জমা হতে লাগল। দূর-দূরান্তর থেকে পাথর আসছে ট্রাকে, যেসব পাথর সাহেবরা বেছে এসেছেন, সেগুলো আসছে হেলিকপ্টারে, বুকে লেবেল আঁটা—'রেয়ার কোয়ালিটি অব গ্রানাইট্ এ্যাণ্ড স্যাণ্ডস্টোন—হ্যাণ্ডেল উইথ কেয়ার।' লোহা, চুন, সুরকি, ইঁট-কাঠ, পাথরকুচিতে রামলীলা ময়দান ভরে গেছে। আসার আর বিরাম নেই ; স্রোতে সব ভেসে আসছে অদৃশ্য কার এক ইঙ্গিতে।

আর্কিটেক্টদের মধ্যে পুলকেশ গোস্বামীর একটু বেশী কদর। বেশী বিদ্বান বলেই বোধ হয়। পরাঞ্জপের মনে হয়, ওর বিচারধারা লেফ্ট্

ঘেঁষা, ঘোর মার্কসিস্ট কিনা তা তিনি এখনও ঠিক ধরতে পারেন নি। যে আত্মবিশ্বাস নিয়ে পুলকেশ কথা বলে, অনেক কথা মনঃপুত না হলেও পরাঞ্জপে ওকেই বেশী ডাকেন। পুলকেশ দেশী আর্কিটেক্টদের দিয়ে যেমন কাজ করাচ্ছে, তেমনি সাহেবদের যে কজন বিশিষ্ট দেশী-বিদেশী আর্কিটেক্ট একাজে বহাল হয়েছে তাদের কোঅর্ডিনেট্ করছে। সেদিন পুলকেশ পুরন্দরে সাহেবকে বুঝিয়েছিল—গণেশ টাওয়ারের ফ্যাস্যড্টা পাথরের না হলে খোলতাই হবে না। তারপর থেকেই নানা রকম পাথর আসা শুরু হয়েছে। পুলকেশ বলেছিল--পরাঞ্জপে সাহেব, এমন একটা কিছু করে যান, যা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। পরাঞ্জপে খুশি হয়ে মাথা নেড়েছিলেন। ঐতিহাসিক কিছু করার জন্যেই ত তিনি কোন কিছুরই ত কার্পণ্য করছেন না। পুলকেশ এও বুঝিয়েছে যে আপনি যদি মাইকেল এঞ্জেলোর স্কাল্পচার দেখেন, তবে বুঝবেন, ফিউডাল লর্ড বলতে তখন সেই ধর্ম, চার্চ আর পোপকেই বোঝাত। তাঁদের হুইমস্ও কিছু কম ছিল না। তাঁদের নির্দ্দেশে মাইকেল এঞ্জেলোর ক্রিয়েটিভিটির অনেক ক্ষতি হয়েছিল। তবুও মাইকেল এঞ্জেলো জানতেন, স্কাল্পচার ইজ এ লিভিং থিং। কোন্ পাথরে কোন্ কাজ করলে লাইট এ্যাণ্ড শেড বেশী খেলা করে, তা তিনি বুঝতেন। মিঃ পুরন্দরে, আপনিও এ নিয়ে একটু ভাবুন, লাইট এ্যাণ্ড শেডের ওপরেই দুনিয়ার যত স্কাল্পচার, যত কীর্তি, যত টাওয়ার, যত সৃষ্টি, সব দাঁড়িয়ে আছে। গ্রানাইট্ হলেই, আমার বিশ্বাস, আলো-ছায়া ভাল খেলবে। দিল্লীতে ছ-মাসের বেশী রোদ্দুর, এটা বলেছেন মলিয়ের নিজেই। পরাঞ্জপে শুনে ঘাড় নাড়েন। অমনি সব রকম গ্রানাইট্ পাথর আনা শুরু হয়ে গেল। বর্তমানে পাথর দিয়ে কিছু করার মানেই হয় না। এখন স্কাইস্ক্র্যাপারের যুগ। তবে আবার পাথর কেন? পাথর ত ফিউডালিজিমের সিম্বল। এখন ভারতে সবে ক্যাপিটল ফর-মেশন শুরু হয়েছে। রাজা, হাতী আর ঐ জগদ্দল পাথর তবে কেন? এটার মানে রিভার্স গিয়ারে চলা নয় কি। আপনি ভারতীয় ঐতিহ্যে বিশ্বাসী, ওসব কথায় আপনি না-হয় কান নাই দিলেন। গণেশ টাওয়ার পাথরের হলেও তার মধ্যে গতি ও প্রাণ ফুটিয়ে তুলতে হবে। এক কথায় যাকে বলে মাইকেল এঞ্জেলো টাচ্। সেরকম লোকবলও চাই। জনবল চাই। সবার আগে চাই আপনাদের মত প্রোগ্রেসিভ্ ইনটেলেকচ্যুয়ালদের সমর্থন। পরাঞ্জপে মাথা নাড়েন। আসলে মিঃ পরাঞ্জপে সর্বক্ষেত্রে, বিশেষ করে আর্টের ক্ষেত্রে অ্যাটিটিউডই বড় কথা। এই অ্যাটিটিউড সম্পর্কেই ডি. ডি. কোশাম্বীর সত্য উক্তিটা মনে করুন। যে-টাকা লাটিন আমেরিকায় যায়, সেটা ফিউডাল ফর্ম নেয়; সেই একই টাকা যখন লণ্ডনে যায়, সেটা হয় ক্যাপিটল। টাকাকে ক্যাপিটল করার ক্ষমতা রাখে এমন সব মহা-

রথীরা এখানে এসেছেন। কিন্তু রাশিয়াকে আপনি কি কারণে বাদ দিলেন, আমি জানি না। এ ব্যাপারে আপনার হয়ত বুঝতে একটু ভুল হয়েছে। তবু যাঁরা এসেছেন, তাঁদের পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে এমন কিছু আপনি করে যান যাতে গণেশ টাওয়ার ফাউণ্ডেশন আধুনিক ভারতের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ হয়ে ওঠে।

পরাঞ্জপে কথাটা শুনে আগের মত আর মাথা নাড়লেন না। পুলকেশ ধরে নিল—রাশিয়ান কোন এক্সপার্ট কেন আসেননি, তাতে সত্যিই কোন ক্ষতি হবে কি-না—তা নিয়েই পরাঞ্জপে হয়তো তখনো ভাবছিলেন। তাই তিনি রিঅ্যাক্ট করলেন না। ড্রয়ার খুলে একটা ভিডিও টেপ ও ব্লু-প্রিন্ট পুলকেশের হাতে ধরিয়ে দিলেন। পুলকেশ বুঝতে পারলো এটা রাম দেওধরের আঁকা গণেশ আর ইঁদুর। আর নানান ভঙ্গীতে তোলা গণেশ ও ইঁদুরের ভিডিও টেপ। পরাঞ্জপের আদেশ দেবার ধরনও অদ্ভুত। ওগুলো হাতে ধরিয়ে দেওয়ার অর্থ, গণেশ ও ইঁদুরের ভিডিও ছবি দেখে পুলকেশ যেন সেগুলো লোক দিয়ে পাথরের ওপর খোদাই করার ব্যবস্থা করে। চন্দ্রভানু ভর্মার তৈরী প্রশান্ত গণেশের তবে কি কোন ছবি তোলা হয়নি? সাহেবরা ত সেটাও দেখেছেন। ঐ মডেলটা না নেওয়া হলে চন্দ্রভানু কি রেগে যাবেন না? দেওধর সাহেবদের খুশী করেছে বলেই কি তার মডেলটা নেওয়া হচ্ছে?

পুলকেশ নানা লোককে দিয়ে গণেশ আর ইঁদুরের নানা ভঙ্গীর অভিব্যক্তি পাথরের ওপর খোদাই করাচ্ছে। অসংখ্য গণেশ আর অসংখ্য ইঁদুর, রূপ নিয়ে অপরূপ হয়ে উঠছে। লোকগুলো ঠুক্‌ঠাক্ করে অনবরত কাজ করে যাচ্ছে, অবিরাম, অফুরন্ত সে প্রয়াস। এগুলোর কতটা যে কাজে লাগবে, সেটা অবশ্য পরাঞ্জপে ছাড়া কেউ জানেন না; কারুর কোন প্রশ্ন করার অধিকার নেই, যতক্ষণ না তিনি নিজে কোন প্রশ্ন করেন।

আজ এত হাঁক-ডাক, আর এত ব্যস্ততা, এই কারণেই। পরাঞ্জপে এসে হয়তো সবার কাছে এক সঙ্গে হিসেব চাইবেন—কার কাজ কতটা এগিয়েছে। তিনি হয়তো ওদিক দিয়েই যাবেন না। ওটা ওঁর মর্জি। তার জন্যে প্রস্তুত থাকাই নিরাপদ। সবাই নিরাপদ থাকতে চায়। ফাঁকি-বাজ আর্কিটেক্টরাও তাই যে-যার নিজের মত তর্জন-গর্জন শুরু করে দিল—মাথা ঝাঁকিয়ে আর আস্ফালন করে গণেশ টাওয়ারের আশেপাশে। মজুর-মজুরনীদের মধ্যে রীতিমত ভূ-কম্পন ধরিয়ে দিয়েছে। না-বুঝে মাথা ঝাঁকানোর চোটে রাজমিস্ত্রিরাও ভয় পেয়ে হুলুস্থুল শুরু করল। সবেতেই মাথা নেড়ে সায় দিতে থাকে। যত দোষ, নন্দ ঘোষ ঐ মেহনতী মানুষগুলোর। মজুর-মজুরনীরা 'কসুরটা' যে ঠিক কোথায় হয়েছে, বুঝতে না-পেরে কাজ থামিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কেউ বা নিরাপদ

দূরত্বে কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। কিসের জন্যে এত বকাঝকা, কেউ জানে না। যে বকছে তারও বুক কাঁপছে, যাকে বকছে তারও সেই একই দশা।

এই রকম ছুটোছুটি ও ভূ-কম্পনের মধ্যে পরাঞ্জপে সাহেবদের নিয়ে ঢুকলেন। সঙ্গে আছেন সাহেবদের সঙ্গে যেসব আর্কিটেক্ট কাজ করছেন তাঁরা, তাছাড়া--পুলকেশ গোস্বামী, রাম দেওধর ও চন্দ্রভানু ভর্মা ত আছেনই। মিটিং-এর জায়গাটায় বেশী ছুটোছুটি। কেউ-ই ঠিক জানে না, কটা চেয়ার-টেবিল লাগবে, কটা মাইক, কত বিস্কুট, কত কাপ চা-কফি, ক্রিমকেকার কতগুলো, কত ব্লু-প্রিন্ট, কত ভিডিও, কাদের ভিডিও আর কোন্ কোন্ কাজের মডেল। পরাঞ্জপেকে দেখে যে-যার দাঁড়িয়ে পড়ল; ভেতরে ভেতরে তারা কাঁপছিল কি-না বাইরে থেকে তা ঠিক বোঝা গেল না। পরাঞ্জপের উপস্থিতির একটা আতঙ্কিত ছায়া সবার চোখে-মুখে।

পরাঞ্জপেকে দেখে অনেকে আশ্বস্তও হলেন, তাঁর হাসি হাসি মুখ দেখে সবাই ভাবে সাহেবের মেজাজ তা'লে আজ শরিফ। মজুর-মজুরনী, কন্ট্রাক্টর রাজমিস্ত্রির দল, যে-যেখানে ছিল, মৌন-মিছিলের মত একসঙ্গে দাঁড়িয়ে সেলাম করল। পরাঞ্জপেও খুশী মেজাজে 'জয় গণেশ' বলে প্রতি-নমস্কার করলেন। যারা 'জয় রাম' বলে ফেলেছিল, তারা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলে উঠল--জয় রামজী কী, জয় গণেশজী কী জয়। আর্কি-টেক্টদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব পড়ল পুলকেশের। সবাইকে সে এক ডাকে চেনে। নাম ধরেই আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এত আর্কিটেক্ট, এত কন্ট্রাক্টর, এত রাজমিস্ত্রি কি কাজ করছে এ প্রশ্ন যাতে কেউ, বিশেষ করে সাহেবরা না করে, তার জন্যেই পরাঞ্জপে আগে-ভাগেই বলে দিলেন--এঁরা অনেকেই অ-নে-ক কিছু করছেন, তবে কে কি করছেন, তার এখনও হিসাব মেলাবার সময় আসেনি। তাঁর কথা শুনে কেউই আর ও নিয়ে মাথা ঘামালো না, বরঞ্চ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। অনেকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, ভাবে আপাতত কিছুদিনের জন্যে ফাঁড়া কাটল।

সুসজ্জিত সামিয়ানার নীচে এক্সপার্টদের নিয়ে এসে পরাঞ্জপে বসালেন। দৃপ্ত কন্ঠে বলতে শুরু করলেন--এদেশে চাকরীর বড় অভাব। কালচার করতে নেমে আমরা যদি ম্যান-ডেস্ জেনারেট করতে না পারি ত অন্যায় করা হবে। এই রকম অনুদার মন নিয়ে আর যাই হোক গণেশ টাওয়ার গড়া যায় না। ম্যান-ডেস্ জেনারেট করার ব্যাপারে ওপর মহলেও আমি কথা বলেছি। আজ তাই দেখছেন এখানে এত লোক কাজ করছে। এতে অযথা ও'রিড হবেন না।

রাম দেওধর মলিয়েরের পাশে বসে মন দিয়ে সব শুনছিলেন। চন্দ্রভানু অ্যাসকারীর পাশে। পুলকেশ বাকী সবাইকে নিয়ে বসে আছে। কোন কিছুর প্রয়োজন হলেই পুলকেশের ডাক পড়ে। 'এক্সকিউজ্ মী' বলে উঠে গিয়ে পরাঞ্জপে যা চাইছেন, হাতের কাছে তা এগিয়ে দেয়।

একটা ব্লু-প্রিন্ট খুলে পরাঞ্জপে বেশ একটু পুলকিত হয়েই বললেন-- আমাকে অনেকে অনেক আইডিয়া দিয়েছে। আমার বলতে দ্বিধা নেই যে আপনাদেরটাই আমার সবচেয়ে বেশী পছন্দ হয়েছে। আপনাদের প্ল্যানটা সহজ কথায় বলি, লে-ম্যানের ভাধায়। আমার বুঝতে কোথাও ভুল হয়ে থাকলে, শুধরে দিতে এতটুকু দ্বিধা করবেন না। এই ব্লু-প্রিন্ট হিসেবে গণেশ টাওয়ার হবে। দুর্গের মধ্যে দুর্গ, ফোর্ট উইদীন এ ফোর্ট। গোলার্ধ বিরাট একটা জায়গা। বাইরের গেট দিয়ে গোলার্ধ দুর্গের মধ্যে ঢুকতে হবে। চারপাশে তার নানা আকারের বিল্ডিং। সবটাই পাথরের স্ল্যাব দিয়ে তৈরী। সর্বত্রই পাথরের গায়ে গণেশ আর ইঁদুরের খোদাই করা সব প্রতিকৃতি। এক্সেলেন্ট আইডিয়া, যে বিল্ডিংগুলো এখন উঠছে, ভেরী গুড্। এখানে থাকছে এডমিনিস্ট্রেশনের অফিস, লাইব্রেরী, অডিটরিয়াম আর মিউজিয়াম। যারা অফিস ঘর চাইবে তাদের জন্যে নানা সাইজের নানা আকারের নানা কক্ষ। ভেতরে, মানে মাঝখানে অর্থাৎ সেন্টারে যে দুর্গটা থাকছে সেটাই 'গণেশ টাওয়ার'। উত্তম প্রস্তাব। ভেতরের দুর্গের মধ্যেও বিল্ডিং হবে। সব পাথরের। 'গণেশ টাওয়ার' কিসের হবে! পাথর, না কন্‌ক্রিট। এখনও ইনডিসিসীভ। সেসব নিয়ে আপনারা এখনও ভাবছেন, ভাবুন, খুব ভাবুন, ভেবেই বলুন। কিন্তু আমি যে কথা জানতে আজ আপনাদের সবাইকে ডেকেছি সংক্ষেপে সেটা আগে বলে নিই। তেইশ তলার যে নৃত্যরত গণেশ বাইরে থেকে সবাই দেখবে তার ভেতরে কিন্তু থাকবে নানা বিভাগীয় অফিস। আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি আমার ভুল হলে শুধরে দেবেন। গণেশের শ্রীচরণের নীচে দিয়ে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা করবেন। ওঁ গণেশায় নমঃ। ভেতরে যে অত সব থাকবে বাইরে থেকে কিন্তু তা বোঝা যাবে না। ঠিক কনসীল্ড ওয়্যারীংএর মত, তাই না? 'জয় গণেশের জয়' বিড় বিড় করে আউড়ে নেন।

একটু দম নিয়ে হেসে পরাঞ্জপে বললেন-- এটা কী ফিজবল্ হবে?

স্যর উইলিয়ম জোনস্ বললেন--ভীষণ জটিল টেক্‌নিক্যাল ব্যাপার, সন্দেহ নেই। তবে মনে হয় ইট্ মে বী ফিজবল্।

কিসিঞ্জার বললেন--সবার প্রথমে আমাদের দেখতে হবে দিল্লী কোন্ সিস্‌মোলজিক্যাল জোনে পড়ে। সারা ভারতবর্ষ পাঁচটি জোনে বিভক্ত; দিল্লী থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত চার নম্বর জোন, রিক্‌টার স্কেলে

যার পরিমাপ ৭·৫। আসাম সমেত গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতের জোন পাঁচ, রিক্‌টার স্কেলে যার পরিমাপ ৮·৫। দিল্লী ভূ-কম্পন জোনে পড়লেও ফাউণ্ডেশন যদি জোরাল হয় ড্যানসিং গণেশের ভেতরে বিল্ডিং করার সেরকম বাধা নেই বলেই মনে হয়। আসাম হলে হয়ত এটা সম্ভব হত না। জুলাই মাসে এখানে বৃষ্টি পড়ে ৮ থেকে ৯ ইঞ্চির মত। জুন থেকে সেপ্টেম্বরের বৃষ্টির গড়পড়তা হিসেব করলে দাঁড়ায় ১৬-১৭ ইঞ্চি। ওটা গণেশ টাওয়ারের পক্ষে এমন কিছু বেশী নয়। উইণ্ড ফোর্স এই এলাকায় জুন মাসেই সবচেয়ে বেশী--প্রতি ঘন্টায় গড়পড়তায় প্রায় ১৪ কিলোমিটার। যাই হোক এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে এসব বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার প্রয়োজন।

এবার মলিয়ের বললেন--এখন সবচেয়ে বড় প্রবলেম্ দেখা দিয়েছে এই যে নৃত্যরত গণেশের মধ্যে বিল্ডিং করতে হলে পোজ শাফ্‌ট্‌-এর দরকার। আমরা ত কোন সোজাসুজি শাফ্‌ট্ পাচ্ছি না। গণেশ যদি সোজা দাঁড়িয়ে থাকতেন, তাহলে নীচে থেকে উপর পর্যন্ত গণেশের স্পাইন বরাবর একটা শাফ্‌ট্ আমরা বার করে নিতে পারতাম। এন্‌ট্রান্সটা মনে হচ্ছে আমাদের পায়ের তলা দিয়েই বার করতে হবে।

অ্যাসকারী বললেন--বিল্ডিং করতে হলে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা শাফ্‌ট্ চাই-ই। নৃত্যরত গণেশের ভঙ্গী সাধারণ দাঁড়িয়ে থাকা ভঙ্গীর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর। সেটাই ত সবচেয়ে বড় প্রবলেম্। গণেশ ড্যানসিং পোজে দাঁড়িয়ে থাকলে পা দুটো বাঁকানো পাচ্ছি, বাঁকানো পা দিয়ে শাফ্‌ট্ পাওয়া মুশকিল। অন্য কোন উপায় ভাবতে হবে। ওদিকে আবার তেইশ-তলা বিল্ডিং। এ:ে উঠতে গেলে লিফ্‌ট্ চাই, সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে ওঠা সম্ভব নয়।

মলিয়ের বললেন--একটা কাজ করা যেতে পারে। গণেশের কোমর পর্যন্ত যদি একটা এক্সকালেটর বসান যায়, যার চারদিকে গাইড রেইল থাকবে, তাতে সমস্যার সমাধান হতে পারে। কোমর থেকে গণেশের সোজা স্পাইন পাচ্ছি ; সেখান থেকে শাফ্‌ট্ পেয়ে যাচ্ছি।

কিসিঞ্জার বললেন--আজকাল কোন বড় বিল্ডিং করার আগে আমেরিকায় ভূ-কম্পনের জোন আর উইণ্ড ফোর্স-ই সবচেয়ে আগে দেখা হয়। এখানে ঝড় কিম্বা সাইক্লোন যখন হয় তখন উইণ্ড স্পীড কত, তার গত দশ বছরের স্ট্যাটিস্‌টিকস দেখতে হবে।

পুলকেশ এটা নোট করে নেয়। কাউকে দিয়ে কাজটা করাতে হবে।

পরাঞ্জপে খুব উৎসাহ দেখান। ড্যানসিং গণেশের মধ্যে বিল্ডিং হতে পারবে কি না, এ নিয়ে অনেক আলোচনা অনেক তর্কবিতর্ক এর আগে হয়ে গেছে। আরও যে কতবার হবে, তা ঠিক বোঝা যায় না। বিদেশীদের

এ ব্যাপারে চিন্তা করতে বলা হয়েছিল, তাঁরা থরো না হয়ে কিছুই মন্তব্য করেন না। আজই প্রথম জানালেন যে এটা সম্ভব। সত্যিই এটা একটা অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হবে। ভারতবর্ষের মধ্যে আরও একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠবে। পরাঞ্জপে আলোচনা শুনে গেলেন, কিন্তু কোন মন্তব্য করলেন না। তাঁকে বোঝাতেই সবাই এত বিস্তারিত আলোচনা করে যাচ্ছেন।

স্যর উইলিয়ম জোনস্ এবার বললেন--গণেশ টাওয়ারের কতটা ওজন, তার ওপরেই নির্ভর করবে তার ব্যালেন্স ও স্ট্যাবিলিটি। এটা সবচেয়ে ইম্পরট্যান্ট্। দ্য সেন্টার অব ম্যাস মাস্ট কয়েনসাইড্ উইথ দ্য সেন্টার অব ওয়েট।

শুনে কিসিঞ্জার বললেন--গণেশ টাওয়ারের গোটা বিল্ডিংটা নিশ্চয় চাইবেন এয়ারকনডিশনড্ হোক, সেটা কোন প্রবলেমই নয়, আজকাল এসব জিনিস কমপিউটারে কনট্রোল করাই ভাল।

স্যর জোনস্ জিজ্ঞাসা করেন--ইলেক্ট্রিসিটি ফেইল করলে কি অলটার-নেটিভ ব্যবস্থা থাকবে, তাও এখন থেকেই ভাবা দরকার। এখানে ত আজকাল লোডশেডিংটা বেড়ে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে পাওয়ার ক্রাইসিস্ কিছু বিচিত্র নয়।

অ্যাসকারী উৎকন্ঠা প্রকাশ করেন--পাওয়ার ফেইল করলে বাইরের হাওয়া চাই, সেটার কি ব্যবস্থা হবে?

মলিয়ের বললেন--আমি কদিন ধরে এই সমস্যাটা নিয়ে ভাবছি। গণেশের চোখ দুটো দিয়ে বাইরের হাওয়া টেনে আনা পসিবল।

অ্যাসকারী লাফ দিয়ে ওঠেন--আমিও ঠিক এই কথা ভাবছিলাম। আরও প্রশস্ত জায়গা আছে। গণেশের শুঁড় কিংবা গণেশের চার হাত--এর ভেতর দিয়ে ফোরসিবলী হাওয়া টেনে আনা সম্ভব। আইডিয়াটা যত সহজে বলছি, অত সহজে কিন্তু ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি। চন্দ্রভানু ভর্মার একটা স্বপ্নের কথা শুনে গোটা আইডিয়াটা পেয়েছি।

সবার নজর একসঙ্গে গিয়ে পড়ল শান্তশিষ্ট চুপচাপ ঐ মানুষটির ওপর। তিনি এতক্ষণ সব কথাই নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিলেন। অ্যাসকারী উৎসাহ দিয়ে বললেন--বলুন না, আপনার সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথাটা।

অ্যাসকারী একদিন সমস্যাটাকে নিয়ে যখন চন্দ্রভানুর সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করছিলেন, তখন চন্দ্রভানু তাঁর স্বপ্নটার কথা বলেছিলেন। কিন্তু দশজনের সামনে অ্যাসকারী এভাবে ব্যাপারটা ফাঁস করে দেবেন তা তিনি কখনও ভাবেননি।

পরাঞ্জপে একটু জোর দিয়েই বললেন-- স্বপ্নের কথাটা বলেই ফেলুন না শুনি।

চন্দ্রভানু অনেকটা বাধ্য হয়েই বললেন—এই স্বপ্নের সাইকোলজিক্যাল ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায় যে মডেলটা তৈরী করতে করতে গণেশের প্রশান্ত মুখখানাই হয়ত চিন্তা করছিলাম। দেখলাম, একটা মন্দিরে গিয়েছি। ভীষণ ভিড়। সবাই পুজো দিচ্ছে। পুজো দেবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। হঠাৎ গণেশজী পিট্‌পিট্‌ করে তাকিয়ে, অ্যানটেনার মত অত বড় কান দুটোকে নাড়িয়ে আমাকে কাছে ডাকলেন, আমি ভিড় ঠেলে সামনে যেতে পারলাম না, অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। সেটা তিনি লক্ষ্য করেই হঠাৎ শুঁড়টা দিয়ে একটা বড় মালা তুলে আমার গলায় পরিয়ে দিলেন। এটা বলতেই মিঃ অ্যাসকারী চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলেন— 'ইউরেকা , ইউরেকা'। পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি। গণেশের শুঁড়ের মধ্য দিয়েই বাইরের হাওয়া আসতে পারে, দ্যাটস্‌ দ্য আইডিয়াল প্লেস।

মলিয়ের একটু আক্ষেপ করে বললেন—গণেশের অতবড় কান দুটোর কথা মনে পড়েনি, আশ্চর্য! ওটাও ত প্রশস্ত জায়গা যেখান দিয়ে বাইরের হাওয়া টেনে আনা সম্ভব। আর এগুলোর ভেতর দিয়ে বাইরে থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড টেনে এনে কমপিউটারের সাহায্যে আগুন নেভাবার ব্যবস্থা। কমপিউটারের এই বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে মিঃ পরাঞ্জপের ঘরে, গণেশের শীর্ষস্থানে। যেখানে শুধু থাকবে একটি অফিস, লেখা থাকবে, প্রবেশ নিষেধ। পরাঞ্জপে সায় দিয়ে বলেন—গণেশের শীর্ষদেশে অন্য কারুর কিন্তু ওঠা বারণ। ওটা হবে পলিসি নির্ধারণ করার অফিস। শুধু দু-একজন ছাড়া কারুর ওঘরে যাবার অধিকার থাকবে না, আমাদের বিশ্বাস, গণেশের শীর্ষদেশে আছে জ্ঞানালোক, সেখানে যে-কেউ যেতে পারে না, গেলে গণেশ রাগ ক বন, বলেই তিনি একটু হাসলেন।

কিসিঞ্জার বুঝিয়ে বললেন—পাওয়ার ফেইল করলে একদিকে থাকবে ফোরস্‌ড্‌ এয়ার ঢোকার ব্যবস্থা, যাকে টেকনিক্যালি ড্রাফ্‌ট্‌ বলে। আর থাকবে কমপিউটার কনট্রোলড্‌ এইচ. ভি. এ. সি.। পাওয়ার চলে গেলে চাই স্ট্যাণ্ডবাই অক্‌সিলিয়ারি পাওয়ার সোর্স অর্থাৎ জেনারেটর, অথবা আমেরিকায় যা আজকাল চালু হয়েছে, সুপার কণ্ডাকটর ম্যাগনেটিক জেনারেটর।

অ্যাসকারী সবাইকে আবার স্মরণ করালেন—গণেশ টাওয়ারের ফাউণ্ডেশন্‌টা কি রকম হবে, সেটা নিয়েও বিশেষ করে ভাবা দরকার। আমি কুতুবমিনারের ফাউণ্ডেশন্‌টাকে আপনাদের ভাল করে স্টাডি করতে বলছি। স্যর জোনস্‌ যে কথাটা বলেছেন—দ্য সেন্টার অব ম্যাস মাস্ট কয়েনসাইড্‌ উইথ দ্য সেন্টার অব ওয়েট—এই প্রিন্সিপ্‌ল্‌টা ওরা হুবহু কুতুবমিনারে ফলো করেছে। তখন বিজ্ঞান এত এগোয়নি, অথচ এরা এরকম একটা সায়েন্টিফিক ফাউণ্ডেশন্‌ কিভাবে করলো ভাবলে

সত্যিই আশ্চর্য লাগে। পুরো স্ট্রাক্‌চার যদি রিএন্‌ফোরসড্‌ কংক্রিটের হয়, তবে ফাউণ্ডেশনের ভিতটা—পোডিয়্যামের মত হবে।

মলিয়ের বললেন—অনেক রকম ফাউণ্ডেশন্‌ আছে, যেমন—ম্যাট্‌ ফাউণ্ডেশন্‌, পাইল্‌ ফাউণ্ডেশন্‌, ফ্‌লোটিং ফাউণ্ডেশন্‌, গ্রিলেজ ফাউণ্ডেশন্‌। কুতুবমিনারের ফাউণ্ডেশন্‌টা এখানে হতে পারে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। মিঃ পরাঞ্জপে, আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ ব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে। ইঁদুর সচারাচর গণেশের ডানপাশে থাকে, বা পাশেও কি থাকতে পারে? ধর্মের দিক থেকে যদি খুব একটা বাধা না থাকে, তাহলে ইঁদুরটাকে আমরা গণেশের দু-পায়ের মাঝখানে প্লেস্‌ করতে চাই। নৃত্যরত গণেশের পা একটু বাঁকা বলেই শাফ্‌ট্‌ বের করতে পারছি না, তবে গণেশের দু-পায়ের মাঝখানে যদি ইঁদুর হাঁ করে থাকে তাহলে ইঁদুরের হাঁ দিয়েই এনট্রানস্‌ বার করা যেতে পারে।

পরাঞ্জপে বেশ একটু চিন্তায় পড়লেন। বললেন—ইঁদুরের অবস্থানের পরিবর্তন করা যায় কিনা সেটা আমায় ভেবে বলতে হবে। আমি আপনা-দের পরে জানাব।

এইসব আলোচনার মধ্যেই চা-বিস্কুট সার্ভ করা হয়ে গেছে। মিটিং শেষ হলে পরাঞ্জপে বললেন—চলুন, এবার আমরা সাইটে গিয়ে দেখে আসি কতটা কি কাজ হল।

সবাই সাইট্‌ দেখতে গেলেন।

॥ এগারো ॥

এবার শীতকালেও কদিন বেশ বৃষ্টি হয়েছে। আকাশে এখন ঝক্‌ঝকে্‌ রোদ্দুর। সবুজ পৃথিবীর যৌবন বার বার ফিরে আসে রোদ আর বৃষ্টিতে, গাছের ফাঁকে রোদ, ছাদে রোদ, স্কাইস্ক্র্যাপারে রোদ, পার্কে রোদ, বাড়ির লনে রোদ, রোদ্দুর উপছে পড়ছে দিল্লীর সর্বত্র। জলে-ভেজা পৃথিবী অনেকদিন পর রোদ্দুরকে পেয়ে সোহাগে মত্ত।

গঙ্গাধর রোদে বসে কাগজটা পড়ছিলেন। কফির পেয়ালায় ধোঁয়া। কফিটাই তিনি সকাল বেলায় পছন্দ করেন, কখন দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে কফির পেয়ালায় চুমুক দেবেন, সব ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা।

অনেকদিন পরে সন্দীপকে কাছে পেয়ে মনটা তার সুপ্রসন্ন। মুখে

চোখে আনন্দের অভিব্যক্তি, মুখে কিন্তু তার প্রকাশ নেই। সন্দীপ এই সময়ে তাঁর কাছে এসে বসলে তিনি খুশী হন, এটা সন্দীপ জানে বলেই কফির পেয়ালাটা নিয়েই সন্দীপ গঙ্গাধরের পাশে এসে বসল। গঙ্গাধরের কাগজটা অনেকটাই পড়া হয়ে গেছে এরমধ্যে। সামনের গাছে একটা পাখিকে রোদ পোহাতে দেখে সন্দীপ বলল—আজ সুন্দর রোদ উঠেছে।

গঙ্গাধর চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—হ্যাঁ, শীতকালে বৃষ্টি পড়লে রোদটা খুব ঝক্‌ঝকে লাগে। কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বললেন এডিট্যরিঅ্যালে কি লিখেছে একবার পড়ে দেখ।

সন্দীপ এক নিঃশ্বাসে সবটা পড়ে নিয়ে বলল—আজকাল কাগজও মাঝে মধ্যে সত্যি কথা বলে!

গঙ্গাধর একটু হাসেন। বিষয়টা হেসে উড়িয়ে দেবার মত নয়। দেশের সর্বত্র দুর্নীতি কেন বাড়ছে তার একটা সুন্দর বিশ্লেষণ। ১৯২৯ সালের গোড়ার দিকে টাকার মূল্য কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১৬ পয়সা। স্বাধীনতার এত বছর পরেও ব্যুরোক্র্যাটদের মাইনে তেমন কিছু বাড়েনি। ১৯২৯ থেকে ১৯২৯তে যাদের মাইনে ছিল আড়াই হাজার টাকা তাদের ডি, এ, দেওয়া হত পনেরোশো টাকার মত। কিন্তু এতেও তাঁদের ডাঁয়ে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। তাই ব্যুরোক্র্যাটরা তাঁদের ঠাটবাট বজায় রাখতে অফিস থেকে নানারকম সুযোগ-সুবিধে নিতে থাকেন, যা আদৌও তাঁদের প্রাপ্য নয়। চলতে ফিরতে অফিসের গাড়ি, বাড়িতে অফিসের পিওন। গঙ্গাধর ভাবেন এতো আমিও করতে পারতাম, কিন্তু কখনো করিনি। অফিসের গাড়িতে ঘুরে বেড়ান, স্ত্রীকে নিয়ে বাজার করতে যাওয়া, এসব তিনি কোনদিন ভাবতেও পারতেন না। মৈত্রেয়ী অফিসের স্টাফ-ওয়েলফেয়ারের কাজে যখন বে-েত তখনও গাড়ী দিতে আমি কতই ইত-স্ততঃ করতাম। মৈত্রেয়ী হেসে বলত—তোমার ধ্যান-ধারণা নিয়ে তুমি থাক, অতশত বাধা-নিষেধ এখন আর কেউ মানছে না। গাড়ীর অপব্যবহার সবাই করছে। তোমার এই নীতির কোন মূল্যই কেউ দেবে না।

সন্দীপও সম্ভবত সে-কথাটাই ভাবছিল। বলল—তুমিত আইডিয়্যাল নিয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দিলে। সেই আইডিয়্যালের মর্যাদা কী কেউ দিচ্ছে?

গঙ্গাধর চুপ করে থাকেন। এসব কথা গঙ্গাধরকে আঘাত করে। সন্দীপ আর কথা বাড়ায় না। বলে—বাবা, কফিটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আর এক কাপ পাঠিয়ে দিতে বলব?

—হ্যাঁ, বলে তিনি আবার এডিট্যরিঅ্যালটায় চোখ বোলাতে লাগলেন। লিখেছে—ব্যুরোক্র্যাটরা বিদেশে আজকাল বেশী যান। এই মাগ্গীগণ্ডার দিনে ডি, এ, নেহাৎ কম নয়। বাড়ি ভাড়া দিন দিন বাড়ছে। ব্যুরো-

ক্র্যাটদের তাতে কিছু এসে যায় না। তাঁদের সরকারী কোয়ার্টার আছে। রিটায়ার করার সময় রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটই একমাত্র ভরসা। বাড়ী করার খরচা দিন দিন যা বেড়ে যাচ্ছে, তাতে রিটায়ার করে পুরো টাকাটা লাগালেও আজকাল আর বাড়ী তৈরী করা যায় না। চোখের সামনে এঁরা দেখছেন, মন্ত্রীমশাইরা পার্টির টাকায় লাল হয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান মানে অকারণে হয়রানী হওয়া। ভারতের এক প্রান্তে কোন এক অজানা জায়গায় ট্র্যান্‌স্‌ফার। মন্ত্রীমশাইদের সঙ্গে সব ব্যাপারে যদি হাত মেলানো যায়—বাড়িঘর, অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি সবই বজায় থাকে, নিরুপদ্রব জীবন। ব্যুরোক্র্যাটদের তাই আর সে চরিত্র নেই। গোড়া থেকেই যদি ব্যুরোক্র্যাটদের ভাল মত মাইনে দেওয়া হত, তাহলে দারিদ্র্যের সঙ্গে এঁদের এভাবে যুঝতে হত না। অবশ্য, এর ব্যতিক্রম যে হত না তা নয়। রাজনৈতিক নির্বাচনের জন্য কোন ফাণ্ড যদি থাকত, তাহলেও দুর্নীতি যে একেবারে চলে যেত, তা নয়। তবে বোঝা যেত, কে বেশী দুর্নীতিপরায়ণ, কারা সেই দলীয় নেতা আর কারা শুধু লড়াই করে সৎভাবে বাঁচতে চায়।

গঙ্গাধরের মনে পড়ে, তিনি যখন ব্যাঙ্গালোরে, তখন কত বড় বড় কোম্পানী থেকে কত বড় বড় অফার এসেছে; দ্বিগুণ মাইনে, একগাদা পার্ক্‌স্‌। কই, তিনি ত কখনও যাবার কথা ভাবেননি। শুধু এক চিন্তা মাথায়ঃ বড় কাজ, দেশের কাজ। বড় মাইনের কাজ করার লোক ত অনেক আছে। কিন্তু যেটা করছি, মেশিন তৈরী করতে ইঞ্জিনীয়ারদের উদ্‌বুদ্ধ করছি, এটা কে করবে। চব্বিশ ঘন্টা একই ধ্যান-জ্ঞানঃ ফ্যাক্‌টরির উৎপাদন কি করে বাড়বে। যত বড় কারণই হোক—ফ্যাক্‌টরি এক-দিনও বন্ধ থাকবে না। অটুট বিশ্বাসঃ সমস্ত দেশটা যেন ফ্যাক্‌টরির কর্মগতিতে এগিয়ে যাবে। ফ্যাক্‌টরি বন্ধ মানে দেশের অগ্রগতিতে বাধা— এ অসহ্য! একদিনের ঘটনা। সামান্য তুচ্ছ কারণে একবার একজন কর্মী মেশিনের সুইচ অফ্‌ করে দিয়েছিল। সেই পথ দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম। মেশিন বন্ধের কারণঃ র‍্যা-ম্যেটিরিয়াল ফুরিয়ে গেছে। তা আগে কেন ভাবনি, অন্য ডিপার্টমেন্টে একটা হাঁক দিলেই ত তা এসে যেত। কাজে নেমে এত আলসেমি কিসের? তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো তার হাতে ধরিয়ে দিলাম। লজ্জা পেয়ে সে আবার মেশিন চালু করল। এরপর থেকে মেশিন বন্ধ রাখার ব্যাপারে সে দু-বার ভাবত। মেশিনের অস্তিত্ব তার চলাতে, তার গতিতে। বন্ধ করলেই তার ভেতর থেকে যেন একটা কান্না উঠে আসে।

মনে পড়ে, মহম্মদ ইব্রাহীমের কথা। ওরকম কর্মী গঙ্গাধরের চোখে খুব কমই পড়েছে। রিটায়ার করে দেরাদুনে একটা মোটর ওয়ার্কশপ্‌ খুলেছিল।

ওর বড় ছেলেটা এযুগের ; সে চাইত গাড়ী এমনভাবে সারাবে যাতে দু-মাসের মধ্যেই আবার সেই গাড়ীটা গ্যারেজে আসে, নয়ত মুনাফা থাকে না। বাপ অন্য জাতের মানুষ ; এভাবে কাজ করতে সে রাজি নয়। এক-বার যদি গাড়ীতে হাত দেয়, সে গাড়ী দু-বছরের মধ্যে যেন গ্যারেজের মুখ না দেখে। ওটা শুধু কর্মনৈপুণ্যের প্রশ্ন নয়, ইজ্জতেরও। কে গাড়ী সারিয়েছে, সেটাই বড় কথা। ফল হল এই যে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নানা ছুতোয় বাপকে গ্যারেজ থেকে সরিয়ে রাখা হত।

ফ্যাক্টরিতে এই ইব্রাহীমই গঙ্গাধরের গাড়ীটা দেখাশুনা করত। এক-দিন গঙ্গাধর একটু বেঁকিয়ে গাড়ীটাকে লম্বালম্বি রেখে বাড়ীর ভেতরে একটা কাজে গিয়েছেন। ইব্রাহীম সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ী-বারান্দায় এক ফোঁটা তেল পড়েছে। খুবই সামান্য। ইব্রাহীমের যত কথা, যত আব্দার সব মৈত্রেয়ীর কাছে। প্রয়োজন ছাড়া সে গঙ্গাধরকে কিছুই বলত না। সোজা মৈত্রেয়ীর কাছে গিয়ে বলল—মা, কালকে দাদা যখন অফিসে চলে যাবেন, ওঁর গাড়ীর চাবিটা আমাকে দিও ত। গাড়ী থেকে তেল পড়ছে কেন, খুলে দেখব। গঙ্গাধরকে কথাটা বলতেই তিনি বললেন—এই ত সেদিন ইব্রাহীম ওটাকে খুলে ঠিকঠাক করল। খানিকটা চললে আপনা থেকেই তেল পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। কাজে কোন খুঁত থেকে গেলে ইব্রাহীম কারুর কথা শোনার পাত্র নয়। গাড়ীটা খুলেছিল সে-ই, কিন্তু এক ফোঁটা তেল পড়ছে মানে কোথাও কিছু গণ্ডগোল রয়ে গেছে।

গঙ্গাধরের আপত্তি সত্ত্বেও ইব্রাহীম গাড়িটার প্রত্যেকটি পার্ট্‌স্ খুলে তিন রাত জেগে আবার ঠিক করল। কাজ সুরাহা না হলে ইব্রাহীমের কাছ থেকে ছাড় পাওয়া মুশকিল। রোগী একবার হাসপাতালে দাখিল হলে, রোগ না সারলে ডাক্তার কি করে ছাড়ে?

মেদবিহীন, লম্বা, টান্‌টান্ চেহারা। ফ্যাক্টরীতে কর্মরত ইব্রাহীমের চেহারাটা গঙ্গাধরের চোখের সামনে এখনো ভাসে। আর সেই 'মা' বলে ডাক। মৈত্রেয়ীর কোন একটা ছেলেমানুষী দেখলে প্রাণ খুলে হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠা ইব্রাহীমের সেই ছবিটাও।

ইব্রাহীমের কাজের নৈপুণ্য আর দক্ষতা দেখে গঙ্গাধর তাকে প্রমোশন দিয়ে কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ারদের মাথার ওপরে বসিয়ে দিলেন। ইব্রাহীমের কোন ডিগ্রি নেই ঠিকই, কিন্তু ওর কাছ থেকে যদি ইঞ্জিনীয়াররা কাজ শিখে নিতে পারে—জীবনে এরকম সুযোগ তারা আর পাবে না। ইঞ্জিনীয়ার-দের এটা পছন্দ হবে কেন? ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে কয়েকজন আবার বিলেতের ডিগ্রিধারী। অকর্মণ্য হলে কি হবে, ডিগ্রির তো ইজ্জত আছে। অশিক্ষিত এরকম একজন লোককে তাদের মাথার ওপরে বসিয়ে দেওয়াতে তারা ক্ষুব্ধ হল। ভাবল এটা মস্ত অন্যায়, এটা ভীষণ অপমান। এটাতো

আর ,বিলেত-আমেরিকা নয় যে শুধু কর্ম-দক্ষতার গুনে কাউকে ধরে এনে বসিয়ে দিলেই হল। প্রতিবাদে সোচ্চার হল ইঞ্জিনীয়াররা। গঙ্গাধর তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেন, বলেন--বুঝতে কিংবা চিনতে যদি আমার ভুল হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা আমাকে শাস্তি দিও, আমি সে শাস্তি মাথা পেতে নেবো' এই ভেবে যে, ওটাই আমার প্রাপ্য। তোমাদের অপমান করার জন্য আমি এটা করিনি, করেছি তোমাদের তৈরী করতে, তোমাদের কর্মক্ষমতা বাড়াতে, তোমাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাতে, তোমাদের আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা এই 'অব্যবস্থা' মেনে নিয়েছিল। কিছুদিন ইব্রাহীমের সঙ্গে কাজ করার পরেই তাদের এ ভুল ভাঙ্গল। শুরুতে তারা অনেকেই অনেক সময় যেত না, ইব্রাহীমের বিষয়ে নানান কটুক্তি করত। পরে ইব্রাহীমের কাজের দক্ষতা দেখে ওর অস্বাভাবিক প্রমোশন তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ঠিক এরকম সময়েই অন্য আর একটা ঘটনা ঘটল। বিলেত থেকে একটা মেসিন এসেছে। হঠাৎ সেটা অকেজো হয়ে পড়ল। ইংরেজ কন্‌সাল্‌টেন্ট্‌রা বললেন--বিলেতে না পাঠালে ওটা ঠিক করা যাবে না। গঙ্গাধর অত সহজে হার মানতে রাজী নন। সারা ভারতবর্ষ থেকে তিনি বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারদের আনালেন। ফ্যাক্টরির ইঞ্জিনীয়াররাও নানান-ভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখল। কিন্তু কিছুই সুরাহা হল না। ইংরেজ কন্‌সাল্‌টেন্ট্‌রা সেই একই কথা আউরে যাচ্ছে--এটাকে পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ ধরণের অ্যাকিউমেন্ এখানে নেই।

গঙ্গাধরের আঁতে ঘা লাগে। ওটাকে তিনি সমুদ্রে ফেলে দিতে রাজী, কিন্তু বিলেতে নয়।

ইব্রাহীমের ডাক পড়ল।

—বোলিয়ে সাব্। ইব্রাহীম দাঁড়িয়ে।

গঙ্গাধর একবার তার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—বোস, জরুরী কথা আছে।

ইব্রাহীম গঙ্গাধরের সামনে কখনও বসে না, তাই বসল না, বলল-- ঠিক হ্যায়, বোলিয়ে সাব্। গঙ্গাধর বলে চলেন—এত বড় বড় সব ইঞ্জিনীয়াররা মেসিনটাকে দেখল, কিন্তু কেউই কিছুই করতে পারল না। আমার ইচ্ছে তুমি একবার দেখো না, কিছু করা যায় কিনা।

—কি যে বলেন সাব্, বড় বড় ইঞ্জিনীয়াররা যেখানে হার মেনে গেল, আমি ত কোন্ ছার। মেশিনটা তো ঐ সাহেবদেরই। ওরা পর্যন্ত বুঝতে পারছে না । ওটাকে পাঠিয়ে দিলে যদি--ইব্রাহীম কথাটা শেষ করতে পারে না, গঙ্গাধর এক ধমকে ওকে চুপ করিয়ে দিলেন।

—না, ইব্রাহীম। সেইজন্যেই ত তোমায় ডেকেছি। কথায় কথায়

ত বিলেত যাওয়া সম্ভব নয়। ওটাকে এখানেই সারাতে হবে। আর তা তোমাকেই করতে হবে, আমি জানি, তুমি পারবে। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। তুমি একবার দেখ।

—বলছেন যখন, তখন দেখব। বলেই ইব্রাহীম আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াল না। সোজা মৈত্রেয়ীর কাছে গিয়ে নালিশ করল—মা, বড়বাবু কী যা-তা শুরু করেছেন।

মৈত্রেয়ী হেসে বললেন—কি আবার হল?

—বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার যেখানে হার মেনে গেল, সেখানে বড়বাবু বলছেন, তুমি একবার দেখ। এ ক্যয়া তাজ্জব ব্যাত হ্যায়, মা। একথা শুনে তমাম্ ফ্যাক্টরির লোক হাসবে না? কালকেই দেখবে হাসি-টিট্‌কিরির চোটে ফ্যাক্টরিতে আর টেকা যাচ্ছে না।

মৈত্রেয়ী ভরসা দিয়ে বললেন—দেখই না। লোকেরা হাসলে কি এসে যায়? সাহেব যখন বলছেন, তুমি একবার চেষ্টাই কর না। আমারও মনে হয় তুমি পারবে।

ইব্রাহীম জোর একটা ধমক দিল—কি যা-তা বলছ মা, বড় বড় ইঞ্জি-নীয়ার যেখানে—?

—ওসব ইঞ্জিনীয়ারদের কথা রাখ। ঠিক না বুঝলে, সাহেব তোমাকে একথা বলত না। একবার চেষ্টা করে দেখ না। সাহেবের মুখ রাখতে চেষ্টা কর।

গঙ্গাধর ইতিমধ্যেই সিকিউরিটি গার্ডকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। দিনে-রাতে কখনও যেন ইব্রাহীমকে কোন ব্যাপারে কোন বাধা দেওয়া না হয়,—ওকে আমি একটা বিশেষ জরুরী কাজ দিয়েছি।

সেদিন ফ্যাক্টরি থেকে ফির.ত গঙ্গাধরের একটু রাত হয়েছিল।

ক্লান্ত হয়ে এসেছেন দেখে মৈত্রেয়ী বললেন—টেবিল লাগিয়ে দিতে বলি, একেবারে খেয়ে নাও।

গঙ্গাধর মাথা নেড়ে বারণ করলেন, বললেন—একটু পরে। তোমার সময় আছে? টপ করে তৈরী হয়ে নাও ত, আমরা যাব আর আসব।

—কোথায়?

—আরে চলই না, দেখলেই বুঝতে পারবে।

যে শপ্‌টায় মেসিনটা রাখা ছিল গঙ্গাধর-মৈত্রেয়ী গিয়ে দেখলেন সেই শপের মাঝখানে মেসিনটার সামনে একটা টুলে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে ইব্রাহীম। গালে হাত দিয়ে চুপ করে শুধু দেখে যাচ্ছে মেসিনটাকে। ওঁরা চুপচাপ পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন, কিছুক্ষণ ওকে নিরীক্ষণ করলেন। তারপর আবার নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন। ইব্রাহীমের সেদিকে কোন হুঁশ নেই, কিছুই টের পেল না।

বাড়ীতে এসে টেবিলে বসে খেতে খেতে গঙ্গাধর বললেন—ঐ লোকটাই দেখো, পারবে। তুমি ভাবতে পার, লোকটার কি ভয়ানক কন্‌সেন্‌ট্রেশন্? আমরা ওখানে গেলাম, দাঁড়িয়ে রইলাম, লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত এক দৃশ্য। মেসিনটা ছাড়া আর কিছু ও দেখতে পাচ্ছে না। আমার এত বছরের অভিজ্ঞতায় এরকম একটা মানুষ আমি দেখিনি।

দু-দিন এভাবে কাটল। তিনদিনের দিন ইব্রাহীম ছুটে এল। মৈত্রেয়ীকে এসে বলল—মা, দাদাকো বোল না, হাথোড়া লাগে গা।

মৈত্রেয়ী বাধা দিয়ে বললেন, আমাকে বলছ কেন, দাদাকে গিয়ে বল না।

—নহী, তুম বোল দেনা। কথাটা বলেই উধাও।

মৈত্রেয়ী গঙ্গাধরকে ডেকে কথাটা বলতেই তিনি চটে উঠলেন—ইব্রাহীমের কী মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল? এরকম একটা সফিসটিকেটেড্ মেসিনে হাতুড়ি মারবে? না, ওকে বোল ওর মাথাটাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। হাতুড়ি লাগবে, যত সব আজগুবি কথাবার্তা।

গঙ্গাধর যা বললেন, মৈত্রেয়ী সেটা ইব্রাহীমকে জানাতেই সে ক্রোধে গর্জে উঠল। বলল—হ্যাঁ, জী হ্যাঁ, হাথোড়া লাগে গা, আোর হাথোড়া ইব্রাহীম ঠোকেগা বলে বুকে কয়েকটা চাপড় মারল।

মৈত্রেয়ী ওর অগ্নিদীপ্ত মুখের কথা যখন গঙ্গাধরকে শোনালেন, গঙ্গাধর নিজেকে প্রবোধ দিতেই বললেন—আচ্ছা, ও যখন এত জোর দিয়ে বলছে, করুক না। অন্যেরা ত হাত গুটিয়েই বসে আছে। সামান্য সম্মান-বোধটুকু পর্যন্ত নেই। তাছাড়া আমি ত ঠিকই করেছি, সমুদ্রে মেসিনটা ফেলেই দেব, তবু সারাতে ওটাকে বিলেতে পাঠাব না। একবার দেখিই না—দেশের একটা নিরক্ষর মানুষ মেসিনটা ঠিক করতে গিয়ে ওটাকে নষ্ট করে ফেলেছে। সেটাও অনেক সম্মানের ব্যাপার। বলেই গঙ্গাধর আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

ইব্রাহীম যে শপের ইনচার্জ ছিল, সেখানে নানা মাপের নানা ওজনের হাতুড়ি ও স্ক্রু ড্রাইভার তৈরী করা হয়। ক-দিন ঐ শপে বসে নানা মাপের ও নানা ওজনের ছোট-বড়-মাঝারি হাতুড়ি ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নানা ধরণের স্ক্রু ড্রাইভার তৈরী করাল। দশ-বারোটা হাতুড়ি ও সেই মাপের স্ক্রু ড্রাইভার তৈরী করাল ইব্রাহীম।

ফ্যাক্‌টরিতে গিয়ে মেসিনটার সামনে বসবার আগে ইব্রাহীম এক ফাঁকে মৈত্রেয়ীর কাছে চলে এসে ছেলেমানুষের মত আব্দার করল—মা, মেরে সর পে হাথ ফেরদো।

মাথায় হাত দিয়ে আশীবাদ করে মৈত্রেয়ী বললেন—পাগলা ছেলে আমার, ভয় কি, দেখো, তুমি ঠিক পারবে।

ইব্রাহীম খুশী হয়ে বলল—মা, গরম গরম কফি বানাও।

মৈত্রেয়ী কফি বানিয়ে ওর হাতে দিলেন—গরম কফিটা ঢক্‌ঢক্‌ করে খেয়ে ইব্রাহীম বেরিয়ে গেল।

শপ্‌টার চারপাশে সারা ফ্যাক্‌টরি যেন ভেঙ্গে পড়েছে; সাহেবরা, ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা ও নানা শপের নানা লোক ভিড় করে দাঁড়িয়ে। গঙ্গাধরের মাথা কতটা খারাপ হয়ে গেছে, তার সর্বশেষ দৃষ্টান্ত আজ তাঁরা চোখের সামনে দেখবে। রূপেশ্বর আসতে চায়নি, গঙ্গাধর তাঁকে ধরে এনেছেন।

সে এক দৃশ্য! ইব্রাহীমের সামনে নানা মাপের ও নানা ওজনের সব হাতুড়ি ও স্ক্রুড্রাইভার রাখা। হাত দিয়ে একটা হাতুড়ি তুলছে, জায়গা মত স্ক্রুড্রাইভারটা রেখে সেই হাতুড়ি দিয়ে ঠক্‌ করে একটা বাড়ি মেরে সেই হাতুড়ি আর সেই স্ক্রুড্রাইভারটা রেখে দিচ্ছে। আবার আর একটা। হাতুড়িটা মেসিনের কাছে নিয়ে ঠুক করে আওয়াজ করে, আবার সেটা রেখে দেয়। দম বন্ধ করে সবাই যেন ইব্রাহীমের পাগলামী দেখে যাচ্ছে। কেউ টু-শব্দ করছে না। এভাবে দেড় ঘন্টা যাবৎ মেসিনটার এলাইন্‌মেন্ট ঠিক করে ইব্রাহীম উঠে পড়ে। বলে, সাব্‌, মেসিন চালানে কো বোলো। মেসিনটা চলতে না চলতে ইব্রাহীম সেখান থেকে হাওয়া। সোজা মৈত্রেয়ীর কাছে।

ইব্রাহীমকে ওভাবে আসতে দেখে মৈত্রেয়ীর বুকটা ধড়াস্‌ করে উঠল। জামাকাপড় ঘামে ভেজা, কপাল বেয়ে টপ্‌টপ্‌ ঘাম পড়ছে। সারা চোখে মুখে ক্লান্তি, যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

মৈত্রেয়ী এগিয়ে এসে খুব ব্যস্ত হয়েই বললেন—কি, মেসিনটা চলল না?

—দাদাসে পুছো। বলেই যে-খাটটায় ও শুয়ে থাকে, ধপ্‌ করে সেই খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল।

মৈত্রেয়ী ভাবলেন, কিছু একটা গণ্ডোগোল নিশ্চয় হয়েছে, নয়ত মেসিন চললে কি এরকম হতাশা নিয়ে কেউ এসে শুয়ে পড়ে? তিনি খাটের কাছে গিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—মেসিন তবে কী চলেনি?

—দাদাকে লিয়ে তো কুছ করানাই থা মা। উনকি ইজ্জত কে বাস্তে।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। গঙ্গাধর অধীর আগ্রহে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন টেলিফোনে—ইব্রাহীম কী তোমার কাছে গেছে, মৈত্রেয়ী?

—হ্যাঁ, বাড়ি এসে ওর খাটটায় শুয়ে পড়েছে।

—কি আশ্চর্য, ওকে ডাক ত, মেসিনটা চমৎকার চলছে। সবাই ওকে ডাকাডাকি করছে আর ও তোমার কাছে গিয়ে বসে আছে? ওকে শীগ্‌গিরি পাঠিয়ে দাও। ওর দেখছি কাণ্ডজ্ঞান নেই।

মৈত্রেয়ী ইব্রাহীমের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক করে বুঝিয়ে ওকে ফ্যাক্‌টরিতে ফেরৎ পাঠালেন।

লম্বা, টানটান চেহারা। গঙ্গাধর যেন এখনও ইব্রাহীমকে দেখতে পান, আর হাতুড়ির ঐ ঠুক্-ঠাক্ আওয়াজ। সারা ফ্যাক্টরি যখন ওকে নিয়ে পাগল, তখন ও নেই। একজন, বিশ্বাস করেছে বলে তার জন্য জীবনপাত করা, নিজের গুণকে আড়াল করে রাখা, এরকম মানুষ আজকাল খুঁব একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

সন্দীপ এসে বলল—বাবা, তোমার কী শরীর খারাপ লাগছে? কফি খাওনি?

—ও, হ্যাঁ, তাই ত। তোর মনে আছে ইব্রাহীমের কথা?

—সন্দীপ বলল—ওর কথা ভাবছিলে বুঝি? ইব্রাহীম চাচা আমাকে খুব ভালবাসত। গাড়িটা কিভাবে মেরামত করেছিল মনে আছে বাবা? আমি তার অ্যাসিস্‌টেন্ট্ ছিলাম। এক ফোঁটা তেল পড়ছে দেখে গোটা গাড়িটা খুলে ফেলায় আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম এও কি কারুর পক্ষে সম্ভব। আর তোমার ফ্যাক্টরিতে কি তুলকালাম কাণ্ড করেছিল, সে গল্প কতদিন শুনেছি তোমার কাছে—।

—হ্যাঁ, ইব্রাহীম মারা গেছে।

—অ্যাঃ সে-কী? তোমরা ত আমাকে বলনি!

মৈত্রেয়ী ততক্ষণে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন, বললেন—তোকে বলতে আমি বারণ করেছিলাম। এই ত সবে এলি। শুনলে, তুই খুব কষ্ট পাবি, তাই বলতে বারণ করেছিলাম তোর বাবাকে। উনি তোকে তাই বলেননি। আজ সকাল থেকে বারবার ওর মুখটা ভেসে উঠছে। মৈত্রেয়ীর চোখ দু-টো ছলছলিয়ে উঠল। কি মিষ্টি করেই না মা ডাকত। অমন আন্তরিক মায়ের ডাক আমি খুব একটা শুনিনি রে।

সন্দীপ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইল। একটু পরে বলল—সত্যি, অমন মানুষের মৃত্যু আত্মীয়স্বজনের শোকের চেয়ে কিছু কম নয়।

—ও রকম কর্মীর মৃত্যু নেই রে, ওরা চিরকাল বেঁচে থাকে। বলতে বলতে গঙ্গাধরের গলা যেন ধরে এল।

মৈত্রেয়ী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উনি যেন ইব্রাহীমের মা ডাকটা এখনও শুনতে পান। বুকটা হাহাকার করে ওঠে।

॥ বারো ॥

সূর্যালোকিত আকাশ, অলকা নিজের উদ্ভট সব চিন্তায় বিভোর। ওর মনে হল মেঘ করে আসছে। ঘন ঘন দৃশ্য পালটে যাচ্ছে। নীলাভ আকাশ, দিগন্তের কোণে কোণে আকাশের নীল রঙ যেন ছড়িয়ে পড়ছে। নীল পাহাড় পেরিয়ে কাল কাল মেঘ এক্ষুণি যেন বৃষ্টি নিয়ে আসবে। জানলার ফাঁক দিয়ে বাড়ির সামনে বিরাট শিমুল গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ মনে হয় ওটা নিশ্চয় চেখভের চেরী গাছ। এরকম বিদ্‌ঘুটে স্বপ্নবিলাসিতা অলকার স্বভাবে নেই। কালই একটা সেমিনারে 'হিস্‌টোরিক্যাল ট্রেণ্ডস্‌ অব হিউম্যান সেট্‌ল্‌মেন্টে'-র ওপর একটা পেপার পড়ে এসেছে। অনেক যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছে, ইতিহাসের রেখাটা চোখে সবসময় পড়ে না, অথচ সেটা আছে। মনের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে যে অদৃশ্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রটা রয়েছে, তার বিচ্ছুরণে একটার সঙ্গে অন্যটার সম্পর্ক ধরা পড়ে।

যেমন, বাংলার সরস্বতী নদী যেখানে ছিল, একদিন তার ধারে ধারে, তীরে তীরে কত অদৃশ্য নগরী, কত অদৃশ্য বসতি গড়ে উঠেছিল; কত মানুষ ঘর বেঁধেছিল। সেই সরস্বতী নদীর চারপাশের বিরাট নগরীর অস্তিত্ব ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। সেখানে সারা দেশের জাহাজ এসে ভিড়ত। কত লেনদেন, কত বাণিজ্য, নানান দেশের কত মানুষের আসা-যাওয়া, কথা বলা, গল্প করা, নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক পাতান। সুখে-দুঃখে জীবনধারণ করা। সরস্বতী নদী যখন গেল শুকিয়ে, ধীরে ধীরে নদীর বিশুষ্ক বক্ষের মতই মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য, গতি আর বসতি, লেনদেন—সব কোথায় যেন হারিয়ে গেল। মূল থেকেই অসংখ্য রেখা বেরোয়; গাছ শুকিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শাখাগুলোও বিবর্ণ ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে।

একই রকম এখনকার ইকনমি ও বর্তমান অর্থনীতি। মূল-নীতি নির্ধারণ করেন কেন্দ্রীয় সরকার। তার রূপায়ণে নানান পর্যায়ে হাজার

হাজার কেন্দ্রে রয়েছে, ভিন্ন ভিন্ন জাতের মানুষ, বিভিন্ন রাজ্য সরকার। অগুণতি মন্ত্রী, অসংখ্য ব্যুরোক্র্যাট। লোভ, দুর্নীতি, লোভী মারচেন্ট, শিল্পপতি, ডিস্ট্রিবিউটার আর ট্রেডার। শিমূল গাছের ফুলের মত আছে অসংখ্য কোম্পানী, ন্যায্য মুনাফা আদায় না করে যারা এক পা এগোতে চায় না। এদের সহযোগী ডিস্ট্রিবিউটাররাই কোম্পানীগুলোর বাণিজ্য-নীতি নির্ধারণ করে ধীরে ধীরে কোম্পানীগুলোকে নিজেদের করতলগত করে নিয়ে গোটা ইকনমিটাকেই চালায়। বড় বড় কোম্পানী আর তাদের ডিস্ট্রিবিউটাররা একজোট হয়ে রাজনীতির স্ট্রিংগুলো হাতড়ে নিয়ে, তারপর একদিন দেশ-জোড়া পুতুলনাচ দেখাতে থাকে। মন্ত্রীরা, এমন কি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী মজা লুটতে বা কৌতূহলী হয়ে পুতুলনাচে উৎসাহ জোগান, পুতুলনাচ দেখতেও যান। আর আস্তে আস্তে তার শতপাকে জড়িয়ে পড়েন। জনগণের কথা ভেবে প্রথম প্রথম একটু থমকে দাঁড়ান, বিপদে পড়ে ঘন ঘন ধমকি দেন। তলে তলে যাদের ষড়যন্ত্র, তারা কিন্তু এই সব ধমকি শুনে হাসতে থাকে। মূল তখন হারিয়ে যায়। আগাছাই তখন প্রাধান্য পায়। চোখে অন্তহীন নিত্যনতুন ধাঁধা। যা সাধারণ মানুষ ও ঐতিহাসিকের বিভ্রান্তি ঘটায়; বিস্তারকেই আমরা দেখি, মূল নাটক নাড়াচাড়া করে তলিয়ে দেখতে আমাদের ভীষণ অনীহা।

বাড়ির সামনের পার্কে গরু ঘাস খাচ্ছিল। রোদ্দুর পড়েছে তাদের গায়ে; কাকেরা কা-কা রবে গরুগুলোর ল্যাজে বসছে। সম্ভবত খাদ্যের সন্ধানে। অলকার কেন জানি মনে হয়, এই যে গরুর প্যারামিটার, এর মধ্যেই গরুকে চিরকাল বিচরণ করতে হবে। গরু কোনকালে কাক হতে পারবে না, কাকও গরু নয়। শিমূল গাছটা একদিন গরু হয়ে বসে যদি ঘাস খেতে থাকে তাহলে মহা বিশৃঙ্খল। শিমূল গাছে চড়তে গিয়ে গরু যদি তার ল্যাজটা ফেলে আসে, কিংবা ভয় পেয়ে তার বাঁট-দুটোকে খুইয়ে আসে, তবে প্রকৃতির মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতাটাই প্রকট হয়ে উঠবে, এমত অবস্থায় মানুষের কোনকালে দুধ জুটবে কি না সন্দেহ। সেদিন দুধওয়ালা-দের মিছিলে হয়ত ঐতিহাসিকদের ডাক পড়বে। কথা উঠবে—কবে, কোনদিন গরুর ল্যাজ শিমুলগাছে প্রথম আটকা পড়ে আর গরুটা ভয় পেয়ে তাঁর বাঁট-দুটো ফেলে এসে পৃথিবীকে কিভাবে বিশুষ্ক দুধবিহীন অবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছে। এইসব তথ্যহীন বিষয়েই রিসার্চ শুরু হয়ে যাবে।

এইসব সঙ্গতিহীন এলোমেলো চিন্তা যে কেন, অলকা নিজেই জানে না। মনের এই অবস্থার কথা অলকা কাউকে খুলে বলতে পারে না। এমনকি বাড়ির কারুর কাছেও নয়। শুনলে হয়ত তারা ভাববে মানসিক বিকারের কথা। বন্ধু-বান্ধবরা শুনলে হেসে বলবে, অলকার নিশ্চয়ই মাথা

খারাপ হয়েছে, ডাক্তার দেখানোর দরকার। দশজনে যা ভাবে, অলকা তুমিও সেইমত ভাব। নতুবা সমাজে তোমার স্থান নেই, একঘরে হবে। একথা ভেবেই আমরা চাপে পড়ে অসংলগ্ন অস্বাভাবিক চিন্তাগুলোকে স্বাভাবিক করে নিই। নিজের চিন্তা আমার নিজের মধ্যেই গুমরে মরে; নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে আর পাঁচজনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে হয়। আন্দোলন, সমাজ, দেশ, রাজনীতি, অর্থনীতি—কোন কিছুই আর মনকে স্পর্শ করে না। আজ সন্দীপ আসবে। সেজেগুজে তৈরী হয়ে বসে আছে অলকা। বসে বসে এসব কথাই ভাবছিল অলকা। সন্দীপের সঙ্গে কোথায় যাবে? জু-তে, না কনট্‌প্লেসে। জনপথের দোকান-পাট, শাড়ি, মডেল, বিচিত্র ভোগ্যবস্তুর প্রদর্শন দেখতে গেলেও মন্দ হয় না। হালকা চালে ডিস্‌ট্রিবউটারদের ম্যাজিকের কথাও সন্দীপকে এই সময় শোনানো যাবে। বলবে, জান সন্দীপ, এই যে কন্‌জিউমারিজম্‌, এতো শক্তিশালী ডিস্‌ট্রিবিউটারদেরই অবদান। তাদের বস্‌ হচ্ছে বড় বড় কোম্পানী। তারা ত আজকাল খুব পাওয়ারফুল। ছলে বলে কৌশলে এরা মন্ত্রীদের, পলিটিশিয়ানদের আর মস্তানদের হাত করে গরুর ল্যাজে কাক বসার মত আস্তে আস্তে গোটা ইকনমিটাকেই গোল করে দেয়। তখনই গরুর বাঁটগুলো গাছে খোয়া যায়। আমার এই অদ্ভুত মন্তব্য শুনে সন্দীপ হয়ত হেসে উঠবে। নয় ত বলবে, অতসব আমি বুঝি না বাপু—বিলাস, ভোগ, দুর্নীতি সব দেশেই আছে। ওসব নতুন কিছু নয়। ও নিয়ে আমি অত মাথা ঘামাই না। অলকা ভুলে গিয়েছিল যে সন্দীপ নিজেও ইনডাস্‌ট্রিয়ালিস্ট হবার স্বপ্ন দেখে। দেশ-বিদেশে যাবে, ফাইভ-স্টার হোটেলে থাকবে। কথায় আছে ঃ বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। জুটবে সুন্দরী নারীদের সঙ্গ, হুইস্কি আর ট্যাক্‌সি। নর্তকীদের সহজলভ্য বাহুপাশ, অতীব বিলাস, সুন্দরী-পরিবৃত ডিনার-টেবিল। রাতের বিলাস। আচ্ছা সন্দীপ, তুমি আমার একটা কথার জবাব দেবে? কোন কিছু গড়ে তোলার সময় কত সংগ্রাম, কত নিষ্ঠা, কত কর্মসাধনা। তারপর যখন বিস্তার আর আলাপ, তখন এত ভোগ-বিলাস কেন? জীবনের সব পাওয়া কি ওতেই, সব চাওয়া-পাওয়া এই অভিলাষেই শেষ?

১৮৫০ সাল থেকে ত বাংলায় কতবার দুর্ভিক্ষ হয়ে গেল। সর্বশেষ দুর্ভিক্ষ ১৯৪৩ সালে। ৫০ লক্ষ লোক মারা গেল। দালাল, ডিস্‌ট্রিবিউটার, দেশী-বিদেশী ব্যবসায়ী, আর ওই নপুংসক বাংলা সরকার আঙুলটি নাড়ল না। তুমি ভাবতে পার সন্দীপ? তখন থেকেই কালো বাজারের জন্ম আর সেই থেকেই কালো টাকায় দেশ ছেয়ে গেল। ব্ল্যাক মার্কেটিয়াররা ভুবনজোড়া ফাঁদ পেতে বসল, প্যারালাল্‌ ইকনমি তৈরী করল। একজন রিসার্চ করে

দেখেছে যে, প্রতি বছর গড়ে সারা ভারতে চোরাই মালের কারবার হয় ১২ হাজার কোটি টাকার মত। এর মধ্যে সোনার লেনদেন হয় ১৫০ টন। তিন হাজার কোটি টাকার মত কৃত্রিম কাপড়-জামা আমদানী করা হয় ভারতে।

অলকা নিজে পাঞ্জাবী, দেশভাগের পরিণতি, রক্তক্ষয় ও তার শত শত মর্মান্তিক কাহিনী চোখে না দেখলেও, পড়েছে অনেক, শুনেছে অনেক। লক্ষ লক্ষ শেকড়ছেঁড়া শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা ও নতুন করে জীবন শুরু করার সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার বিচিত্র চিত্র দেখেছে। দেখেছে মানুষ ব্যবসায় নেমে লাল হতে হতে কিভাবে নিজেদের একেবারে ডি-ক্লাসিফাই করে ফেলেছে। মারুতি গাড়ীর চোখে যদি বর্তমান অর্থনীতিটা দেখো, তাহলে বুঝবে পার্টিশনের গোড়াতে টাকা কামানর ও টাকা জমানর যে তাগিদ—যাকে ইকনমিস্টরা বলেন ক্যাপিটাল ফরমেশনের গোড়ার কথা—তার সূচনা এখান থেকেই। সেই একই শোষণ ও পেষণ নীতি। বড় বড় এম্পায়্যারের লুট-তরাজ তবু চোখে পড়ে, কিন্তু মানুষ মেরে, তাদের উপড়ে ফেলে যে ইতিহাস রচিত হয়, সেটা অনেকেরই নজর এড়িয়ে যায়। এটা বড় দুঃখের। সকল মানুষ বর্তমানের সূর্যালোকিত আঙিনায় আবর্তিত হয়, এটাও কম দুঃখের নয়। এতসব এলোমেলো কথা কেন যে আজ অলকার মনে উঠ্‌ছে তা সে ভেবে পায় না। মা-বাবা পার্টিতে গেছেন, দিদি বন্ধুর বাড়িতে। জুলিটা মাঝে মধ্যে ঘরে এসে একটু আদর খেয়ে যায়। অলকা বাইরে বেরুবে, তাই জুলি বারে বারে আদর করে যায়। —হ্যাঁরে জুলি, তুই কি কোনদিন মানুষ হতে পারবি? —কিরে?

জুলি 'ঘেউ' 'ঘেউ' করে অদ্ভুত একটা সুন্দর ভাব নিয়ে অলকার সুসজ্জিত মুখের দিকে তাকায়। অলকার এই প্রশ্নে বিব্রত হয়ে একটু বেশী মাত্রায় 'ঘেউ' 'ঘেউ' করতে থাকে। অলকা নিজেকে নিয়ে এতই বিভোর ছিল যে কখন যে সন্দীপ এসেছে তা খেয়ালই করেনি।

দরজা খুলে দিয়ে বলল—এসো। রোমিও-জুলিয়েট দৌড়ে এল আটকাতে। ধমক খেয়ে সরে গেল।

—ঘরে বসবে, না বাইরে যাবে? সন্দীপ জানতে চায়।

—যা তোমার মন চায়, অলকা মুচকি হাসলো।

—ঘরেই বসি, কেমন?

সন্দীপের খেয়াল হল, বাড়িতে বোধ হয় কেউ নেই। বলল—শুন্‌শান্‌ মনে হচ্ছে বাড়ি, কি ব্যাপার? বাড়িতে কেউ নেই বুঝি।

—মা-বাবা পার্টিতে, দিদি বন্ধুর বাড়ি?

—অর্থাৎ একান্ত নিরালা। শুধু রোমিও-জুলিয়েটের দৌরাত্ম।

—যদি বল, ওদেরও অন্য ঘরে চালান করে দেওয়া যেতে পারে।

—তাই কর, গল্প-গুজব করে পরে না-হয় বেরুনো যাবে।

—দু-এক পেগ হুইস্কি পেটে পড়ার পর, না? অলকা হেসে টিপ্পনী কাটে।

—ওটা একলার সঙ্গী, আর তুমি ত জানই, অ্যাডিক্ট্ আমি নই।

—ঠিক বলছ ত। আচ্ছা বোস, নিয়ে আসি।

সন্দীপ বসে পড়ে, অলকা তেরচা চোখে সন্দীপকে একবারি দেখে নেয়। প্রশ্ন করে—হুইস্কি, না রাম?

সন্দীপ হেসে উত্তর দেয়—বেরুবার মুখে রামনামই ভাল।

—মরি রে, মরে গেলেও মুখে রাম নাম আসে না, রামকে সব সময় পেটে পুরে ফেল।

—খাসা বলেছ। কেমন খাসাটি সেজেছ আজ। সাধ করে কি আর বলি লণ্ডন রিটার্ন পি, এইচ-ডি, অলকা ভর্মা। এক ডাকে সবাই চেনে। পারলো না চিনতে শুধু এই আমি।

অলকা এক ঝলক হেসে বলল—কথার খেই হারিয়ে গেলে তোমার মুখ থেকে ওই সব কথাই বেরোয়।

অলকা দুটি গ্লাস নিয়ে এল। সঙ্গে রামের বোতল। সন্দীপ নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করে —তুমি একটু খাবে ত?

—আমার অতিথি তুমি, কথায় বলে অতিথি দেবতা। না বলতে কি পারি।

দুজনেই হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ে।

সন্দীপ ছাইদানি খুঁজছিল, ধারে কাছে কোথাও দেখতে না পেয়ে চার-দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল—চাকরদেরও কি জুলিয়েটদের মত ভাগিয়ে দিয়েছ নাকি? তুমি ত দেখছি ম্যাজিক জান।

অলকা আলমারী থেকে একটা অ্যাসট্রে বার করে নিয়ে সন্দীপের কাছে রাখল, বলল—একা থাকলেই হুইস্কি কিংবা রাম, এখন ত আমি তৃতীয় ব্যক্তি।

—আলবাত, অ্যাবসলিউট্লি কারেক্ট। আজকাল পৃথিবীতে তৃতীয় ব্যক্তিরই কদর, যেমন থার্ড ওয়ার্লড্।

অলকা হেসে ফেলে—হ্যাঁ, তা-ত বটেই। কদর ত তোমাকে করতেই হবে। তৃতীয় বিশ্বের সেরা শিল্পপতি হবে তুমি, কেমন?

—ওরে বাবা! কি অদ্ভুত তোমার চিন্তা, তল পাওয়া মুস্কিল। ঠাট্টা করে একটা কথা বললাম, আর তুমি একেবারে ভবিষ্যদ্বাণী করে বসলে।

গ্লাসে রাম ঢেলে একটু জল মেশাল। তারপর বরফ দিয়ে হাসতে হাসতে একটা গ্লাস সন্দীপের দিকে এগিয়ে দিল অলকা।

—থ্রী চিয়ার্স্।

—থ্রী চিয়ার্স—অলকা হাসে।

আগের কথার খেই ধরে অলকা বলল—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, চিন্তা আর

দুঃশ্চিন্তা, এই দুই নিয়েই আজকাল বড় মশগুল থাকি।

—কি রকম ? সন্দীপ কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে অলকার দিকে তাকায়।

—সে অনেক কথা। কখনও ইতিহাসের কথা, কখন দেশের অর্থনীতি। কখন পাবলিক সেক্টরের পেছনের নিঃশব্দ আন্দোলন আর তারই ইতিহাস। যা আমার এখনকার রিসার্চের বিষয়। একটার সঙ্গে অন্যটার সম্পর্ক খুঁজতে, প্রডাকটিভ রিলেসনস্ বুঝতে গিয়ে এক প্যারামিটার থেকে অন্য প্যারামিটারে ঘুরতে থাকি। এইসব হাতড়াতে গিয়ে যেন সব এলোমেলো হয়ে যায়। বিচিত্র সব আয়নায় নিজের মুখ, নিজের সমাজ ও দেশের মুখ দেখি। জান সন্দীপ, সেসব কথা যদি তোমাকে ডিটেলস-এ বলি, তাহলে তুমি নির্ঘাত বলবে, আমি একটা বদ্ধ পাগল।

—বলব ? হয়ত বলব। আমার প্যারামিটারে এখন শুধু কর্মের সাধনা ও সংগ্রাম। আয়নাটা তাই কাছে আনতে চাই না, দূরে রাখাই ভাল। বাবার নিজের আয়নাটা দেখি বাবার হাতের কাছেই থাকে। মাঝে মাঝে মা সেই আয়নাটা বাবার মুখের কাছে তুলে ধরেন।

সন্দীপের কথা শুনে অলকা শুধু একটু হাসে।

সন্দীপ বলে চলে—হাসছ, কিন্তু তুমি জান না অলকা, বাঙালীরা এমনিতেই বাক্যবাগীশ আর এর উৎস হচ্ছে আয়না। কিছু জ্যান্ত আর কিছু মৃত আইডিয়্যাল।

—কথাটা বেশ ভালোই বললে। অলকা সপ্রশংস দৃষ্টিতে সন্দীপের দিকে তাকায়। গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে একটা চুমুক দেয়।

হুকুম সিং দুটো প্লেটে চানাচুর আর শিককাবাব নিয়ে ঘরে ঢোকে। প্লেট দুটো টেবিলে রেখে দিয়ে চলে যায়।

সন্দীপ একটা শিককাবাব তুলে নিয়ে বলল—মা-বাবার কথাবার্তা শুনেই ত কথা বলতে শিখেছি। নয় ত, এতসব কথা বলার মত বিদ্যে আমার পেটে নেই। লণ্ডন রিটার্ন অলকা ভর্মার সঙ্গে ত নয়ই।

—তাত বটেই। আজকাল চারিপাশে বিদ্বানদের যা ছড়াছড়ি। অলকা সন্দীপের হাসির সঙ্গে সুর মিলিয়ে কথাটা বলল।

—তারা কি বলছে, একটু না হয় শোনালে। বিদ্যার জগৎ কি বলছে, না বলছে তা জেনে নেওয়া ভাল। আর তোমার কাছে জেনে নেওয়া, আরও ভাল।

—কেন ? কাগজ পড় না ? তারাও ত আজকাল দেশ নিয়ে পড়েছে, দেশের নীতি ও দুর্নীতি নিয়ে ভীষণ ভাবছে। স্বার্থের সঙ্গে যতক্ষণ না ঠোকাঠুকি লাগে, মায়াকান্না শুনতেই হবে।

অলকার মন্তব্য শুনে সন্দীপ একটু গম্ভীর হয়ে বলল—সত্য চিরকালই প্রকাশ্য। তাই ওটা চেপে যাওয়াই নিয়ম। সদা সত্য কথা বললে নিজেরই

ক্ষতি। তাই সত্য বা অর্ধ সত্য যা কাগজে ছাপা হয় তা আমি পড়ি। হ্যাঁ, ভাল করেই পড়ি। অনেক সময় পড়িও না। সভ্য জগতের পড়া মানে ত ঐ কাগজী পড়া। কাগজে নিত্যনতুন যা বেরোয় তা পড়ে চোখ ও মন দুটোরই বিভ্রান্তি ঘটে। আসলে ওতে জ্ঞান বাড়ে কি না সন্দেহ। অধিকাংশ সময়ই লোকের—তোমাদের মনে কনফিউশন্ হয়, অলকাঁদের দরকার হয়ে পড়ে।

—বেশ কথা বলতে শিখেছ দেখছি। এত কথা শিখলে কি করে? আগে ত কথাই বলতে না। মন দিয়ে শুধু আমার কথাই শুনে যেতে।

—তোমার সংস্পর্শে এসে ডবল প্রমোশন পেয়েছি। মুখ খুলেছে। কাগজ আর অলকা, আর সেই সঙ্গে সিভিক লাইফে ফিরে আসার চিন্তা, সব মিলে আমার মুখ খুলে দিয়েছে। ত্রয়ী আলোর ঝলকানি। ভারতবর্ষের রাস্তায় বিদেশী গাড়ি।

অলকা সশব্দে হেসে ওঠে।

—কই, খাচ্ছ না যে। আমার গ্লাস ত শেষ। আর তোমার? সন্দীপ তাড়া দেয়।

—মেয়েদের বেশী খেতে নেই, পুরুষের তাতে ক্ষতি হয়।

—সাংঘাতিক মেয়ে তুমি। ইতিহাস-ভূগোল ছেড়ে দেখছি এবার ক্ষতির ইতিহাস নিয়ে পড়লে।

—না, না, তুমি খাও। তোমাকে আমি বারণ করছি না। আমি ঢেলে দেব?

সন্দীপের গ্লাসটা অলকা ভরে দিল।—কোথায় যাবে ঠিক করেছিলে, সন্দীপ প্রশ্ন করে। চল ঘুরে আসি। দিল্লীতে সে-রকম নদী নেই, সে-রকম সমুদ্রও নেই যে, তোমাকে জাহাজ দেখাব।

অলকা কথাটা লুফে নিয়ে বলল—দিল্লীতে কোথাও বসার জায়গা নেই যে, তোমাকে নিয়ে একান্তে বসব, বল, এটাই ত বলতে চেয়েছিলে।

—না, একমাত্র নেহেরু পার্ক ছাড়া। সন্দীপ হেসে নিজেকে একটু সামলে নেয়। নেহেরুজীর দেশে কোন বড় কাজ অন্য নামে হয় না। হতেও নেই, তাতে ইতিহাসের ক্ষতি হয়।

—ওটা অনেকটা বংশরক্ষার মত। নিজের গরিমা বজায় রাখার ফিউডাল চিন্তা। যার কোন যুক্তি নেই। একটু হেসে অলকা আবার বলে—নেহেরু পার্কে না যাও, প্রগতি ময়দান আছে। ওখানে সিনেমা-থিয়েটার সবই আছে। আরও একটু এগিয়ে 'আপ্পু-ঘর', আরও এগুলে ডলস্ হাউস।

—বুঝলাম, আছে ত অনেক কিছুই। কিন্তু এসব জায়গায় যেতে হলেও তোমাকে 'নেহেরু প্লেস' আর 'নেহেরু স্টেডিয়াম' ক্রস্ করে যেতে হবে।

—সে এখন কী করা যায়! বংশ রক্ষা পেলে, শাখায়-প্রশাখা গজায় জানি,

সেটা তোমার অজানা নয় ? খোটাটা ত আমাকেই দিচ্ছ। মনে আছে, একদিন কথায় কথায় পাবলিক সেক্টরের কথা বলতে গিয়ে তোমায় বলেছিলাম, দেশটা যখন রাইটিস্ট নেতাদের কবলে, তখন নেহেরু, যদিও তিনি ফ্যাবিয়ন সোশ্যালিস্ট, হিংসাত্মক কোন সংঘর্ষ চাননি। যদি চাইতেন, তাহলে ইতিহাসে হয়ত তিনি লেলিনের মর্যাদা পেতেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে পৃথিবীর গোটা সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের ইতিহাসের টারময়েলের কি সম্পর্ক তার সূত্র ধরে নেহেরু ইতিহাসের অন্য ব্যাপক অর্থ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। এইসব বিভিন্ন মতবাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তিনি বুঝতেন। তার স্বাক্ষর—তাঁর লেখা ও তাঁর ভাষণ। এসব পড়তে আমার খুব ভাল লাগে, বুঝতে পারি, ইতিহাস-চেতনা কাকে বলে। আন্দোলনের পেছনের ইতিহাস, বর্তমান ইতিহাসকে কতটা প্রভাবিত করেছে বা করবে তার একটা ইঙ্গিত এসব লেখায় ও ভাষণে আছে। এগুলো তাই একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে মুশকিল কোথায় জান, সন্দীপ। তুমি প্রগেসিভ্ বলে যদি আখ্যা পেতে চাও, তবে দেশের নেতাদের ছেড়ে অন্য দেশের অন্য নেতাদের কথা বলা অনেক নিরাপদ। কিন্তু আমি চাই, যাঁরা আমাদের দেশের, যাঁরা দেশের কথা ভেবেছেন, দেশকে ভালবেসেছেন তাঁদের কথাই বলব, তাঁদের স্মরণ করব। কারা থাকলে কি হতে পারত, কারা বেঁচে থাকলে দেশের কি রকম কি উন্নতি হত, সেটা নিয়ে ত আর রিসার্চ হয় না। রাইটিস্ট্ ফোর্সের সঙ্গে নেহেরুর কম লড়াই করতে হয়নি, সন্দীপ, সেটা কী তুমি অস্বীকার করতে পার ?

—এই দেখো, সন্দীপ বাধা দিল, তোমার রিসার্চ নিয়ে আমি কোন কথাই বলতে চাইনি। তার জন্য আমার চেয়ে অনেক যোগ্য লোক আছে। মা কিংবা বাবার সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করলে তুমি অন্য সাহায্য পাবে। আমি এ বিষয়ে একেবারেই অজ্ঞ। শুধু এইটুকু জানি, প্রধানমন্ত্রী এত শতর মধ্যে সংগ্রাম চালিয়ে বেঁচে আছেন। দেশে নানারকম ফ্যানাটিসিজম্ ও ফ্যান্‌ডামেন্‌টালিজম্ দিন দিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। এ-সবকে কাউন্টারএ্যাক্ট করতেই হয়ত গণেশ টাওয়ারের আবির্ভাব হতে চলেছে। পৃথিবীর অন্যতম এক দর্শনীয় বস্তু আমরা হয়ত অচিরেই পেয়ে যাব। এটা কী কম লাভের কথা, অলকা।

অলকা হাসে। গণেশ টাওয়ার কি বস্তু হতে যাচ্ছে, তা আমিও ঠিক জানি না।

—কেন ? চন্দ্রভানু আঙ্কেল ত ওর মধ্যে আছেন।

—হ্যাঁ, বাবা কাজ করছেন। তবে কি জান, বাবার ধারণা আমি বাবাকে একটা কম্‌পিটিশনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছি। তা মোটেই নয়। অপছন্দ হলেই বাবাই সরে আসবেন। বাবাকে ত তুমি চেন। বাবার অসুবিধে কি

জান, গঙ্গাধর মেসোর মত বাবাও নিজেকে ঠিক মেড্-টু-অর্ডার করে নিতে পারেন না। আর বাবা যে কি চান, সেটা বাবা জানেন। তাই অন্যেরা যে কী চাইছে, তার তোয়াক্কা বাবা করেন না। সারা জীবন এভাবেই কাটিয়ে দিলেন। এখন অন্য রকম কিছু একটা হবে সেটা দুরাশা। বাবা আছেন বলেই যে গণেশ টাওয়ারের কি উদ্দেশ্য অথবা এর পেছনে কারা কারা আছেন, সেটা আমার বা বাবার জানার কথা নয়। বাবা এসব জানতেও চান না। তিনি শুধু কাজ ক'রে যেতে চান।

সন্দীপ বলল—আমি সত্যিই এসব জানতাম না। আমার শুনে খুব ভাল লাগল যে, চন্দ্রভানু আঙ্কেলও এখনও বাবার মত কোন ব্যাপারেই কম্প্রো-মাইজ করতে রাজী নন।

—ওঁরা আগের জেনারেশনের মানুষ। গঙ্গাধর মেসোকে দেখ না। সরে আসবেন, তবু বেঁকবেন না।

—বিলক্ষণ জানি। কিন্তু গণেশ টাওয়ার ব্যাপারটা আসলে কী?

—বললাম ত, আমিও ঠিক জানি না। তবে মনে হয়, গণ মানে যদি ঈষ হয়, তাহলে গণমানবের কথা এতদিন পরে আমরা ভাবতে চাইছি। গণ-মানবের বাহন পুরন্দরে পরাঙ্গপে।

—তিনি যেই হন, এ দেখছি একেবারে 'ম্যাসে'র রাজত্ব। জান ত, জনতার রাজত্ব মানে কি, শিল্পপতিরা জনমানবের নামে কয়েকজনের স্ফূর্তির জন্য কাঁড়ি-কাঁড়ি চাঁদা দিয়ে মরবে। আরও অন্যভাবে সাহায্য করতে গিয়ে মার খাবে, তাদের প্রেমিসেস রেইড্ হবে।

—আচ্ছা, এরই মধ্যে সে ভয়ও ঢুকেছে বুঝি? বরঞ্চ এক কাজ কর, অত অনিশ্চয়তার মধ্যে গিয়ে লাভ কি? তার চেয়ে বরং কোন মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীতে শাঁসালো মাইনের একটা চাকরী জুটিয়ে নাও।

—কথাটা মন্দ বলনি। আমি জনতাকে ভয় পাই। কেন জান? আমার মধ্যে আমিত্বটা একটু বেশী। স্বাধীনভাবে বাঁচতে যে চায় আর পাঁচজন বাঙালী শিল্পপতিদের মত। এত অনেক দূরের পথ। আপাতত যে পথটা চিনি সেইপথে চল বেরিয়ে পড়ি।

অলকা সম্মতি জানায়। চল, কোথায় যাবে, বলনি কিন্তু।

সন্দীপ স্মরণ করিয়ে দেয়। সেদিন যে বলেছিলে, পথই আমাদের পথ দেখাবে।

অলকা হেসে সুরে সুর মিলিয়ে বলে—সে-ই ভাল, পথে বেরিয়ে, পথ খুঁজে নেব।

॥ তেরো ॥

আই, এন, এ-র 'দিল্লী চলো' শ্লোগানের এখন রূপ বদলেছে। এর অর্থ এখন দাঁড়িয়েছে দিল্লীতে গিয়ে বড় কর্তাদের ধরে করে নিজের কাজ গুছিয়ে নেওয়া। আর তাই যদি করা যায় তবে অকারণে কাজ করা কেন ? কাজ না করে তদবির করলে অনেক বেশী লাভ। জেনারেল ম্যানেজার গঙ্গাধর, কাজ পাগলা লোক। কাজ ছাড়া কিছু বোঝেন না। তাই ফ্যাক্টরির ব্যাপারে রূপেশ্বর নিশ্চিন্ত। শুধু এইটুকুই রূপেশ্বরকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে খেয়াল রাখতে হবে যে, গঙ্গাধর যেন তার গদি ধরে টানাটানি না করে। এ ব্যাপাবে আগে থেকেই সচেষ্ট থাকতে হয় এবং সময় মত কলকাঠি নাড়তে হয়। এ অনেকটা প্ল্যানিং কমিশনের প্ল্যানিং-এর মত। ইয়ার-টু-ইয়ার প্ল্যান করতে হয় স্ট্রাটেজী অনুযায়ী। আগে থেকে আটঘাট না বাঁধলে ভরাডুবি হবার আশঙ্কা, ক্যারী ফরওয়ার্ড করা যায় না।

দিল্লীর বড়কর্তাদের বিলাস—ফ্যাক্টরির ক্ষতি হোক বা না হোক—কারণে-অকারণে ঘন ঘন রাজধানীতে ডেকে পাঠাও। বড় কর্তাকেই যে সব সময় যেতে হবে এমন কোন কথা নেই। এ-ব্যাপারে রূপেশ্বর কিন্তু আগ বাড়িয়ে সাড়া দেয়। রূপেশ্বরের ধারণা এমন কিছু কাজ আছে, যা অন্যকে দিয়ে হয় না। রূপেশ্বরের বদ্ধমূল ধারণা ঃ কোন কিছুই যখন দিল্লীকে বাদ দিয়ে হবার উপায় নেই, তখন সবচেয়ে যেটা জরুরী, তা হল তদবির ; দিল্লীতে ঘন ঘন গিয়ে চাট মশলা মেশান খাদ্য বস্তু পরিবেশন করাটাই সমীচীন। বিশেষ করে রূপেশ্বর যখন স্পষ্ট দেখছে গঙ্গাধরের রেপুটেশনের কার্ভটা ক্রমাগত উপরের দিকেই উঠছে। গঙ্গাধরকে শুধু কাজ দিয়ে ভুলিয়ে রাখলেই চলবে না ; সে যেন ঘরের শত্রু বিভীষণ না হয়ে দাঁড়ায়, সেদিকেও কড়া নজর রাখা দরকার।

ইব্রাহীম নিরক্ষর মিস্ত্রি। বিলেতের সর্বাধুনিক একটা অকেজো মেসিনকে চালু করে দেবার ক্ষমতা সে রাখে। একথা তড়িৎ-প্রবাহের

মত সমস্ত ফ্যাক্টরিটাকে নাড়া দিয়ে গেল। আত্মবিশ্বাসের দমকা হাওয়া বয়ে গেল সব ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে। গঙ্গাধর এই অনুকূল পরিস্থিতিকে পুরোদমে নিজের কাজে লাগালেন। অনেক দিন ধরে সাহেব এক্সপার্টদের বিলাস-ভ্রমণ ও বিভ্রান্তিকর আচরণ তিনি লক্ষ্য করে আসছিলেন। সুযোগ ও সুবিধে মত তিনি তাদের তাড়াতে থাকেন। নানাভাবে নানা সুযোগ এল। কাজের অযোগ্য যারা, তাদের তিনি আগে থেকেই মেমো ইস্যু-করে যাচ্ছিলেন। নিজেদের সংশোধন করা ত দূরের কথা, তারা চার্জ-শীটের উত্তরে উদ্ধত ভাবই প্রকাশ করতে থাকে। ফলে, তাদের একে একে বিদায় করতে গঙ্গাধরের সামান্যমাত্রও বেগ পেতে হয় না।

এদের মধ্যে দু-একজন নিজেরাই সুযোগ করে দিল। গঙ্গাধর একদিন গাড়ি করে ফ্যাক্টরির দিকে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যা হয় হয়। দেখেন, এক সাহেব অত্যধিক মদ গিলে ফ্যাক্টরির এক কর্মীর গলা জড়িয়ে ধরে টলতে টলতে চলেছে। তর্জনী তুলে কি যেন বলে চলেছে। ফেরার পথে গঙ্গাধর দেখেন ঐ সাহেব ড্রেনের পাশে পড়ে আছে ঐ অবস্থায়। গঙ্গাধর অ্যাম্বুলেন্স্ ডেকে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। ডাক্তারকে ফোনে বলে দিলেন যে সাহেবকে মদোমত্ত অবস্থায় ড্রেনের পাশে পাওয়া গেছে। গঙ্গাধর নিজেই অ্যাম্বুলেন্স্ ডেকে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ডাক্তার যেন তাকে একটা সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেন। মদোমত্ত সাহেবকেও ভারত ছাড়তে হল।

সারা ফ্যাক্টরিতে এই নিয়ে শোরগোল পড়ে গেল। সাহেব তাড়াবার নিগূঢ় রহস্য রূপেশ্বর কিন্তু জানতেন না। রূপেশ্বরের ওপর প্রচণ্ড চাপ আসতে লাগল, তিনি যেন এসব বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। সাহেবদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলাই যেখানে ভারতীয়দের পক্ষে একটা দুরূহ ব্যাপার, সেখানে সাহেব তাড়াবার কথা ত কল্পনাতীত। প্রথমে খবরটা রূপেশ্বর হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরে যখন এক এক করে তারা বিদায় হতে লাগল আর ফ্যাক্টরির বিদেশী-বর্জিত ব্যারন্ ল্যাণ্ড হয়ে দাঁড়াল তখন রূপেশ্বরের মাথায় বাজ পড়ল। ভাবলেন, এখন কী হবে? প্রথমে রূপেশ্বর খুব চটে গেলেন। তাঁকে কোন কিছু না জানিয়ে, এতবড় একটা ব্যাপার তাঁর সঙ্গে কোন শলাপরামর্শ না করে কি করে সম্ভব হল। গঙ্গাধর এসব কি করছে। এনিয়ে তিনি দিল্লীর সঙ্গে লড়ে যাবেন ভাবলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল গঙ্গাধর যা করছে, তাতে তিনিই উল্টে দিতে পারেন। ক্ষমতা আসলে কার—গঙ্গাধরের না রূপেশ্বরের। এখনই তার মোকাবিলা হয়ে যাক। রূপেশ্বর তৈরী। অতএব 'যুদ্ধং দেহী'। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, সাহেবদের কাজকর্ম সম্পর্কে কোন কিছুই তিনি ত রাখেন না। কোথায় কখন কোন কাজটা করেনি বা করতে

গিয়ে গাফিলতি করেছে অথবা কতৃপক্ষ যা করতে বলেছে, তা বিপর্যস্ত করে দেবার কোন ষড়যন্ত্র করেছে কিনা আর ঔদ্ধত্য দেখাতে গিয়ে গঙ্গা-ধরের কাছ থেকে কত মেমো পেয়েছে--এসব খুঁটিনাটি বিষয় তারত কিছুই জানা নেই। এখন ফাইল চেয়ে পাঠালে গঙ্গাধর দেবে কি না সন্দেহ। ফাইল না দিলে, কেন দিচ্ছেনা, তা নিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু করলে, দিল্লী কিভাবে এটা দেখবে, কতটা সহযোগিতা করবে এ ব্যাপারে এই মুহূর্তে রূপেশ্বর তা ঠিক বুঝতে পারছেন না। কাঁচা মানুষ গঙ্গাধর মোটেই নয়। সে যখন এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন সব আঁটঘাট বেঁধেই করেছে। এতটা সাহসের পরিচয় শুধু কি নিজের জোরেই করেছে, না, মিশ্রসাহেব ওকে টিপে দিয়েছেন বলেই করছে, সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দিল্লীর সঙ্গে সংযোগ রেখে গঙ্গাধর এসব করে যাচ্ছে কিনা তাও ঠাহর করার উপায় নেই। এত বড় সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে নিশ্চয় কোন বড় চাঁইয়ের সমর্থন আছে। গঙ্গাধর স্বাভাবিক কারণেই তা বলবে না। সাহেবদের তাড়ানোর কেন এত প্রয়োজন হয়ে পড়ল, তার আসল কারণটা রূপেশ্বরের জানা থাকলে তিনি নিজেই দিল্লীর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। ব্যাপারটা ভালভাবে না জেনে হঠাৎ কাউকে টেলিফোন করেনই-বা কী করে? পরে জানাজানি হয়ে গেলে এটাই প্রমাণ হয়ে যাবে যে রূপেশ্বর ম্যানিজিং ডাইরেক্টর হয়েও ফ্যাক্টরির কোন খবরই রাখে না। সেটা হিতের বিপরীত হবে। শেষ পর্যন্ত কোপটা হয়ত তাঁর ঘাড়েই এসে পড়বে। গঙ্গাধরের ব্যাপারে যেসব মিসাইল্ তিনি অস্ত্রাগারে জমা করে রাখছেন, অসময়ে সেসব অস্ত্র নিক্ষেপ করলে নিজেই কুপোকাত হয়ে যেতে পারেন। কোন কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছেন না রূপেশ্বর। দেখছেন, সাহেব তাড়িয়েও গঙ্গাধরের কোন কিছু এসে যায়নি। সে আগের মত দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে। ঝড়ের মত কাজ করে যাচ্ছে, রূপেশ্বরের মনে হল কাজ দেখিয়ে গঙ্গাধর তাকে আরও বেশী ভড়কে দিতে চায়। গঙ্গাধরের কাণ্ড-কারখানা দেখে তিনি মনে মনে আঁতকে উঠলেন। ভাবনায় আর দুশ্চিন্তায় দিশেহারা হয়ে রূপেশ্বর গঙ্গাধরকে ডেকে পাঠালেন।

বরাবরই গঙ্গাধর যেভাবে রূপেশ্বরের ঘরে ঢোকেন, ঢুকতে ঢুকতে যেভাবে নানানপ্রশ্নে জর্জরিত করতে থাকেন, আজও কিন্তু তার কোন ব্যতি-ক্রম হল না, রূপেশ্বর তা লক্ষ্য করলেন। শশব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে ঠিক আগের মতই প্রশ্ন করলেন গঙ্গাধর। যখনই কোন ইম্প্যরট্যান্ট্ কাজে ব্যস্ত থাকি তখনই আপনি ডেকে পাঠান। কি ব্যাপার বলুন?

রূপেশ্বর ভাবলেন বলবেন, ব্যাপার তো অনেক কিছুই, তোমাকে কি সব বলা যায় গঙ্গাধর? কতটা দিল্লীকে হাত করেছ, তা কি আমি জানি না, কিন্তু মনের কথা অত খোলাখুলি বলার মত সম্পর্ক এখন আর নেই।

তাই মনের কথা মনেই রেখে শুধু বললেন —স্টুয়ার্ট এসে বলল, কয়েকজন সাহেবকে নাকি তুমি তাড়িয়েছ। আরও কয়েকজনকে নাকি ফ্লিমজি গ্রাউণ্ডে তাড়াতে চাইছ?

এসব প্রশ্নের মধ্যে কতটুকু কৌতূহল, কতটুকু পলিটিকস্, কতটা ওপর মহলের চাপ, গঙ্গাধরকে ফ্যাসাদে ফেলার কতটা অভিসন্ধি কিংবা খবর বার করার কতটা গূঢ় অভিপ্রায়—এসব ব্যাপার নিয়ে গঙ্গাধর কোনকালেই মাথা ঘামান না। রূপেশ্বরের প্রশ্নের তিনি সোজাসুজি জবাব দিলেন—হ্যাঁ, দু-চারজন যারা বাকি আছে, তাদেরও আর প্রয়োজন হবে না বলে মনে হচ্ছে।

—সে কি! করছ কী? সবগুলোকে তাড়িয়ে দিলে তুমি মুশকিলে পড়বে না, আমরা মুশকিলে পড়ব না? দিল্লীইবা কি বলবে, কি ভাববে, এসব কি ভেবে দেখেছ?

গঙ্গাধর জানেন, দিল্লীর মনোভাব কি। কথার পিঠে কথা দিয়ে সেটা বার করতেই রূপেশ্বরের এত টালবাহানা। এ-ব্যাপারে দিল্লীর কতটা সমর্থন আছে বা আদৌও আছে কিনা, তা রূপেশ্বর শত চেষ্টা করেও এখনও সঠিক জানতে পারেননি। জানতে পারেননি বলেই তিনি গঙ্গাধরের সামনেই টোপ্‌টা ফেলেছেন আর ভাবছেন, সেই টোপে গঙ্গাধর সহজে ধরা দেবেন। কিন্তু গঙ্গাধর রূপেশ্বরের কোন প্রশ্নেরই সঠিক জবাব দিলেন না। শুধু ফ্যাক্টরির উৎপাদনের সর্বশেষ চার্টটা রূপেশ্বরের সামনে তুলে ধরলেন।

চার্টটা হাতে নিয়ে রূপেশ্বর কি যে দেখলেন তা তিনিই জানেন। একবার সেটায় চোখ বুলিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন--সে ত না হয় হল, প্রডাকশন না হয় বাড়ল। একটা অপ্রিয় কথা যদি তোমায় বলি আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না। তুমি দেখাচ্ছ প্রডাকশন বেড়েছে, তাত এতদিন সাহেবরা ছিল বলেই।

অন্য সময় গঙ্গাধর এসবের কোন উত্তর দেন না। কিন্তু আজ ভাবলেন, এসব ব্যাপারে রূপেশ্বর যে কিছুই জানেন না, তার জন্য কি তিনি নিজে দায়ী? মোসাহেবী করে যা জানা যায়, তার মধ্যে থাকে খানিকটা শঙ্কা, গালগপ্প আর সত্যের অপলাপ। আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা সত্যিকারের কাজ করছে। বিলাসবহুল কক্ষে বসে সাহেবরা ওদের মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে। উল্টোপাল্টা নক্‌সা পাঠাচ্ছে। আগেরটা পরে, পরেরটা আগে। এ নিয়ে যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন গঙ্গাধর ও তাঁর সহযোগী ইঞ্জিনীয়াররা, এসব জানার আগ্রহই বা রূপেশ্বরের নেই কেন? কাজের ব্যাপারে কোন খোঁজখবর রাখার বালাই নেই, শুধু বাধা দেবার ব্যাপারেই আমি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সোরগোল তোলার পূর্ণ অধিকার

আমি রাখি; এটা কোন যুক্তি? এ যুক্তি যদি গঙ্গাধর মেনে নিতেন, তাহলে ফ্যাক্টরিকে আজ তিনি এই পর্যায়ে তুলতে পারতেন না। মনের ভেতর এসব তোলপাড় হতে থাকলেও অতি সংক্ষেপে দু-চার কথাতেই গঙ্গাধর দু-আড়াই বছরের গোটা ইতিহাসটা বলে গেলেন। আপনি যা বলছেন, তা ঠিক নয় মিঃ সিংহ। ওরা বহুদিন ধরেই হাত গুটিয়ে বসে আছে। কাজে রীতিমত বাধার সৃষ্টি করছে। ভুল-ভাল নক্‌সা পাঠাচ্ছে। অনেক জরুরী নক্‌সা আমরা চেয়ে পাঠিয়েছি, রিমাইন্‌ডার দিয়েছি। কোন ফল হয়নি। খুবই দুঃখের কথা, কোল্লাবরেটর হিসেবে ওরা যা করছেন, আমরা নেহাতই অপারগ বলে এতদিন সহ্য করেছি। এখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এমন অনেক নক্‌সা পড়ে আছে যা কোন কাজেই লাগেনি। নিজেরাই ওসবের সমাধান করেছি। এরজন্য দিনরাত পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাও আমরা ওদের কিছু বলিনি। আর নয়, অনেক হয়েছে, এ ধরণের গাফিলতির লিখিত প্রমাণ আমার হাতে। ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কাছে স্টুয়ার্ট যে কথাটা বলে যেতে সাহস পায়, সেই একই কথা জেনারেল ম্যানেজারকে বলার সাহস স্টুয়ার্টের নেই। তা যদি থাকত তাহলে আপনার কাছে না এসে আমার কাছেই আসত। কিন্তু আসেনি, না এসে ভালই করেছে। আমাদের প্রতি কাজে পদে পদে ওরা কিভাবে বাধা দিয়েছে তার সমস্ত প্রমাণ আমার কাছে আছে। প্রয়োজনবোধে তা দেওয়া যাবে। অন্ধকারে কিভাবে আমরা হাতড়ে মরেছি তা আমরাই জানি। এরপরও কি আপনি বলবেন যে ওরাই সব করে দিচ্ছে। হিসেবে আপনার ভুল হচ্ছে। এটাই শুধু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আমার মনে হয় সঠিক খবর আপনার কাছে সব সময় ঠিকমত পৌছঁয় না। ফ্যাক্টরির সব ব্যাপার আমাকেই সামলাতে হয়। তাই এসব আমাকে জানতেই হয়। আপনাকে শুধু একটা কথা বলে যাই যাতে আপনার দুশ্চিন্তা কিছুটা কমে। দিল্লী যদি এ ব্যাপারে আপনাকে কিছু লেখে, সেই চিঠি বা সেই ফাইলটা শুধু আপনি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। আপনার হয়ে আমি না হয় জবাব দিয়ে দেব।

ভেতরে যে এতসব ব্যাপার ঘটেছে রূপেশ্বর তা ভাবেননি। সবশুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন। মুখ দিয়ে শুধু অস্ফুট একটা কথা বেরিয়ে এল—লেকীন বদনাম—?

—বদনামের অত পরোয়া করলে চলে না। দেশ এখন স্বাধীন। সাহেবরা এখন দেশ চালাচ্ছে না, এখন ওরা স্রেফ ট্রেডার। ট্রেডারদের কিভাবে ম্যানেজ করতে হয়, সেটা আমার অজানা নয়। সমস্ত সিদ্ধান্তই এখন দেশের স্বার্থেই হওয়া দরকার। এছাড়া, প্রডাকশন চাটটা ত দেখলেন।

যতদূর মনে পড়ে আপনাকে আমি একটা কপি এনডোর্স করেছিলাম। অনেক কাগজের মধ্যে হয়ত সেটা চাপা পড়ে আছে। উৎপাদন বাড়ছে, তা যার জন্যেই বাড়ুক, তখন বদনামে অত ভয় পাচ্ছেন কেন? আপনাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি--আমি যখন যেটা ধরি, মাঝপথে সেটা ছেড়ে দিই না। এটাই আমার চরিত্রের দোষ বা গুণ। যা করার তা আমি করব, আপনার কাজ শুধু প্রডাকশনের চার্টটা মিলিয়ে যাওয়া, কমছে, না, বাড়ছে। আপনার নিজের চার্টটা হয়ত খুঁজে পেতে দেরী হবে, আমার-টাই বরঞ্চ রাখুন। বলেই গঙ্গাধর বেরিয়ে এলেন, দাঁড়ালেন না।

রূপেশ্বর কি একটা ছুতো করে সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীতে উধাও। ফিরে এসে দেখেন যে দু-চারজন সাহেব লাইটহাউজের মত আলো দিচ্ছিল, তাদেরও গঙ্গাধর হটিয়েছেন। শুধু বড় কর্তাদের হাওয়া দিয়েও কিছু সুবিধে হল না। বিশেষ কিছুই জানতে পারলেন না রূপেশ্বর। নীচের মহলকে খুব উৎসাহিত দেখলেন। সবাই একবাক্যে বলল--গঙ্গাধরের মত সাহস যদি আরও দু-চারজনের থাকত, তবে দেশেরচেহারাই পাল্টে যেত। নীচের মহলের চিন্তা-ধারণাটা যদি উঁচু মহলে প্রতিফলন হয়, তবে ত বেশ দুশ্চিন্তার কথা। সাহেব থাকল কি গেল--সেটা নিয়ে গঙ্গাধরের সঙ্গে লড়াই করাটা বোধহয় ঠিক হবে না। ওঁর সঙ্গে সত্যিই যদি লড়াই করতে হয়, তবে অন্য কোন বড় ব্যাপার নিয়ে করাই ভাল, ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা উচিত নয়। রূপেশ্বর তাই বেমালুম সব হজম করে গেলেন।

সাহেব-বর্জিত মরুদ্যানে উৎপাদন বেড়েই চলে। পার্লামেন্টে খুব তারিফ হল; সেক্রেটারি মিশ্র সাহেবের কন্‌গ্রাচুলেটরি চিঠি এল গঙ্গাধরের কাছে; সেটা তিনি পাঠিয়ে দিলেন রূপেশ্বরের কাছে। কিন্তু যে আনন্দে রূপেশ্বরের বুক আজ ফেটে যাচ্ছে, তা হ'ল তাঁকে লেখা মন্ত্রীমহোদয়ের চিঠি। কন্‌গ্র্যাচুলেশন জানিয়েছেন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে রূপেশ্বরকেই। রূপেশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি আজকের, বহুদিনের। যখন বিহারে তিনি রাজনীতি করতেন, তখন। রূপেশ্বর অবাক হয়ে দেখে, মন্ত্রীমহোদয়ের চিঠি, এত বড় একটা ঘটনা, ওসব গঙ্গাধরের কাছে যেন কিছুই নয়। কোন ব্যাপারেই গঙ্গাধর বিচলিত নন।

খোস মেজাজ নিয়ে রূপেশ্বর গঙ্গাধরকে ডেকে পাঠিয়েছেন। গঙ্গাধর এসে চিঠিটা দেখে কি বলবে রূপেশ্বর তা জানেন। সুখে-দুঃখে সবেতেই তার অবিচলিত ভাব। মা ফলেষু কদাচন। শুধু এক কথা, কাজ চাই, আরও কাজ। যে যেখানে, যেমনভাবে আছ, দেশের কথা ভেবে কাজ কর। পাগল! বদ্ধ পাগল!

গঙ্গাধর এসে বললেন—কহিয়ে ক্যেয়া বাত হ্যায়?

—নহী, কহ রহা থা কি—

—যা বলতে চান, স্পষ্ট করেই বলে ফেলুন না।

রূপেশ্বর কাগজ-ভরা ড্রয়ারটা খুলে মন্ত্রীমহোদয়ের চিঠিটা বার করে অতি সন্তর্পনে গঙ্গাধরের হাতে দিলেন। মুখখানা গর্বে ও আনন্দে লাল হয়ে ওঠে।

গঙ্গাধর চিঠিটা পড়লেন, শুধু—একটু হেসে বললেন—ওঃ এই কথা। এইজন্যে ডেকেছিলেন। আমি চললাম, অনেক কাজ। রূপেশ্বরের আসল মনোভাবটা জানবার জন্যে ঠাট্টা করে বললেন—আপনি বরং এক কাজ করুন। অফিসারদের একটা পার্টি দিন, আমিও থাকব এই পার্টিতে। ওখানে চিঠিটা পড়ে শোনাবেন। প্রডাকশন যে ওদের জন্যেই বাড়ছে, এই সুযোগে না-হয় ওদের একটু তারিফ করলেন। ওরাও খুশী হবে, আপনার মত ওরা আত্মবিশ্বাস আবার ফিরে পাবে, গর্ববোধ করবে।

কথাটা শুনেই রূপেশ্বর আঁতকে উঠলেন । গঙ্গাধরকে উপদেশ দেবার ছলে বললেন—নহী, নহী। এইস্যা কাম কভী ন করো। বুরোক্র্যাসি আমাদের একটা জিনিস শিখিয়েছে, এত বিশাল ভারত সরকার যার ওপরে চলছে। বুরোক্র্যাসির মূল কথা ঃ যা না বললেও চলে, তা কখনও বলবে না। ঘন ঘন প্রশংসা করা চলবে না। ওটা জাতপাতের মতই ছোঁয়াচে। ফ্যাক্‌টরির সর্বাঙ্গীন উন্নতির ক্ষতিকারক ওটা।

—আপনি যা ভাল বুঝবেন, করবেন। আমার বলার কথা বললাম। আমি চললাম এখন।

—অরে বৈঠো না,

রূপেশ্বর ভাবেন, এই কাজ কাজ করে মানুষটার মধ্যে ফিলিংস-টিলিংসের কোন বালাই নেই। আরে কাজত সবাই করে। তাবলে কি আর সব খোয়াতে হয়। মৈত্রেয়ীতো সেদিন বলছিল, আজকাল গঙ্গাধর ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া করে না। সরকারী চাকরী করতে এসে নিজের স্বাস্থ্যটাই যদি ভেঙ্গে ফেল গঙ্গাধর তবে সেটাকি দেশের ক্ষতি নয়? বড় সাধ করে ফুলের বাগান করছো, ফুল তুলবেনা, সেকি হয়। অনেক মেহনত করে ফল ফলিয়েছ, ফল ফলেছে, তুলে খাবে না। এ আবার কেমনতর কথা! গঙ্গাধর, তোমার স্বাস্থ্য অটুট রাখাটা আমার স্বার্থেই দরকার।

নিজের কথার সুর টেনেই রূপেশ্বর আবার বললেন—কাম তো হ্যায় হী, বই তো তুম কিসী তরহ করহী লৌগে। বৈঠো তো সহী—।

গঙ্গাধরের ভাবের কোনও পরিবর্তন হল না। একটু বিরক্ত হয়েই তিনি বললেন—বেশী 'বৈঠ, বৈঠ' করলে ওদিক যে যাবে।

—আরে তা কি হয়, বলতে বাধা নেই, যা-কিছু হচ্ছে তা ত তোমার জন্যই।

—আর কিছু বলবেন? আমি চললাম।

—অরে ঠেহর যাও। গদগদ কন্ঠে রূপেশ্বর আবার বললেন—অফি-সারদের আমি পার্টি দিতে রাজি, সবাইকেই ডাকব। ইউনিয়নের নেতাও দু-একজন থাকুক। দু-একজন কর্মীকেও ডাকা যেতে পারে যাদের তুমি বলবে। ঐ পার্টিতে আমি একটা ছোট্ট ভাষণ দেব। বলব, কিভাবে ফ্যাক্টরিটাকে তুমি আবার নতুন করে গড়ে তুলেছ একক প্রচেষ্টায়, হ্যাঁ, একক প্রচেষ্টাতেই। ভারতরত্ন পাবার যোগ্গী তুমি, কিভাবে সাহেব তাড়ালে এক এক করে, হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন রূপেশ্বর। তাজ্জুব কী বাত হ্যায়, তুম্ ভারতমনী হো—।

হঠাৎ রূপেশ্বর থেমে গেলেন। দেখেন গঙ্গাধর উঠে পড়েছে।

—অরে! ক্যায়া বাত হ্যায়, বৈঠো না।

—বলুন।

—ইংল্যাণ্ডের কোলাবরেটর কম্পানীর সর্বময় কর্তা স্যর রিচার্ড আস-ছেন, দিল্লী আমাকে যেতে বলেছে।

চলে যান। কথাটা বলেই গঙ্গাধর বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রূপেশ্বর যাবে স্যর রিচার্ডের মত দুর্ধর্ষ বিজিনেস ম্যাগনেটের সঙ্গে কথা বলতে। স্যর রিচার্ডের সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান সব কিছুই করেছেন গঙ্গাধর। আর চূড়ান্ত আলোচনার সময় দিল্লী রূপেশ্বরকে ডেকে পাঠি-য়েছে! কাজের বেলায় গঙ্গাধর, আর দিল্লী যাবার সময় রূপেশ্বর। গঙ্গাধর মনে মনে প্রমাদ গোনেন, তবু মুখে বললেন—যান, ঘুরে আসুন। কি রকম কি আলোচনা হয়, জানাবেন। কথাটা বলেই গঙ্গাধর ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন।

রূপেশ্বর ভেবেছিলেন, স্যর রিচার্ডের ব্যাপারটা যখন তাঁর পুরোপুরি জানা নেই, তখন গঙ্গাধরকেই দিল্লী যেতে বলবেন। রিচার্ডের দিল্লী আসবার গূঢ় কারণটা কি? সাহেব তাড়ানর ব্যাপার নিশ্চয়ই। গঙ্গাধরের এবার বেজ্জতি হবেই। তাই রূপেশ্বর উপস্থিত থাকলে সময়মত গঙ্গাধরের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে পারবেন। গঙ্গাধর কিন্তু কিছুই বলল না। গঙ্গাধর কিছু না বলে চুপচাপ চলে য়াওয়াতে রূপেশ্বর নিজেকে বড় অসহায় বোধ করলেন। স্যর রিচার্ড ফ্যাক্টরির এক্সপ্যানশন্ নিয়ে কথা বলতে ত আসছেন না। নতুন যে কোলাবরেশন হবে, যা নিয়ে নানা পর্যায়ে নানা আলোচনা হয়েছে, তার ফয়সলা করতেই কি আসছেন? এক্সপ্যানশনের জন্যে কত কোটি টাকা খরচ হবে, তাওত সম্ভবত ঠিক হয়ে গেছে। চিঠি-পত্রে যেটা ঠিক করা যায়নি, সেটা যে আসলে কি, রূপেশ্বর অনেক ভেবেও ঠিক মনে করতে পারলেন না। ফাইলও ত সব গঙ্গাধরের কাছে। এক-বার যে চোখ বুলিয়ে নেবেন, তারও উপায় নেই। হঠাৎ মনে পড়ল যে

কয়েকটা বিষয় এখনও ঝুলে আছে, তার মধ্যে কোলাবরেশনের ফীস ও আছে। শুনেছিলেন ও নিয়ে যে ফাঁস লেগেছে, তা আর সহজেই খোলা যাবে না। টুকরো টুকরো সব মনে পড়ছে রূপেশ্বরের। কিন্তু একটার সঙ্গে অন্যটার যে কী সম্পর্ক তা ভাবতে গিয়ে বারবার খেই হারিয়ে যায় রূপেশ্বরের। তাঁর এই অসহায় অবস্থার জন্য গঙ্গাধরই দায়ী। যত তিনি ভাবেন, ততই রাগটা গিয়ে পড়ে গঙ্গাধরের ওপর। আসলে সমস্ত ব্যাপারটা নখদর্পনে থাকলে বেশ একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে দিল্লী যাওয়া যায়। কিন্তু তা না-থাকায় শত চেষ্টা করেও রূপেশ্বর সেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পাননা। নিছক অনুমানের ওপর নির্ভর করেই সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে থাকলেন। অথচ গঙ্গাধর এর প্রতিটি বিষয়ে রূপেশ্বরের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তখন রূপেশ্বর ভাবতেন, গঙ্গাধর যখন সমস্ত ব্যাপারটা এত ভাল বোঝে তখন গঙ্গাধরই ওটা নিয়ে ডীল করুক। এখন ফাইলপত্র চেয়ে পাঠানটা ঠিক হবে না। গঙ্গাধর ভাববে, কোন কিছুই রূপেশ্বর জানেনা, অথচ দিল্লী যাবার শখ। তাই ফাইল চেয়ে পাঠানটা ঠিক হবেনা। এতে গঙ্গাধরের কাছে রূপেশ্বরের ইমেজ নষ্ট হয়ে যাবে। তা করা চলবে না। খোলাখুলি আগের মত আর কিছু গঙ্গাধরকে বলা যাবে না।

দিল্লীতে গিয়ে দুদিনেই রূপেশ্বর প্রমাদ গোনেন। রূপেশ্বরের আসল রূপ বেরিয়ে পড়ল। তিনি আর হালে পানি পান না। সেক্রেটারী মিশ্র ফোন করে গঙ্গাধরকে বললেন—রূপেশ্বর কি সব উল্টোপাল্টা বলছে। সব ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছে। সব পণ্ড হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। তুমি ইমিডিয়েটলি চলে এস। এক্ষুণি যদি কোন ফ্লাইট জায়গা পাও, তাতেই চলে এস। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

প্লেনে যেতে যেতে গঙ্গাধর ভাবছিলেন—মিশ্র সাহেবের নির্দেশে এখন তাঁকেই যেতে হচ্ছে। রূপেশ্বরের এতে মান-মর্যাদা কি বজায় রইল? রূপেশ্বরের সব ব্যাপারেই পলিটিক্স। মিনিষ্ট্রিতে ওঁকে সাহায্য করার মত লোকেরত অভাব নেই। গঙ্গাধর সে কথা জানেন, কিন্তু পলিটিক্স করে কি সব সময় সব দিক সামলান যায়? অথচ যখন মিশ্র সাহেব বেশ একটু উত্তেজিত হয়েই বলেছিলেন—রূপেশ্বরকে কেন পাঠালে? তুমি নিজে কেন এলেনা? এক মুহূর্তের জন্য ভেবে পেলেন না কি উত্তর দেবেন গঙ্গাধর। তখন হয়ত বলতে পারতেন, রূপেশ্বর কি কারুর কথা শোনে, আগ বাড়িয়ে চলে গেল। আমার কি বাধা দেওয়া সাজে, শত হলেও রূপেশ্বর এম, ডি,। তাই মিশ্র সাহেবকে বলেছিলেন, বিশেষ একটা জরুরী কাজ ছিল; তাই ভাবলাম উনি যখন যাচ্ছেন, তখন দুজনের গিয়ে কি লাভ।— কি আশ্চর্য, মিশ্র সাহেব বললেন, স্যার রিচার্ডকে সামলান কি রূপেশ্বরের কাজ? তুমিও যেমন!

গঙ্গাধর যাবার সঙ্গে সঙ্গে রূপেশ্বর পালিয়ে বাঁচলেন।

স্যর রিচার্ডের সঙ্গে আলোচনা শুরু হল। নানা তর্ক-বিতর্ক, বাত-বিতণ্ডা।

স্যর রিচার্ড বললেন—আপনারা যা করলেন, এটা অন্যায়।

গঙ্গাধর প্রতিবাদ করে উঠলেন, বললেন—আপনারাও যা করেছেন, সেটা আরও অভাবনীয়, আরও বেশী অন্যায়।

—আমরা কী করেছি? স্যর রিচার্ড ভ্রূ কোঁচকালেন।

—আপনারা ঠিকমত সাহায্য পাঠাননি। নক্সা পাঠিয়েছেন, এক নম্বরের জায়গায় পাঁচ নম্বর, পাঁচের জায়গায় বারো। প্রথমে ভেবেছিলাম, হয়ত-বা পাঠাবার সময় ভুল হয়ে থাকবে। পরে বুঝলাম, দ্যাট্ ওয়াজ দ্য প্ল্যান। এতসব বাধা সত্ত্বেও কাজটা আমরা ঠিকই করেছি। অ্যাণ্ড্ উই হ্যাভ ডান্ ইট্ ইন্ স্পাইট্ অব ইউ।

স্যর রিচার্ড ব্যঙ্গ করে বললেন—মিঃ মিশ্র ইওর জেনারেল ম্যানেজার ওয়ানট্স্ টু চিউ মোর দ্যান হী ক্যান স্যোয়ালো।

—পারডন্ মী স্যর—অ্যাই ক্যান্ বেট্ ওনলি ম্যাই জব। আমরা মিটিং বন্ধ করে এক্ষুণি ব্যাঙ্গালোরে যাব। আপনাকে আমি আগে দেখাব আমরা কি করেছি তারপরে আলোচনায় বসব, তার আগে নয়। সব দেখেশুনে যদি বলেন, আমরা কিছুই পারিনি, তবে এক্ষুণি আমি চাকরীতে ইস্তফা দেব।

মিশ্র সাহেবও কিছু কম যান না। তিনি সায় দিয়ে বললেন—তাহলে ব্যাঙ্গালোরে যাওয়াই ঠিক। আপনারা ক-জন যাবেন স্যর রিচার্ড? আমি পি. এ.-কে প্যাসেজের বন্দোবস্ত করতে বলছি।

স্যর রিচার্ড যেন একটু দমে গেলেন। তিনি মনে মনে ভাল করেই জানেন জেনারেল ম্যানেজার কি জাতের মানুষ। ওঁর কাছে যেটুকু ধরা পড়েছে—ওটুকুই থাকুক। বেশী ঘাঁটালে ব্যাপারটা আরও জটিল হবে, ঝামেলা বাড়বে। তাই তিনি কথার সুর পালটে নিয়ে বললেন—লেট্ অ্যাস্ দেন ডিসাইড্ অন্ দ্য লেটেস্ট কলাবরেশন্ প্ল্যান এ্যণ্ড ফীস্।

কলাবরেটর চাইছিলেন সাড়ে চার মিলিয়ন পাউণ্ড।

গঙ্গাধর সেটাকে আড়াই মিলিয়নে নামিয়ে নিয়ে আসতে চান। একজন পরিচিত ডেপুটী সেক্রেটারীকে পাশের ঘরে ডেকে এনে বললেন—তুমি এখানে বসে যত ইচ্ছে চা-কফি খাও। এই রইল ৫৫৫-এর টিন। আমি অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি, তোমাকে ওরা আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর জুগিয়ে যাবে কফি। আমি সেক্রেটারী মিশ্র সাহেবের ঘর থেকে তোমাকে একটা ফলস্ টেলিফোন করব, তুমিই যেন আমাদের ফিন্যান্স সেক্রেটারী। টেলিফোনে তোমাকে আমি যে অংকটা বলব, তুমি শুনে ভয়ানক আপত্তি

তুলে বলবে, ইম্পসিবল্, ফিন্যান্স ওন্ট্ অ্যগ্রী। আসলে ওরা চাইছে চার মিলিয়ন, আমরা সেটাকে আড়াই মিলিয়নে নামিয়ে আনতে চাই। এবার বুঝলে ব্যাপারটা। সাড়ে চারকে কমিয়ে আমি বলব সাড়ে তিন, আর তুমি আপত্তি তুলবে। তখন তুমি আড়াই মিলিয়নের অংকটা দিয়ে বলবে, এটাতে মনে হয় ফিন্যান্স আপত্তি করবে না।

গঙ্গাধর এ-ব্যাপারটা সেক্রেটারী মিশ্র সাহেবকে আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন।

মিটিং-এ নানা বিষয়ে আলোচনা হতে লাগল। কোলাবরেশনে এবার কত লোক বিলেত থেকে আসবে, এবং কারা আসবে, সে বিষয়ে ফয়সালা হয়ে যাবার পর, স্যর রিচার্ড বললেন—রেট যা আমরা দিয়েছি, ওটা মিনি-মাম্। ওর থেকে আর কম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

গঙ্গাধর তখন মিশ্র সাহেবকে বললেন—আপনি কী বলেন?

মিশ্র সাহেব খুব মোলায়েম সুরে বললেন—দিস্ সিমস্ টু বী ভেরী মাচ্ অন্ দ্য হাই সাইড্।

গঙ্গাধর কথাটা লুফে নিয়ে বললেন—আমিও ত তখন থেকে স্যর রিচার্ডকে সেটাই বোঝাবার চেষ্টা করছি।

—অল্ রাইট, স্যর রিচার্ড বললেন—থ্রি পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন পাউণ্ড। দিস্ ইজ্ দ্য ম্যাক্সিমাম্ রিডাক্শন্ উই ক্যান্ অফার।

গঙ্গাধর বললেন—এটা নিয়ে তাহলে ফিন্যান্স সেক্রেটারী শ্রীনিবাসনের সঙ্গে একবার কথা বলে নিলে হয়। ওরা যদি নাকচ করে দেয়, তাহলে স্যর রিচার্ডকে আবার হয়ত আসতে হতে পারে, কিংবা আবার একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করতে হতে পারে। তাতেও সময় লাগবে। আপনি কি বলেন স্যর রিচার্ড?

স্যর রিচার্ড বললেন—দ্যাট্ উইল বী ফাইন।

মিশ্র সাহেবও বললেন—সেটাই ভাল। গঙ্গাধর, তুমি ফোন কর।

গঙ্গাধর ফিন্যান্স সেক্রেটারীকে টেলিফোনে মিলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—অ্যাম্ আই স্পীকিং টু দ্য ফিন্যান্স সেক্রেটারী মিঃ শ্রীনিবাসন্। দিস্ ইজ গঙ্গাধর চ্যাটার্জী, স্যর। এঁরা বলছেন এঁরা ম্যাক্সিমাম্ কমাতে পারেন থ্রি পয়েন্ট থ্রি মিলিয়নে। আপনাদের এতে নিশ্চয় আপত্তি নেই।

ওপাশ থেকে উত্তর এল, এমন জোরে যে, ঘরের মধ্যে এঁরা সবাই তা শুনতে পেলেন। ফ্রি সিগারেট ও কফিতে গলাটা বেশ খুলে গেছে বোঝা গেল। না-না টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়নের বেশী হলে আমরা অ্যাক্সেপ্ট্ করতে পারব না।

গঙ্গাধর ফোনের মুখটা হাত দিয়ে চেপে রেখে বললেন—ওরা বলছে টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়নের বেশী হলে নাকচ করে দেবেন। শেষ পর্যন্ত

টু পয়েন্ট সেভেন মিলিয়নে রফা হল।
গঙ্গাধর হাসি মুখে ব্যাঙ্গালোরে ফিরে এলেন।

॥ চোদ্দ ॥

হউজ খাশে অলকার বাড়ির সামনে সন্দীপ গাড়িটা দাঁড় করাল। অলকা সেজেগুজে একেবারে তৈরী ছিল। হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি পরেছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ। মখমলের নীল চাদর, কপালে নীল টিপ্। নীলে নীলাম্বরী। জানলা দিয়ে দেখল সন্দীপের গাড়ি এসে দাঁড়াল। বাড়িতে বলা ছিল। হর্নের আওয়াজে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল।

সন্দীপ খুব সন্তর্পণে গাড়ির দজরাটা খুলে দিতেই অলকা পাশে এসে বসল। সূর্যের আলো এসে পড়েছে অলকার মুখে। হালকা হাওয়াতে উড়ছে ওর চুল, শাড়ি। অলকাকে এক নজরে ভাল ভাবে দেখে নিয়ে সন্দীপ মন্তব্য করে—আকাশের নীল রঙ হয় জানতাম। মানুষও যে নীলপরী হতে পারে, তা জানা ছিল না।

—এক্ষুণি বুঝিয়ে দিচ্ছি কি করে কি হয়। বোঝাবার তাগিদ যে খুব একটা আছে তা মনে হল না। সন্দীপকে আড় চোখে আর একবার দেখে নেয় অলকা।

সন্দীপ মেরুন রঙের প্যান্ট পরেছে। সার্টের ওপরে সাদা-কাল বর্ডারের একটা পাতলা সোয়েটার।

সন্দীপ জিগ্যেস করল—কোথায় যাবে?

—যেখানে খুশী।

—খুব মেজাজে আছ দেখছি। ও-রকম বেখেয়ালী মুড দেখালে আমার চাকা চারটে কিন্তু ঘুরতেই থাকবে, থামবে না কোথাও।

—তাতেও আপত্তি নেই।

কোথায় যাচ্ছি, এটা জানা না থাকলে সন্দীপের আবার কেমন যেন অস্বস্তি হয়। চলে ফিরে বেড়াতে সন্দীপও ভালবাসে। কিন্তু উদ্দেশ্যহীন

চলা ওর ভাল লাগে না। তাই বলল—দিল্লীতে বেড়াবার জায়গারত অভাব নেই। রাজধানীর চারিদিকে অজস্র পার্ক। এই সব পার্কে দুপুরে লোকে তাস পেটে, নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। আমরাও কোন একটা জায়গায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারি। নিম, জাম, অর্জুনের সঙ্গ পেয়ে মনটা হয়ত খুশীতে ভরে উঠবে। বগ্যান্‌ভিলিয়্যার আবির রঙ এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। পার্কের চারপাশে অজস্র ফুল ফুটে আছে। মালির হাতে গড়া সবুজ ঘাসে বসে ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকতে পার। কবি নই, তবু ছোটবেলার মুখস্থ-করা দু-একটা কবিতা না-হয় আবৃত্তি করে যাব।

সন্দীপের উচ্ছ্বাস দেখে অলকা হেসে উঠল।

ফুল তুলে খোঁপায় গুঁজলে মালি আপত্তি করতে পারে। তাকে খুশী করার জন্য দু-এক টাকা বকশিসও দিতে হতে পারে। গাড়ী চালান্‌ করার হুমকি দেখিয়ে পুলিশ যেমন দু-চার টাকা কামিয়ে নেয়।

খুশী খুশী মন নিয়ে অলকা মুখ টিপে হাসতে থাকে। সন্দীপ বলে চলে। অলকা বাধা দেয় না। ঘুষের অঙ্ক বাড়িয়ে দিলে ফুলের সঙ্গে ঝাউ গাছের পাতাও পাবে। মালি বুকে করে এনে ফুলরানীর হাতে দেবে। তোমার নিভৃত ঘরটাকে আলো করতে তা নাহয় একদিন করলে।

অলকা বলল—ওরকম কারণে—অকারণ বকশিস্‌ দিতে আমি পারি না। বেখেয়ালী মনে আজ না হয় তা দিতাম।

—দাঁড়াও, এখনও শেষ হয়নি, আরো আছে। নির্জন নিরালা পার্কে মুখোমুখি বসে থাকা চলে। দেখছি, সেরকম একটা মুডেই তুমি আছ। দুজনে মুখোমুখি, কোন কথা বলা চলবে না।

অলকা হেসে বলল—ওটা বোধ হয় পারব না। মাস্টারি করে কতটা লাভ হয়েছে জানি না, কিন্তু কথা বলার বদ অভ্যাস হয়ে গেছে।

দুজনেই হো হো করে হেসে ওঠে।

সন্দীপ বলল—পারবে না বলে কি চেষ্টা করবে না। তাত হয় না।

তাও ঠিক।

সন্দীপ নিজেও জানত না যে, সে এত কথা বলতে পারে। সঙ্গ দোষ আর কি।

পালামের পথে যেতে যেতে গাড়ী উল্টোমুখো করে রামকৃষ্ণপুরমের রাস্তা ধরেছে সন্দীপ। সাউথ এক্সটেনশন দিয়ে মূলচাঁদ হয়ে সোজা চলেছে সুন্দর নগরের দিকে।

সুন্দর নগরের বাজারে গাড়ী থামিয়ে বলল—চল, সুন্দর নগরের অ্যান্‌-টিক্‌ দোকানগুলো দেখি। তোমার ভাল লাগবে। অতীত ইতিহাসের সঙ্গে আধুনিক জগতের লিঙ্ক খুঁজে পাবে। তোমার পেট্‌ সাবজেক্ট। তোমার ইতিহাস মানে ত সেই একই কথা—অ্যান্‌টিকের ইতিহাস হয়ত

নতুন কিছু বলবে।

আজ কোন রূঢ় কথা বলতে অলকার মন চায় না। গাড়ী থেকে নামতে নামতে বলল—বিনম্র হয়ে ইতিহাসের ধ্বংসস্তুপের কাছে গেলে হয়ত-বা কিছু কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। আর ও-নিয়ে যারা কারবার করে তারা শুধু একটা কথাই জানে, বিনিময়ে কতটা মুনাফার অংশ বাড়বে। এ দুইয়ের মধ্যে যে তফাৎ তা বুঝতে সূক্ষ্ম বুদ্ধি লাগে।

সন্দীপ কথা না বাড়িয়ে সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ে। বলে—বুঝতে পারছি, বিরুদ্ধ শক্তিকে বিনা অস্ত্রাঘাতে তুমি রেহাই দাও না।

দোকানের সামনে বড় বড় প্যাকিং কেস। ভারতের অমূল্য সব কারু-শিল্প বিদেশে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। সূক্ষ্ম কাজ-করা বড় বড় কাঠের দরজা-জানালা, রাজস্থানী ঢঙের প্রাচীন সিংহ, বাঘের মূর্তি, রাজা-বাদশাদের কুরশী। কাঠের কয়েকটি সৈনিক মূর্তি দাঁড় করান। দোকা-নের ভেতরে কোনারকের নানা মূর্তি, সূর্য-মন্দিরের চক্র। ইমিটেশন্ কিনা বোঝার উপায় নেই। অলকার মনে পড়ে যায় কদিন আগে কাগজে পড়েছিল কয়েক কোটী টাকার বাহান্নটি অ্যান্টিক্ বিদেশে পাচার করার জন্যে দিল্লীর খান মার্কেটের একটি দোকানের দুজন ব্যবসায়ী ধরা পড়ে-ছিল। এদের লজ্জা সংকোচের বালাই নেই, টাকার জন্যে এরা সব পারে। অলকা খুটিয়ে খুটিয়ে সব দেখছিল। বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর বলল—দেখে মনে হচ্ছে কিছু কিছু জিনিস ওড়িস্যা বা দক্ষিণ ভারতের কোন মন্দির থেকে উঠিয়ে আনা হয়েছে। উঠিয়ে আনার পিছনে কত লোক যে জড়িয়ে থাকে আর কত টাকা-পয়সার লেনদেন যে হয়, তা ভাবতেও কেমন লাগে।

সন্দীপ রহস্য করে বলে, ব্যবসা করতে নেমে লেনদেনের ব্যাপারটা তোমার চেয়ে আমি ভাল বুঝি। লেনদেনের মূল কথাটা কাজ বাগানো। দেশ, ইতিহাস এসব নিয়ে অত ভাবলে, আর যাই হোক, ব্যবসা হয় না।

চিন্তাধারায় যে গরমিল দেখা দিল, তার প্রতিফলন সন্দীপের চোখে-মুখে। দেখে শুধু অলকা মুচকি একটু হাসল।

শো-রুমের অন্যদিকে বিষ্ণু, গণেশ, শিব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের মূর্তি। অলকা সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে দেখে একজন তরুণী এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—কি চাই?

অলকা একটু গম্ভীর স্বরে জবাব দিল—দেখছি।

সুসজ্জিতা স্মার্ট সেইলস্-গার্ল হেসে অভিনন্দনের ভঙ্গীতে বলল—নিশ্চয় দেখুন।

সন্দীপ বলল—ইতিহাসের ধ্বংসস্তুপের জন্যে যদি কিছু টাকা খসাতে রাজী থাক ত তোমার ঘর এসবে ভরে যাবে।

ঘরে টাকা রাখার চেয়ে এসব রাখার মূল্য অনেক বেশী। কিছু কিনবে

কি না ভেবে দেখ।

—যা দেখব, তাই যদি কিনব, তবে এ ডিস্‌প্লের প্রয়োজন কি? দোকানে ঢুকলেই যদি কিছু কিনতে হয়, তাহলে ত দোকানে ঢোকাই দায়।

অলকা সন্দীপকে বলে—তোমার এত অস্বস্তি কেন? কিনতে যদি কিছু হয়, আমিই কিনব।

দূরে একটি মূর্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে অলকা মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল—এটা কি কোনারকের আসল জিনিস?

এতক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখে এ প্রশ্ন করার কি অর্থ, তা ঠিক বুঝতে না পেরে মেয়েটি ভড়কে গেল। রূঢ় স্বরে বলল—ধরে নিতে পারেন।

'ধরে নিতে পারেন' বলছে যাকে সেকি অত সহজে ছাড়ার পাত্র?

সঙ্গে সঙ্গে অলকার তীক্ষ্ণ প্রশ্ন—প্রমাণ কি?

মুখ ভরা দাড়িগোঁফ নিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক তরুণ। সে কোন থেকে টক্ করে এনট্রি দিয়ে দুজনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বলল—কি হয়েছে, কি নিয়ে এত বচসা হচ্ছে? কি জানতে চান, ম্যাদাম?

অলকার প্রশ্নটারই পুনরাবৃত্তি করতে সন্দীপ এগিয়ে আসছিল, মাঝপথে তাকে থামিয়ে অলকা বলল—আমি জানতে চাইছিলাম, ঐ মূর্তিটা অরিজিনাল কিনা?

—আসল কি নকল, জেনে কি করবেন? কিনবেন ত বলুন।

—কত দাম? অলকার বিরক্তি চাপা রইল না।

—চার হাজার।

অলকার জেদ চেপে গেছে, তাই জোর দিয়ে বলল—যদি প্রমাণ করে দিতে পারি, এটা নকল, তাহলে?

দাড়িওয়ালা ব্যবসায়ীর মুখে কঠিন ব্যঙ্গোক্তি শোনা গেল—তাহলে লাগবে পাঁচ হাজার।

এদের সঙ্গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই ভেবে অলকা বলল—আমি ভুলে গিয়েছিলাম এরা ব্যবসা করছে; চল সন্দীপ, যাই।

সন্দীপ আস্তে করে অলকাকে বাইরে নিয়ে এল, বলল—হ্যাঁ, চল। বড় চটে গেছ মনে হচ্ছে। মেজাজ শান্ত করার জন্যে একটু রহস্য করে বলল আজকাল সেমিনারে দেখি বুকে নেম-প্লেট লাগিয়ে স্কলাররা ঘোরাঘুরি করে। আগের দিনে রায়বাহাদুররা ত বটেই, অনেকে বাইরের দেয়ালে লাগিয়ে রাখত বি.এ.এল.এল.বি। সেরকম কিছু একটা করলে লাভ হয় কি না তুমি ভেবে দেখলে পার।

খোলা হাওয়ায় একটু শান্ত হয়ে অলকা গাড়ীতে এসে বসল। সন্দীপের গাড়ী ছুটল। অলকার মেজাজ তখনও সম্পূর্ণ শান্ত হয়নি। সেটা লক্ষ্য করেই সন্দীপ বলল—আবার কি হল?

—জান সন্দীপ, আমরা যেটা দেখলাম ওটা কিন্তু আসল জিনিসই ছিল। ভেবে পাই না, মন্দিরের এসব অমূল্য পীস্ এরা কিভাবে উঠিয়ে আনে। আমরা বড় স্বার্থপর জাত। দেশ সম্পর্কে আমরা একেবারেই নির্বিকার। এর ঠিক উল্টোটা দেখবে তুমি বিদেশে।

এ প্রসঙ্গ সন্দীপের আর ভাল লাগে না। ঘরে-বাইরে, সব সময় অলকার ঐ এক চিন্তা—দেশ আর দেশ। বিরক্তিকর ব্যাপার। দেশ নিয়ে, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দীপ আর কখনও ভাববে না। বাবা দেশ দেশ করেন, মাও দেশ ছাড়া কথাই বলতে জানেন না। অলকাও তাই। সেই দেশ, সেই একই প্রসঙ্গ। দেশের অমূল্য সম্পদ নিয়ে দাড়িওয়ালা ছেলেটি কিছু টাকা-পয়সা কামাতে চায়, সেখানেও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে, কেন? সন্দীপ এও লক্ষ্য করেছে যে, দেশ নিয়ে যারা কথা বলতে ভালবাসে, তারা আশা করে অন্যেরাও দেশ নিয়ে ভাববে। তাই বলল—দাড়িওয়ালা ছেলেটি হয়ত অনেক আগে থেকেই তোমাকে ওয়াচ্ করছিল গ্রীনরুম থেকে। তোমার জ্ঞান দেবার রকম দেখে ভেবেছে তুমি নিশ্চয় একজন প্রফেসর, আর আমার চেহারা দেখে ভেবেছে একজন সি.বি.আই-এর অফিসর। তাই ঘাবড়ে গিয়ে বিশ্রী রকম ব্যবহার করেছে। তোমাকে ওখানে নিয়ে যাওয়াটাই আমার ভুল হয়েছে। এর চেয়ে ভাল হত নেহেরু পার্কে গেলে।

—ওখানেই বরং চল।

গাড়ীটা ঘুরল নেহেরু পার্কের দিকে।

অলকার মনের স্বাভাবিক ভাব তখনও ফিরে আসেনি। একটু হেসে সন্দীপ বলল—অলকা, তুমি এই মুহূর্তে কি ভাবছ তা আমি বলে দিতে পারি।

অলকা বলল—নিকট সান্নিধ্যে এলে তা ত বলা উচিত, বল দেখি।

—নিশ্চয়ই ভাবছ, ছোটখাটো দোকানদারদের হাল যদি এই হয়, তাহলে রাঘব-বোয়ালেরা কি করে। কত বড় জাল বিছিয়ে কত বড় সর্বনাশ করছে।

শুনে অলকা একটু হাসে। সন্দীপ বুঝতে পারে না অলকা এখনও দেশের কথা, দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবছে কি না। সঙ্গে যে রয়েছে, তার কথাও ত একটু ভাবতে পারে।

নিজের অনুমান ঠিক হয়নি ভেবে, সন্দীপ আবার বলে—তুমি বোধ হয় ভাবছ বিদেশেও ত কুরিয়ো বা অ্যান্টিকের দোকান আছে। সেখানে ত দিন দুপুরে-এমনি চুরি-ডাকাতি হয় না।

অলকা মুচকি হাসল, কোন উত্তর দিল না। প্রসঙ্গ পাল্টাতে সন্দীপ বলল—মনে আছে, কথা ছিল পার্কে গিয়ে মুখোমুখি বসে কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলব না। পার্কে যাবার পথেই তার রিহার্সাল শুরু হয়ে যাবে,

এতটা কিন্তু ভাবিনি।

—আমাকে তোমার খুব রহস্যময়ী লাগে, না?

—শুধু তোমাকে কেন, সব মেয়েকেই আমার রহস্যময়ী মনে হয়। আকাশের মত রূপ পাল্টাও তোমরা, বিশেষ করে তুমি। জান, পুরুষ চিরকালই যাযাবর; পুরুষকে ছলনার আঁচল বিছিয়ে ঘরে নিয়ে আস তোমরাই; আবার ঘর-ছাড়া করতেও তোমরাই। সময় সময় ভাবি যারা বিদুষী যাদের চিন্তার জগৎ আছে, যারা দেশ নিয়ে ভাবে, তারাও কোন জাদুবলে পৃথিবীটাকে নাচায়। নিজের স্বাধীনতা হারাবার আশংকায় আমি মেয়েদের কাছ থেকে একটু দূরে থাকতে চাই।

—আমাকেও তোমার ভয়?

—ভয় ঠিক নয় বিস্ময়! সন্দীপ হেসে নেহেরু পার্কের কাছে গাড়ী থামাল।

দুজনে এসে ঘাসে বসল। সূর্যের সোনার রঙ দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে উঁচু-নীচু জায়গা। গাছের আড়ালে রোদ্দুর, আর ছায়া কাঁপছে। বড় বড় ইউকালিপটাস্ গাছ। পাশে বাগ্যান্‌ভিলিয়্যার সারি। দেবদারু গাছের পাতাগুলোর গায়ে সূর্যের শেষ রক্তিম আভা। চারিদিকে অজস্র ফুল ফুটে আছে।

সরস এই পরিবেশে অলকার রূপ বদলায়। সন্দীপ একটু আগেই বলছিল, মেয়েরা মুহর্তে মুহর্তে রঙ পাল্টায়। খুশীতে ভরে ওঠে অলকা বলে—চলো, সারা পার্কে আমরা ঘুরে বেড়াই।

তুমি যাও। এখানে বসে তোমাকে আমি দেখি।

অলকা উঠে পড়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে। এক গাছের আড়াল থেকে অন্য গাছের আড়ালে; এক টিলা থেকে অন্য টিলায়। কখনও রোদ্দুর পড়ছে ওর মুখে, কখনও অন্ধকারের ছায়া। বিদ্বান মহলে আলাদা ব্যক্তিত্ব নিয়ে অলকাকে ঘুরতে দেখেছে সন্দীপ। ডঃ মহিন্দর, ডঃ থাপর, ডঃ হরিতোষ, ছাত্রছাত্রীরা—সবাই মিলে তুমুল তর্ক করছে। অলকা অন্য জাতের। তাই তার চিন্তা অন্য রকমের। অলকার মন্তব্যকে কচুকাটা করছে সবাই মিলে; অলকা সমানে তর্ক করে যাচ্ছে; তাঁদের কথা কাটছে খাপ-খোলা তলোয়ারের মত। বাকী যারা সেখানে উপস্থিত আছে, তাকেই তারা সাপোর্ট করছে। যার যুক্তি যত বেশী জোরালো। অলকা প্রায়ই একা পড়ে যায়। তাতেও হার মানার পাত্রী নয়। অলকার এও এক রূপ, সন্দীপ দেখেছে। নিন্দায় বা প্রশংসায় অলকা একেবারে নির্বিকার, সন্দীপ সেটা বুঝেছিল সেদিন। শুরুতে অলকা বলে যেত, সন্দীপ শুনত। মুখ খুলত না। শুধু মন দিয়ে শুনত, কে কি বলছে। নির্বাক জেনেও এই বিদগ্ধ মহলে অলকা সন্দীপকে কেন টেনে নিয়ে যেত তা

সন্দীপ জানে না। হয়ত দেখাতে চাইত ওর পরিচিত মহলকে অথবা অলকা দেশ-দশ ও ইতিহাসকে কিভাবে দেখে তা বোঝাতে। সন্দীপ তখন কৃতী সার্ভিসম্যান, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। অলকা সন্দীপকে ওর বন্ধু হিসেবেই পরিচয় করিয়ে দিত সবার সঙ্গে। 'হ্যালো' বলে হাত মিলিয়ে সন্দীপ চুপ করে বসে থাকত। সময় হলে অলকাকে গাড়ী করে বাড়ীতে পৌঁছে দিত। সন্দীপ তখন অলকাকে এদের থেকে আলাদা করে ভাবতে পারেনি। সন্দীপের জীবনে বিদ্যার জলুস না থাকলেও বড় অফিসার হিসেবে নিজের উপস্থিতিটাকে কোনদিন অনাদরণীয় করে তুলতে দেয়নি। তবুও নিজের মধ্যে সব সময় একটা দূরত্ব অনুভব করত। অলকা হঠাৎ সন্দীপকে কেন অন্দরমহলে নিয়ে এল, সেটাও সন্দীপের কাছে এক বিস্ময়। অলকাকে ঠিক এভাবে এতটা কাছে কোনদিন পায়নি সন্দীপ, যত গভীরভাবে ওকে জানতে পারছে, ততই মনে হচ্ছে অলকা বিদগ্ধ-সমাজে ওঠে বসে, সেই মহলকেই সে ভালবাসে। সেখানে সন্দীপকে সঙ্গী হিসাবে পেতে চাইলে অলকা ভুল করবে সেটা কী অলকা জানে? বিদ্যা নেই, কিন্তু চিন্তা করার ক্ষমতা আছে, হৃদয় আছে, এতে কী অলকার তৃষ্ণা মিটবে?

অলকা মাঝে মাঝে ওর কাছে এসে বসছে।

—তুমি যে একেবারে মহাস্থবির জাতক হয়ে গেলে।

—তোমাকে দেখছি তাই।

—খুব ভাল লাগছে এখানে এসে।

—দেখতে পাচ্ছি। ভেবেছিলাম, রেস্তোরাঁয় যাব। বড় পিপাসার্ত আমি। কিন্তু তোমাকে দেখে ভ.বছি, বাড়ী ফিরে যাওয়াই ভাল। খোলা আকাশ তবু-বা চলে, কদাচ রেস্তোরাঁ নয়।

—ঐ যে বললে, সন্ধ্যাবেলা তোমার এক বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যাবে।

—না, আর কোথাও নয়। এখন তোমার হাতে একটু হুইস্কি।

—তার আগে বল, আমি যখন একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তুমি কি ভাবছিলে?

—ভাবছিলাম, এই অলকা ভর্মাকে সেমিনারে পেপার পড়তে দেখেছি, বিদ্বান মহলে আলোচনা করতে দেখেছি, একি সেই অলকা? আলো-ছায়া মুখে করে যে অলকা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সে-ই বা কে?

খিল খিল করে হেসে ওঠে অলকা। বলে—চল, বাড়ি যাই। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি।

দুজনে গাড়ীতে এসে বসল।

॥ পনেরো ॥

পরাঞ্জপে কোন কিছুতেই বাধা দেন না। রামলীলা গ্রাউণ্ডে এত কাজ ও এত ব্যস্ততার মধ্যে অপজিশন্‌রা র‍্যালি করতে চান। এখানেই র‍্যালি করতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। তবুও তাঁরা করবেন। এক একটা জাতীয় ও আঞ্চলিক প্রশ্ন উঠলেই অপজিশন্‌রা মিলনের হুমকি দেখায়। মিলন যদি এত সহজ হবে, তবে বিচ্ছেদের সমস্যা তোমাদের কাছে অত বড় কেন? প্রশ্ন তুলেছে, বোফর্‌স্‌, ফেয়ার ফ্যাক্স, ওসব কি? আবার অপজিশনদের এই সুযোগে মিলন! পরাঞ্জপে জিজ্ঞেস করলেন--এ মিলনের ভিত্তিটা কি, একবার ভেবে দেখেছ? র‍্যালি করতে চাও, কর। বোট ক্লাব থাকতে এখানে কেন? ওটা ত অনেক ভাল জায়গা, পার্লামেন্ট হাউজও কাছাকাছি। ওখানে যেতে হলে ওর কাছাকাছিই থাকাই দরকার। আসলে ওদেরও নজর এই গণেশ টাওয়ারের দিকে। তাই ওরা এই রামলীলা ময়দানেই আবার একটা ঐতিহাসিক মিলন ঘটাতে চাইছে। তা র‍্যালি করবে, কর না! আমরা যে ডেমোক্র্যাসি খাড়া করেছি তাতে এখানে কারণে-অকারণে অপজিশন্‌ পার্টি র‍্যালি করবেই, এতে বেশী কৌতূহল দেখানর কি আছে?

'সরকারের দুর্নীতি'র বিরুদ্ধে পোস্টার পড়েছে; এমন কি গণেশ টাওয়ারের বিরুদ্ধেও। তা জেনে দ্বিধায় পড়লেও পরাঞ্জপে নিজের নিরপেক্ষ বিচারের সার্থকতা দেখতে পেয়ে রাজী হয়ে গেলেন। এখানেই র‍্যালি করুক বা বোট ক্লাবে করুক তার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে পরাঞ্জপে মনে করেন না।

কেন মনে করেন না, সেটা অপজিশনের সামনে তুলে ধরার জন্যেই পরাঞ্জপে তাঁর বিখ্যাত ডায়েরী খুলে বসলেন। সেখানে অপজিশনের মিলন ও বিচ্ছেদের সব কাহিনী সাল-তামামী দিয়ে লেখা আছে। প্রহসনটা ত সেখানেই; যদিও ওরা ওটা ভুলেই থাকে। তোমরা বলে বেড়াও কংগ্রেস ভাঙতে ভাঙতেই কংগ্রেস আই। মানলাম, তোমাদের ইতিহাসটা

না-হয় একবার খুলে দেখনা! ওখানে কে দলে ছোট, কে দলে ভারি, কে আঞ্চলিক, আর কে যে জাতীয়, এ হিসাব তোমাদের সামনে নেই বলেই ভাঙা-গড়ার ইতিহাসটা সব সময় তোমাদের চোখে পড়ে না। তাই তোমাদের বলি, শোন।

প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি'র জন্ম হল আচার্য কৃপালনীর কৃষক মজদুর প্রজা পার্টি থেকে ১৯৪৮ সালে, গান্ধীজীর মৃত্যুর পরে। ১৯৩৪-৩৫ সালের পুরনো বন্ধু কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি হাত মেলালেন কৃপালনীর সঙ্গে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের প্রথম নির্বাচনে দুটো দল কেউ কারুর অস্তিত্বই দেখতে পেল না; তখন একতার প্রয়োজনেই পি.এস.পি.-এর আবির্ভাব। কিন্তু এ মিলন বড় দুঃখের, কারণ দুঃখের দিন কাটতে না কাটতেই ১৯৫৫ সালে আবার এদের থেকে বীরবিক্রমে বেরিয়ে এলেন সোশ্যালিস্ট পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া।

১৯২৯ সালের নির্বাচনের পর আবার এল সুখের দিন। পি.এস.পি. আর সোশ্যালিস্ট পার্টি নিজেদের আলাদা অস্তিত্ব ভুলে দেশের-দশের হিতার্থে ঐক্যের জয়গান গেয়ে এক হয়ে গেলেন; নাম হল সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি। এস. এম. যোশী এদের চেয়ারম্যান আর রাজনারায়ণ জেনারেল সেক্রেটারী। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন পর্ব শেষ হল। ঠিক চার মাস বাদে জুন মাসের মধ্যে আবার আর এক চোট মিলন-পর্বের ঝড় উঠল। পেজেন্‌স্ অ্যাণ্ড ওয়ার্কারর্স পার্টি ও ফরওয়ার্ড ব্লক বললেন, তাঁরাও ভেবে দেখবেন এ মিলন-মহাযজ্ঞে আহুতি দেওয়া যায় কি না। কেউ-ই কিন্তু সে রকম আগ্রহ দেখালেন না। চারটে দলের মধ্যে নীতিগত বিষয় নিয়ে বড় গাল দেখা দিল। ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া খুব চেষ্টা করলেন শান্তি বারি দিতে; পুরোহিত হয়ে শান্তির জল ছিটিয়েও দিলেন। কিন্তু ১৯২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে এঁরা ঠিক করলেন, এঁরা সব আলাদা আলাদাভাবেই নিবাচন লড়বেন। ওটাই নিরাপদ। বারোয়ারী চাষে আর যাই হোক ব্যক্তিগতভাবে ফসলটা ঘরে তোলা একটু মুশকিল। এদিকে ডঃ লোহিয়া দেখলেন শান্তি জল ছিটিয়েও কোন লাভ হল না। তখন তিনি ভাবলেন শুধু শুধু তাহলে নিজের ব্যক্তিত্বটাই বা খোয়ান কেন! তিনি তাই পুরনো সোশ্যালিস্ট পার্টি'কেই আবার মন্ত্রপূত করে জাগিয়ে তুললেন।

সংযুক্ত সোশ্যালিস্ট পার্টি'র থেকে কিছু গণ্যমান্য লোক ও কর্মী বেরিয়ে এসে বললেন—আমরাও আছি আপনার সঙ্গে, নিজেদের অস্তিত্ব কাকে বলে সেটা আমরাও জানি। আবার পি.এস.পি. নিজরূপ নিয়ে জেগে উঠলেন। ১৯২৯ সালে বিহার ও কেরেলার ইউনিটগুলি বেরিয়ে এসে বললেন—আমরাও আলাদা অস্তিত্বে বিশ্বাসী, মূল পার্টি'র সাজান ঐক্যকে

আমরা মানি না। ১৯৭২ সালে রাজনারায়ণ হুঙ্কার ছাড়লেন—ভাইসব, তোমরা ভুলে গেছ, আমিও বেঁচে আছি। ১৯৭৪ সালে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকৃত প্রমাণ দিলেন। রাজনারায়ণের সোশ্যালিস্ট গ্রুপ হাত মেলালেন স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে। চরণ সিং-এর ভারতীয় ক্রান্তি দলও বড় কিছু একটা করা যায় কি না তাই ভাবছিলেন। সেরকম সুযোগ আসতেই প্রস্তুত হয়ে গেলেন। বহু দূরের কথা ভেবেই এ'রা কাজ করেন। তাই তিনটে দল মিলে হল ভারতীয় লোক দল। এভাবে এগোতে এগোতে মিলনের কার্ভটা তুঙ্গে এল ঐতিহাসিক ৭৭ সালে। ভারতীয় লোক দল, কংগ্রেস-ও এক হয়ে, জনসঙ্ঘ ও সোশ্যালিস্ট পার্টিকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে জনতা পার্টি গড়ে তুললেন। নিজ নিজ অস্তিত্ব ভুলে যাবেন, এ প্রতিশ্রুতিও এ'রা আগেভাগে দিয়ে বসলেন, পোস্ট-ডেটেড্ চেকের মত।

সেবার লোকসভায় কংগ্রেসের সে কি লজ্জা! ৫৪২টি আসনের মধ্যে মাত্র ১৫৫টি। জনতা পার্টি পেলেন ২৯৭টি আসন। অথচ ১৯৭০-এর মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচনে এ'রাই—কংগ্রেস-ও, জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র এবং এস. এস. পি. 'গ্র্যাণ্ড অ্যালায়ান্স' করেও লোকসভায় বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেননি। একমাত্র জনসঙ্ঘ ৩২টি আসনের জায়গায় ২২টি আসন ধরে রাখতে পেরেছিলেন। একা মিসেস্ গান্ধী সারা ভারত চষে বেড়িয়ে ৫২১টি আসনের মধ্যে ৩৫০টি আসন পেয়েছিলেন। এই নির্বাচনের ন্যায্যতা নিয়ে এ'দের মুখে অবশ্য অনেক কথা শোনা গিয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন কাগজের বিভিন্ন মন্তব্যও পরাঙ্গপে লিখে রেখেছেন। ১৯৭৭ সালের আগে ১৯ মাস ধরে এমার্জেন্সি, সে এক দুঃসহ সময়! প্রচণ্ড এক ধাক্কায় ডেমোক্র্যাসির ধ্বজাধারী কাগজগুলি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মুখ বন্ধ করে বসে রইল। কিছুদিন আগেও যেসব ইউনিভারসিটির ছাত্রদের মুখে বিপ্লবের কথা ছাড়া আর কিছুই শোনা যেত না, সেসব ছাত্ররা ভীত, সন্ত্রস্ত। একেবারে নিশ্চুপ, নিস্তব্ধ।

একলক্ষ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী রাজনীতিবিদ বা রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জেলে পোরা হল। ওদিকে 'টারগেট' পূরণের ধুম। চারদিকে ভ্যান, বাস নিয়ে মরিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্টেরিলাইজেশনের টারগেট-পূরণ-অভিলাষীরা। লক্ষ্ণৌ, বেনারস আর দিল্লীর রামলীলা ময়দানের আশেপাশে পার্টিশনের সঙ্গে সঙ্গে যেসব বস্তি গড়ে উঠেছিল সেগুলোতে হাত দিতে কোন নেতাই এমন কী নেহেরুজী পর্যন্ত সাহস করেননি। এমার্জেন্সির সুযোগে রাতারাতি তুর্কমান গেটের বস্তিগুলোকে ভেঙে ফেলা হল। ভাঙা বাড়ী আর ভাঙা বস্তি সামলাতে গিয়ে পঞ্চাশজন বস্তিবাসী শহীদ হল ; শ'য়ের ওপরে আহত। ২২ মাসের মধ্যে দিল্লী কর্তৃপক্ষ একলক্ষ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশী বাড়িঘর ভেঙ্গে মাটিতে

মিশিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক দিন গড়পড়তায় এগারোশর বেশী লোক ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হত। এমার্জেন্সির চাপে ভয়ে ও আশঙ্কায় সারা ভারতবর্ষের লোক তখন সময় মত অফিসে গেছে। লোকেদের কাজ করার আগ্রহে বাধা দেবার কোন কার্যসূচী রাজনৈতিক দলগুলোও নিতে সাহস পার্নান। •

জনতা পার্টি দেশ-শাসনের ঐতিহাসিক সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদের অর্থ ও সামর্থ্যের মোটা অংশ ব্যয় হয়ে গেল কমিশন বসাতে। কমিশনের একমাত্র কাজ ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে—এমার্জেন্সির সময়ে কিভাবে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ করেছিলেন। জানা কাহিনীগুলোই আবার নথিভুক্ত করা হল কমিশন মারফৎ। অপরিমিত ক্ষমতা এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পেলে প্রথম প্রথম এরকম একটু-আধটু মাথা ঘুরে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক, ওটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

সাময়িক এই মিলন বেশীদিন টিকল না। জনতা পার্টি ভাঙল, তিন ভাগ হল। লোকদল, ভারতীয় জনতা পার্টি ও জনতা [জে, পি,]। রাজ-নারায়ণের আবার আলাদা দল জনতা [এস]। এছাড়া, মিলন পর্বে যাঁরা যোগ দিতে পারেনর্নান, তাঁরাও তাঁদের আলাদা সত্তা নিয়েই রইলেন। ফরোয়ার্ড ব্লক [মার্কস্‌সিস্ট], রেভ্যালুশনারী সোশ্যালিস্ট পার্টি, ওয়ার্কার্স্ অ্যাণ্ড পেজন্ট পার্টি, এছাড়া আরও অনেকে।

এসব মিলন-বিচ্ছেদে কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বাস নেই। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের পর, ফ্যাক্টরির শ্রমিকেরা বড়, না, কৃষকেরা বড় সংগ্রামী, এনিয়ে যা একটু গোল বেধেছিল। তার দু'বছর পরেই চীনের মাওয়ের নীতি সম্বল করে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এলেন কমিউনিস্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া [মার্কস্‌সিস্ট]। সি, পি, আই, ধুয়ে গেলেন। ১৯৬৮ সালে সি,-পি, আই [এম] থেকে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে এলেন নকসাল দল। পরবর্তীকালে নানা নামে নানা দল। দল গড়া আর দল ভাঙা। পরাঞ্জপে ভাবেন, এভাবেই চলবে।

পরাঞ্জপের এইসব মন্তব্যে ক্ষিপ্ত হয়ে যারা কংগ্রেসের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছিল, পরাঞ্জপে অনেক ধৈর্য ধরে সেগুলোও তাঁর ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলেন। তারা বলেছিল, কংগ্রেস যত গর্জায়, তত বর্ষায় না। তাই ঝগড়া আর দ্বন্দ্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মত ফিক্‌সড্ ডিভিডেণ্ড দিয়ে যাচ্ছে। কামরাজ প্ল্যানে মোরারজী ও আরও কয়েকজন ধরাশায়ী হলেন। নেহেরুর বহুমুখী ব্যক্তিত্বকে সামলাতেই সিন্‌ডিকেটের জন্ম। ১৯৬৯ সালে কূটনীতিবিদ ইন্দিরা গান্ধী তাঁর নিজের নামে আলাদা এক কংগ্রেস খাড়া করলেন। অনেকে ভক্তিতে গদ গদ হয়ে 'যা দেবী সর্ব-ভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ' বলে

পুজো শুরু করে দিলেন। কেউ কেউ আবার তাঁকে মহিষাসুরমর্দ্দিনীর সঙ্গে তুলনা করতেও পিছপা হলেন না। তখন থেকেই ক্ষমতার নির্বিচার বহু-মুখী প্রয়োগ, ক্ষমতার লেনদেন, কলা-কৌশল, কূটনৈতিক চাল-বেচাল সারা দেশের নগরে-প্রান্তরে, খেতে-খামারে ছড়িয়ে পড়ল। ইতিহাসের অনেক-নতুন পাতা লেখা হয়ে গেল পরবর্তীকালে। পরাঞ্জপে আস্তে করে ডায়েরীর পাতাটা বন্ধ করে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

বাসের পর বাস আসছে, ট্রাকের পর ট্রাক। কত রকমের কত রঙের পতাকা, হলদে-কমলা-লাল-বেগুনি। লাল পতাকা হাতে হাজার হাজার মানুষ। দূর থেকে পতাকাগুলোকে মানুষের চেয়ে বেশী গতিশীল মনে হচ্ছে। এমনিতেই লাল রঙ সবার আগে চোখে পড়ে; কথায় বলে রঙের রাণী লাল। বাতাসে সব রঙের পতাকা উড়ছে, তার মধ্যে লালই বেশী। অগণিত লোকের শুধু মাথা দেখা যায়। শুধু মাথা, আর অনেক, অনেক চোখ। দৃষ্টি আবদ্ধ শুধু—নেতাদের ওপর। নেতা মানেই গতি, জনসমুদ্রে যেন জাহাজ। নিজেরা পার হয়, অপরকে পার করে।

গণেশ টাওয়ারের মেহনতী মানুষেরা এই ভিড়ে হারিয়ে গেছে। দল থেকে বেরিয়ে নির্দল, আবার নির্দল থেকেই দলবদ্ধ, এটাই চিরন্তন, চির-কালের আবর্ত। যাদের হাতে পতাকা নেই, বোঝা মুশকিল, তারা কোন্ দলে।

সময়মত উচ্চ-মঞ্চে অপজিশনের সব নেতারা একে একে এসে বসলেন। মাইকে ঘোষণা হল, সমবেত কন্ঠ সঙ্গীতের মাধ্যমে আজকের সভা শুরু হচ্ছে। 'গীতিচক্র' সঙ্গীত পরিবেশন করছেন। সমবেত সঙ্গীত শেষ হল। মাইকে আবার ঘোষণা করা হল, এখন গণপার্টির তারকেশ্বর তাঁর বক্তব্য রাখবেন।

তারকেশ্বর এগিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ মাইকের কাছে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন—নীরবে তাকিয়ে রইলেন বিপুল জন সমুদ্রের দিকে। তাঁর এই ড্রাম্যেটিক একস্‌পোজারের জন্য জনতা তাঁকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাল। তিনি বলতে শুরু করলেন—আজ বড় দুর্দিন, আপনাদের নিশ্চয় একথা স্মরণ করাতে হবে না। ১৯৭৯ সালে টাকার মূল্য ছিল ১৬ পয়সা, এখন কত? এখন দাঁড়িয়েছে সাড়ে ১২ পয়সায়, সরকারের হিসাব বড় পাকাপোক্ত। লোকেরা 'সামলায়', তাঁরা গণেশ টাওয়ারে থাকেন, তাই বলে বেড়াচ্ছেন, জিনিসপত্রের দাম বাড়েনি, র‍্যাশনে আগের চেয়ে বেশী তেল-চিনি পাওয়া যাচ্ছে। আমরা শুনছি, কিন্তু কি করব? সরকারের গলার আওয়াজ ভীষণ চড়া, বলার যন্ত্রগুলোও ভীষণ মজবুত, সারা দেশ জুড়ে মিথ্যার অপপ্রচার চলছে। কিন্তু আমি জানি, আশি শতকের জনতা মুখর। ঘুষ দিয়ে তাদের মুখ দিয়ে মিথ্যাকে আর সত্য বলানো যাচ্ছে

না। তারা আজ জাগ্রত। আশেপাশে, চারিপাশে দিনরাত কারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করে যাচ্ছে। তাদের উচিত শাস্তি কি? [শ্যেম্, শ্যেম্]। আমি আবার বলছি আজ বড় দুর্দিন, বড়ই দুর্দিন। চারিদিকে দুর্নীতি, ছোট বড় সবাই গাড়ি চায়, বাড়ি চায়, বিদেশ ভ্রমণ চায়, সুখে থাকতে চায়। এ ত ভাল কথা। সবাই যদি এভাবে এগোয়, তবে ত দেশে গরীব ব'লে আর কিছু থাকে না। সরকার অবশ্য গরীবদের জন্য বহুকাল ধরে অনেক কিছুই করছেন। আপনারা সবাই তা জানেন, চোখে দেখছেনও। এখন আবার ঘরেই গণ্ডগোল, যারা সরকার চালান, তাঁরাই দেখছি লুটতরাজ ও ভাগবাটোয়ারা নিয়ে সারা দেশে লম্ফঝম্ফ করে বেড়াচ্ছেন। ফলে, নিজেদের লোকই কিছু কিছু ঘায়েল হয়ে পড়ছেন। এটাকেও আমি ডেমোক্র্যাসি বলি, এটাকেও অগ্রগতি বলতে আমার দ্বিধা নেই। [হাত-তালি]। ঐসব গণ্ডগোলে চেনা মানুষগুলির মুখোশ খুলে দিতে দেশ-জোড়া আন্দোলন আমরা শুরু করেছি। এ আন্দোলন যে কতটা জনপ্রিয় হয়েছে, আপনাদের উপস্থিতি তার প্রমাণ দিচ্ছে আজ।

আমাদের অসুবিধা, বড্ড বেশী চিৎকার করতে হয়। সরকারের গলাবাজি থামাতে গিয়ে আমাদের গলা ভেঙ্গে যায়। আমাদের কিছু বলবার থাকলে হয় সভা ডেকে তা আপনাদের জানাতে হয়, নতুবা কাগজের লোককে ডেকে করিৎকর্মা সরকারের সর্বশেষ অপকর্মের সবিশেষ বলতে হয়। সরকার আমাদের কন্ঠরোধ করতে চান কেন? এসবের অর্থই বা কী? কাগজ আমাদের কথা বললে কাগজদের শাসিয়ে বলা হয়, তাঁরা যেন গণতন্ত্রের স্বার্থেই শুধু খবর দেন, মানুষকে বিভ্রান্ত করতে নয়। যদি কাগজওয়ালারা বিভ্রান্তেরই সৃষ্টি করে, তবে তাদের শাস্তি কী, জানেন আপনারা। সরকারী বিজ্ঞাপন ও সরকারী অন্য সুযোগ-সুবিধে বন্ধ করে দেওয়া। এই কি গণতন্ত্র, একেই কী বলে গণতন্ত্র? আপনারাই এর জবাব দিন। [হাততালি]।

আপনাদের চোখের সামনেই গণেশ টাওয়ার তৈরী হচ্ছে। অনেকদিন ধরে এর কাজ-হচ্ছে, আরও অনেকদিন এর কাজ চলবে। আমরা যখন থাকব না, তখন কাজ আস্তে চলবে, কারণ, গণেশ, আমি ত আগেও একবার বলেছি, গণেশ শুধু মানুষের দেবতা নন, তিনি ঐ শুঁড় দিয়ে পশুকুলদেরও শাসনে রাখেন। পশুদের সংখ্যা দিন দিনই বাড়ছে এবং বাড়বে। এদের শাসনে রাখে মানুষের সাধ্যের বাইরে। গণেশবাবার আগমন সেদিক থেকে অসাধারণ একটা ঘটনা। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, তা সে যারাই এটা খাড়া করুক। পশুকুলদের আভিজাত্যের আড়ালে এই যে শয়তানি, তা গণেশজীই শুঁড় দুলিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারেন। তাঁর শক্তির কাছে আমরা অতি নগণ্য শাসক, ওরাও। গণেশবাবার আর এক

মাহাত্ম্য তিনি একবার কাজে নামলে কারুর রক্ষে নেই। অকেজো লোক-গুলোকে খুঁজে খুঁজে বার করে তিনি মহা শোরগোল শুরু করে দেন। কাজ কাকে বলে তা তিনি দেখিয়ে দেন। [হিয়ার, হিয়ার]।

ঐ ত দেখুন না, পাথরের বাড়িটা প্রায় শেষ। সামনে গিয়ে দেখুন শুধু গণেশ আর ইঁদুর। মহারাজ আর তাঁর অ্যাকটিভ্ বাহন। আজকের সরকারও ত তাই, রাজা একজনই, আর সবাই তাঁর বাহক। কন্ঠহীন, শব্দহীন, মেরুদণ্ডহীন সব কৃতদাস। ঐ যে বাড়িটা দেখছেন, যেটা প্রায় শেষ, ওটা আগে হচ্ছে। ওটা ফাউণ্ডেশনের বাড়ি, ওটা ভিত, ওটাই ভাঁড়ার। ভাঁড়ারে ঐশ্বর্য না থাকলে বাড়ি আবার কিসের? নিজেরটা আগে গুছিয়ে না নিলে কত আর পর নিয়ে থাকা যায়; বড় ক্লান্তি আসে তখন। তাই ওটা আগেভাগে হওয়া দরকার, আর হচ্ছেও আগে। এবার গণেশবাবা উঠ্‌বেন। তারই তোড়জোড় চলেছে। আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন কিনা জানিনা, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি। আজ আমি এসব কথা বলতে আসিনি। যারা এসব কথা নানা ভাবে, নানা রঙ্গে আপনাদের বলবেন, আপনাদের বোঝাবেন, তাঁরা কিন্তু ঐ ঘরের আড়ালে যে আখড়া, সেখানে ডন্‌বৈঠক দিচ্ছেন। গভীর তথ্য ও তত্ত্বের কথা যাঁরা বলবেন, ভক্তির মা-গঙ্গা বইয়ে যাঁরা আপনাদের ভোট নেবেন, তাঁরা তৈরী হচ্ছেন। বারণ করলেও তাঁরা বলে যাবেন, এমনই তাঁদের শক্তি।

তাঁদের সামনে আমি অতি নগণ্য এক ব্যক্তি, বলতে গিয়ে তাই থেমে যাই। জীবনের যেটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তাতে আজকাল মনে হয়, কি বলব, বলার কিছু নেই। তবে হ্যাঁ, মানুষের ক্ষমতা অসীম। চাইলে সে থেমে থাকতে পারে, আবার উধর্বশ্বাসে ছুটতেও পারে। বহু-দিন ধরে ছুটে ছুটে আমি বড় ক্লান্ত। এখন একটু হাঁপ ছাড়তে চাই, বসতে চাই সবাইকে নিয়ে। আগে ভাবতাম একা থাকাই ব্যক্তিত্ব, এখন দেখছি বহুকে নিয়ে থাকার মধ্যে, চলার মধ্যে প্রকৃত শক্তি, প্রকৃত বল আর মঙ্গল [হাততালি]।

আমরা আলাদা আলাদা দল, আমাদের শক্তি অনেক, আমরা বহুবার বহু হয়েছি। হাত গুটিয়ে নিয়েছি, আবার হাত বাড়িয়েছি। হাত জ্বলেছে, বিরক্ত হয়েছি, অনেক সময়ে ক্রোধে ও অপমানে নিজস্ব সত্তা জাহির করতে গিয়ে আমরা একঘরে হয়ে গেছি। কিন্তু ঐ যে বললাম, অভিজ্ঞতা বড় জিনিস। বুঝতে পেরেছি, ভারতবর্ষের মানুষ এখন বহুর মধ্যে কেন বাঁচতে চাইছে। একা থাকতে গিয়ে আমরা তাদের শুধু নিরাশ করছি। নিজেরা বারবার বিড়ম্বিত হয়েছি। আর নয়। আপনাদের তাগিদের কাছে হার মেনেও সুখ। [হাততালি]।

আজ এখানে, অনেকগুলো পতাকাকে এক সঙ্গে উড়তে দেখছেন।

আপনাদেরও আজ আমি আলাদা করে দেখছি না, এক মন এক প্রাণ, একতা। [হিয়ার, হিয়ার]। বহু হয়ে থাকার দায়িত্ব অনেক, সংযম, শৃঙ্খলা আর বহু আয়াসে বহুকে নিয়ে চলা যায়। বহু দিনের কঠিন সাধনাতেই সেটা শুধু সম্ভব। ইতিহাস একবার আমাদের সে সুযোগ দিয়েছিল। আমরা সফল হইনি। বড় তাড়াহুড়ো করেছি, নিজেদের কাঁজের বিচার করে দেখিনি। আবার সে সুযোগ আসছে। ওরা বলে বেড়াচ্ছে, শকুনি ভাগাড়ের গন্ধ পেয়ে আকাশে পাখার ঝাপটা মারছে। এবাব তারা ধরিত্রীতে নামবে, এক হয়ে বসবে ; কিন্তু কদিন ? হ্যাঁ, ভাগাড়ের গন্ধ পেয়ে যদি নেমে থাকি, সেইসব দুর্নীতির শবগুলি তোমরাই নামিয়েছ। আমরা তোমাদের মুখোশ খুলে দিয়েছি মাত্র। [হাততালি]। কিন্তু এবার আমরা খুব সাবধানে চলার চেষ্টা করছি, আপনারা নিশ্চয় তা লক্ষ্য করেছেন। সেদিন অতি উৎসাহে যারা ফেটে পড়েছিল, এবার তাদের আমরা ডাকিনি, ডাকব না। এবার আমরা চাই, যেভাবে আমরা শুরু করব, শেষও করব সেইভাবে। আমরা জানি, খুব ভেবেচিন্তে ধীর পদক্ষেপে আমাদের এগোতে হবে। দেশবাসী কি চায় ? কাজ। কাজ না দেখিয়ে কাজ করছি, এই ভাঁওতা দিতে গিয়ে আমরা নিজেরা বারবার বিড়ম্বিত হয়েছি, ধরা পড়েছি। এবার কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যেটুকু কাজ করব, সেটুকুই শুধু আপনাদের বলব। যা হয়েছে, যতটুকু হয়েছে, ততটুকুই বলব। যা ভবিষ্যতের, যার কথা আমরা শুধু ভাবছি, কাজে এখনও নামিনি, তার কথা বর্তমান সরকারের মত আগেভাগে কখনই বলব না। এটাই আমাদের অঙ্গীকার। [হিয়ার, হিয়ার]।

দেশ বিশাল। সমস্যা বহু। একটা সমস্যা মিটতে না মিটতে অন্য সমস্যা দেখা দেয়। তাড়াতাড়ি সুফল আশা করাটা বোধহয় অন্যায়। তবুও আগামী দিনে শুধু চোখ খুলে পথ চললেই হবে না। সবার দুঃখকষ্ট দূর করার প্রতিশ্রুতি চাই। 'গরীব', 'গরীব' বলে চিৎকার করলেই কমিট্‌মেন্ট্‌ হয় না। বর্তমান সরকার এ ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। উইকার সেকশনের জন্য কান্নাকাটি করলেই উইকার সেকশনের পেট ভরে না, গরীবী হটানো যায় না। আমরা সবাই আশাবাদী, তাই শুধু আশ্বাস চাই ; কাজ দেখাবার চেয়ে কাজ করার ভঙ্গীটার মাহাত্ম্য বেশী।

কাউকেই সমালোচনা করতে আমি আসিনি। তবে আপনাদের সামনে-পেছনে যে কাজ হচ্ছে, সমাজের প্রয়োজনের দিক থেকে বিচার করলে এটাকে কী কাজ বলবেন ? হ্যাঁ, দেবতা আসছেন, আমি আগেও বলেছি, বড় সুখের কথা, বিশেষ করে দেবতা যখন গণেশ। কিন্তু একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। দেবতাদের কি কিছুর অভাব হয়েছে কখনও, কোনকালে ? অভাব ত মানুষের, কারণ সে দেবতা নয়, গণেশও

নয়। মানুষের অভাবটা গ্রাহ্যের মধ্যে না আনলে তার স্বভাব বিগড়ে যায়। স্বভাব বিগড়বার আগে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, তাঁরা কী করছেন তা একবার ভাবুন, কি করতে পারতেন, তাও ভাবুন, কার জন্য করছেন, কোন্ শ্রেনীর জন্য করছেন, তাও একবার ভেবে দেখুন। ফাঁকি দিয়ে যারা সরকারকে কুক্ষিগত করে রেখেছে, তাদের একবার ভেবে দেখতে বলি। ভেবে দেখতে বলি, এটা কী ঠিক হচ্ছে? জনমানুষ যদি একদিন ক্ষেপে যায়, সেদিন কী গণেশ তাদের শান্ত করতে পারবেন? গণেশবাবার যতটুকু পরিচয় আমি পেয়েছি, তাতে কিন্তু তিনি মানুষকেও ক্ষেপিয়ে তোলেন, এ ছাড়া আমার আর কিছু বক্তব্য নেই।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে সমানে হাততালি পড়ল। চিৎকার-চেঁচামেচি ও ভিড়ের ঠেলাঠেলিতে বোঝা গেল ভাষণ শুনে লোকেরা রীতিমত গরম হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় মাইক থেকে ঘোষণা করা হল মেহনতী মানুষ ও শ্রমিকদের নেতা জীবন বসু এবার তাঁর বক্তব্য রাখবেন। বলার সঙ্গে সঙ্গে লাল পতাকাগুলি মাথার চেয়ে বেশী কেঁপে উঠল।

জীবন বসু মাইকের কাছে এগিয়ে এলেন। ভাষণ শুরু হল। আপনারা আজ এখানে কেন এসেছেন তা নিশ্চয় আপনারা জানেন। কোন কিছু বলার আগে সেটাই বলে নি। জানার ত শেষ নেই। কিন্তু কতটুকু জানব—সেটাও জানা বিশেষ দরকার। [হিয়ার, হিয়ার]। [কিছুক্ষণ ধরে সমানে হাততালি]। আমরা বহুদিন ধরে আন্দোলন করছি, আন্দোলন করি, এটা আপনারা সবাই জানেন। আন্দোলন করি কেন—সেটাই মূল কথা, মানুষ ঘা না খেলে জাগে না। বেশীর ভাগ মানুষ জেগেই ঘুমোয়। বাসে-ট্রামে-ট্রেনে এ দৃশ্য প্রতিনিয়তই আপনারা দেখছেন। হয়ত দেখলেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে, চোখ খোলা। ভাবলেন, জেগে আছে,—তা নয়, আসলে কিন্তু ঘুমোচ্ছে। [করতালির সঙ্গে হাসির শোরগোল]। মানুষকে শুধু জাগানোর জন্যই আমাদের এ আন্দোলন নয়, জাগতে হবে সমস্ত চেতনা নিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে। আশ্বাস নিয়েও জাগতে হবে। অসীম প্রতীক্ষায় সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করা, আর নীরবে কাজ করে যাওয়াটাই আমাদের পথ। দেশের লোক নিয়েই আমাদের কারবার, তাই আমরা স্বদেশী। কিন্তু যুগের হাওয়াকে ত আর অস্বীকার করা যায় না। এ যুগ আন্তর্জাতিক যুগ, একটার সঙ্গে দশটা জড়িয়ে আছে। একজনকে আঘাত করলে দশজনের লাগে। এক ঘটনার সঙ্গে অন্য একটা ঘটনার আন্তর্জাতিক যোগসূত্র থেকে যায়। সেদিক থেকে আমরা আন্তর্জাতিক।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশটাকে ভাঙ্গতে চায়, অনেক দিন ধরেই তাদের এ চেষ্টা চলছে। এখন তাদের অনেক বেশী সুযোগ। তাই তারা এখন অনেক বেশী তৎপর। তাদের সুযোগ করে দিচ্ছে এই বর্তমান সরকার।

কেন তারা এ দেশটাকে ভাঙ্গতে চায়। গড়বার আগেই কেন তারা ভাঙ্গবার কথা ভাবে, সেটা ইতিহাসের কথা। সেটা স্বার্থ-সংঘাতের কথা। একটু ভাবলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। বিদেশী শক্তি আমাদের চেয়ে চিরকালই শক্তিশালী ছিল, এখনও আছে, এটা আপনাদের ভেবে দেখতে বলি। শুধু ভাবলে হবে না, ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে কথাটার সত্যতা যাচাই করে দেখতে হবে।

আমি জানি আপনারা এক্ষুণি জানতে চাইবেন, কী করতে হবে? আপনারা আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে নিজেদের চেতনা বাড়ান। একটার সঙ্গে অন্যটার কি সম্পর্ক, একটার সঙ্গে অন্যটার কি পারম্পর্য সব তখন জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এই সামনে-পেছনে যে বাবাই উঠুন এটার আবার প্রয়োজন পড়ল কেন—সেটাও আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই! [হাততালি]। উত্তর অবশ্য এঁরা দেবেন না। কারণ, কাজের নামে কেন যে এঁরা এত অকাজ করেন, জন-অর্থ ধ্বংস করেন, এ প্রশ্নের উত্তর এঁদের কারুর কাছেই নেই। কিন্তু মানুষ ছেড়ে আবার দেবতা কেন? দেবতা কী কোনকালে মানুষের পেট ভরায়, মানুষের অন্ন জোগায়? তাহলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেই ত দেশ তরতর করে এগিয়ে যেত। তা যখন হয়নি, তা যখন হয় না, তখন কোন দেবতাই সত্য নয়। সত্য শুধু মানুষই। [প্রচণ্ড হাততালি ও বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিৎকার]। মানুষের হাতেই শক্তি, জাগরণ মানুষের হাতেই। [আবার প্রচণ্ড বেগে করতালি]। তবে এসব প্রহসন কেন? প্রহসন শুধু ঘরে নয়, বারোয়ারী সভায়। মেহনতী মানুষ, শ্রমিক, এরা জাগ্রত হয়ে উঠলে, দেখবেন, কোন দেবতারই আর প্রয়োজন নেই। মানুষের আয়ু কম, কাজের সময় আরও কম। সেই সময়ের এতটা যদি দেবতাই নিয়ে নেন, তাহলে কাজ হবে কতটুকু বুঝতেই পারছেন। [শ্যেম্, শ্যেম্]।

আর একটা কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। সরকার বহুদিন ধরে একইভাবে ভাঁওতা দিয়ে আসছে। যখন অবস্থাটা হাতের বাইরে চলে যায়, যখন বোফরস্ বা ফেয়ারফ্যাক্সের মত ঘনঘটা মেঘ দেশের আকাশ ছেয়ে ফেলে, তখন গণেশ টাওয়ারের মত অত্যাশ্চর্য জিনিস গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বহু আগে থেকে প্ল্যান করে এরকম একটা গণদেবতা খাড়া না করলে গদি আর সামলান যায় না। এটার উদ্দেশ্য কি তাই নয়? আমি জানি এটা টুরিস্টদের কাছে একটা মস্ত বড় দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠবে, তা হয়ে উঠুক। কিন্তু এদেশের মানুষ-গুলোও যে দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠছে, সেদিকে সরকার কী একবার নজর দেবেন? আমরা নজর দেব বলেই আজকে সবাই মিলিত হয়েছি। নজর

দেব বলেই সবাই একত্রে আরও অনেক বেশী সংগ্রামী ও শক্তিশালী হতে চাই। আপনারা এ আন্দোলনে দলে দলে যোগ দিন, সরকারের 'অরণ্যে রোদন' বন্ধ করুন। লাল সেলাম। [বহুক্ষণ ধরে একনাগাড়ে হাততালি দিয়ে যায় সমবেত জনতা।]

বিরোধী পক্ষের অন্য বক্তারা একে একে নিজেদের বক্তব্য রাখলেন। অনেকক্ষণ ধরে জনসভা চলল। আস্তে আস্তে জনসভার আসর গরম হয়ে উঠ্‌তে লাগল। হাততালি ও চিৎকারে আকাশ বিদীর্ণ হল।

পরাঞ্জপের লোকেরা সব ভাষণই টেপ্‌ করে নিলেন। ভবিষ্যতে হয়ত কাজে লাগবে। 'জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।'

॥ ষোল ॥

অলকা সুরিন্দরকুমারকে ঠিক পছন্দ করে না। সুরিন্দর বিলেতে 'আন্ত-র্জাতিক বিষয়' নিয়ে অলকার সঙ্গেই রিসার্চ করত। রিসার্চে খুব সুনাম হয়। তাই ইংল্যাণ্ডে থেকে যাওয়াই ঠিক করে সুরিন্দর। এখানে পয়সাকড়ি, মানইজ্জতও সবই বেশী; স্বদেশে স্বীকৃতি পাবার ওটাই আজ-কাল চাবিকাঠি।

অলকার প্রতি সুরিন্দরকুমারের দুর্বলতা ছিল। নানা ঘটনায়, নানা অভিব্যক্তিতে তা প্রকাশ পেত। অল্প বয়সে এত প্রতিষ্ঠা, এত সম্মান। বিলেত-আমেরিকার অধিকাংশ জার্নালিস্ট, রিসার্চার, আর বেশীরভাগ লেখকের মতই ভারতবর্ষের দারিদ্র্য, কুসংস্কার, জাতিভেদ, নিজেদের মধ্যে হানাহানি ছাড়া ভাল কোন কিছুই চোখে পড়েনা সুরিন্দরের। এদেশের লোকেরা লোভী, বড় অভদ্র। 'আন্‌স্ক্রুপুলাস, এণ্ড শ্যাবি।' পৃথিবীর সব ব্যাপারেই ভারতীয়রা নাক গলাতে অভ্যস্ত; যেন 'মরালিটি' আর 'এথিক্স্‌'—এর যদি কিছু এখনও অবশিষ্ট থাকে, তা শুধু ভারতেই আছে। নন্‌সেন্স। তাবড় বিদ্বানদেরও কারুর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সাহস নেই। নিজস্ব অপিনিয়ন বলতেও কিছু নেই। কথা

বলার সময় যত রাজ্যের এডজেক্‌টিভস্‌ আর সুপারলেটিভস্‌-এর ব্যবহার, চমৎকার, এক্‌সেলেন্ট। সুরিন্দরের মনে এইসব ধারণা বেশ বদ্ধমূল হয়ে গেছে। শুরুতে এ নিয়ে অলকা তর্ক করত, সুরিন্দরের ভুল ভাঙ্গাবার চেণ্টা করত। খুব একটা সফল হয়নি। সুরিন্দরকে অপছন্দ করার এটাই বোধ হয় বড় কারণ।

আর কদিন পরেই ভারতবর্ষে ফিরে যাবে অলকা। সসম্মানে ডক্‌টরেট পেয়েছে। সুরিন্দর খুব খুশী। অলকাকে একথা জানাতেই যত দ্বিধা। অলকার দেশে ফিরে আসার আর দুদিন বাকী। সুরিন্দরের সঙ্গে অলকার দেখা। দুজনের মধ্যে অনেক কথা হয়।

সুরিন্দর, তুমি তাহলে এখানেই থেকে গেলে? বিলেত তোমার ভাল লাগে, এখানকার সব কিছুই চমৎকার। নেটিভ ভারতের মত ন্যাস্টি নয়, কি বল? আমার মনে হয় এটা তোমার শ্লাভিস্‌ টেমপারামেন্ট।

সুরিন্দর কোন দ্বিধা না করেই বলে—অলকা, তোমাকে ত অনেকবারই বলেছি, আমি এখানে থাকব। আমি চাই, তুমিও থেকে যাও।

—রক্ষে কর। আমার দেশ যত ন্যাস্টি হোক না কেন, সে আমারই দেশ। সেখানকার রাস্তাঘাট নোংরা, বসবাসের অযোগ্য সে জায়গা—যা তোমরা সব সময় বল। দারিদ্র্য যার অঙ্গের ভূষণ, যার জন্যে তোমাদের মত সব এলিটদের রাতে ঘুম আসেনা, আমাকে মাপ কর যত খারাপই হোক সে ভারত, সে আমারই দেশ। তোমাদের মত অত ইনটেলিজেন্ট আমি নই যে এখানে পড়ে থেকে তোমাদের মত আমারই দেশের নিন্দা করব। এই নিন্দা করার জন্যই তোমরা রিসার্চ কর। রিসার্চ ম্যাটিরিঅ্যালকে কাজে লাগিয়ে খুশীর মেজাজে পয়সা লোট। ওরকম প্রতিষ্ঠা বা পয়সা আমি চাই না। তাছাড়া, তোমার মত অত ব্রিলিয়েন্ট আমি নই। তোমার মধ্যে এদেশের অনেকেই পটেন্‌শিয়্যালিটি দেখতে পেয়েছে। তুমি কাগজে লেখ, ওরা বাহবা দেয়। সেমিনারে তুমি পেপার পড়, বক্তৃতা কর, ওরা বাড়ি বয়ে তোমাকে পয়সা দিয়ে যায়। প্রশংসায় গলে পড়ে। এতসব ছেড়ে তোমার পক্ষে ওই পোড়া দেশে ফেরা সত্যিই মুশকিল। এটা আমি বুঝি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ব্যাপারে তোমার মতামতের এরা কদর দেয়। শুরুতেই এই, এখনও অনন্তকাল বাকী। তোমার ভবিষ্যত উজ্জ্বল। তুমি থাক। আমি চলি।

—এটা তোমার অভিমান, আমি জানি।

—অভিমানের কথা নয় এটা, সুরিন্দর। এটা আত্মবিশ্বাসের ও আত্মপ্রত্যয়ের কথা। কি জান, দেশের কথা না ভাবলেও তোমার চলে যাবে। চার ভাইয়ের মধ্যে তিন ভাই-ই এক্সপোর্টের ব্যবসা করে। ওদিকে তোমার মন নেই বলেই তুমি পড়ছ। পড়াশুনা করছ বলে তোমার বাড়ির

লোকেরা কৃতার্থ। সবাই ধন্য ধন্য করছে। স্বচেষ্টায় তুমি এরই মধ্যে এখানে এতটা প্রতিষ্ঠা পেয়েছ। এরই মধ্যে দু-তিনটে বইয়ের অথর হয়েছ। ভবিষ্যতে আরও না জানি কত লিখবে। লণ্ডনের নামী প্রতিষ্ঠান তোমার বইয়ের পাবলিসার্স। দিল্লী-লণ্ডন ত তোমাদের এপাড়া-ওপাড়া। আমরা ভাবতেই পারি না। তোমার দৃষ্টি আন্তর্জাতিক হবে না ত কার হবে।

—তোমার? সুরিন্দর একটু হাসল।

—আমার! তোমার পাশে সামান্য এক রিসার্চার।

—হ্যাঁ, তা ত বটেই! বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পার তুমি। তোমার ব্যক্তিত্ব—

—থাক্, সুরিন্দর, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমাদের মিল কোন-দিন হবে না, সেটা তুমিও জান, আমিও জানি।

—ওকথা বলছ কেন অলকা? কতদিন আমরা একসঙ্গে ঘুরেছি। সুখে, আনন্দে দিন কাটিয়েছি। এত কাছাকাছি এসেছি। বিদায়ের মুহূর্তে, তবে কেন মনে হচ্ছে আমাদের কোনদিন মিল হবে না? কেন অকারণে এ কথা মনে হল তোমার, বল অলকা, জবাব দাও।

—আজকে এই মুহর্তে প্রথম আমরা আমাদের সম্পর্কটাকে গভীরে তলিয়ে দেখছি। আরো এসব কথা যখনি তুলতে চেয়েছি, তুমি এড়িয়ে গেছ। কি কারণ, অবশ্য জানিনা। গভীর আশঙ্কায় অধীর হয়ে শুধু বলেছ—না, না। আজ থাক অলকা। আজকে ওসব কথা নয়, অন্য দিন।

সুরিন্দর হঠাৎ বলে ফেলে—আমার মনে হয়, আমাকে সিরিঅ্যাসলি তুমি কোনদিনই নাওনি। তাই না?

—হ্যাঁ, তা হয়ত কিছুটা ঠিক। সিরিঅ্যাসলি নিইনি, বলছ। কেন জান? কিছু টুকরো টুকরো ঘটনা, মাঝে মাঝে তোমার এলোমেলো উক্তি, তোমার চাল চলন আমায় ব্যথা দিয়েছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে তোমায় যখন বিচার করেছি তখন কেন জানি আমার মনে হয়েছে, তুমি যে ইন্-কাম-গ্রুপের, সেখানে বিদেশী মেয়ে বন্ধু বা কোন ব্রিলিয়েন্ট দেশী মেয়ে তোমার পাশে বেশী মানাবে। আমি নিশ্চয় নই।

—মা-বাবার পয়সা আছে, সেকথা ঠিকই। আমার আদর-আব্দার তাঁরা হয়ত একটু বেশী মিটিয়েছেন। দাদারাও পয়সাওয়ালা লোক। আমি যা চাই, বিনা কৈফিয়তে তাঁরা তা মেনে নেন। এর জন্যে তুমি আমাকে দায়ী করছ কেন? হ্যাঁ, একথাও ঠিক যে আমি রেস্তোরাঁয় বন্ধুবান্ধবদের এন্‌টারটেইন্ করতে ভালবাসি; দল বেঁধে ক্লাবে যেতেও আমার ভাল লাগে। এসব আমি এফোর্ড করতে পারি। ধার করে এসব করা আমার স্বভাব নয়, সেটা নিশ্চয় করে আমি বলতে পারি।

—হ্যাঁ, সবই ঠিক। অলকা একটু হাসল, তোমার এত আছে, বন্ধু-বান্ধবদের জন্য একটু খরচ করবে, এটাই ত স্বাভাবিক। এত করেও এদের কাছ থেকে তুমি কিছু প্রত্যাশা কর না। উল্টে, আগ্‌ বাড়িয়ে কেউ কিছু করতে গেলে তুমি রীতিমত অপমান বোধ কর। এও তোমার এক ধরণের বিলাসিতা, নিশ্চয় তা স্বীকার করবে।

—তুমি ত জান, মতামত আমি সহজে দিই না, এমন কি ভারতবর্ষ সম্পর্কেও নয়।

—হ্যাঁ, সেটাও তোমার একটা মস্ত গুণ। ভারতবর্ষকে কতটুকু দেখেছ, দেখার কতটুকু সুযোগ পেয়েছ যে তুমি অথরিটি নিয়ে কিছু বলবে। কিন্তু যতটুকু তুমি বল, সেটা বলাও তোমার সাজে না। বই পড়ে, অপরের মতামত ধার করে এ সম্পর্কে বলা যায় না। তুমি ভারতীয়, লেখাপড়া শিখে রিসার্চ করে পণ্ডিত হয়েছ, তাই ভারতবর্ষ সম্পর্কে তোমার কথাবার্তা এদেশের লোকেরা মন দিয়ে শোনে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানার সৌভাগ্য যাদের হয়নি, সেই সব আধা ইংরাজ ও আধা ভারতীয়দের বাড়িতে তোমাকে নিয়ে রীতিমত আসর জমে, পার্টি হয়, এইসব আসরে আন্ত-র্জাতিক বিষয়ে তুমি কেম্ব্রিজ-তকমাধারী মধ্যমণি। আমাদের মত হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিজের চোখে এইসব দেখেছি, তাই আজ আর না বলে পারলাম না। যদিও জানি, তোমাকে এসব বলে কোন লাভ নেই।

—কি রকম!

—সব কথা সব সময় বলতে নেই, সুরিন্দর।

—তুমিই ত কথাটা তুললে।

—যাতে আমার সম্বন্ধে তোমার কোন ভুল ধারণা না থাকে।

—আমি ত আমার মতই হব, এতে যদি তোমার রাগ হয়, আমার কিছু করার নেই।

নিজের সম্বন্ধে সুরিন্দরের এই সাফাই অলকা বহুবার শুনেছে। ফেলে আসা দিনগুলোর অনেক কথাই অলকার মনে পড়ে। শুধু বলল—নিজেকে তলিয়ে দেখার সময় তোমার কোথায়, আমি এটাই ভুলে যাই।

—তুমি আমাকে তোমার মত করে তৈরী করতে চেয়েছিলে, কিন্তু পারনি। আমি জানি নানান কথার মধ্যে দিয়ে তুমি সেটাই বলতে চাইছ।

—মস্ত ভুল করছ সুরিন্দর। মানুষের স্বভাব অত সহজে পাল্টান যায় না।

—আমি দেশে ফিরতে চাইনা বলেই ত তোমার রাগ।

—না, তাও নয়। দেশে তুমি ফিরবেই বা কেন? তোমার মত কজন স্কলার দেশে ফিরে পড়ে পড়ে মার খায়? তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য

সুরিন্দর, হাতে গোনা যায়। একটু থেমে অলকা আবার বলে—এখন দেশের সঙ্গে দেশের ব্যবধান অনেক কমে এসেছে। যারা এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে তারাই হবে প্রকৃত 'আন্তর্জাতিক'। আমাদের দেশও কত এগিয়েছে দেখো; সমাজচ্যুত হবে বলে একসময়ে কালাপানি পেরত না। আর এখন। ঠিক তার উল্টো। যত বার বিদেশে যাবে, তত নাম-যশ পাবে, ততই দেশে তার সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়বে। অলকা নিজের মনেই একটু হাসল। ব্যঙ্গ করে বলল—তোমার মত ছেলে বিয়ে করতে চাইলে বিশ্বের সেরা সুন্দরী ও বিদুষী মেয়ে পাবে, একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

—তাই বুঝি! জানা ছিল না ত! তোমাকে আমি একটু অন্য চোখে দেখি অলকা। আজ মনে হল অন্য চোখে দেখার ব্যাপারটা শুধু আমারই। বঝতে পারছি তোমাকে ইমপ্রেস করতে পেরেছি বলে যেটা ভাবতাম, সেটা শুধু আমার অহংকার। ভাবতাম, তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু, আমাকে ঠিক পারস্পেকটিভে দেখবে, প্রয়োজনে গাইডও করবে।

—গাইড আমি কাউকে করি না, তোমাকে করার স্পর্ধাও রাখিনা। অলকা একটু থামল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। সেটা বিদ্রূপ না ব্যথার, ঠিক বোঝা গেল না। অলকার শেষ কথাটার অর্থই শুধু বোঝা গেল।

আসল কথা কি জান। আমি যা ভাবি তা নির্ভীকভাবে বলি। এও জানি, অনেক সময় তা অপ্রিয় শোনায়।

আমি দেখেছি, বলেই সুরিন্দর থেমে যায়। দ্বিধা কাটিয়ে বলেই ফেলল—অর্থবান লোকেদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে তোমার ভীষণ বাধা। একদা কমিউনিজম নিয়ে তুমি মেতেছিলে। আমার মনে হয় তখন থেকেই তোমার স্বভাবে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে এই ধরনের নানান সূক্ষ্ম ইন্‌হিভিশন্ দেখা দিয়েছে। তোমার কথা ও ব্যবহারে কন্‌ট্রাডিকশন্ আমি লক্ষ্য করি। অনেক সময়েই আমার মনে হয়েছে, তুমি ইচ্ছে করেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছ। এটা আমি অনেক আগেই টের পেয়েছিলাম, কিন্তু বাধা দিতে সাহস পাইনি।

—আমার পরিবর্তনটা তুমি লক্ষ্য করেছিলে। আমাকে যদি আপনজন ভাবতে তাহলে নিশ্চয়ই বাধা দিতে। তোমার স্বভাবের এও এক ধরণের কারচুপি। এটাকে ঠিক ব্যর্থতা বলছি না। জেনেশুনে না-জানার ভান করে, চুপ করে থাকার অর্থ কি, সেটা বুঝতে নিশ্চয়ই তোমার অসুবিধা হবে না। আমি যা, তা নিয়েই আমি। আর যাই হোক, আমার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটানো তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে অবাধ স্বাধীনতা ও স্বাচ্ছন্দের মধ্যে তুমি মানুষ হয়েছ, আমি বুঝতে পারি, মার্ক্সিয়ান মেথড-

লজির সত্য আলো দেখার সাধ্য তোমার নেই। তবুও দেখ, সুরিন্দর, যা স্বাভাবিক তাকেও তুমি মেনে নিতে পারনি। আমার মনে আছে, ইন্টারন্যাশনাল্ পলিটিক্সটা বুঝতে কমিউনিজমের ইতিহাস তুমিও খুঁটিয়ে পড়েছ। কি তার ধারা, নিউ-কমিউনিজমের রূপ কিভাবে পাল্টে যাচ্ছে, মার্ক্সের অরিজিনাল ওয়ার্কস এমন কি 'দাস ক্যাপিটলও' তুমি দাগিয়ে পড়েছ। এত পড়ে, এত জেনেও তোমার কি কিছু লাভ হল। এতটুকু পরিবর্তন তোমার হল না। কমিউনিজমকে তুমি শুধু ক্রিটিকালী বিচার করেছ। কমিউনিজমের কোন মতামতেই তুমি বিশ্বাসী নও। কেন নও, তাও আমি জানি। ইন্হিবিশন্ নিয়ে তুমি একটু আগেই কথা তুলেছিলে না, ইন্হিবিশন্ একেই বলে।

--এতক্ষণে বুঝলাম, কোথায় তোমার অভিমান। ওরা যাকে 'ডি-ক্ল্যাসিফাই' করা বলে, আমার দ্বারা তা কোনদিন সম্ভব হবে না। আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করিনি।

—হ্যাঁ, সেটাও তোমার মস্ত ঔদার্য। প্রকৃত স্বাধীনতায় বিশ্বাসী মানুষ হয়ত ছলনা করে না। কিন্তু তুমি যে ধরণের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, সেখানে ছলনাকে কি বাদ দিয়ে চলা যায়?

থতমত খেয়ে সুরিন্দর বলে ওঠে--ওটা বড় শক্ত প্রশ্ন। তবে কি জান, সব দেশ একইভাবে যেমন এগোয় নি, এগোয় না, সব মানুষও তেমনি একইভাবে এগোতে পারে না। তুমি স্বেচ্ছাচারী স্বাধীনতার সামাজিক কুফলের কথা তুলেছ। ওটাকে আমি অন্যভাবে দেখি। আমি ভাবি জগৎ বিচিত্র, সেই বৈচিত্র্যেই তার বিপুলতা। এটা ত তোমারই কথা।

—তোমার সঙ্গে এই নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না। অনেক সময় তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি নিজের ইচ্ছায়, কখনও বা তুমি জোর করাতে। তোমার জোর করার মধ্যে অনুরোধের চেয়ে একগুঁয়ের ভাবই প্রকাশ পেত। অন্যের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন মূল্যই তুমি দাও না। কোনদিন কোন ব্যাপারে অসফল হওনি বলে সব ব্যাপারেই তুমি তোমার নীতি চালাও, এমনকি হিউম্যান রিলেশানেও। অন্যকে ততটুকুই স্বাধীনতা তুমি দাও, যতটুকু তুমি মনে কর দেওয়া উচিত; অথবা না-দিলে বিগড়ে যাবে। এটা স্বার্থপরতারই সর্বাধুনিক রূপ। তোমার হাসি দিয়ে, হিউমার দিয়ে তুমি তোমার ঐশ্বর্যের দাপট ঢেকে রাখ বলেই লোকের কাছে তুমি এত অমায়িক, এত ভদ্র, এত কালচারড্। আসলে কিন্তু তা নও। অন্য মেয়েরা তোমার এসব প্লাস পয়েন্টে মুগ্ধ হয়। বিদ্যার জৌলুস দিয়ে তুমি তাদের কাছে তোমার এরোগেন্স্ যেভাবে ঢেকে রাখ, আমার বেলায় সেটা বোধহয় সম্ভব হয়নি। তুমি ভুলে যাও যে হিউমান অ্যাটিটুউড্ নিয়েই আমি রিসার্চ করেছি।

—তোমার এসব যুক্তির মধ্যে তীব্র একটা গোয়ার্তুমি আছে। লজিক থাকুক বা না থাকুক তুমি প্রমাণ করবেই যে বিদ্বান ও পণ্ডিতরা বড় এক-ঘেয়ে। বিচিত্র সব মানুষের সঙ্গে বিদ্বানদের সদ্ভাব ও সংযোগ হয়। অসংখ্য বই তারা পড়ে। কিন্তু তাই বলে কি তুমি প্রমাণ করতে পারবে যে, সব ঘটনার পটভূমি বা পৃথিবীর ইতিহাস, রাজনীতির টালমাটালের বিষয় কিংবা বিপ্লবের ধারাকে তারা সবাই একইভাবে দেখে? এই দেখার বিভিন্নতাটাই ব্যক্তিত্ব। এটা তোমারই কথা।

—কি জানি, কখন, কি কন্‌টেক্সটে কি বলেছি—তার রেফারেন্স দিয়ে তুমি আমাকে এখন এ্যম্‌ব্যারাস্‌ করতে চাইছ। মানুষকে বেকায়দায় ফেলতে তুমি দেখছি ওস্তাদ।

—কি করব বল, বাড়ির আদর পেয়ে আমার দুটো জিনিস লাভ হয়েছে। এক, অর্থের কষ্ট কোনদিন আমি পাইনি। আর দ্বিতীয়টা, কোন কথা আমি সহজে ভুলি না। অ্যাই হ্যাভ এ ফেনোমেনাল্‌ মেম্যারি।

—এটাও এক ধরণের একঘেয়েমি। বেশী বই পড়ার কুফল। ক্রিয়েটিভ মানুষের কাছে ওটা অপচয়।

সুরিন্দর অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আর সহ্য হয় না। রেগে বলে ফেলে—দেখো অলকা, তোমার মত আরও দশটা মেয়ে কেম্ব্রিজ ইউনিভারসিটিতে আমার পেছন পেছন ঘোরে।

—এক্ষেত্রে তোমার ফেনোমেনাল্‌ মেম্যারিটা নিশ্চয় তোমার খুব কাজে লাগে। কিভাবে তুমি এর সদ্ব্যবহার কর, সেটা কি আমি কোনদিন শুনতে চেয়েছি? এটুকুই আমার ভদ্রতা।

সুরিন্দর চুপ করে যায়। ভাবে এ প্রসঙ্গে কথাবার্তা আর না বাড়ানই ভাল। তাই প্রশ্ন করে—তুমি কবে যাচ্ছ?

—পরশু।

—কাল একবার কি দেখা হবে?

—চাইলে, হবে।

—কাল আমার একটা লেকচার আছে, ভারতবর্ষের বর্তমান গ্রোথ প্যাটার্ন নিয়ে। শুনতে যাবে?

—নিশ্চয়ই। দশজনের সামনে ভারতবর্ষকে কিভাবে তুলে ধর, তোমার বক্তব্যটা কিভাবে ফুটিয়ে তোল, যাবার আগে শেষবারের মত একবার তা নিজের কানে শুনতে চাই।

কাল আবার অলকার সঙ্গে দেখা হবে। সুরিন্দর খুশী হয়। কথায় তা ফুটে ওঠে। ভেরী গুড। বক্তৃতার পরে তোমার অনারে আমার এক্সক্লিউসিভ্‌ পার্টি—অ্যান্ড আওর লাস্ট মিটিং, অলকা।

—ওটাকে তুমি স্মরণীয় করে রাখতে চাও, তাই না?

—এক্‌জাক্‌টলি। সুরিন্দর দু-হাত বাড়িয়ে স্বাগত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল।

অলকা হেসে বিদায় নিল।

পরের দিন বক্তৃতা-সভায় স্কলারদের ভিড় দেখবার মত হয়েছিল। সুরিন্দর দাঁড়িয়ে উঠে বলল—যে বিষয়ে আজকে আমাকে বলতে বলা হয়েছে তার যুক্তি খাড়া করতে মাঝে মাঝে আমি নানা বই থেকে বিশেষজ্ঞ-দের কোট্‌ করবো—আমার বক্তব্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ দেবার জন্য। ভারত কতটা এগিয়েছে, কতটা পারেনি, সেটা জানা শক্ত নয়। অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান ভারতের 'এড্‌মিক্সচার গ্রোথ প্যাটার্ন' কোথায় গিয়ে আটকে যাবে, সে বিষয়ে আজ আমি বলব। সুরিন্দর চমৎকার একটা ভূমিকা করে তার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দিল। বলল—ভারতে 'গ্রোথ' ঠিকমত কেন হচ্ছে না, তার যেমন কার্যকারণ সম্পর্ক আছে, তেমনি এর ঐতিহাসিক দিকও আছে। সেটাই আগে বলছি। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বিশেষ সেক্রেটারী মহলানবিশ। সে সময় রাশিয়ায় যে এক্সপেরিমেন্ট্‌ চলছিল, তা টেগোরকে ইমপ্রেস করেছিল, বিশেষ করে ওদেশের শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা। মহলানবিশও মুগ্ধ হয়েছিলেন রাশিয়ার পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণ দেখে। মহলানবিশ শুধু যে একজন দক্ষ স্ট্যাটিস্‌টিশিয়ান ছিলেন তা নয়, বিরাট পণ্ডিতও ছিলেন। তখন ভারতবর্ষের উন্নয়ন পলিকল্পনার কোন নির্ভর-যোগ্য 'ডেটা' ছিল না। পরবর্তীকালে ভারত যখন স্বাধীন হল তখন তিনি নানা বিষয়ের গভীর অনুসন্ধান করে দেখেছিলেন। সাইনটিফিক্যালি সমস্ত 'ডেটা' তৈরী করে তার ·র্যালোচনা করে বলেছিলেন যে, ভারতের উন্নতি বলতে কিছুই হয়নি। [শুনতে শুনতে অলকার একবার মনে হল কোন্‌ ঐতিহাসিক কারণে ভারত পিছিয়ে পড়েছিল, পিছিয়ে পড়ার আর্থিক ও রাজনৈতিক কারণগুলোই বা কি এ সম্বন্ধে সুরিন্দর কিছু বলল না। কেন না, ওটা বললে বিদেশীরা তা উপভোগ করবে না, এটা সুরিন্দর জানত। তাই এই কারচুপি]।

সুরিন্দর বলে চলে—নেহেরুর সঙ্গে মহলানবিশের বেশ হৃদ্যতা হয়েছে। নেহেরু তাঁকে খুবই পছন্দ করতেন। মহলানবিশ এই সুযোগে সোভিয়েট মডেলের অনুকরণে ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাটা নিজেই তৈরী করলেন। অবশ্য আরও অনেকে ছিলেন তাঁর সঙ্গে। বড় বড় অর্থ-নীতিবিদও বিদেশ থেকে এসেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা গ্রহণ করা হল, তা হল সেই সোভিয়েট মডেল।

অথচ, মিক্সড্‌ ইকনমি রইল, যদিও মূল ভিত ক্যাপিটালিস্টিক। সেই থেকেই কনট্রাডিকশন্‌। সেটাই আপনাদের বলব। প্রথম পরি-

কল্পনায় কৃষি উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বড় বড় মেশিন্ তৈরীর ওপরই শক্তি ও সামর্থ্য নিয়োজিত হতে দেখলাম। স্টীল চাই, 'কী ইনডাসট্রিস্' চাই, পাওয়ার চাই। আপনারা জানেন, এসব হল মূল শিল্পকে গড়ে তোলার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য। যাকে আমরা আজকাল বলি, ইন্ফ্রাস্ট্রাক্চারস্। এসব গড়ে তুলতে না পারলে ভারত কোনদিনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না।

পাশাপাশি দেশের ইকনমির কথা মনে রাখতে হবে। সোভিয়েট এক্সপেরিমেন্টকে কার্যকরী করে তোলার মত শক্তি তখন ভারতের ছিল না। কেন? তারও একটু ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

সেদিন দেশে নেতারা গদি সামলাতে ব্যস্ত। এটা ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়ায়নি। এ সম্পর্কে আমি শুধু মাইকেল এডওয়ারডিসের 'দি লাস্ট ইয়ারস্ অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করতে চাই। তখনকার কংগ্রেসের অবস্থা অল্প কথায় কি সুন্দরভাবেই না তিনি তুলে ধরেছেন। ক্ষমতা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই তখন দলাদলি শুরু হয়ে গেছে। যুবক সম্প্রদায়ের সামনে চাকরীর সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এখন তারা তার সুযোগ নিতে চায়। তখন কংগ্রেসের কাছে পরাধীন অখণ্ড ভারতের চেয়ে খণ্ড ভারত অনেক বেশী শ্রেয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের তখন পড়ন্ত অবস্থা, সর্বত্রই স্ট্রাইক, বেশীর ভাগ ফ্যাক্টরি বন্ধ, প্রজারা বিদ্রোহের হুমকি দিচ্ছে জমিদারদের।

'কংগ্রেসের মধ্যেও শক্তিশালী পুঁজিবাদী শক্তি নেহেরুকে অস্বীকার করার জন্য তৈরী হচ্ছে, যেমনভাবে তারা গান্ধীকে এক কথায় সরিয়ে দিয়েছিল। এদেরই মুখপাত্র হচ্ছেন প্যাটেল। প্রথমে প্যাটেল ব্যবসায়ীদের টাকা ঢালতে বলেছিলেন; তারা এখন ডিভিডেন্ট চায়। প্যাটেলই প্রথম পাঞ্জাব ও বাংলাকে বিভক্ত করে দেশ দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব এনেছিলেন। এখন তিনি ভারতকেও দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব নিয়ে তৈরী। জিন্নাকে খুশী করতে নয়, কংগ্রেসের পতন এড়াতে। সোশ্যালিস্টদের বড় একটা দাম কোনকালেই ছিল না, বিশেষ করে কংগ্রেস যখন দেখল, এদের এখন খুব সহজেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে...।'

একমাত্র নেহেরু ছাড়া দেশের বেশীর ভাগ নেতাই চাইছিলেন দেশটাকে ব্রিটিশ মডেলে গড়ে তুলতে। সেটা হলেই হয়ত ভাল হত। কিন্তু দেশ-বিভাগের সম্মুখীন হয়ে বেশীর ভাগ নেতাই এমন কি নেহেরু পর্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। অনিশ্চিত এই পরিস্থিতিতে কি করা উচিত তা কারুর পক্ষেই ভেবে দেখা সম্ভব ছিল না। এঁদের অনেকেই নেহেরুকে একটু সন্দেহের চোখে দেখতেন স্বাধীনতা পাবার বহু আগে থেকেই। কিন্তু তাঁরাও তখন দিশেহারা। একদিকে লক্ষ লক্ষ লোক মারা পড়ছে, অন্য-

দিকে ভাগবাটোয়ারা নিয়ে মহা গোলযোগ শুরু হয়ে গেছে। নেহেরু তখন নন্-অ্যালাইনমেন্ট্ নিয়ে পলিটিকাল ফিল্ডে জোরদার এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছেন। এশিয়া-আফ্রিকাকে পথ দেখাবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব। এশিয়ার বেশীর ভাগ দেশই তখন স্বাধীন। এদের সবাইকে পথ দেখানই নেহেরুর একমাত্র চিন্তা। নেহেরুর বিশ্বাস, বড় শক্তির সঙ্গে জোট বাঁধলে নিজস্ব স্বত্তা খোয়া যাবে। তাই কোন গোষ্ঠীতে যোগ না দেবার জন্যে দেশবাসীকে তিনি সাবধান করে দেন। এইরকম একটা সংশয়ের মধ্যে নেহেরুকে পাবলিক সেক্টরের আইডিয়াটা সেল্ করলেন মহলানবিশ। নেহেরু বরাবরই ক্রিয়েটিভ্ ডেমোক্রেসির পূজারী। আইডিয়াটা লুফে নিলেন, একবারও মনে হল না, যে ১৯৪৬ পর্যন্ত প্রাইভেট সেক্টর মোটামুটি একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল এ ব্যাপারে। প্রাইভেট সেক্টরের কথা ভুলে গেলে হয়ত ভালই হত, কিন্তু তিনি যা করলেন, সেটা আরও মারাত্মক, তিনি পাবলিক সেক্টরের রোল আইডেন্টিফাই করে দিয়ে বললেন, ভারতের আর্থিক অবস্থায়, পাবলিক সেক্টরের থাকবে 'কমাণ্ডিং হাইটস্'। এক কথায়, এরাই থাকবে মেন রোলে, আর প্রাইভেট সেক্টর সাইড রোলে। অর্থনীতির মূল কথাটা বেমালুম ভুলে গেলেন। গ্রোথ-এর এই যে ওভারল্যাপিং তা এখনও চলছে। পুরণো টেকনলজি, পুরণো বিশ্বাস, পুরণো কথাকে নতুনভাবে সাজানর এক অর্থহীন ব্যর্থ প্রয়াস। এটা আজও আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখনও দরিদ্রতা সেই একই পর্যায়ে আছে, বেকার-সমস্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষ থেকে ২ কোটি ১০ লক্ষে পোঁছেছে। অর্থনীতিবিদদের মতে এই সংখ্যা অন্ততঃ এর দ্বিগুণ। দ্বিতীয় বার্ষিক পরিকল্পনায় পাবলিক সেক্টরের জন্যে ৪ হাজার ৮ শো কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, আর প্রাইভেট সেক্টরের জন্যে দু'হাজার কোটির মত। এর রূপায়ণে বেকার সমস্যা কোনদিনও ঘুচবার নয়। মাত্তর ২২ কোটি লোক দরিদ্র সীমা অর্থাৎ পোভার্টি লাইনের নীচে পড়ে আছে। প্যারিস ও লণ্ডনে সাধারণ একজন মানুষ তিন হাজার ক্যালরী খাবার খায়। ভারতবাসীদের গড়পড়তা ২ হাজার ক্যালরীর বেশী জোটে না। ৪৫ কোটি লোক গ্রামে থাকে, তাদের কি মর্মান্তিক অবস্থা তা স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মিষ্টিমধুর রস দিয়ে ভারতের অবস্থার যে-চিত্র সুরিন্দর কুমার তুলে ধরল তাতে বেশীর ভাগ শ্রোতাই যে খুশী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বাহবা সুরিন্দর পেল বেশী। অলকা ভেবেছিল প্রতিপদে বাধা দেবে, প্রতিবাদ করবে। কিন্তু বিরত হল। ভাবে, সুরিন্দরকে সংশোধন করতে যাওয়া নেহাত পণ্ডশ্রম।

বাইরে বেরিয়ে এসে সুরিন্দর জানতে চায়—কেমন লাগল তোমার?

—চমৎকার! এক কথায় মাস্টারপীস।

—সত্যি বলছ? সুরিন্দর ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিল না।

—কেন, সন্দেহ আছে নাকি?

—সন্দেহ ঠিক নয়। মানে তুমি কি না—, তোমার ব্যাপারটা আবার সব উল্টোপাল্টা কিনা।

—কি রকম?

—এই যা অন্যেরা বলবে, তুমি ঠিক তার উল্টোটা বলবে।

—হ্যাঁ, ভারত যে এগুচ্ছে, এটা দেখবার দৃষ্টি ও ক্ষমতা বক্তার থাকা চাই ত।

—ওটা একরকম জোর করে লোকেরা বলে থাকে। সুরিন্দরের ব্যঙ্গ-হাসি।

—তোমাদের মত এত বিদ্বানের সমন্বয় যেখানে, সেখানে একটু জোর-জবরদস্তি করতে হবে বই কী?

—ওভাবে লোককে ভাওতা দেওয়া যায় না।

—ঠিকই বলেছ। ভাওতা কে এবং কারা দিচ্ছে, কোন্ স্বার্থে আর কাদের স্বার্থে, ইতিহাসই তার প্রমাণ দেবে। সত্যের অপলাপ করে কি ইতিহাসকে পাল্টানো যায়?

তর্কের সুর অন্য খাতে বইছে দেখে সুরিন্দর বলে—কোথায় খেতে যাবে, বল।

—ভেবেছিলাম যাব। কিন্তু এখন না। আমার এক আঙ্কেল আমেরিকা থেকে হঠাৎ এসে গেছেন। আজই শেষ রাতে চলে যাবেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতেই হবে। তাই আমাকে এক্ষুণি ফিরে যেতে হবে। আমি সত্যিই দুঃখিত সুরিন্দর, আমার শেষ কথা আমি রাখতে পারলাম না।

সুরিন্দর ভাবে অলকার নিশ্চয় এটা একটা বাহানা। তাই বলল—আচ্ছা, তাহলে চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। ভেবেছিলাম, তোমার সঙ্গে আজকের এই সন্ধ্যাটা কাটাব।

—সরি সুরিন্দর, আমি সোজা আঙ্কেলের ওখানে যাচ্ছি। তুমি আর সেখানে গিয়ে কি করবে? আর এ ত খুব কাছেই। দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব। কথা বলারও সময় হবে না, তাহলে শুধু শুধু কেন কষ্ট করবে?

মনে মনে সুরিন্দর একটু ক্ষুণ্ণ হয়। কথা আর বাড়ায় না। সে নিজেই একটা ট্যাক্সি ডেকে দিল অলকার জন্যে।

ট্যাক্সিতে উঠে হাত নেড়ে বিদায় নিয়েছিল অলকা।

সেই সুরিন্দর কুমার হঠাৎ আবার দিল্লীতে এসে হাজির। কতদিন এখানে থাকবে, অলকা তা এখনও জানে না। শুনেছে সুরিন্দর নেহেরু ইউনিভারসিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে এসেছে। অলকার ডিপার্ট-মেন্টে এসেছিল, দেখা হয়নি। এবার হয়ত বাড়িতে হাজিরা দেবে।

॥ সতেরো ॥

অলকাকে সঙ্গে নিয়ে সন্দীপ বেশ কিছুদিন ঘুরে বেড়াল। কখনও পায়ে হেঁটে, কখন বা গাড়িতে। দিনগুলো কেটেছে পার্কে, সিনেমায়, রেস্তো-রাঁয় ও ক্লাবে। অফুরন্ত হাসিতে হাল্‌কা কথাবার্তায় ওরা দুজনে মিলেছে, মিশেছে। কিন্তু কথা ফুরোয় না। কত কি যেন বলার আছে, তা আর শেষ হয় না।

হাত ধরে হেঁটে চলে রাস্তায়, হাসি-খুশিতে টইটম্বুর। সমস্ত দেহমনে উচ্ছল যৌবনের দীপ্তি। দোকানপাট দেখে বেড়ায় অকারণে, কচিৎ কখনও কেনাকাটি করে। খেয়াল হলেই সিনেমা-থিয়েটার বা অনুষ্ঠান দেখে আসে। সময় যে কিভাবে কেটে যায় ভেবেই পায় না দুজনে।

মাঝে মধ্যে একআধ হপ্তা দেখা হয় না সন্দীপের সঙ্গে। নিজের কাজে সন্দীপ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজেকে অলকার কেমন একা একা মনে হয়। টেলিফোন করে। সন্দীপেরও সেই একই অবস্থা। কাজের ফাঁকে অলকার কথা মনে পড়ে। সময়ে অসময়ে টেলিফোন করে। ওদের কথা আর ফুরোয় না।

এত নিবিড় করে এত কাছাকাছি পেয়েও ওরা দুজনের মনকে এখনও চেনে না।

সন্ধ্যা হতে তখনও বাকি। পার্কে এসে দুজনে পাশাপাশি বসল। সূর্যের হাল্কা সোনালী আলো। মৃদু-মন্দ হাওয়া বইছে। মাঝে মধ্যে পাখির কূজন। গাছে জল দেওয়া শুরু হয়েছে। জলের পাইপের কাছে মস্ত বড় একটা গর্ত। জলভরে আছে। চিল জল খেয়ে পাখা ঝাপটে উড়ে

যায়; চিলের ভয়ে অন্য পাখিরা সরে যায়। কাকেরা কা কা করে চলে, *পায়রা নীরবে জল খায়।*

অলকা একমনে দেখে হঠাৎ বলে ওঠে--কি রকম সভা বসেছে দেখেছো? সন্দীপও ওদিকে তাকিয়ে ছিল। সায় দিয়ে বলল—শক্তি-মানদের জয় সর্বত্রই। চিলটা কিভাবে উড়ে এসে জুড়ে বসে সবাইকে তাড়িয়ে জল খেয়ে আকাশে উড়ে গেল, দেখলে? পায়রাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই। আপন মনে জল খেয়ে যাচ্ছে। কাকেরা বড় সেয়ানা, কাজের চেয়ে অকাজের শোরগোল তোলে বেশী।

—সেয়ানা মানুষগুলোরও সেই একই স্বভাব।

—কিন্তু তারা বোঝে না যে তারা যা চায়, শোরগোলে তার আর্ধেক খোয়া যায়। সন্দীপ হেসে বলে।

—যেমন তুমি, ঠিক না।

—আমি, আমি কেন হতে যাব?

—নিজের পারসনালিটি বজায় রাখতেই বেশীর ভাগ সময় কেটে যায়।

—তাই নাকি? নতুন কথা শোনালে। নিজেকে নিয়ে ভাববারই সময় পাই না।

—তার মানে দাঁড়ায় তোমার কোন পারসনালিটি নেই।

—ব্যক্তিত্ব কি চশমা, যে পরে নিলেই হ'ল।

—তবে কি?

—তুমি যখন প্রশ্ন করছ, তুমিই এর জবাব দাও।

—এখানে কি ক্লাস নিচ্ছি, যে ব্যক্তিত্বের উৎস বা তার ইতিহাস ও পরিণতি নিয়ে লেকচার না দিলে মান থাকবে না।

—কোথেকে কোথায় এসে পড়লাম আমরা। শুরু হয়েছিল সেয়ানা মানুষ নিয়ে। চলে এলাম ব্যক্তিত্বতে।

—সেয়ানা মানুষের কি আর ব্যাখ্যা লাগে। সবাই তাদের চিনতে পারে। ব্যক্তিত্বের কিন্তু ব্যাখ্যা লাগে, ওটা ধরা ছোঁয়ার বাইরে কিনা। আমরা শুধু আন্দাজ করতে পারি। ভেতরের মানুষটিই ত ব্যক্তিত্ব। ওটা সহজে ধরা দেয় না।

—আমি তাহলে ধরাছোঁয়ার বাইরে, কি বল। সন্দীপ হাসে।

অলকা মিচকি হেসে বলে—ব্যক্তিত্ব আছে কি নেই সেটাই ঠিক হ'ল না। দুর্লভ না সুলভ তা নিয়ে মাথা ব্যথা কেন? কই ব্যক্তিত্ব কাকে বলে তাত বললে না।

সন্দীপ হাসছিল, বলল—আমি কী তোমার ছাত্র যে জটিল প্রশ্ন করে ছাত্রকে বেকায়দায় ফেলবে? ব্যক্তিত্ব আমার আছে বলেই আমি ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা জানি না।

—চমৎকার উত্তর। একশোতে একশো নম্বর পাবে।

—*তোমার চেয়ে?*

—*আমি বুঝি ভাল কথা বলি?* অলকা সন্দীপের দিকে আড়চোখে তাকায়।

সন্দীপ কথাটা পালটে নেয়। কে কার চেয়ে ভাল, জানিনা, তবে তুমি যে আমার চেয়ে ভাল কথা বল, সেটা জানি।

—ও তাই বুঝি? খুশীতে ঝলমল করে উঠল অলকা। কিন্তু কৌতূহল কি সহজে নিবৃত্তি হয়। তাই জানতে চাইল—আমার আর কি কি ভাল?

—প্রশংসা শুনবার সাধ যখন হয়েছে তখন তা পূরণ করতেই হবে। কিন্তু আমার দ্বারা তা হবে না। চাটুকদারদের ডাক।

—ওটা আমি খুব সহজে পাই। তাই ওতে আমার কোন আকর্ষণ নেই।

—আমার কাছ থেকে আর কি তুমি শুনতে চাও, বল? সন্দীপ হাসে।

—এই যে আমি কেমন?

—তুমি কেমন, সে-কথা বলার মত লোকের অভাব তোমার নেই।

—তারা কি বলবে তা আমি জানি।

—আমি যদি তাদের মত একই কথা বলি? সন্দীপের চোখেমুখে দুষ্টুমির হাসি।

—সেটা আমি বুঝতে পারি। কে বানিয়ে বলছে আর কে ঠিক বলছে মানুষ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি, ওটা বুঝতে আমার কোন অসুবিধা হয় না।

—তবে ত ধরেই ফেলেছ আমি কি বলতে চাই। কথায় তার আর কতটুকু প্রকাশ করা যায়।

—তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে কয়েকটা জিনিস লক্ষ্য করেছি।

—যদি আপত্তি না থাকে ত বল, মন দিয়ে শুনি।

—তোমার মনে হবে না ত, যা তুমি জান, তা আবার অন্যের মুখে শোনা কেন?

—নিজেকে আর কতটুকু জানি। অন্যের চোখে অনেক অজানা জিনিস ধরা পড়ে।

—যেমন? অলকা কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে।

—বারে! কথাটা ত তুমিই তুললে, আবার বলছ, যেমন?

—তুমি বলতে চাইবেনা, শুধু শুনবে, তা কি করে হয়?

—শ্রোতার ত দরকার।

—সেটা আমি জানি, তবে সব সময় নয়।

—আমার চুলচেরা বিশ্লেষণ করবে, বলছিলে না?

—শুনে যারা সংশোধন করতে রাজী নয়, তাদের শুনিয়ে লাভ কি। তোমাকে যতদূর বুঝেছি, তুমি ঠেকে শেখার দলে।

—মোটামুটি সব পুরুষই তাই। সন্দীপ বলল। পুরুষেরা এক্সপেরিমেন্ট্ পছন্দ করে, তাই 'ঠেকে শেখাকে' তারা অভিজ্ঞতা বলে।

—অভিজ্ঞতাকে কি মেয়েরা অন্য কোন আখ্যা দেয়? অলকার প্রশ্ন।

—অনেকটা তাই। দেখার মত করে দেখলে তবে ত ভাল-মন্দ চোখে পড়ে। ওটা মেয়েদের আছে কি না সন্দেহ, তাই সব কিছুই তাদের কাছে অনুভূতি।

—তুমি ভুল করছ সন্দীপ। পুরুষের কুদৃষ্টিটা বড় বেশী। তাই তারা একটু বেশী দেখে। বেশী দেখতে গিয়ে জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা চোখে পড়লেও জীবনের পরিণতিটা তাদের চোখে পড়ে না। সেটা পূরণ করতে গিয়ে তারা ছলনার আশ্রয় নেয়। রাগ আর হিংসায় অধীর হয়ে ওঠে।

—কিন্তু যাদের দূরদৃষ্টি আছে, তারাও? সন্দীপ হার মানতে রাজী নয়।

—সেইজন্যেই ত দূরদৃষ্টি যাদের আছে তাদের কাছেই সাধারণ পুরুষেরা ছোটে। সেখানে যাওয়া সম্ভব হলেও, সেই জ্ঞানের গভীরে পৌঁছতে পারে না বলে জ্ঞানের মেড্-ইজি খোঁজে। দৃষ্টি না পেয়ে হাত দেখায়।

—জান ত, আজকাল পলিটিশিয়ান্‌রাই বেশী জ্যোতিষীদের শরণাপন্ন হয়। দেশের যা অবস্থা, দূরদৃষ্টির ওপরে আস্থা রাখা বোধহয় একটু রিস্কি।

—তাই কাজও তাদের কমে গেছে।

—কাজ যে খুব একটা কমেছে বলে মনে হয় না। নয়ত সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কতরকমের কত যে বক্তৃতা, দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চষে বেড়ানো। হাতে মাটি তুলে নিয়ে ভারতের মাটি চেনার চেষ্টা, ওসব তবে কী? সেমিনার আর কন্‌ফারেন্স ত লেগেই আছে। কত লাখ, কত কোটি খরচ হয়, ভাবতে পার?

অলকা হো হো করে হেসে ওঠে। বলে—সেমিনার-কন্‌ফারেন্সে অন্যের লেখা 'না-বুঝে' পড়ে এলেও চলে। পলিটিকাল পাওয়ার সাধ করে কি লোকের মন ভোলায়। ছাত্রদের আর যাই হোক পয়েন্টগুলো কষ্ট করে মুখস্থ করতে হয়। নেতাদের, অপরের চিন্তা, অন্যের ভাবনা শুধু পড়ে গেলেই, রিপোর্ট করার জন্য মিডিয়াগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেতে-আসতে যেটুকু এনার্জি খরচ, ওটাকেই 'কর্ম' বলে ধরে নিতে পার।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, কর্মই আবার প্রকৃত আত্মবিশ্বাস যোগায়।

—একে বলে অকাজের দুর্ভোগ। প্রকৃত কর্মের সংজ্ঞাটা যে নড়বড়ে হয়ে গেছে!

—টাকা কামানোর এটাই সহজ পন্থা, তাই ত বলবে।

—মিনিস্টার বা নেতাদের স্থায়িত্ব আমাদের চাকরীর মত পারমানেন্ট নয়। তাই তাঁরা অত তাড়াহুড়ো করেন। ওদিকে নজর রেখেই তাঁরা সব কিছু করেন।

—তাড়াহুড়ো করে চলতে গিয়ে দুপুরদাপুর পড়ে আছাড় খায়।

অলকা সশব্দে হেসে ওঠে। একটু থেমে বলে, সেদিন কাগজে দেখছিলাম আজকাল সার্কাস আর আগের মত চলে না।

—কেন? সন্দীপ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে। সার্কাস দেখতে তার এখনও ভাল লাগে।

—কেননা সবাই আগে ভাগে জেনে যায় কোন্ মাস্টার কোন্ জন্তু নিয়ে কখন খেলা দেখাবে। কিন্তু নেতাদের খেলায় এই নিশ্চয়তা থাকে না। এঁদের খেলায় রহস্য-উপন্যাসের ছাপ থাকে বলে লোকেদের ওতে আজকাল এত উৎসাহ।

—জানো অলকা, আমিও ভাবছিলাম, ফ্যাক্টরি-ট্যাক্টরি অত কষ্ট করে খাড়া না করে রাতারাতি নেতা হয়ে যাই। নয়তো টি. ভি. সিরিয়াল নিয়ে লেগে পড়ি। একান্ত কিছু না জুটলে কপালে বড়-একটা তিলক লাগিয়ে জ্যোতিষী সেজে বসে যাই। আমার মনে হয় বিনা আয়াসে অনেক পয়সা কামাতে পারবো। এই তিনটের মধ্যে অ্যাস্ট্রোলজির প্রস্পেক্টই বেশি। এক স্ট্রোকে নেতাদেরও কাত করা যাবে। আমার এক বন্ধু আছে। সে বলে সে গায়ক, রেডিও ও টেলিভিশনে গায়। বড় বড় লোকেদের কাত করার জন্য সে তার ভিজিটিং কার্ডে লিখে রেখেছে 'মিউজিসিয়ান-কাম-অ্যাস্ট্রোলজার'। এতে য তার কিরকম পসার, তোমায় কি বলব।

অলকা সন্দীপের সঙ্গে একমত হতে পারেনা। বলে-অ্যাস্ট্রোলজি কষ্ট করে শিখতে হয়, সন্দীপ। আমার মনে হয়, দেশের বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে পলিটিশিয়ান্দের স্কোপই অনেক বেশী। কয়েক লাখ টাকা খরচ করে একবার যদি একটা ইলেকশনে জিততে পার ত কেল্লা ফতে। ভবিষ্যতের কথা আর ভাবতে হবে না। একটু ম্যানেজ করে যদি মন্ত্রী হতে পার ত সোনায় সোহাগা, তিন জেনারেশন বসে খাবে। কথাটা সন্দীপের মনে ধরে না। বলে-তোমার কথা ঠিক মেনে নিতে পারছি না। এতেও আজকাল ঝামেলা পাকিয়েছে। মন্ত্রীত্বের যোগ্যতা দেখিয়েও টিকিট পাওয়া যায় না। সব 'সেন্ট্রালাইজড্'। সেন্ট্রালের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে হবে।

—ওটা ত করতেই হবে। না হলে কনট্রোল থাকবে কি করে।

সন্দীপ হেসে ফেলে বলে—মেয়েদের কন্ট্রোলে রাখতে গেলে শুধু পার্টি টিকিটে কুলোয় না, 'সেন্ট্রালাইজড্' হলেও চলে না—এটাই যা মুশকিল।

—মেয়েদের যে আর একটা দারুন অস্ত্র আছে। চোখে মুখে ওদের

যে মায়া।

—মায়া! মায়া নয় অলকা মরীচিকা।

—মায়ার দরজা খুলে গেলে মরীচিকাও অন্তর্ধান হয়।

—পুরুষদের সাধনা ভাঙ্গতেই ত মায়া।

—মায়াও আলোছায়ার খেলা। খেলা ছেড়ে উঠে পড়, দেখবে মায়া পালিয়েছে।

—মানে মেয়েরা শুধু খেল্ নিয়ে মেতে থাকতে চায়।

—ওটা অবিদ্যা শক্তি, ওখানে অন্ধকার।

—আলো কোথায়? সন্দীপ জিজ্ঞাসা করে।

—মনের ভেতরে। অলকা হেসে ফেলল।

সন্দীপও হেসে ফেলে, বলে—আমরা শুধু কথা নিয়েই খেলছি। তবু কথা যেন ফুরোয় না।

এও এক ধরনের মায়া, মাদকতাও বলতে পার।

—মেয়েরা তবে কি শুধু—মায়া আর মাদকতা।

অলকা হাসে। বলে—ওটা কিন্তু নির্ভর করে কে টারগেট্ তারই ওপর।

—এক্ষেত্রে আমিই কি সেই টারগেট?

—আমি কি করে বলি বল। তুমি বুঝে নাও।

—আসলে মুশকিল কোথায় জান, তুমি সত্যিকারের আলো, না মাদকতা,—সেটা আমি ঠাহর করতে পারি না।

অলকা শুধু হাসে, কথা বলে না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে চল, যাই।

—হ্যাঁ চল, অনেক কথাই ত হল, আসল কথা হল না।

॥ আঠারো ॥

মৈত্রেয়ী চ্যাটার্জী ভোরের আলোয় দেখলেন তিনটে চীনা জবা ফুল ফুটেছে। পাশের বাড়ির জবা গাছের একটি ডাল লাগিয়ে দিয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। গাছটা এখনও বড় হয়নি, কিন্তু রোজই দু-চারটে করে ফুল ফোটে। মৈত্রেয়ী বরাবরই লাল পাড়ের শাড়ী পরতে ভালবাসেন। লাল

রঙটা স্নেহময়ী মায়ের স্বরূপ বলেই বোধ হয়। ভরাট ভারি পাপড়ি, সজীব টক্‌টকে লাল রঙ; প্রকৃতি যেন তার রঙের ভাণ্ডার খুলে দিয়েছে। মায়ের পায়ের রঙের সঙ্গে রক্ত-জবার তুলনা করা হয়েছে। এ কবির কল্পনা নয়, মৈত্রেয়ীর কাছে এ বাস্তব সত্য। লাল ফুলটা হাতে নিয়ে মৈত্রেয়ী গাছটাকে আদর করেন। হাতের স্পর্শে জবার সুকোমল সৌন্দর্য অনুভব করেন বেশ কিছুক্ষণ, আপন মনে, খুব সন্তর্পণে, সবার অজ্ঞাতে।

মন খুশীতে ভরে ওঠে। সন্দীপ ব্যবসায় নেমেছে, যন্ত্রপাতি কিছু তৈরী করবে, তার সব আয়োজন সারা। এ-ব্যাপারে গঙ্গাধর অনেক সাহায্য করেছেন। ঠিক হয়েছে, যতদিন না ফ্যাক্‌টরী পুরোপুরি চালু হয় ততদিন সন্দীপ দু-একটা কোম্পানীর লিয়াজোঁর কাজ করবে। তাতে যা রোজগার হবে, তা দিয়ে সংসার হেসে-খেলে চলে যাবে। উদ্বৃত্ত কিছু যদি হয়, সেটা ব্যবসায় লাগাবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে প্রথম প্রথম একটু কষ্ট করতে হবে। সন্দীপ তাতে রাজী। সন্দীপ বলেছে—কষ্ট করতে হয়, তাও সই, কিন্তু পরের গোলামী আর নয়। অনেক হয়েছে। দিল্লীর কাছে ওখলাতে কারখানা তৈরী হচ্ছে। বছর খানেকের মধ্যেই সম্ভবত প্রডাকশন শুরু হয়ে যাবে। আপাতত কাজ চালু হয়েছে বাড়ির গ্যারেজটায়।

গঙ্গাধরের অদম্য উৎসাহ। ব্লু-প্রিন্ট্ থেকে শুরু করে কি তৈরী হবে, কত পুঁজি লাগবে, সরকারী অনুমোদনের জন্য অ্যাপ্লাই করা, লাইসেন্স্ যোগাড় করা ইত্যাদি যাবতীয় খুঁটিনাটি কাজ তিনি সন্দীপকে দিয়ে করিয়েছেন। এমন কি, মার্কেটিং-এর মত দুরূহ ব্যাপারেও তিনি সন্দীপকে ওয়াকিবহাল করাচ্ছেন এবং সময় পেলেই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। সন্দীপ এখন নিজেই অনেকটা সামলে নিচ্ছে। একটু চেষ্টা করলেই সন্দীপ হয়ত ভাল একটা চাকরী পেয়ে যেত। কিন্তু মৈত্রেয়ী চান, সন্দীপ এমন কিছু করুক, যাতে বাপের সাহায্য পেয়ে এগিয়ে যেতে পারে। বাপের অভিজ্ঞতা যদি ছেলের কাজে লাগে, তাতে বাপও আনন্দ পাবে। সারা জীবনই ত অন্যের জন্য পরিশ্রম করলেন, এখন নিজের ছেলেকে যদি তৈরী করে যেতে পারেন, সেটাও কম কথা নয়।

বাপ-বেটাতে আজও বেরিয়ে যায়। বেরুবার আগে ফাইলপত্র নিয়ে বসে, কিছুক্ষণ আলোচনা হল, মাঝে-মধ্যে দুজনের তর্ক। সন্দীপও ছাড়ার পাত্র নয়। নানা প্রশ্ন করে; সবকিছু জানার একটা সুতীব্র আগ্রহ। গঙ্গাধর কখনও রাগেন না। বরঞ্চ ছেলের আগ্রহ দেখে খুশী হন। কখনও কাগজ কিংবা কোন রিপোর্ট দেখিয়ে অথবা টেলিফোন করে প্রকৃত তথ্য জেনে নিয়ে ঘটনার পারম্পর্য তিনি সন্দীপকে বুঝিয়ে দেন, সন্দীপের

বিশ্বাসের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেন। মৈত্রেয়ীও সে আলোচনায় যোগ দেন, প্রয়োজনে মতামত দেন। বাকী সময় চুপ করে শোনেন। কোন কিছু গড়ে তোলার উৎসাহ গঙ্গাধরের এ-বয়সেও কি সুতীব্র!

মৈত্রেয়ী একা বসে পুরনো দিনের কথা ভাবছিলেন। মনে পড়ে, ব্যাঙ্গালোরের কথা। গঙ্গাধর ফ্যাক্টরির দশ বছরের একটা পারস্পেক্টিভ প্ল্যান তৈরী করছিলেন, তখন দিনরাত অফিসে কাজ চলছে। বাড়িতেও কামাই নেই, অনেক সময় দেখতেন মাঝ রাতে উঠে গঙ্গাধর কিছু পয়েন্টস্ নোট করে, আবার শুয়ে পড়তেন। অসুস্থ হয়ে পড়লে নিরুপায় হয়ে দু-চারদিন শুয়ে থাকতেন। ভাল হয়ে উঠতে না উঠতেই আবার সেই কাজ। গভীর আশংকায় মৈত্রেয়ী এক একবার বলে ফেলতেন—এসব করে কি হবে? রূপেশ্বর কী এর মূল্য দেবে?

—কোন একজনের জন্যে আমি এটা করছি না, মৈত্রেয়ী।

—সে আমি জানি, তবু—

—হ্যাঁ, তোমার আশংকা কেন, আমি জানি।

—বল ত, আমি কী ভাবছি?

—রূপেশ্বর মূল্য দেবে না, এই ত!

—সেটা ত আছেই। তোমার চেয়ে আমি অনেক বেশী লোকজনের সঙ্গে মিশি। ফ্যাক্টরির সোশ্যাল লাইফ, ওয়েলফেয়ার অ্যাকটিভিটি—।

গঙ্গাধর মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললেন—এটা তুমি ভালই কর। আমার চেয়েও রূপেশ্বর তোমাকে বেশী সমীহ করে, ভয় পায়। আমি লক্ষ্য করেছি।

—আমি ত আর কারুর মাইনে করা চাকর নই। ওরা আমাকে ওয়েল-ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান করেছে, আমি চাইনি, তবুও। রূপেশ্বর আগে বোঝেনি যে, মাইনে নিই না বলে ও আমাকে উপেক্ষা করবে। সে সাধ্য রূপেশ্বরের নেই।

কথাটা শুনে গঙ্গাধর একটু হাসেন। খুশীর মেজাজে বলেন—তোমার সুবিধে, তুমি যে লেগে থাকতে পার। তোমার কোথায় জোর জান, অন্যের জন্যে তুমি আপ্রাণ লড়াই করে যেতে পার।

—তুমি আম্মা চন্দ্রিকার কথা বলছ ত?

—হ্যাঁ, তার স্বামী হঠাৎ মরে যাবার পরে চন্দ্রিকার নিজের আপন চার ভাইকে তুমি যেভাবে তলব করে ডেকে আনিয়েছিলে— ।

—ডেকে পাঠাব না, মানে? চন্দ্রিকা লেখাপড়া জানে না। দুটো বাচ্চা নিয়ে কি বিপদেই না পড়েছিল। চার চারটে ভাই, প্রত্যেকেই বড় বড় কাজ করে। দেখলে ত, সংসার কি রকম? মাসে দশটা করে টাকা দিয়ে চন্দ্রিকাকে সাহায্য করতে কেউ রাজী হল না।

—আর সবটাই আমার ঘাড়ে চাপালে।

—তোমার ঘাড়ে মোটেই নয়, রূপেশ্বরের ঘাড়ে।

—ঐ একই হল। রূপেশ্বরও খুশী হল, ও জানতে পেরেছিল এ-ব্যাপারটার ঝক্কি আমি নিতে চাইছি না। কেন আপত্তি করেছিলাম, সেটা তলিয়ে দেখার ধৈর্য ওর ছিল না। তাই ভাবল, এ ব্যাপারটা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি একটা লড়াই বাধিয়ে দেওয়া যায়! লড়াই ত বেধে ছিল, কি বল?

—লড়াই বাধবে না? চন্দ্রিকা লেখাপড়া করেনি। তুমি বললে, ফ্যাক্‌টরির কোন কাজই তাকে দেওয়া যাবে না। অনেকদিন থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল ফ্যাক্‌টরির অফিসার ও কর্মীদের বাচ্চাদের জন্য একটা ক্রেইশ খুলব। ভেবে দেখলাম, একটা ক্রেইশ যদি খুলতে পারি, বাচ্চাদের যাবতীয় কাজ আমি চন্দ্রিকাকে দিয়ে করাতে পারব। লেখাপড়া না করলেও, ওটা ও শিখে নিতে পারবে। নিজের দু-দুটো বাচ্চা মানুষ করা, তাদের লেখা-পড়ার খরচ চালান, এত সব আসবে কোথা থেকে? ভাইয়েরা ত সরে দাঁড়াল! ওকে বসিয়ে খাওয়াবে কে? তুমি বললে—যতই তুমি চেষ্টা কর, এটা বোর্ড এ্যাপ্রুভ্‌ করবে না। রূপেশ্বরকে দিয়েই বোর্ডে এ্যাপ্রুভ্‌ করালাম। প্রস্তাবের যাবতীয় পরিকল্পনা আমিই তৈরী করে-ছিলাম। রূপেশ্বরকে বললাম, ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান হিসেবে চন্দ্রিকার কেস্‌টা বোর্ডের সামনে আমিই পেশ করব। আমি দেখতে চাই, হিউম্যানিটেরিয়ান্‌ গ্রাউণ্ডে ফ্যাক্‌টরি ক্রেইশে চন্দ্রিকার চাকরী হতে পারে কি না। রূপেশ্বরের টাল-বাহানার রকম সকম ত তুমি জান, কিছুতেই ওটা এজেণ্ডায় ঢোকাবে না। পরে যখন দেখল মিশ্র সাহেবকে বলে আমি রাজী করিয়েছি, তখন সুড় সুড় করে ওটা এজেণ্ডায় ঢোকাল, দেখলে ত। জমির ব্যবস্থা হল, ক্রেইশের ঘর উঠল, ডাক্তার, নার্স, মেথর,—সব ব্যবস্থা হল। কাজ শুরু হয়ে গেল।

—আর তুমি! কি মাতান মাতলে। আমাদের একটা ঘর আর ফ্যাক্‌টরির একটা অংশ ক্রেইশেতে পরিণত হল।

—চন্দ্রিকা চিঠি লিখতে পারত না। ক্রেইশের মেট্রন হলে কি হবে! সব চিঠিপত্র আমিই লিখতাম, ওকে দিয়ে সই করাতাম। কুড়ি-পঁচিশটা বাচ্চা। তাদের প্রয়োজনও নেহাৎ কম নয়। সর্ট-কাট্‌ পথ দিয়ে আসা-যাওয়া করতাম। তুমি বললে—ওভাবে ফ্যাক্‌টরির মধ্যে যখন-তখন আসা-যাওয়া চলবে না, তা সে তুমি যে-ই হও। তোমার জন্য ফ্যাক্‌টরির ডিসিপ্লিন্‌ নষ্ট হচ্ছে।

—হ্যাঁ, অর্ডার বার করতে হয়েছিল, তুমি আমার বারণ শুনলে না। যখন তখন ফ্যাক্‌টরির মধ্যে চলে আসতে। আমি নির্দেশ দিতে বাধ্য হলাম, কর্মীরা যেখান দিয়ে আসা-যাওয়া করে, সেখান দিয়ে তোমার যাওয়া চলবে না। যেতে হলে মেইন্‌ গেট্‌ দিয়ে।

—আমি কষ্ট করেছি ঠিকই, কিন্তু আমার সান্ত্বনা, চন্দ্রিকা এতে স্বাবলম্বী হয়েছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে ভেসে যায়নি।

—তোমার মাথায় একটা কিছু ঢুকলে আর রক্ষে নেই। সবাইকে আমি কন্‌ট্রোল্‌ করতে পেরেছি, শুধু তোমাকে পারিনি। কোন স্বামীই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে কন্‌ট্রোল্‌ করতে পারে না। বলে গঙ্গাধর হো হো করে হেসে উঠলেন।

—এ-নিয়ে তোমার-আমার মধ্যে ঝগড়া বেধে গেছে দেখে রূপেশ্বর ভারী খুশী। সমানে ও উস্কানি দিত। আমি বুঝতে পেরেছিলাম।

—ভেবেছিল যাতে আমার আপত্তি, তা যদি বোর্ডে পাশ করিয়ে নেওয়া যায়, তবে আমার অপমান। নিজে অথচ কোন রুলই জানত না। কর্মীদের জন্য কোন রকম ক্রেইশ গড়ে তোলার অনুমোদন দেবার ক্ষমতা ফ্যাক্টরির কর্তৃপক্ষের নেই; সেটাও রূপেশ্বর জানত না। একমাত্র বোর্ডই সেটা পারে। ক্রেইশের জমির জন্য টাকা, অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের বরাদ্দ, চন্দ্রিকাকে মেট্রোন করা যায় কি না—এসব নানা ব্যাপারে বোর্ডের অনুমোদন লাগবে দেখেই আমি তোমাকে বাধা দিতাম। যাতে তুমি পরোক্ষভাবে তৈরী হতে পার। মিশ্র সাহেব তোমার নিঃস্বার্থ কাজ দেখে খুশী হয়েছিলেন বলেই বোর্ডে ওটা পাশ হয়েছিল। নরম্যালি এ-ধরনের জিনিস বোর্ড এ্যাপ্রুভ্‌ করে না। তোমাকে বাধা দেবার জন্য আমি বাধা দিতাম না, তুমি যাতে আঁটঘাট বেঁধে এগোও, তারই জন্যে। রূপেশ্বরের ত মোটা বুদ্ধি, ও তা না বুঝেই আমার বিরুদ্ধে তোমাকে উস্কানি দিত। ফ্যাক্টরির কোন ব্যাপারে মিশ্র সাহেবের কাছে আমার 'ইমেজ' যদি খারাপ করা যায় আর তাতে যদি আমারই স্ত্রী ভূমিকা নেয়, ব্যাপারটার ইম্‌প্যাকট্‌ আরও বেশী হবে। রূপেশ্বর তাই ক্ষেপে গিয়েছিল। ওসবে গা করতাম না বলে কত যে এন্‌-কাউন্টার এড়িয়ে গেছি, তার ঠিক নেই। সত্যি বলতে কি ওসব নিয়ে ভাববারও আমার সময় ছিল না। কাজ না থাকলে মানুষ অকাজ নিয়ে কত যে মেতে উঠতে পারে, রূপেশ্বরই তার সবচেয়ে বড় এক্সজাম্পল্‌। গঙ্গাধর একটু হাসলেন।

কতদিন আগেকার কথা। গঙ্গাধরের সেই তাচ্ছিল্যের হাসি মৈত্রেয়ী এখনও যেন স্পষ্ট দেখতে পান। এই কাজে নেমে মৈত্রেয়ী টের পেয়েছিলেন, গঙ্গাধরকে আর যেন সহ্য করতে পারছেন না রূপেশ্বর। সেই প্রথম মৈত্রেয়ীর মনে খটকা লাগে। তবে কী রূপেশ্বর ওনাকে সরিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র করছে? লোকের মুখে তিনি এরকম একটা আভাসও পেয়েছিলেন। গঙ্গাধরকে বলে লাভ ছিল না। তিনি ওসব কথায় কানও দিতেন না। মৈত্রেয়ীও ওঁকে কিছু বলেননি। কার কাছেই বা বলবেন? মিশ্র সাহেবের সঙ্গে মৈত্রেয়ীরও তখন বেশ অন্তরঙ্গতা

গড়ে উঠেছে। অনেক সময় মিশ্র সাহেব সোজা বাড়িতে চলে এসে বলতেন—মৈত্রেয়ী, তোমার হাতের রান্না খাব। অফিসের কোন ব্যাপার কখনও যদি মিশ্র সাহেবের কানে তুলতেন আর তা যদি গঙ্গাধর টের পেত, তাহলে মৈত্রেয়ীর আর রক্ষে ছিল না। মিশ্র সাহেব নিজের থেকেই যেটুকু বলতেন, মৈত্রেয়ী শুধু সেটুকু জানতে পারতেন। গা-পড়া হয়ে মিশ্র সাহেবকে কোন কথা জিজ্ঞেস করতেন না।

কলিং বেল বেজে উঠল।

মৈত্রেয়ী ভাবলেন, সন্দীপরা বোধ হয় ফিরে এল। দরজা খুলে দেখেন, অলকা দাঁড়িয়ে।

—তুমি? কি ব্যাপার। এসো। অচলাকে সন্দীপ জবাব দিয়ে দিয়েছে। কোন কাজ জানত না, শেখারও কোন গা ছিল না।

অলকা বলল—তাই আপনাকে দরজা খুলতে দেখে একটু অবাক হলাম। অচলা থাকতে, দরজা অধিকাংশ সময়ই খোলা থাকত।

—মেয়েটা একদিন আসে ত দু-দিন আসে না। এভাবে কী অফিসের কাজ হয়?

অলকা জিজ্ঞেস করল—তা অফিসের চিঠিপত্র কে টাইপ করছে?

—আর কে করবে, বেশীটা উনিই করেন। ইদানীং অবশ্য সন্দীপই করে। বাপ-বেটাতে মিলে ব্যবসা নিয়ে মেতেছে, জান ত।

—হ্যাঁ, শুনেছি, তবে ডিটেল্‌স্ জানি না। আজ মাত্তর দুটো ক্লাস ছিল। কয়েকটা ব্যাপারে আপনার মতামত জানা খুবই দরকার, তাই চলে এলাম।

—আমার মতামত? ওরে বাবাঃ, তুমি আমাকে মস্ত লোক ঠাওরেছ, দেখছি। বোস, আগে জিরিয়ে নাও, তারপর শুনব তোমার কথা। কি খাবে লস্যি, না চা?

—কফি।

—বেশ, ধীরেনকে বলে আসি। মৈত্রেয়ী উঠে গেলেন।

ফিরে এসে বললেন—আজকাল পুরনো দিনের সব কথা মনে পড়ে। আমি ত চাকরী করিনি, শখ করে কাজ করতাম। সে স্মৃতিও বড় কম নয়। যখন একা থাকি ওসব কথাই ভাবি। সত্যিকারের যারা কাজের মানুষ, না-জানি তাদের আরও কত দুর্ভোগ। উনি এখনও কাজ নিয়ে আছেন, তাই রক্ষে।

—আপনাকে ত কেউ জোর করত না। তবুও আপনি নানা ওয়েলফেয়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, শুনেছি। এখন ত দেখি না।

মৈত্রেয়ী হেসে বললেন—কাজের মানুষের সঙ্গে ঘর করতে হলে নিজেকেও কাজ দেখাতে হয়, নয় ত মান থাকে না।

কথাটা মৈত্রেয়ী উড়িয়ে দিতে চাইলেন। মৈত্রেয়ী এড়িয়ে যাচ্ছে দেখে,

অলকা বলল—গঙ্গাধর মেসোর সঙ্গে এ-ব্যাপারে কথা বলে দেখেছি, আপনার কর্মক্ষমতায় তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। সত্যিকারের কাজ না দেখাতে পারলে এ বিশ্বাস কি একদিনে গড়ে ওঠে?

মৈত্রেয়ী বললেন—কতটা কাজ করেছি, জানি না। অনেক সময় এ নিয়ে তুমুল তর্ক হয়েছে। শেষে দেখেছি, আমার কথাই তিনি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু মুখ ফুটে কোনদিন তা বলতেন না। কাজটা আমি যেভাবে করতে চেয়েছি, সেইভাবেই কাজটা এগোচ্ছে দেখে অনেক সময় টের পেতাম। এটা অবশ্য আস্থারই পরিচয়। আমার নিজের, বা আত্মীয়-স্বজন কিংবা নিজের ছেলের সুখ-সুবিধের কথা আমি কোনদিন ভাবিনি। শুধু কর্মীদের জন্যেই কিছু করতে চেয়েছি। চাকুরে ছিলাম না বলেই বোধ হয় সবাই একটু সমীহ করত।

—পাবলিক সেকটরের একজন বড় অফিসারের স্ত্রী হিসেবে আপনি যে আদর্শ খাড়া করেছিলেন, তা সত্যিই দুর্লভ। এখন কি কেউ তা করে?

মৈত্রেয়ী হেসে উঠলেন—কি জান, আদর্শ-টাদর্শ জানি না। কাজের ঘূর্ণিঝড়ে যে-মানুষটাকে কখনও বাড়িতে পেতাম না, তাঁর সঙ্গে ঘর করতে গেলে, স্রেফ বেঁচে থাকার তাগিদেই আমাকেও কিছু করতে হত। আজ-কাল অনেক সময় মনে হয়, যেটুকু করেছি, তাও বোধ হয় বৃথা। ফ্যাক্-টরির কর্মীদের বাচ্চাদের জন্য একটা ক্রেইশ করেছিলাম। টেগোর সোসাইটিতে অনুষ্ঠান করিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ইং-রেজীতে অনুবাদ করে পড়েছি। তার যাবতীয় রিহার্সাল সব আমার বাড়িতে হত। এমনকি অ্যানিউয়্যাল ফাংশনও। যে সব স্কুল, এমন কি টেকনিকাল স্কুল—যা গড়ে তুলেছিলাম, শুনতে পাই, তাদের মধ্যে কয়েকটা বন্ধ হয়ে গেছে। যে কটা চলছে, তাকে আর চলা বলে না। আমাদের মুশকিল কি জান, আমরা গড়তেও জানি না, কেউ গড়ে দিলেও তাকে ঠিক মত চালাতেও জানি না। যাদের উৎসাহে আর উদ্দীপনায় এগুলো গড়ে ওঠে বা চলে তারাও আজকাল নাকি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। ভাবে ফ্যাক্টরি চালানই ত এক বিরাট ঝঞ্ঝাট। আবার ওসব এক্সট্রা ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কি লাভ?

মৈত্রেয়ীর কথায় অলকা বলল—পাবলিক সেক্টরের এই সোশ্যাল্ বেনিফিটের কথাটা কেউ ভাবে না। অনেকেই বলে থাকেন, ইদানীং মন্ত্রীরাও বলে বেড়াচ্ছেন যে, পাবলিক সেকটরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক নেওয়া হয়েছে। এই জন্যেই এইসব প্রতিষ্ঠান লাভ দেখাতে পারছে না। কর্মচারীদের দাবীর লম্বা ফিরিস্তি অথচ কাজের ব্যাপারে কোন কমিট্মেন্ট্ নেই। এটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু যাঁরা এসব বলেন তাঁরা কখনও ভুলেও প্রাইভেট সেকটরের পারফ্যরম্যান্স্ নিয়ে

আলোচনা করেন না। প্রাইভেট সেকটরে কর্মীদের জন্যে কী কোয়াটার দেয়? চীপ ক্যানটিন অথবা ফ্রি কিংবা সাবসিডাইজড্ ট্রান্সপোর্ট প্রোভাইড করে? সব প্রতিষ্ঠান কি প্রডাকটিভ বোনাস দেয়? যারা অক্ষম, শারীরিক অক্ষমতার জন্যে যারা সক্ষম নয় তাদের কি প্রাইভেট সেকটরে চাকরী দেয়? এখানে প্রতিমুহূর্তে যোগ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে--এখানে এদের জায়গা নেই। কিন্তু পাবলিক সেকটরে আছে। আমাদের মত গরীব দেশে এর সোশ্যাল্ ইম্প্যাক্ট্ অনেক বেশী। এটা আমরা ভেবে দেখি না।

মৈত্রেয়ী বললেন—হ্যাঁ. তা-ত আছেই। পাবলিক সেকটরে কর্মীরা অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধে পায়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এদের দিয়ে কীভাবে কাজ করিয়ে নিতে হবে, সেটাও ভাববার কথা। এই দেখো, আমিই বলে যাচ্ছি। অলকা, তুমি যেন কি জানতে এসেছিলে, কই বললে না ত। আজ ওরা থাকলে হয়ত তোমার সুবিধে হত, কি বল? আমি একা কি তোমার সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব?

--না, না। সেরকম কিছু নয়। আপনাকে একা পেয়েছি, আজ আপনার কথাই শুনি। সন্দীপ ইচ্ছে করলে অনেক প্রশ্নের ভাল জবাব দিতে পারে। কিন্তু ধৈর্য ধরে ও আমার কথা শুনতেই চায় না।

মৈত্রেয়ী মুচকি একটু হাসলেন। দু-জনের মধ্যেই ছোটবেলা থেকে টেক্কা দেবার ভাব ছিল। বড় হবার পর সেটা আরও বেড়েছে। বাড়াটা স্বাভাবিকই। অলকার সঙ্গে সন্দীপ পেরে উঠবে কি করে, বিদ্যে-বুদ্ধিতে অলকা অনেক এগিয়ে গেছে। সে কথা মনে হতেই মৈত্রেয়ী বললেন—না, তোমার কথা সন্দীপ খুব বলে।

সন্দীপ সম্পর্কে ওর যে দুর্বলতা, সেটা মাসিমার সামনে যাতে কোন-ক্রমে প্রকাশ না পায়, সে দিকে অলকা খুবই সচেষ্ট। তাই কোন সঙ্কোচ না করেই প্রশ্ন করল—তাই নাকি, কি বলে মাসিমা?

—তুমি সিরিআস্লি সব সময় কিসব ভাব, বেশীর ভাগ সময়ই গম্ভীর থাক। আর সুযোগ পেলেই তোমার চিন্তা-ভাবনা বলতে থাক।

—তা মোটেই না, আমি যা ভাবি, তার বিশেষ কিছুই সন্দীপকে আমি বলি না। ওর ধারণা আমার চিন্তাধারা, বিদগ্ধদের জন্যে, ওর জন্যে নয়।

--আসলে, চিন্তার চেয়ে ও কাজকেই বেশী মূল্য দেয়। অনেকটা ঠিক বাপের মতই।

—না, মাসিমা, সন্দীপ আজকাল নানা বিষয়ে অদ্ভুত সব মতামত দেয়। আমিও মাঝে মাঝে চমকে যাই। সন্দীপ আর সে সন্দীপ নেই।

নিজের ছেলের সম্পর্কে এ মন্তব্য শুনে মৈত্রেয়ীর খুবই আনন্দ হল। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ না করে শুধু বললেন—ওর পরিবর্তনটা আমারও চোখে পড়েছে। শুধু ভাবি, কি জানি, মায়ের মন ত, ওর সম্পর্কে হয়ত একটু

বেশী ভাবছি। এসব কথা থাক। বল, তোমার রিসার্চ কেমন চলছে?

—মোটেই এগোচ্ছে না। ভাবনাগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। গঙ্গাধর মেসোকেও আমার খুব দরকার। তাঁর সাহায্য না পেলে এগুলোকে ঠিকমত সাজাতে পারব না।

—তুমি বরঞ্চ এক কাজ কর। যখন যা মনে আসে, লিখে ফেল। দেখবে চিন্তাগুলো সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আস্‌ছে।

—সেটা করছি। পাবলিক সেক্টর নিয়ে পড়াশুনা করতে গিয়ে নানা পর্যায়ের নানা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি ও ছলচাতুরী আমার চোখে পড়ছে। প্ল্যানিং-এর ইতিহাস পড়তে গিয়েও দেখছি কংগ্রেসের মধ্যে প্ল্যানিং নিয়ে তুমুল বাধা, তুমুল ঝগড়া। গান্ধীজী পর্যন্ত প্ল্যানিং-এর তাৎপর্য ঠিক বুঝতে পারেননি, আমার মনে হল এনিয়ে যে সব চিঠি তিনি জওহরলালকে লিখেছেন, তা পড়েই আমার এই ধারণা হয়েছে। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন কুটির শিল্প ও হস্তশিল্প গড়ে উঠলেই দেশটা আধুনিক হয়ে উঠবে, আর দেশের বেকার সমস্যা ঘুচে যাবে। প্ল্যানিং নিয়ে অত মাতামাতি তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। নেহেরু যে কত অসহায় হয়ে পড়েছিলেন, তা প্ল্যানিং-এর ইতিহাস যারা একটু তলিয়ে দেখবে তারাই বুঝতে পারবে।

—বইতে তুমি নানান বাধার কথা পড়্‌ছ, সে সব আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কি জঘন্য সে ব্যাপার। অনেক সময় ক্ষতিও সহ্য করেছি। উনি অনেক দুঃখে বলতেন—দেখলে ত, গড়তে গেলে ভেঙে দেয়। কি যে তারা গড়তে চায়, তাও তারা জানে না। এদের দিয়ে তুমি কি গড়বে? মানুষটাকে আমি অনেক কাছ থেকে দেখেছি বলেই ওঁর এই গভীর ব্যথা আমি অনুভব করতে পারতাম। আবার এও দেখেছি কাজ পেলে ওসব একেবারে ভুলে যেতো। কাজের মধ্যে ডুবে যেতেন। সে যাক, কি বলছিলে যেন?

অলকা আবার শুরু করে—সারা দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার দেশ-গুলোর বর্তমান অবস্থাটা যখন তলিয়ে দেখি, তখন কি মনে হয় জানেন। মনে হয় নিজের স্বার্থেই বড় দেশগুলো চায় না যে অন্য দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠুক। স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার সব প্রচেষ্টাই ওরা ভণ্ডুল করে দিতে চায়, পৃথিবীময় উপনিবেশ গড়ে তোলার সময়েও এই প্রচেষ্টার অন্য রূপ দেখি। এখন আবার ব্যবসা-বাণিজ্যে একাধিপত্য বজায় রাখার জন্যে মাল্‌টি-ন্যাশনাল কোম্পানীর আবির্ভাব। এদের দাপট অসহ্য। কিন্তু করার কিছু থাকে না ছোট দেশগুলোর। ওটা সিম্পটম মাত্র। ভেতরের ষড়যন্ত্র আরও গভীর। সেদিন ভারত সরকারের নামী একজন অর্থনৈতিক উপদেষ্টার সঙ্গে পাবলিক সেক্টর নিয়ে কথা হচ্ছিল। সত্তর দশকে তিনি ফিলিপিন্‌স্‌-এ ওদের আর্থিক উপদেষ্টা হয়ে গিয়েছিলেন। সমস্ত

ম্যানিলায় নাকি ওরা শুধু হোটেল তৈরী করতে চেয়েছিল। খুব বিরক্ত হয়ে তিনি বলেছিলেন, শুধু হোটেল তৈরী করে কোন দেশের অর্থনীতিকে গড়ে তোলা যায় না। হোটেলগুলো ইন্‌টারন্যাশনাল প্রস্‌টিটিউশনের কেন্দ্র হয়ে উঠবে। তাই তিনি শরিক হতে চাননি। অত ভাল কাজ ছেড়ে ফিরে এলেন, তবুও এই সোজা কথাটা ওদের তিনি কিছুতেই বোঝাতে পারেননি। পাকিস্তানে কন্‌জুমার ইন্‌ড্রাসট্রিজ-এ ভরা। কোন শিল্প-বুনিয়াদই সেখানে গড়ে ওঠেনি। এই গড়ে-না-ওঠার পেছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কতটা হাত, পাকিস্তানের নেতারা সেটা নিয়ে ভাবেন কি না, জানি না। বাংলাদেশ বিদেশী দ্রব্যে ভরে গেছে। জাপান ও আরও অনেক দেশ ওখানে জমিয়ে বসেছে। শিল্প গড়ে তোলা ত দূরের কথা, চাষ-বাসের ব্যাপারে ওখানে আধুনিক পদ্ধতির কোন প্রচলনও হয়নি। বাংলা-দেশের লোকেরা গর্ব করে বলে—ওসব দেশী জিনিসে আমরা বিশ্বাস করি না। সবই আমাদের বিদেশী। আন্তর্জাতিক কায়েমী স্বার্থ যে কি মারাত্মক, এসব দেখলে তা স্পষ্ট হয়। আমরাও হয়ত পারতাম না, শুধু পেরেছি দুটো কারণে। এক, দেশ এ-নিয়ে অনেকদিন ধরে প্রস্তুত হচ্ছিল। আর দুই, পঞ্চাশ/ষাট দশকে এমন সব যোগ্য লোকের আমরা সাহায্য পেয়েছিলাম, যাঁরা নানা বিরোধিতা ও বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও কাজ করে গেছেন, পিছু হটেননি। এই ব্যাপারটাও আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। এটাই আমার দুঃখ।

একটু ভেবে নিয়ে মৈত্রেয়ী বললেন—এটা সাড়ে সাতশো বছরের গোলামীর ফল। আত্মবিশ্বাস আমরা খুইয়ে ফেলেছি। আমরা যে কিছু বড় কাজ করতে পারি, এই বিশ্বাস আমাদের নেই। জাপান বল, য়ুরোপ-আমেরিকা বল—দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতির বুনিয়াদ সেখানে গড়ে উঠেছে বহুর আত্মত্যাগে, বহুর প্রচেষ্টায়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। আমাদের সময়ে, কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করত না। সেই কমিউনিস্ট দেশগুলোর দিকে আজ যদি তাকিয়ে দেখ, দেখবে, 'আন্দোলন মূলত আন্তর্জাতিক' এই শ্লোগানে তারা আর বিশ্বাস করে না। বিশ্বাস করে না বলে আগের মত অত জোর গলায় বলে না। আন্তর্জাতিকতায় চীনের বিশ্বাস নেই বলতে পার। এ-নিয়ে স্ট্যালিন ও ট্রট্স্কির মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই বেধেছিল। রাশিয়ার স্বার্থের কথাই স্ট্যালিন শেষে ভেবেছিলেন। সেদিন সোভিয়েট রাশিয়া নিজের স্বার্থই দেখেছিল, তাই অন্য পথ দিয়ে জাতীয়তাবাদীর কথা মাথায় রেখে আমেরিকার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বড় শক্তি হতে পেরেছে। জাতীয়তাবাদই সর্বস্তরে কাজ করেছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনের স্বরূপ যদি প্রকৃতই আন্তর্জাতিক হত, তাহলে ষাট দশকে চীনের স্বার্থ রক্ষাই রাশিয়ার কাছে হয়ত বড়

প্রশ্ন বলে মনে হত। তা নিয়ে দুটি বৃহৎ কমিউনিস্ট দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে এত মনোমালিন্য চলতে পারত না। আসলে ইতিহাসের কিছু জিনিস আমরা জোর করে ভুলে থাকতে ভালবাসি। আগে আমিও ও-নিয়ে খুব ভাবতাম। এখন মনে হয় মৌলিক সত্যের পরিবর্তন হয় না। আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে আত্মগৌরব-বোধের যে ভাব তুমি দেখতে চাইছ, সেটা আসতে আরও খানিকটা সময় লাগবে। অনেক বেলা হল, অনেক কথাও হল। তুমি বরং আজ এখানে খেয়ে যাও, ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে।

ঘড়িটা দেখে নিয়ে অলকা উঠে পড়ল। বলল—কথায় কথায় দুটো বেজে গেল। না, মাসিমা, আজ থাক। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আজ লাঞ্চ করার কথা। অন্য আর একদিন এসে খেয়ে যাব। চলি। আপনার কথা শুনলে সত্যিই আমি অনেক কিছু জানতে পারি। চিন্তার অনেক খোরাক পাই। আমার কাজেই আপনার কাছে আবার আসব।

—নিশ্চয় এস। মৈত্রেয়ী হেসে দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

অলকা নিজের গাড়িতে গিয়ে বসল।

॥ উনিশ ॥

সুরিন্দর কুমারকে আজ খেতে বলেছে অলকা। সুরিন্দর একটু আগেই এসেছে। দেখে অলকা বাড়ি নেই। খুব নিরাশ হল। মনের তাগিদেই সুরিন্দর তাড়াতাড়ি এসেছিল। বিলেতের পুরনো বন্ধু সুরিন্দর। তার সঙ্গে দেখা করার বিশেষ কোন আগ্রহ অলকার নেই। অসাক্ষাতে একটু সুরিন্দর মর্মাহত হয়। ড্রইংরুমে অলকার মা নির্মলার সঙ্গে সুরিন্দর অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথা বলছিল। অলকার কতটা পরিবর্তন হয়েছে তাই ভাবতে ভাবতে সুরিন্দর নির্মলার শত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল। চন্দ্রভানু ভর্মা একবার এসে ভদ্রতা রক্ষা করেই উঠে পড়লেন। সুরিন্দর ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। কখন অলকা আসবে, তাকে কখন দেখতে পাবে।

সুরিন্দর এক রকম যেচেই নেমতন্ন নিয়েছিল। সুরিন্দর এসেছে জেনেও অলকা তাকে ফোন করবে না, এরকম একটা আশঙ্কা সুরিন্দরের মনে ছিল। তাই দু-দিন কেটে যাবার পরও যখন ফোন এল না, তখন সুরিন্দর নিজেই অলকাকে ফোন করেছিল--হ্যালো, আমি সুরিন্দর বলছি।

অলকা স্বাভাবিকভাবেই বলল--শুনেছি তুমি এসেছ। কেমন আছ?

--কেমন আছি তা জানার আগ্রহ সত্যিই কি তোমার আছে অলকা? সে যাক, তোমার কথা হঠাৎ মনে হল, তাই বিলেত থেকে চলে এলাম।

সত্যি তোমার কত পজিশন হয়েছে! ইচ্ছে করলেই তুমি ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে আসতে পার, যা আমার এতদিনের চেষ্টায় হল না। কত দিনের মেয়াদ?

--দাঁড়াও, আসতে না আসতেই যাবার কথা। সুরিন্দর একটু হাসল। সুরিন্দর ইচ্ছে করেই বলল না কত দিনের মেয়াদে এসেছে। একটু থেমে বলল--আপাতত দু-বছর। ইচ্ছে হলে তিন বছরও থেকে যেতে পারি। কথাটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে বলল--আসলে কতদিন থাকব, সেটা নির্ভর করছে তোমরা আমাকে কিভাবে গ্রহণ কর। বলেই বিজ্ঞের হাসি হাসল। টেলিফোনের মাধ্যমে যতটা বিজ্ঞের ভাব ছড়ান যায়।

অলকার পরবর্তী কথাবার্তা, সুরিন্দরের মনে হল, কেমন যেন অসংলগ্ন, এলোমেলো। তোমার খুব নাম হয়েছে, না সুরিন্দর?

সুরিন্দরের মনটা একটু খুশীর ঝলকে নেচে উঠল--কেন বলত? কেউ কিছু বলেছে নাকি?

--হ্যাঁ, শুনেছি। ইউনিভারসিটি সার্কেলে আমারও কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে, সুরিন্দর।

--বাঃ, আমি কি না বলছি। তবে কি জান, ভারতকে আমি ঠিক জানি না। বেশীর ভাগ সময়ই বাইরে কাটিয়েছি। এখানকার লোক-দেরও কোন্‌টা যে ঠিক প্রশংসা, আর কোন্‌টা প্রশংসার আড়ালে বিদ্রূপ তা আমি ঠাহর করতে পারি না। আশা করছি, এ-ব্যাপারে তুমি আমাকে একটু আলোর রোশ্‌নী দেখাবে।

--তোমাকে গাইড করব, কাকে বিশ্বাস করবে আর কাকে নয়, এই ত?

--হ্যাঁ, নিশ্চয়। বহুদিনের পুরনো বন্ধু তুমি। বলতে দ্বিধা নেই, ভারতবর্ষে আমার সুহৃদ বলে তোমাকেই আমি জানি।

--বড় ভুল করছ, সুরিন্দর। প্রথম প্রথম তোমার অসহায় লাগছে। কিছুদিন পরেই দেখবে অন্য হাওয়া বইছে। বিদেশে যারা কৃতিত্ব অর্জন করে, এদেশে এখনও তাদের প্রচুর সম্মান। আমার গাইডেন্স্‌ ছাড়াই তুমি স্বাধীনতার স্বাদ বেশী পাবে। আমি না থাকলেই বরং তুমি বন্ধু

মহলে জমিয়ে নিতে পারবে।

—বিলেতেও তুমি এই একই অভিমানের কথা বলতে। আমি এবার ওসব ইগ্‌ন্যর্‌ করব বলে রাখছি। কি করছ কাল?

—লাইব্রেরীতে যাব।

—লাইব্রেরীর কাজ আমার জন্যে কি একটু ওয়েট্‌ করতে পারে না?

—কেন, দেখা করতে চাও? লাঞ্চ আওয়ারে লাইব্রেরীতে এসো না।

—না, লাইব্রেরী নয়, আমি তোমার বাড়িতে যেতে চাই। সুরিন্দর নাছোড়বান্দা।

—কটার সময়? অলকা একটু বেকায়দায় পড়ল।

—ধর, এগারোটা নাগাদ।

—অত বেলায়? তাহলে মাকে বলবখন লাঞ্চ করেই যাবে, কী, রাজি ত?

—আসতে পারি, যদি তোমাদের কোন অসুবিধা না হয়।

—অসুবিধা হলে কি আর খেতে বলতাম?

—সেটা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা অলকা, একটা কথা বলছি অফেন্স নিও না, প্লিজ্‌। বহুদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে—আমি খুব এক্সাইটেড ফিল করছি, জান। আর তুমি?

—আমি? আমিও সাগ্রহে অপেক্ষা করব, দেখব তোমার কতটা পরিবর্তন হয়েছে।

—ঠিক বলেছ, আমিও দেখব, তোমার সেই জেদ আর তেজ, আগের মত আছে, না, বদলেছে?

—আমি! বদলাইনি সুরিন্দর। ওটা ত তোমার। তুমিই বরং ঘন ঘন রঙ পালটাও।

—ওটা তোমার বোঝার ভুল, অলকা। ওটা আমার ওপর তোমার রাগ বলেই।

—রাগ-টাগ আমার কারুর ওপরে নেই।

—সে যাক, টেলিফোনে আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই, কাল ত দেখা হচ্ছে, কেমন?

সুরিন্দর কুমার ড্রইংরুমে বসে নির্মলার সঙ্গে কথা বলছিল। কুকুর দুটো দেশী কায়দায় মহা হুলুস্থুলু শুরু করে দিল। চন্দ্রভানুর ধমক খেয়ে একবার করে পালায় আবার ফিরে এসে ঘেউ ঘেউ করে। সুরিন্দর ভাবে, ভারতবর্ষের মানুষগুলোর মত কুকুরগুলোও বড় হস্‌টাইল্‌।

চন্দ্রভানু বললেন—তুমি ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে এসেছ, খবর পেয়েছি। খুব ভাল।

সুরিন্দর একটু হেসে বলল—হ্যাঁ। কিন্তু কতটা কি সুবিধে হবে, ঠিক

বুঝে উঠতে পারছি না। ভারত সম্পর্কে আমার একটু ভীতি আছে।

নির্মলা বললেন—বাইরে বাইরে থাকলে প্রথম প্রথম ওরকম হয়। প্রথম শক্‌গুলো সামলে নিতে পারলে দেখবে ভাল লাগছে। কতদিন থাকবে?

ভারতে তার থাকার সঠিক মেয়াদ কতদিন সেটা এঁদের বলবে কি বলবে না তা ভেবে নিয়ে সুরিন্দর মুচকি হেসে বলল—এরা ত বলছে তিন বছর। পছন্দ না হলে এর আগেই কেটে পড়ব।

নির্মলা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন, বললেন—আসতে না আসতে একথা বলছ? দেখ না, আজকাল কত লোক, কত ইঞ্জিনীয়ার, কত পণ্ডিত বিদেশ থেকে চলে আসছে। শুধু অর্থের জন্যে কতদিন আর বিদেশে পড়ে থাকা যায়। অলকা কিন্তু অন্য কথা বলে। ও বলে দেশকে না চিনে বিদেশে যাবার কোন অর্থই হয় না। অভিজ্ঞতার মধ্যে অনেক গ্যাপ্ থেকে যায়।

—নির্মলার কথা সুরিন্দরের ঠিক পছন্দ হয় না। কেমন যেন গায়ে আঁচড় বসিয়ে কথা বলেন। তার উপযুক্ত জবাব দিতে অবশ্য সুরিন্দর একটুও ইতস্তত করে না। বলে—অলকার ব্যাপারটা অন্য, ভারতবর্ষের কোন দোষই ওর চোখে পড়ে না। আমার কিন্তু ঠিক উল্টো।

চন্দ্রভানু কথাটা শুনেই উঠে পড়লেন। যেতে যেতে বললেন—অলকা বলে গেছে ও লাইব্রেরীর কাজ শেষ করে এগারোটার মধ্যে আসবে। তুমি বোস, নির্মলার সঙ্গে গল্প কর।

বলতে না বলতেই অলকা এসে পড়ল। রোমিও-জুলিয়েট আদরের চোটে অলকাকে অস্থির করে তোলে। একবার অলকাকে আদর করে, আবার আগন্তুকের কাছে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে আসে।

চন্দ্রভানু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন—তুই এসে গেছিস। সুরিন্দর অনেকক্ষণ এসে বসে আছে।

নির্মলা ড্রইংরুমে বসেই গল্প করছিলেন। সুরিন্দরের কাছে এটাই রীতিমত বিরক্তিকর লাগে। নির্মলা সেটা বুঝলেন না। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মা-বাবা-দাদাদের কথা জিজ্ঞেস করতে থাকলেন। ভদ্রতার খাতিরে হ্যাঁ, হুঁ করে দু-একটা কথার উত্তর দিতে হচ্ছিল। অলকার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতটা সুরিন্দরের আর নিরিবিলিতে সারা হল না।

সুরিন্দর মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, দাদাদের ব্যবসাপত্র ভালই চলছে। মা-বাবা শিগ্‌গির বিদেশে যাবেন। এবার লম্বা ট্যুর। য়ুরোপ, আমেরিকা। আমি এসময়ে এসে পড়ায় ওঁরা একটু বিব্রত বোধ করছেন।

নির্মলা বললেন—তা ত হবেই। কতদিন পরে তোমাকে কাছে পেলেন।

—কেন, প্রতি বছরই ত আমি একবার করে আসি। তবে বছর তিনেক

আমি আসতে পারিনি। মা-বাবাই গেছেন।

নির্মলা উঠে পড়লেন—তোমরা গল্প কর। 'খানা' কিন্তু তৈরী।

অলকা বলল—তাহলে দিয়ে দাও, কি বল সুরিন্দর?

সুরিন্দর ভাবে—নির্মলা সব পণ্ড করে দিলেন। প্রিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসে 'খানাটাই' কী বড় হয়ে গেল? এতদিন বাদে দেখা, তাও তিনি মাটি করলেন। দয়া করে যে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে যাবেন, তাও করলেন না। সেই থেকে জাঁকিয়ে বসে আজে বাজে প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, যেন ও-বাড়িতে এক্ষুণি অলকাকে বিয়েশাদী দিয়ে পাঠাবেন। ঐশ্বর্যের প্রতি ভদ্রমহিলার চিরকালের লোভ! হবে না কেন, চন্দ্রভানু আদর্শ দেখাতে গিয়ে শুধু দরিদ্র্যতাকেই সঙ্গী করে নিয়েছেন। নির্মলার সাধ-আহ্লাদ ত অপূর্ণ রয়ে গেল, তার কি হবে, চন্দ্রভানু? আমার কথা শুনে ত আপনি রাগ করেই উঠে গেলেন। আপনাদের শুধু কোন্দল আর দাবী। আমার বাড়িটাও ঠিক এরকম ছিল; আমি অনেকটা শিখিয়ে পড়িয়ে ধাতস্থ করেছি। এখন আর আমাকে অত ঘাঁটায় না। আত্মীয়-স্বজন নিয়ে বেশী পড়ে থাকলে কি জীবনে এতটা উঠতে পারতাম?

—কি সুরিন্দর, কথা বলছ না যে, এখন খাবে না—এই ত। আচ্ছা মা, আমরা পরে খাব, এখন নয়।

সুরিন্দর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল—এই ত এলাম, কিছুক্ষণ গল্প করি, তারপরে না হয় . . । আসলে, ভীষণ হেভী ব্রেক্ ফাস্ট্ করি ত, দেড়টা-দুটোর আগে খিদে পায় না।

নির্মলা বললেন—ঠিক আছে, যখন খেতে ইচ্ছে করবে বোল, টেবিল লাগাতে বলব। বলে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। রোমিও-জুলিয়েট আবার হৈ-চৈ শুরু করল। অলকার বকা খেয়ে অন্য ঘরে চলে গেল; কিছুক্ষণ পরে পরেই মুখ বাড়িয়ে তাদের অস্তিত্ব জাহির করতে থাকল।

সুরিন্দর বড় বিরক্ত বোধ করছিল। প্রিয়ার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সমস্ত মাধুর্য এই দুটো ভারতীয় কুকুর একেবারে পণ্ড করে দিল অকারণ চিৎকার আর লম্ফ-ঝম্ফ করে। এ দুটোকে বেঁধে রাখতে বলা কি খুব অভদ্রতা হবে? সুরিন্দর একটু-ভাবে।

কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলল—এদুটো তোমার খুব পিয়ারের না?

অলকা ইশারা করতেই, ওরা দুজনেই অলকার কোলে উঠে বসল। অলকা দুজনকে আদর করে বলল—ওরা যে শুধু আমার আদরের জন তাই নয়, আমার প্রটেক্টারও।

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ ধরেই সেটা টের পাচ্ছি।

—তাই বুঝি? দাঁড়াও, এদের বেঁধে রাখছি। অলকা হুকুম সিং-কে ডেকে ওদের বেঁধে রাখতে বলল।

সুরিন্দর হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বলল—লাইব্রেরীর কাজ হল?

—না, ঠিক লাইব্রেরীতে যাইনি। একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। তোমাকে ত আমি চিনি, ক্লাস না থাকলে তুমি ঘর থেকে এগারোটার আগে বেরুতেই পার না। ভাবলাম, মিছিমিছি আর কেন এপয়েন্ট্‌মেন্ট্‌টা বাতিল করি।

সুরিন্দর এতদিন পরে ঠিক এভাবে কথা বলতে চায়নি। কিন্তু মুশকিল কি, এখানে কেউ কাউকে প্রাইভ্যাসি দিতে চায় না। অলকার কাছে এসে স্ট্রেট্‌ অলকার সঙ্গে দেখা করা চলবে না। বাপ-মায়ের সঙ্গে ধানাই-পানাই করতে হবে। তাঁরা যখন দয়া করে উঠে যাবেন, কুকুর দু'টোকে যখন বাঁধা হবে, তখনই প্রেয়সীর সঙ্গে কথা বলার অবসর পাওয়া যাবে। তত-ক্ষণে ভাল ভাল কথাগুলো মন থেকে উবে যাবে। শুধু মনের মধ্যে চিঁচিঁ করবে অভিমান, রাগ আর বিরক্তি। সুরিন্দর অন্য কথা খুঁজে না পেয়ে চট করে লাইব্রেরীর কথাটা তুলেছিল। অলকার ফিরতে দেরী দেখে সুরিন্দর অধৈর্য হয়ে পড়েছিল।

পুরনো কথা বললে অলকার মনটা হয়ত-বা একটু ভিজবে। তাই মুখে একটু বাঁকা হাসি এনে বলল—ঠিক, ঠিক। বিলেতে এগারোটার আগে আমি কোথাও বেরুতাম না, যদি অবশ্য ক্লাস না থাকত। আমার কোন কথাই দেখছি, তুমি ভোলনি।

অলকা মাথা নাড়ল—বলল, তুমি যে প্রকৃতির মানুষ, তোমার পক্ষে হ্যাবিট্‌ চেঞ্জ্‌ করা একটু মুশকিল।

সুরিন্দর আরও একটু নরম সুরে বলল—এই দেখ, আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করা হল না। এত ভিড়ে আর চিৎকারে মাথাটা যেন কেমন করে ওঠে! তুমি ত জানই, নয়েজ্‌ আমি একেবারে সইতে পারি না। সে যাক তুমি কেমন আছ?

অলকা রহস্যময়ী হয়ে উঠল—কেমন দেখছ?

—মনে হচ্ছে, অনেক বেশী অ্যাব্‌স্টিভ্‌ হয়েছ। তুমি চিরকালই পজিটিভ্‌ ছিলে, এখন দেখছি খুব ইন্‌ভল্‌বড্‌। আর আমি?

—তোমার কোন পরিবর্তন হয়েছে বলে ত আমার মনে হচ্ছে না।

সুরিন্দর একটু নিরাশ হল। অলকার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আবার সেই ক্লাস কনফ্‌লিক্‌টের কথা। স্বাভাবিক হতে ওর যেন মানা। কোথায় কার সাথে ফেঁসে গেছে, কে জানে? হেসে বলল—পরিবর্তন প্রত্যেক মানুষেরই হয়, তবে ওটা সবার চোখে ধরা পড়ে না। তুমি হয়ত বলবে, আমি যে ক্লাসের লোক, সেখানে ক্লাস কনফ্‌লিক্‌টাই বড়, পরিবর্তন বড় কথা নয়।

—না, তা আমি বলছি না। পরিবর্তন নিশ্চয় তোমার হয়েছে, চেহারায়

না হোক, স্বভাবে। সেটা কী অত তাড়াতাড়ি বোঝা যায়?

—সময় লাগবে, না?

——নিশ্চয়।

—আরও তিন বছর?

—এক যুগ হতে পারে।

সুরিন্দর কথাটার অর্থ না বুঝে চুপ করে গেল। কি বলবে ভেবে পায় না। ভেবে পেল না বলেই অলকার কথা বলার ভঙ্গীটারই প্রশংসা শুরু করল। বলল—কথায় তোমাকে কেউ হার মানাতে পারবে না, এ-ব্যাপারে তুমি অদ্বিতীয়া।

—তাই বুঝি?

—হ্যাঁ, ঐ কথার জাদুমন্ত্রে একদিন তোমার প্রেমে পড়েছিলাম।

—তাই বোধ হয় সে প্রেম টেকেনি। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলে কথার ফুলঝুরি ছাড়া আমার আর কিছু দেবার নেই।

—তুমি ভুল করছ অলকা। তুমিই বরং আবিষ্কার করলে আমার মধ্যে সার-বস্তু কিছু নেই। তাই হঠাৎ-ই সরে গেলে। মনে আছে, শুরুতে আমি বেশ কয়েকটা চিঠি লিখেছিলাম। তার কোন জবাব দাওনি। তুমি ভয়ংকর একরোখা, দাম্ভিকও বটে।

—তাই নাকি? অলকা হাসছিল। —আর আর, কি জেনেছ বল?

—বললাম ত—ভয়ানক রাগ আর সেই রাগের মূলে আছে অটল আত্ম-বিশ্বাস। যাকে আমরা বলি দাম্ভিকতা, কন্‌সিটেড্।

—আরও কিছু বলবে?

—না, বলার কিছু নেই, জীবনটা আমার বরবাদ হয়ে গেল, অলকা।

—কেন বলত?

—তোমাকে ভালবেসে আমি সব খুইয়েছি।

—তাই নাকি? আমার জন্যে তোমার বন্ধু-বান্ধবদের সংখ্যা কমে গেল নাকি? ইদানীং তোমার মেয়ে বন্ধুরা আমার রেফারেন্স দিয়ে তোমার সঙ্গে মেশা কি ছেড়ে দিল? তা যদি হয়, খুবই বিপদের কথা।

—আমি তোমারই কথা বলছিলাম, অলকা।

—কি বললে, আমার সান্নিধ্য ও তাদের সংখ্যা—দুটোই বুঝি এক?

সুরিন্দর এবার একেবারে হতবাক।

তাই অলকাই হেসে বলে—ভালবাসার কথা বলছিলে না, ওসব থাক। অন্য কথা বল।

সুরিন্দর বলল—তোমাকে এবারে যেরকম অ্যাকটিভ্ দেখছি, কারুর সঙ্গে ইন্‌ভল্‌ভড্ হওনি ত?

—হলে কি করবে, শুনি?

—কি যে করব, এখন বলা মুশকিল।

—আমি ত তোমাকে কোনদিনও বলিনি যে আমার সঙ্গে মিশতে হলে তোমাকে তোমার মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়তে হবে। তুমি বোধ হয় পুরুষের অধিকার চাইছ, না সুরিন্দর? তোমাকে একটা কথা বলি। তোমার সঙ্গে মিশেই বুঝেছি যে বিদ্বান ও বিদগ্ধজনকে কতটুকু বিশ্বাস করা উচিত, তাদের সান্নিধ্য থেকে কতটা দূরে থাকলে নিজের শান্তি বজায় থাকে। মোদ্দা কথা, বিদগ্ধজনদের দেখে ওদের সম্পর্কে আমার একটা রীতিমত ভীতির সঞ্চার হয়েছে। আর কেউ না বুঝুক, অন্ততঃ তুমি ত তা বুঝবে।

—আমি তাহলে তোমার অনেক ক্ষতি করেছি বল?

—ক্ষতি এতটুকু নয়, বরঞ্চ লাভই হয়েছে। তোমার সঙ্গে মিশেছিলাম বলেই আমি মোহমুক্ত হয়েছি। এখন আমি নিজের মনে, নিজের চিন্তার জগৎ নিয়ে বেশ মশগুল থাকি। কোন কষ্ট হয় না। সত্যিই তুমি আমার খুবই উপকার করেছ।

সুরিন্দরের মুখে খুশীর এক ঝলক খেলে গেল। বলল—শুনে সত্যিই আমার খুব গর্ব হচ্ছে। শুনলাম, তুমি নাকি একটা বই লিখছ, পাবলিক সেক্‌টর এ্যাণ্ড গ্রোথ—না, ওরকম কিছু একটা বিষয় নিয়ে।

—কে বলল?

—সবাই বলছে। তুমি দেখছি খুব পপুলার। তোমার ব্যাপারে সবায়েরই দেখছি ইন্টারেস্ট্‌।

একটু হাসে অলকা, বলে—তুমি এসে এদের সংখ্যা বাড়ালে, বল।

—নিশ্চয়। আমি যদি তো র কোন কাজে লাগতে পারি ত নিজেকে ধন্য মনে করব। ধর, বইটার জন্যে কোন বিদেশী পাবলিশার্স যোগাড় করা, সে আমি পারব। সব ভারই আমি নিতে পারি।

অলকা আবার একটু হাসল, বলল—বইয়েরই দেখা নেই, এখনই পাবলিশার্স যোগাড় হয়ে গেল। যেভাবে আমি লিখছি, আর যা আমি লিখছি, তাতে কোন বিদেশী পাবলিশার্স তোমার রেকমেণ্ডেশনেও এ বই ছাপবে না। বরং ক্ষুব্ধ হবে।

—কেন, রাইটিস্ট্‌ ফোর্সকে কষে গালাগালি দিচ্ছ নাকি?

—না দিয়ে উপায় আছে? ব্রিটিশরা দেশটার আর কিছু রেখেছিল যে ডেকে ডেকে তাদের শুধু প্রশংসা করতে হবে?

—তুমি যাই বল না কেন, গ্রোথ প্যাটার্ন ওরাই ত শিখিয়েছে। ওয়েল-ফেয়ার ইকন্‌মিক্সের মডেল মানে এখনও আমরা হ্যারল্ড লাস্কি, হাইক ও রবিনস্‌-কেই বুঝি। চল্লিশ দশকের কথাই দেখ না—এইচ. হোটেলিঙ্গ থেকে শুরু করে জে. ই. মিড্‌, জে. এম. ফ্লেমিং, এ. এম. হ্যাণ্ডারসন্‌, এ. পি. লারনার—এঁরা পাবলিক এন্টারপ্রাইজের আউটপুট নিয়ে কম

ভেবেছেন? হোটেলিঙ্গ যেমন, অন্যরাও তেমনি সাজেস্ট করেছেন, Marginal-cost pricing for the products of public enterprises in a mixed economy. এখনও এই নিয়ে তর্ক চলছে বলে আমার ধারণা।

—থাক, থাক। প্লিজ্ সুরিন্দর, তুমি ইকন্‌মিক্সের থিউরি কপ্‌চাতে বসলে আমার মাথা ধরে যায়। ইতিহাসের সঙ্গে অর্থনীতির যেখানে সংযোগ, সেই দৃষ্টিতে প্রাক্-স্বাধীনতার গ্রোথটা আমি দেখাবার চেষ্টা করছি। ওখানে যদি তোমার দৃষ্টি আনতে চাই, কি দাঁড়াবে জান ত, যারা তোমার মতই বলেন, যা কিছু আমরা করেছি, সবই বৃথা। লপ্-সাইডেড্।

—নিশ্চয় তাই। আমাদের অরিজিনাল দৃষ্টি কোথায় যে সত্যিকারের কিছু করব? সুরিন্দর উত্তেজিত হয়ে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। অলকা বাধা দিয়ে বলল—ও-নিয়ে আর কিছু আমি শুনতে চাই না সুরিন্দর, অনেক শুনেছি।—খাবার দিতে বলি?

—তাড়াতাড়ি খাইয়ে বিদায় করতে পারলে দেখছি তুমি বাঁচ, না?

—এরকম যদি ভাব ত আমার কিছু বলার নেই। তোমার রেস্তোরাঁ-বিলাসী মন। সেখানে তুমি খুবই ধৈর্যশীল। সহজে মেজাজ খারাপ কর না। অশোভন কিছু ঘটলেও মনে কর ওটা স্বাভাবিক। কিন্তু বাড়িতে যখন কাউকে খেতে বল, হাঁকডাকে তুমি কি কাণ্ড করে বস মনে আছে? একবার তোমার মা-বাবা বিলেতে বেড়াতে গেছিলেন, সেখানে তাঁরাই তোমার অতিথি, আমাকে খেতে ডেকে কি তুলকালাম কাণ্ডটা করেছিলে, মনে আছে কি? এখানে হাঁকডাক কবার মত কেউ নেই বলেই তোমার খাবার সময় হল কি না বারবার আমি জিজ্ঞেস করছি। অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।

—আমার মেজাজকে তুমি খুব ভয় পাও, না অলকা?

—প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু দোষ থাকেই, ওসব ধরতে নেই।

সুরিন্দরের চোখ-মুখে খুশীর ঝলক খেলে যায়। জীবনের সব সফলতাই অর্থহীন যদি তা অলকার মত মেয়ের নজরে না পড়ে! কিন্তু কোন্‌টাতে অলকা যে রিয়েলি খুশী হয়, আর কোন্‌টা যে ওর বিদ্রূপ, বুঝে ওঠা দায়। সুরিন্দরের জীবনেও কম মেয়ে আসেনি। কখনও ছাত্রী, কখনও বান্ধবী, কখনও সহকর্মী, কখনও কোন অনিসন্ধিৎসু, কখনও পি-এইচ. ডি. করছে—এমন রিসার্চার যে সব সময় যা-চাও সব দিতে প্রস্তুত। সুরিন্দরের রূপযৌবন আছে, সুরিন্দর গুণী, সুরিন্দর স্কলার, সুরিন্দর অর্থবান। এতগুলো হাত নিয়ে সে যখন যা চেয়েছে, তার চেয়ে বেশীই পেয়েছে। গ্রহণে কোন কুণ্ঠা নেই সুরিন্দরের। ঈশ্বর, বিবেক, সৎবুদ্ধি—ওসব ও বিশ্বাস করে না। ওসবের জ্বালাও নেই।

ও জানে এ জীবনে যতটুকু পাওয়া যায়, সবটুকুই প্রাণভরে নিতে হয়। মৃত্যুর পরে সবই যখন শেষ, মৃত্যুর জন্যে ভাল কর্ম তুলে রাখার পক্ষপাতী নয় সুরিন্দর। কাকে কোন্ অবস্থায় কিভাবে গ্রহণ করেছে, যখন একা থাকে, সেই নিভৃত মুহূর্তগুলো অনেকগুলো হাত বাড়িয়ে ওকে যেন উত্তেজিত করে তোলে। স্মৃতিও মানুষের এক ভয়ংকর সহযাত্রী। সেই মধুর নিভৃত মুহূর্তগুলো মনকে বড় নাড়া দেয়। এক-এক জনের এক-এক রকম আকুতি। মন-প্রাণ-ভরে-ওঠার কলোচ্ছ্বাস সুরিন্দরকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। মাঝে মাঝে তাই ওর মনে হয়, নারীকে সর্বপ্রকারে আত্মসাৎ করে তাকে খুশী করার মধ্যে অসাধারণ এক সুপ্ত শক্তি আছে। ভরে দিতে পারলে সে শক্তি যেন নিজেরও করতলগত হয়। তখন মনে হয় পৃথিবীর সব-কিছু হাতের মুঠোয়। লোভ বাড়তেই থাকে। যা অসম্ভব, তাও চরিতার্থ করার জন্যে মন তখন অস্থির হয়ে ওঠে। জীবনের ট্র্যাজেডি এইখানেই। অনায়াসে বা স্বল্পায়াসে জীবনে যা পাওয়া যায়, তা পেয়েও মন ভরে না। যা পাওয়া অসম্ভব, যা নাগালের বাইরে, তাকেই পাবার দুর্বার আকাঙ্খা। মরীচিকার মত বার বার সে শুধু ব্যর্থতাই জাগায়। তবু মানুষ ছুটে চলে, শক্তির অপচয় ঘটায়। অন্য মেয়েদের সঙ্গে অলকার স্বাতন্ত্র্য এইখানেই। দুর্বার ওর আকর্ষণ। মনে হয়, হাত বাড়ালেই ধরা দেবে। যত কাছে এগুনো যায়, ততই ব্যবধান বাড়তে থাকে। ওর জন্যে অপেক্ষা করা হয়ত ভুল, তবু এই নিদারুণ ভুলটাই সর্বস্ব করে মরীচিকার মত দৌড়ে বেড়াচ্ছে সুরিন্দর।

এতশত ভেবেও অলকাকে সরিন্দর কিছুই বলতে পারল না। শুধু বলল—বিশ্বাস কর, সত্যিই আমি 'ক্ষুধার্ত', আমাকে খেতে দাও।

—তুমি বোস, আমি এক্ষুণি আসছি। মাকে টেবিল লাগাতে বলে আসি।

সুরিন্দর বুঝতে পারে ওর মনের কথা অলকা কোনদিনই বুঝবে না।

বলল—বেশ। তাড়াতাড়ি এসো, নয়ত খিদে মরে যাবে।

অলকা হেসে বলল—তোমার মেজাজী খিদের পরিচয় আমার জানা।

সুরিন্দর মনে মনে হাসল, অলকা সব বুঝেও না বোঝার ভান করে।

॥ কুড়ি ॥

এক একটা সিম্‌বলের জোরে এক একটা মানুষ, এক একজন নেতা দাঁড়িয়ে গেছেন। গণেশ টাওয়ার কি হতে যাচ্ছে সেই হিসেব নিতে গিয়ে পরাঞ্জপে

এই কথা ভাবছিলেন। ১৮৯৫ সালে বাল গঙ্গাধর তিলক গণেশ পুজো করেছিলেন। তারপর থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত তিনি সারা ভারতে তাঁর দাপট নিয়ে বেড়িয়েছেন। পরবর্তী সিম্‌বল দিলেন গান্ধীজী, তিনি বোধ হয় বিবেকানন্দের লেখা পড়ে বুঝেছিলেন ভারতকে রাজনীতি শেখাতে হলে ধর্মের মুখোশে তা শেখাতে হবে। গান্ধীজী হাঁটুর ওপর ধুতিটি উঠিয়ে নেংটি পরা সাধু সেজে সারা ভারতকে জাগিয়ে তুললেন। তাঁর সিম্‌বল—একদিকে চরখা, অন্য দিকে রামধুন্। ফাঁসিকাঠে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁরা অনেকেই মা-কালীর সাধক ছিলেন। গীতা আওড়ে শহীদও হয়ে গেছেন অনেকে। ওটাও কী এক ধরনের সিম্‌বল নয়? পরাঞ্জপে প্রায়ই ভাবেন, গঙ্গাধর তিলকের মত, গান্ধীজীর মত ভবিষ্যৎ ভারতের জন্যে এমন একটা সিম্‌বল রেখে যেতে হবে, যা মানুষের চেয়েও বড়, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে অমর হয়ে থাকবে। এর জন্যেই ত গণেশ টাওয়ারের পরিকল্পনা। অথচ পরাঞ্জপের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা শুধু বর্তমান নিয়েই ভাবে, ভবিষ্যৎ নিয়ে কারুর কোন মাথাব্যথা নেই। এটাই পরাঞ্জপের দুর্ভাগ্য।

এই প্রশ্নই সবাইকে করবেন বলে আজ তিনি সকলকে ডেকে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করবেন, তোমরা ত অনেকে অনেক কিছুই করছ, তুমি কী মনে কর, গণেশ টাওয়ার এগিয়েছে, এগোচ্ছে?

কথাটা শুনে চন্দ্রভানু একটু চটে গেলেন। বললেন—আমার ত মনে হয়, অনেকে অনেক কিছু করছে কিন্তু কে কি করবে, তা সঠিক জানা না থাকায় কোন কাজই ঠিকমত এগোচ্ছে না।

পরাঞ্জপের কথাটা ঠিক পছন্দ হল না। একটু গম্ভীর হয়েই তিনি বললেন—আমি সবাইকে স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী। তাতে যতটা কাজ এগোয়। এতে সুবিধে হচ্ছে এই যে, যে যার কাজ ঠিক মত করছে। দেখছেন না, কেউ থেমে নেই, কিছুই থেমে নেই।

এতক্ষণে চন্দ্রভানু একটু স্বাভাবিক হয়েছেন। রহস্য করে বললেন—আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই, ভারতবর্ষ এমন একটা বিশাল দেশ, এখানে যে যার মত কাজ করবে সে সুযোগটারই বোধ হয় বেশী দরকার। তবে বয়স হয়েছে ত, দেখে শুনে অভিজ্ঞতাও ত কম হল না। তাই আজকাল ভাবি এভাবে কাজ কী ঠিক এগোয়? তাতে কী একটু কন্‌ফিউশনের রিস্ক থেকে যায় না?

পরাঞ্জপে কথাটা লুফে নিলেন—এগ্‌জ্যাকট্‌লি। কাজ এগোয় কি না কে জানে, কিন্তু কাজ থেমে থাকে না। আর এটাই বর্তমান ভারতের সবচেয়ে বড় আইডিয়েল। কন্‌ফিউশন্ যদি কিছু থাকে, আমার ধারণা, আলটিমেটলি তা কাজের তোড়ে ভেসে যায়। কোনো কন্‌ফিউশন্ আর থাকে না।

এসব শুনে চন্দ্রভানু ভাবেন, এর মধ্যে না থাকাই নিরাপদ। তাই বললেন—অনেক ত হল, আমাকে এবার না-হয় রেহাই দিন। অত স্বাধীনতায়, অত বড় মুক্তাঙ্গনে আমি আবার কাজ করতে পারি না। আমি জানি, আজকাল ভারতবর্ষে সবাই এ সুযোগ চাইছে। কিছু না করে মাইনে চাই। বিন্দুমাত্র পরিশ্রম না করে সাহিত্যিক। জীবনদর্শন, আত্মত্যাগ ছাড়াই আর্ট। কিছু না করে পুরস্কার। ওতে আমি সায় দিতে পারছি না।

—কে কী করছে, অনেক দিন পরে আজ সেই হিসেবই ত নিতে বসেছি। আপনি কি করতে চান বলুন। আমি শুনি।

—আপনি ত খালি শোনেন। কিছুই ত বলেন না। গণেশ টাওয়ার বলতে আপনি কী বোঝেন?

—হো-হো করে হেসে ওঠেন পরাঞ্জপে। সেই বিপুল হাসি সামলে নিয়ে বললেন—কোন সন্দেহ আছে নাকি যে টাওয়ার ছেড়ে আমরা একেবারে মাটিতে এসে বসেছি?

—আপনার এসব রহস্যপূর্ণ কথাবার্তা আমার মাথায় ঠিক ঢোকে না।

—বলুন, তবে আপনার কথাই বলুন—কী করলে গণেশ টাওয়ার ঠিক-মত হত? যতটা যা হয়েছে, তাকে গণেশ টাওয়ার কেন বলা চলে না, বলুন। জবাব দিন।

—বারে, কিছুই ত হয়নি। রাম দেওধরের মডেল গ্রহণ করা হয়েছে। ওটা ও বেশ ভালই করেছে, ও-সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য নেই। কিন্তু আমার মডেল দেখে কি যে ঠিক করলেন, কিছুই ত বুঝলাম না। আমাকে এ যাত্রায় রেহাই দিন।

—দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। এত সহজেই কী রেহাই পাওয়া যায়? এই ত সবে শুরু। আমাকে মন খুলে বলুন, কি করলে মনে হবে, আপনার হিসেব মতই কাজ হচ্ছে।

চন্দ্রভানু ভর্মা বুঝলেন আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। একে কিছু বলে লাভ নেই। ভেতরে ভেতরে মৃদু লয়ে রাগও হচ্ছিল। এও বুঝলেন, ভারতবর্ষে বর্তমানে সর্বত্রই এই ধারা, এই চিন্তা। সবই হচ্ছে, অথচ কিছুই হচ্ছে না। পরাঞ্জপে ত এদেরই প্রতিনিধি, সুতরাং ফল অন্য হবে কী করে? তাই বললেন—আপনি হয়ত ঠিকই বলেন। আমার মনে তা রীতিমত 'একো' তোলে। আপনিই বর্তমান ভারতবর্ষ। আজ আমি উঠি।

—উঠবেন, আসুন। কই বললেন না ত কাজ আপনি কাকে বলেন—মানে কি করলে গণেশ টাওয়ার হয়?

চন্দ্রভানু ভর্মা হেসে বললেন—ওটা রাম দেওধর বোধ হয় ভাল বলতে

পারবে। কাজের লোক ত, কাজের কোথায় গলদ ও চটপট ধরে ফেলতে পারে।

—আর আপনি বুঝি পারেন না? পারেন না কেন, বলব? আপনার মধ্যে যে ক্রিয়েটিভ ফ্যাকাল্‌টি আছে তা আপনাকে অনবরত পিষে মারছে। তাকে আপনি বলেন বিবেক, আত্মচেতনা। আমি বলি, ওটা থাকলে এ যুগে অচল। কিছু যে আমি করছি, এতে ত আপনার মনে সন্দেহ জাগেনি? কি?

চন্দ্রভানু নিজের কথাই বললেন—আমি ত এইসব কারণেই আজকাল কিছুর মধ্যেই থাকি না, অথচ আপনি আমাকে টেনে এনেছেন। অনেক ভেবে দেখলাম, আজকাল আমি যে কেন কিছুর মধ্যে থাকি না, তার যুক্তি আমার কাছে এখন আরও জোরাল।

—এবার বুঝেছি। পরাঞ্জপে যেন কোন সত্য-সন্ধানে বেরিয়ে নতুন পথ আবিষ্কার করে ফেলেছেন, তেমনিভাবে বললেন—অর্থাৎ এই যে সব বিদেশী এক্সপার্ট,—এই এত সমারোহ, অথচ এই মূষিক প্রসব, এ আপনার পছন্দ-সই নয়। এই ত বলতে চান। আপনি এও হয়ত ভাবছেন, কিছু না করে এত কিছু করার সুনাম লোকটার হয় কী করে? বলেই হো হো-করে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন পরাঞ্জপে। বললেন—হয়, হচ্ছে, ভারতবর্ষে আজকাল অনেক কাজই হচ্ছে। নানা বিরোধী দল, কত কাজ করছে দেখছেন? নিত্য-নতুন কাগজগুলো কত কিছু লেখার কত অভিনব সব বিষয় পাচ্ছে, স্ক্যান্‌ড্‌ল্‌, ক্যারাপ্‌ট্‌শনের মত পপুলার বিষয়ের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। যদিও ও-নিয়েই এরা বেঁচে আছে। সে যাক, এত কিছু হচ্ছে বলেই ত এত কিছু পাচ্ছে? বলুন, ঠিক কিনা। আমি আরও একটা সত্য কথা বলি—শুনুন, এত সব হচ্ছে বলেই ত এত ক্যারাপ্‌ট্‌শন্‌, এত স্ক্যান্‌ড্‌ল্‌। না হলে, ঐ ত ধরুন ব্রিটিশ আমলে সবাই ত ভদ্র ছিল, সুসভ্য ছিল, বুরোক্র্যাসি পর্যন্ত অনুগত ছিল, কিন্তু কাজ যাকে বলে তা কী কখনও কিছু হয়েছিল? সে আমলে গণেশ টাওয়ারের জন্যে এতগুলো বিদেশী এক্সপার্ট আনার কথা আপনি কী চিন্তা করতে পারতেন?

চন্দ্রভানু এটা স্বীকার করেও সংযত বিশ্বাসে বললেন—আমি ত এর কোন অর্থ দেখি না। যা আপনি করতে চাইছেন, রাম দেওধর, আমি বা পুলকেশ গোস্বামী তা হয়ত করতে পারতাম। বাইরে থেকে লোক ডেকে অযথা—। কথাটা শেষ না করে তিনি বললেন—সে যাক, আসল কথা, আপনি নিজেও জানেন না, কাকে দিয়ে আপনি কতটুকু কাজ করাবেন। এ অনেকটা সেই শুভ উৎসব, সবাই থাকুক, সবাই করুক, এমন একটা এলাহী ব্যাপার চলছে।

—পরাঞ্জপে বেশ একটু চটে উঠে বললেন—আপনি কী আমার

সমালোচনা করছেন? আপনি কি মনে করেন এর জন্যেই আপনাকে আমি ডেকেছি?

চন্দ্রভানু ভর্মা কোনকালে কাউকেই পরোয়া করেননি, আজও করেন না। হয়ত আরও কিছু বলতেন। সে সুযোগও পরাঞ্জপে নিজেই দিয়েছিলেন। কথার অন্য দিকে বাঁক নিচ্ছে বলে তিনি নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে বললেন—না, না, কি যে বলেন। আপনাকে সমালোচনা করার স্পর্ধা এখনও কারুর হয়নি। আপনার পেছনে যে কারা আছে তা এখনও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। তবে এটুকু বুঝতে পারি বর্তমান ভারতের আপনি ঐশ্বর্য, শক্তি ও প্রচেষ্টার প্রতীক, আপনি ভারতের ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ ভারত।

—তাই নাকি? বলুন, বলে যান। শুনতে খুব ভাল লাগছে। তবু বলব আপনি বরং আমাকে প্লিজ্ একটু সমালোচনা করুন।

—না, না। আমি এখন চলব। চন্দ্রভানু ভর্মা নিজের গাম্ভীর্য নিয়ে আস্তে করে উঠে পড়লেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলকেশ গোস্বামী এল।

—কি মনে করে ডেকেছেন, স্যর?

—পুলকেশ, আমরা কী করতে যাচ্ছি, বল ত?

—সে কী স্যর, এতটা এগিয়ে এসব প্রশ্ন আবার কেন? কার কাজে লাগবে এ আত্ম-সমালোচনা, ওসব কথা কে শুনতে চায়? আমার ত মনে হয়, ভারতবর্ষে এ প্রশ্ন আজকাল আর কেউ করে না, সবাই কাজ করে যায় নিজের খুশী মত, নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী, তাই যেমন চলছে, চলুক না।

এই জন্যেই পরাঞ্জপে পুলকেশকে এত পছন্দ করেন। হোক্ না বিরোধী ভাবাপন্ন মানুষ, কিন্তু মার্ক্সিয়ান লজিকে একেবারে ভরপুর। কাজ, কাজ-কর্ম চলুক, এটাই ছিল মার্ক্সের কথা। ঠিক, ঠিক বলেছে পুলকেশ। কিন্তু পুলকেশ এটা বোঝে না যে, ওরা ক্ষমতায় এলে এ-দেশ থেকে ধর্মটা উঠিয়ে দিতে পারবে না। ওরা বলতে চায় ভারত ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, সেখানে ধর্মের প্রাধান্য থাকা উচিত নয়। মানলাম। কিন্তু পুলকেশ কী অস্বীকার করতে পারে 'পেডিগ্রী'কে—যা আজ বিজ্ঞানও মেনে নিয়েছে তার ডি. এন. এ. কনসেপ্টে। কলমের চারাতে জাত আমই হয়। টক আম হয় না। কথাগুলো ভাবতেই পরাঞ্জপে নিজের মধ্যে ডুবে যান। একটু হেসে বললেন—তুমি মান আর না মান পুলকেশ, জাতপাত আমরাও মানি না, কিন্তু কোন্ বীজের কি ফসল বিজ্ঞান তা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। ওটা কি তুমি মান? বিজ্ঞান কি মান?

—কী হল আপনার? আজকে বড় আপনাকে আত্ম-সমালোচনায় পেয়েছে, দেখছি। ওটি করবেন না, মরণ হবে। বরং যেমন চলছে, চলুক না।

পরাঞ্জপে ঘন ঘন মাথা নাড়লেন—কি চলছে, তার হিসেব নিতে হবে না ?

পুলকেশ নিজের দৃষ্টির স্বচ্ছতা প্রকাশ না করে পারে না—বিদেশীরা ত সে হিসেব রাখছে। দেখছেন না, যাদের আমরা বড় বড় দেশ বলে জানি, তাদের ইম্‌পিরিয়েল্‌ হিস্ট্রিটা যদি একটু নেড়েচেড়ে দেখেন, তবে দেখবেন, আমরা স্বাধীন হই, দেশ আমাদের স্বাধীন হোক, আমরা শক্তিশালী হই, এগিয়ে যাই—এটা কেউই চায় না।

—কিন্তু পুলকেশ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে আদান-প্রদানটা অনেক সহজ। সেখানে ত ট্রান্সফার অব টেক্‌নলজির মত আর্থিক স্বার্থ জড়িয়ে নেই। আমি যেখানে এঁদের একত্র করতে চাই, সেখানে আছে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ। শিল্পকলা, সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আদান-প্রদানটা আরও ব্যাপক হলে হৃদয় একদিন প্রসারিত হবেই হবে। তখন এঁরা সর্বশেষ টেক্‌নলজি দিতে আর আপত্তি করবেন না। তুমি কী তোমার প্রাণের বন্ধুকে কিছু দিতে আপত্তি কর ? তবে ? এটা কি মান ?

—ভালবাসা দিয়ে যারা পৃথিবীকে দেখতে চায়, অথবা শাড়ির নীচে সাহিত্যকে, তাদের দৃষ্টিটা এর বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু পরাঞ্জপেকে কী সে কথা সোজা বলা যায় ? অনেক কিছু বলবে ভেবেও পুলকেশ বলল না। শুধু একটু হাসল। পরাঞ্জপের মুড দেখে আস্তে করে ঘুরিয়ে নিজের বক্তব্যটা পেশ করল—আপনি কী অস্বীকার করতে পারেন, জগতের যা কিছু দেখছেন, দেশে দেশে আদান-প্রদান, দেশে দেশে শোষণ, দেশে দেশে জাগরণ, এমন কি ঐ যে আপনাদের প্রেম বা ভালবাসা, সবই দাঁড়িয়ে আছে ঐ একটিমাত্র ভিতের ওপর—আর্থিক সম্পর্ক। ইতিহাসও তাই, আর্থ-নীতিও। আইন-আদালত, ধর্ম-কর্ম, সবের মূলে আর্থিক সম্পর্ক। আপনার প্রশ্নটা আমি ত এভাবে দেখি। আজকে ভারত আর্থিক উন্নয়নে এতটা এগিয়েছে বলে তারই নিদর্শন-স্বরূপ আপনি বিদেশীদের নিয়ে—বলেই থেমে গেল পুলকেশ।

—বল, বল, থেমে গেলে কেন ? নিশ্চয় বলতে চেয়েছিলে, যা তা করছি, এই ত ?

পুলকেশ মাথা নাড়ল—ব্যাপারটা ঠিক ওভাবে নেবেন না। আমি মানে ঠিক তা বলতে চাইনি। তবে আপনার মত হৃদয় ও ভালবাসা দিয়ে আমি পৃথিবীটাকে দেখতে অভ্যস্ত নই। যে কোন দেশের প্রতিনিধি তার ইতিহাস, তার ভূগোল, তার রাজনীতির চাল, আর্থনীতির স্বার্থ ও অন্য অনেক সূক্ষ্ম বাধা-নিষেধ কাটিয়ে উঠে যদি কিছু করতে বা দিতে রাজী হয়, আমি মনে করি, সেটাই অনেক। বাধা-নিষেধ আছে, ওগুলো ফানুসের মত উধাও হয়ে যায়নি। এক্সপার্টদের কাজকর্ম আপনি যদি একটু তলিয়ে দেখেন, দেখবেন, ভেতরে ভেতরে পরস্পরের মধ্যে কী

ভীষণ রেষারিষি। একে অন্যকে কাট্‌ছে। বাইরে থেকে তা ঘূণাক্ষরেও বোঝার উপায় নেই। তবে, হ্যাঁ এসব সত্ত্বেও যদি আমরা কিছু পাই, সে ত আমাদেরই লাভ। আমাকে মাপ করবেন, আমার কাছে আর্থ-নীতির সংঘাতটা কম ইম্‌পরট্যান্ট্‌ ব্যাপার নয়।

—তার মানে, তুমি বলতে চাও, এই বিদেশীদের এনে আমি ভুল করেছি, তাই না? পরাঞ্জপের কন্ঠে হতাশা-মিশ্রিত স্বল্প ক্রোধ।

পুলকেশ বুদ্ধিমান। হাওয়া বুঝে নিজের বক্তব্যকে ঘুরিয়ে নিয়ে শ্রুতিমধুর করে দিতে পারে। গম্ভীর পরিবেশটাকে হালকা ছোঁয়াচ দেবার জন্যে বলল—না, তা আমি বলি না। কাজ করার পরে থাকে অভিজ্ঞতা, যার অসীম মূল্য। এঁদের সঙ্গে কাজ করে আপনার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা দেশের কাজে লাগবে, দেশ এগিয়ে যাবার সুযোগ পাবে।

পরাঞ্জপে খুশী হলেন। হেসে বললেন—দেখ, এঁদের নিয়ে কাজ করতে আমার খুব একটা অসুবিধা হয় না, এটা অবশ্য ওঁদেরই গুণ। তবে ওঁদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, সেদিকে আমিও খেয়াল রাখি। ওঁরা এ পর্যন্ত কতটুকু দিয়েছেন আর কতটুকু নিয়েছেন, সে হিসেবের মধ্যে আমি এখনও যাইনি। আমি জানি, গণেশ টাওয়ার ত ট্রান্সফার অব টেক্‌নলজির মত অত ইন্‌ট্রিকেট্‌ ব্যাপার নয়। আমার বিশ্বাস, ওঁরা যখন আছেন, আমরা বিরাট একটা কিছু করে ফেলব। তোমার কী মনে হয়, পুলকেশ?

পুলকেশ বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়ে। বলে—আপনার অসম্ভব দূরদৃষ্টি। তাই আপনার সঙ্গে আমার [illegible] হতে পারে না। আমি তাই পুলকেশই রয়ে গেলাম আর আপনি কোথায় উঠে গেছেন। এর বিচার করাও ধৃষ্টতা। আপনি যে কী তা ভবিষ্যৎ বিচারসভায় রসিক জনেরাই বিচার করবেন।

—এ তুমি বড় বাড়িয়ে বলছ পুলকেশ। আত্মগৌরবে বিগলিত হয়ে পরাঞ্জপে একটু বিনয় করে বললেন—আমি অতি সামান্য মানুষ। তবে হ্যাঁ, পার্টি-ইন্‌-পাওয়ার, আর তোমরা যাকে বুরোক্র্যাসি বল, এরা সবাই আমায় ভালবাসে। সবায়ের স্বার্থে যা করতে চাই তাতে কেউ আমায় বাধা দেয় না। তাই বলে আমাকে পার্টি-ইন্‌-পাওয়ার বলা—।

—না, না, ওকথা আমি বলিনি। বলতে চেয়েছি আপনার কাজ করাবার অসাধারণ ক্ষমতার কথা। সবাই কী পারে? আপনার সব কিছুই ত এলাহী ব্যাপার। এসব সুষ্ঠুভাবে সামলাতে কম শক্তি লাগে?

—তা যা বলেছ। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এক্সপার্টদের নিয়ে আমাদের দল বেশ ভারি হয়েছে। সবাই এঁরা বড় বড় দেশের প্রতিনিধি-স্বরূপ। আমার ত অনেক সময় মনে হয়, এঁদের পেছনে, এইসব দেশের সরকার

নিজের নিজের কালচারের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। অর্থ, সামর্থ্য, ক্ষমতা, দেখবার দৃষ্টি, সবই আছে কি নেই ওঁদের? সেই দিক থেকে এঁরা এক একজন এক একটি দেশের প্রকৃত রাষ্ট্রদূত, ক্ষমতাসীন ব্যক্তি। আসলে যদিও এঁরা বিশ্ববিখ্যাত সব শিল্পী, স্কাল্প্‌চার, আর্কিটেক্‌চারাল্‌ ইঞ্জিনীয়ার। আমার বিশ্বাস, এঁদের প্রত্যেকের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পাওয়াটাই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, বলতে পার অনেকটা নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মত। আরও বড় কথা, এঁরা সবাই আমাকে অতি আপন করে নিয়েছেন। আমাকে ভালবাসেন বলেই যখন যা বলি, বিনা বাক্যে করেন। এই যে এলাহী ব্যাপার, এটার প্রয়োজন। পেনি ওয়াইজ পাউণ্ড ফ্যুলিশ্‌ হলে আখেরে শিল্পের ব্যাপার মার খায়। আরমা যে সত্যিই গোষ্ঠী নিরপেক্ষ দেশ, এটা এঁরাই ভালভাবে বুঝতে পারছেন। সেটা যত অ্যাপ্রিসিয়েট্‌ করতে পারছেন, তত দেখ, বিনা দ্বিধায় কাজে নেমে পড়ছেন।

—যেমন? পুলকেশের এই বড় দোষ। ঘন ঘন চ্যালেঞ্জ করা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

—যেমন! বল, কি বলতে চাও, বলে ফেল। আমি বুঝিয়ে দেব।

পুলকেশও চন্দ্রভানুর মত সেই একই ভুল করে বসল। আলোচনা শেষ করে পুলকেশের এতক্ষণে চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে জিজ্ঞেস করে বসল—গণেশ টাওয়ার মানে কী, আপনি কী করতে চান, এটা যদি জানতে চাই, আপনি কী রেগে যাবেন?

—রাগব কেন? তুমি একজন এত নামী আর্কিটেক্ট, তোমার ব্লুপ্রিন্ট দেখে খুশী হয়েই তোমাকে আমি অপ্‌ট করেছি। দেরীতে এলেও তুমি অনেক বেশী কর্ম-ক্ষমতা দেখিয়েছ। তোমার অনেক ব্লুপ্রিন্ট এখনও আমার ড্রয়ারে পড়ে আছে। তোমার ব্লুপ্রিন্ট অনুসারে কয়েকটা কাজও হচ্ছে। এতসব জেনে, এতসব করে এখন যদি এই প্রশ্ন তোল, তাহলে বুঝব, তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আমি একটা ক্যান্‌ফিউশন্‌ ক্রিয়েট করেছি। অ্যাই অ্যাম্‌ অ্যাওফুলী সরী ফর ইট্‌। এখন থেকে ভাবতে হবে গণেশ টাওয়ার মানে আমি কী গড়তে চাই। মুশকিল হয়েছে জান কি, তোমরা বিভিন্ন সময়ে আমাকে যত সব বুদ্ধি দিয়েছ, সবই আমি সিরিয়্যাসলি নিয়েছি, কাজেও লাগিয়েছি। কিন্তু কোন্‌টা কার কাছ থেকে নিয়েছি, এতদিন পরে তা হলপ করে বলা মুশকিল। এটা তোমরা ত সবাই দেখছ, ফাউণ্ডেশনের বিল্‌ডিং প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তার প্রত্যেকটি পাথরে গণেশ আর ইঁদুর খোদাই করা। কম কথা? বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াও,—দেখবে নানা আকারের নানা পোজে গণেশ দাঁড়িয়ে হাসছেন। তাঁর পায়ের কাছে, হ্যাঁ, প্রতিটি গণেশের পায়ের কাছে একটা করে ইঁদুর, ভিন্ন ভিন্ন পোজের। ইঁদুরও কতভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে

পারে, তার যেন সচিত্র প্রদর্শন; ঘরে-বাইরে-দেয়ালের এই রিলিফ্‌গুলো, সত্যিই দেখবার মত। ওটা এই ফাউণ্ডেশনের ঘরটা—আসলে ইঁদুর-ঘর। জানি, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করবে, ইঁদুর মানে কি? ইঁদুর মানে গণেশের বাহন। বাহন ছাড়া মর্ডান যুগে কেউ কি কোথাও যেতে পারে? এই বাহনের জোরেই এক রাত্রিতে আজকাল আমেরিকা পৌঁছে যাওয়া যায়। যাকে বলে দি আদার ওয়ার্লডে। এখন প্রশ্ন উঠবে, ইঁদুর না হয় বাহন হল, কিন্তু গণেশের বাহন ত, এই সিম্‌বলের অর্থ কী? একটু থামলেন পরাঞ্জপে। তাঁর কথাগুলো পুলকেশের মধ্যে কতটা ভাবান্তর ঘটাচ্ছে তা খতিয়ে দেখে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন—অর্থ হল এই—কথাটা যে কে বলেছিল তা ঠিক মনে করতে পারছি না। সম্ভবত চন্দ্রভানু ভর্মাই। কারণ, উদ্ভট, বিদঘুটে যতসব অধ্যাত্মবাদের ভাব ওঁর মাথায় আসে। রাম দেওধর বলেনি ত। অ্যাসকারীও হতে পারে। সে যাক, যে-ই বলুক—ইঁদুর মানে নাকি প্রাচুর্য। প্রাচুর্য মানেই ইঁদুর। তাই যেখানেই প্রাচুর্য, সেখানেই ইঁদুর। অফুরন্ত খাদ্য যেখানে লক্ষ্য করে দেখবে, তারা সেখানেই ঘোরাঘুরি করে। মাউজ ইজ্‌ এ সিম্‌বল অব প্লেন্‌টি। আর গণেশ, তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, গণেশ হল—মেধা, অসাধারণ বুদ্ধি, জ্ঞান, ধীশক্তি ও আত্মশক্তির দেবতা। একদিকে এই অফুরন্ত খাদ্য, এই অফুরন্ত প্রাচুর্য আর অন্যদিকে এই অসাধারণ মেধা, এই পূর্ণ জ্ঞান—আমরা গণেশ টাওয়ারের মাধ্যমে সিম্‌বলাইজ্‌ করতে চাই। কী, পুলকেশ, এবার বুঝতে পারলে গণেশ টাওয়ার মানে কী। কথাটা মনে ধরল?

পুলকেশ বলল—ঠিক যে বুঝতে পেরেছি, তা বলব না। তবু ধরে নিচ্ছি, এর মধ্যে নিশ্চয়ই ভাববার কথা আছে। কেননা, আপনি করছেন। আর এনিয়ে আমিও ভাবব। আমার ধারণা, আর্য সভ্যতাকে যদি সভ্যতার প্রাচুর্য বলি, তবে সেই সভ্যতার রসদ ও প্রাণ জুগিয়েছে অনার্য সভ্যতার বিচিত্রতা। লক্ষ্য করুন, এখানেও সেই আর্থিক প্রশ্ন জড়িত, গণেশ তারই প্রতীক বলে আমি জানি। সে যাক, একই সিম্‌বলের যে সবসময় একই অর্থ হবে, এমন কোন কথা নেই। বিশেষ করে এর একটা বিশেষ অর্থ আপনি যখন দিতে চাইছেন। আমি মনে করি এরও নিশ্চয় একটা তাৎপর্য আছে, ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে। নয়ত আপনি এতটা উদ্বুদ্ধ হবেন কেন? শুধু একটা সিম্‌বল খাড়া করতে এত খরচ করবেন কেন? এ প্রচেষ্টায় আমি আপনার সঙ্গী।

—পরাঞ্জপে পুলকিত হলেন, সঙ্গী হবার এই সুখ, একঘেয়ে ভাবনার থেকে অন্তত রেহাই পাওয়া যায়, কি বল? এটুকুই বলা, এই যে এত ডিস্‌স্ট্যাবিলাইজেশনের ধোঁয়া, এর থেকে বাঁচতে হলে আত্মশক্তি চাই।

আত্মশক্তির দুটো কম্পোনেন্ট—একটা প্রাচুর্য, অন্যটি মেধা ও জ্ঞান। গণেশ ও ইঁদুর তারই সিম্বল। এ সিম্বলটাকে যদি একবার দেশবাসী আত্মসাৎ করে নিতে পারে, আর কোন ভয় নেই। দেখবে, দেশকে টলাতে, অপদস্থ করতে আর কেউ পারছে না। তুমি ইতিহাসের অর্থ বোঝ তাই এত কথা বল্লা।

পুলকেশ বলল—ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবা দরকার, একটু ভাববার সময় দিন। এর মধ্যে অনেক কিছু আইডিয়া ঢোকাচ্ছেন। কতটা ধোপে টিঁকবে, সেটা ভাববার কথা। আপনি অনুমতি দেন ত আজ আমি উঠি।

—হ্যাঁ, ভেবে দেখো—। সূক্ষ্ম বুদ্ধির জন্যে বাঙালীর একদিন নাম ছিল। উদ্ভাবনী শক্তি তোমাদের আছে, মনে রেখো আমি তাকে সম্মান করি। আবার এসো।

পুলকেশ যেতে না যেতেই রাম দেওধর সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—কাজ করছিলাম, এমন সময় শুনি আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন। বলুন, কি হুকুম?

—হুকুম কিছু নয়, বোস।

রাম দেওধর বসলেন। বেশ চিন্তান্বিত মুখ নিয়ে, যেন অনেক সমস্যায় পড়েছেন, এমনভাবে কথাটা পাড়লেন—আচ্ছা দেওধর, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। ধর, এই যে গণেশ টাওয়ার খাড়া করছি, এর কি কোন সার্থকতা আছে? লোকেরা কি এটাকে একসেপ্ট করবে?

এরকম একটা প্রশ্নের জন্যে রাম দেওধর প্রস্তুত ছিলেন না। থত মত খেয়ে গেলেন। দেয়ালে দেয়ালে যে সব রিলিফ, যেখানে গণেশ আর ইঁদুরের কত বিচিত্র সব ভাব-ভঙ্গী খোদাই করা হয়েছে, সেটা রাম দেওধরেরই করা। এই রিলিফগুলো এত যে প্রাণবন্ত হয়েছে তা ঐ সাহেবদের জন্যেই। চন্দ্রভানুর অত আপত্তি সত্ত্বেও রাম দেওধর এগুলোর মধ্যে একটা ট্রাইব্যাল ফর্ম দিয়েছেন। চন্দ্রভানু চেয়েছিলেন এগুলোর মধ্যে বুদ্ধের প্রশান্তিভাব ফুটে উঠুক। কিন্তু ট্রাইব্যাল চেতনার সঙ্গে আধুনিক বিশ্বাস ও কৃষ্টির মিলন ঘটিয়ে রাম দেওধর এই রেজাল্ট্ পেয়েছেন। সাহেবরা সাহস না জোগালে তা তিনি কিছুতেই করতে পারতেন না। সে যত চেষ্টাই করুন না কেন। চন্দ্রভানুর প্যার্সনালিটিকে উপেক্ষা করার সাধ্য রাম দেওধরের নেই। এখন সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সাহেবরাও, পরাঞ্জপে নিজেও। এসব বিষয়ে প্রশ্ন করলে, এমন কি যে-যে রেফারেন্স্ বই তিনি ঘেঁটেছেন, সাহেবরা বসে থেকে যেসব আইডিয়া তাঁকে দিয়েছেন, সবেরই উত্তর রাম দেওধর অনায়াসেই দিতে পারতেন। রাম দেওধর প্রস্তুতও হয়ে এসেছেন এর জন্যে। কিন্তু গণেশ টাওয়ার কেন খাড়া

করা হচ্ছে, তাতে লোকেদের কিংবা দেশের বা দশের কোন উপকার হবে কি না, এসব প্রশ্নের জন্যে রাম দেওধর প্রস্তুত ছিলেন না। আর এসব প্রশ্ন এখন কেন? এত সাংঘাতিক প্রশ্ন! এ প্রশ্নের যদি কখনও উত্তর থেকে থাকে ত তা দেবেন পরাঞ্জপে নিজেই। যিনি এত বড় এলাহী কাণ্ড-কারখানা চালাচ্ছেন। এই ব্যাপারে তবে কেন রাম দেওধরকে নিয়ে টানাটানি? তবে কি এটা চন্দ্রভানুর কোন কারসাজী? চন্দ্রভানু কি রাম দেওধরের ওপরে ভীষণ চটেছেন? চন্দ্রভানু কি তবে সাহেবদের বোঝাতে পেরেছেন যে রাম দেওধর যা করেছেন—তা লোকেরা নেবে না। এখন ধর্মবিশ্বাস প্রবল, ওসব এক্সপেরিমেন্টকে লোকেরা আখেরে চ্যালেঞ্জ করবেই? মিঃ অ্যাসকারী এত উৎসাহ দিয়ে এখন বেকায়দায় পড়ে কি অন্য কোন স্ট্যাণ্ড নিয়েছেন? স্যর জোন্স্ই কী এ সমস্যার সূত্রপাত করলেন? কিসিঞ্জার কিছু বলেছেন কি? গোটা ব্যাপারটা রাম দেওধরের কাছে দুর্বোধ্য, রহস্যময় ঠেকল। যত বেশী ভাবতে থাকেন, ততই পরাঞ্জপের এই প্রশ্নটা দুরূহ হয়ে উঠতে থাকে। তিনি কি জবাব দেবেন ভেবে পান না। কি জবাব দিলে পরাঞ্জপে খুশী হবেন? প্রশ্নটা নিয়েই দেওধর ভাবছিলেন। ওঁকে এতক্ষণ নীরব থাকতে দেখে পরাঞ্জপের কি রিঅ্যাক্শন্ হবে, সেটা অবশ্য রাম দেওধর ভেবে দেখেননি।

পরাঞ্জপে রাম দেওধরকে একেবারে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন—তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আমার প্রশ্নটার কথাই তুমি ভাবছ। আমি জানতে চাই, এই যে এত এলাহী কাণ্ড হচ্ছে, তাতে কারুর কি কোন লাভ হবে?

দেওধর অনেক ভেবে-চিন্তে আস্তে আস্তে বললেন—লাভ হবে কি হবে না, সেটা বলা একটু মুশকিল। গণেশ বা ইঁদুরের আর একটা মডেল যদি চান, ত তৈরী করে দিতে পারি। এসব প্রশ্নের জবাব ঠিক আমি জানি না। এটুকু বলতে পারি, আপনি যখন এই মহাযজ্ঞে নেমেছেন, তখন নিশ্চয় এর একটা গভীর অর্থ আছে।

তাহলে তুমি বলছ, যেমনভাবে চলছে, তেমনি চলুক। কোন একদিন নিশ্চয়ই বড় একটা কিছুতেই গিয়ে দাঁড়াবে, কি বল? বিদেশীদের একটা মস্ত বড় গুণ, ওরা কিছু না দিয়ে কিছু নেয় না, তোমারও কী সেই ধারণা?

এ ব্যাপারে সরাসরি কোন মন্তব্য করবেন কিনা, দেওধর একবার ভেবে নিলেন। তারপর বললেন—আমাদের শিল্পীদের অনেক গুণ, আমি জানি ও মানি। কিন্তু যে পারস্পেক্টিভে ওঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন, ব্যাপারটাকে যে গভীর অর্থ দেবার চেষ্টা করছেন, তাতে মনে হয় সমালোচকের দৃষ্টি ও প্রকৃত ক্রিয়েটিভ্ ট্যালেন্ট্ ওঁদেরই আছে। নয়ত ওঁদের আইডিয়া এত সহজ-সুন্দর হয় কি করে? আর তার রূপায়ণে

আমরাও কি অসাধারণ রেজাল্ট্ পাচ্ছি। ফাউণ্ডেশনের বিল্ডিং-এর সামনে দাঁড়ালে, দেখি গণেশ ও তাঁর বাহন ইঁদুর, অতীত এক সভ্যতার জগতে চলে যাই আমরা। ভেতরেও সেই গণেশ, সেই ইঁদুর। ভেতরে গেলে অন্য ভাব। একই জিনিস দেখে মনে হয় অতীতকে ধরে রেখে যেন বর্তমান যুগ চলে এসেছি। এই যে ইমেজের ট্রান্সফরমেশন্, যাকে আধুনিক ভাষায় বলে মেট্যাম্যরফ্যাসিস্—এই ডাইমেন্শন্ দেবার ক্ষমতা ওঁরাই রাখেন। আমাদেরই ব্লুপ্রিন্ট আর রিলিফের একটু-আধটু রঙ বদল করে, সামান্য একটু টাচ্ দিয়ে যে রূপান্তর এঁরা ঘটাচ্ছেন, তা আমরা স্বীকার করি আর না করি, একটা শিল্পের নিদর্শন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পরাঞ্জপে উঠে এসে দেওধরের পিঠ চাপড়ে দিলেন। খুশী হয়ে বললেন—তাই ত আমি বলি, এত জনে এত কথা বলল, তোমার মত কেউ বলতে পারল না। এর জন্যে আমি তোমাকে পুরস্কার দেব। বিদেশী এক্স-পার্টরা এক্ষুণি আসবেন গণেশ টাওয়ারের ভিত নিয়ে আলোচনা করতে। সেখানে উপস্থিত থাকতে হবে তোমাকে, আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

বিদেশী এক্সপার্টরা একে একে আসতে শুরু করলেন। বললেন—গুড্ মরনিং মিঃ পরাঞ্জপে, গুড্ মরনিং মিঃ দেওধর। পরাঞ্জপে খুশীর মেজাজে বললেন—বসুন, অনেক কথা আছে।

॥ একুশ ॥

পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীও কি ভাবে? প্রতি মুহূর্তে যার রূপ-রস-বর্ণ-সৌন্দর্য পাল্টাচ্ছে। কখনও সে ভীষণা, কখনও শান্ত-অধীরা, কখনও বা প্রেম-ভালবাসায় উন্মুখ। কখনও বা শিশুর মত কোমল হৃদয়ের ভরাট কান্না নিয়ে উচ্ছ্বসিত, সেই পৃথিবীও কি অলকার মত ভাবনায় অধীর?

আজ কলেজ বন্ধ। যে-বইটা লিখছে, সকালে তার ফাইলপত্র নিয়ে বসেছিল। ভাবল, যেটুকু লিখেছে তা না-দেখে এগিয়ে যাবে, আর একটা

পরিচ্ছেদ লিখে ফেলবে। এক পাতা লিখে আর এগোতে পারে না। যা লিখেছে তা পড়তে থাকল। সবটা পড়ে ফেলল এক নজরে। যা বলতে চেয়েছে তা ঠিকমত লিখে উঠতে পারেনি। লেখাটার মধ্যে ব্যক্তিগত ধারণা, ব্যক্তিগত বিশ্বাস বড় বেশী ভীড় করেছে। ভাষায় নিরপেক্ষ দৃষ্টির চেয়ে উচ্ছ্বাসের রঙ বেশী। চলবে না। আবার অনেকটাই নতুন করে লিখতে হবে। কবে তা হয়ে উঠবে, অলকা জানে না।

জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। আকাশ-ছোঁওয়া শিমুল গাছটার মাথায় দুটো মৌচাক; আশেপাশে অগুনতি মৌমাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। অজস্র পাখির ডাক, কাকের কা-কা-ই কানে বেশী আসে। গুম্ মেরে আছে আকাশটা, 'লু' বইছে। বৃষ্টি নামবে কিনা কে জানে, হয়ত ধুলোরই ঝড় উঠবে। ওর জীবনেও কত ধুলোর ঝড় উঠবে কে জানে। নিজের বিদঘুটে চিন্তারাজ্য নিয়ে আজকাল নিজের মধ্যেই নিজেরই অলক্ষ্যে নির্বাসিত হয়ে পড়ছে। জোর করে আবার লেখাপত্র নিয়ে বসল।

অলকা দেশের প্ল্যানিং-এর ইতিহাসের একটা পূর্ণাবয়ব চিত্র দিয়েছে। তারপরেই দুটো চার্ট, স্বাধীনতার আগে দেশে কি তৈরী হত, পরে কি হচ্ছে। যেখানে দেশে কিছুই তৈরী হত না, এবং লেদ মেসিন তৈরী করার কথা স্বপ্ন মনে হত, এখন সেখানে এটমিক পাওয়ার তৈরী হচ্ছে, অন্তরীক্ষে উপগ্রহ পাঠান হচ্ছে। আমেরিকার স্টেট্ ডিপার্টমেন্টের একটি রিপোর্টে তারাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, ভারত শিল্প উৎপাদনে এখন কুড়িটি দেশের অন্যতম। ভারত এখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী চতুর্থ সামরিক শক্তি। প্রযুক্তিবিদ্যা ও বৈজ্ঞানিকদের শক্তি-ভাণ্ডারের দিক থেকে এবং আধুনিকতম পারমাণবিক ও অন্তরীক্ষ কার্যসূচীর দিক থেকে ভারতের স্থান তৃতীয়। ২৪ বছর আগে মহলানবীশ দেশের উন্নয়নের যে মডেলটা দিয়েছিলেন তা ঐতিহাসিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য বলেই তার উল্লেখ করেছে অলকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মহলানবীশের নিজের হাতে তৈরী। দেশটার উন্নতি যে ধাঁচে তিনি করতে চেয়েছিলেন, তা পড়লে মনে হয় কত গভীর তাঁর দৃষ্টি। সমসাময়িক কালের অনেক অর্থনীতিবিদ্ তাঁর মডেলের সমালোচনা করলেও সেটাকে গ্রহণ করেই আমরা সুফল পেয়েছি। তিনি বলেছিলেন—"দেশের শিল্পোৎপাদন ও জাতীয় আয় কি হারে বাড়ছে তা কয়লা, বিদ্যুৎ, লৌহ ও ইস্পাত, বড় বড় যন্ত্রপাতি, বৃহৎ রাসায়নিক শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের উৎপাদনের ওপরে নির্ভর করে। এগুলোর ওপরেই পুঁজি সংগ্রহের হার নির্ভর করবে। বড় শিল্প-দ্রব্য ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা থেকে ভারতকে যত শীঘ্র সম্ভব মুক্ত করতে হবে। কারণ, ভবিষ্যতে যদি কোন সময়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র-তৈরীর জিনিসপত্র বাইরে থেকে আমদানী করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে, তাহলে

সেই সংকটেও পুঁজি সংগ্রহে বাধা পড়বে না। সুতরাং বড় বড় শিল্পের যে কোন উপায়ে দেশে দ্রুত সম্প্রসারণ করে যেতে হবে। এই সব দ্রব্য তৈরীর শিল্প থাকবে সরকারের হাতে। সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির উৎপাদন বাড়াবার ব্যাপারে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানও বড় ভূমিকা নিতে পারবে। সঙ্গে "সঙ্গে হস্তনির্মিত শিল্পদ্রব্য বাড়িয়ে যেতে হবে। এতে চাকরীর যেমন সুবিধে হবে, তেমনি হাতে টাকা-পয়সা এলে [এবং চাহিদা বাড়লেও] ভোগ্যপণ্য দ্রব্যের অভাবে কোনরকম অসুবিধা হবে না "।

অলকা লিখেছে, বাস্তবে এই মডেলকে রূপায়িত করা খুবই শক্ত ছিল। কেননা, বাধা দেবার লোক সেদিন কম ছিল না। নেহেরুর ইতিহাস-চেতনা ছিল বলেই ফ্যাবিয়ান সোশ্যালিস্ট হয়েও অন্যান্য নেতা ও শিল্প-পতিদের মত সমাজবাদের নামে আঁতকে উঠতেন না। প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের চাপে পড়ে সরকারের যখন হাত-পা বন্ধ হবার উপক্রম, সেই সময় পাবলিক সেক্টর গড়ে তোলা সত্যিই অসম্ভব ছিল। এর ওপর অলকার যা মন্তব্য—তা অলকা লিখেছে ঃ মহলানবীশ যে মডেলটা খাড়া করেছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেক অর্থনীতিবিদ্ অনেক মতামত দিয়েছেন ; মডেলকে কাজে পরিণত করতে যেসব নিত্য নতুন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার সমাধানও জুগিয়েছেন এঁরাই। প্রগাঢ় জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি নিয়ে যাঁরা এই পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন, তাঁদের এই অবদানকে ঐতিহাসিক না বলে পারা যায় না ; প্ল্যানিং কমিশন মোটামুটি তাঁদের পরিকল্পিত পথ ধরে এতদিন এগিয়ে গেছেন। তাই তাঁরা এখন দরজা-জানলা খুলে দেবার কথা ভাবতে পারছেন। এতে দেশে পুরোপুরি সমাজ-বাদ নিশ্চয় আসেনি, কিন্তু সমাজবাদের কথা কেউ বললে, ক্যাপিটালিস্ট দেশের মত ভয়ে কেউ আঁতকে ওঠে না। সমাজবাদ থেকে ভারত এখনও অনেক দূরে। কিন্তু দেশে শিল্প প্রসারের একটা মজবুত বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে এতদিনে। এখানে পাবলিক সেক্টর কত বড় ভূমিকা নিয়েছিল, তা অলকা বিস্তৃতভাবে দেখিয়েছে। স্বার্থের লড়াইয়ের অগ্রভাগে প্রাইভেট সেক্টর বরাবরই ছিল ; কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেশের উন্নয়নের নানা পর্যায়ে তারা ঘোঁট পাকিয়েছে। সুযোগ পেলেই পাবলিক সেক্টরের ভূমিকাকে তাচ্ছিল্য করেছে। এদের কাজ কিভাবে ভণ্ডুল করা যায়, তারজন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। অলকা সে ইতিহাসও সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছে। পড়তে পড়তে দেখল অনেক জায়গায় নিজের কমেন্ট্ লেখা আছে। ভাবে, লেখা শেষ করার আগে ওগুলোকে কেটে উড়িয়ে দিতে হবে। একবার মনে হল পুরো প্যারাটাই বাদ দিয়ে দিলে কেমন হয়।

আর লিখতে ইচ্ছে করছে না। অলকা ফাইলপত্র গুছিয়ে রেখে দিল। সুরিন্দর কুমার যখন-তখন টেলিফোন করে বিরক্ত করে ; রেস্তোরাঁয় ও

সিনেমায় ডাকে। রেস্তোরাঁয় তবুবা যায়, সিনেমায় কদাচ নয়। বড় পীড়াপীড়ি করতে থাকে। মন খারাপ হয়ে যায়। সন্দীপের কথা বেশী করে মনে পড়ে। ও ত এখন নিজেকে গড়ে তুলতে ব্যস্ত। হাতে ওর একদম সময় নেই।

সন্দীপের কথা ভেবে কেন যেন আজ অলকার মনে হল ওকে ভালবাসা যায়, ওর সঙ্গে কথার জাল বোনা যায়। কিন্তু সন্দীপের যে বাড়ি, গঙ্গাধর মেসোর মত মানুষ যাঁর বাবা, মৈত্রেয়ীর মত উদার যার মা, হোক না ওদের সঙ্গে বহুদিনের সম্পর্ক, তবু কোথায় যেন এক অদৃশ্য বাধা। যে পাহাড়টা খুবই কাছে মনে হয়েছিল; হাঁটতে গিয়ে দেখে সে বড় দুর্গম; হাঁটার শেষ নেই, হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু পাহাড়টা যত দূরে তত দূরেই রয়ে যায়। সন্দীপের শান্ত অনুগত বউ হলেই বোধ হয় ভাল হয়, যে কথায় কথায় প্রতিবাদ করবে না, অন্যভাবে ভাবতে পারবে না। হাসি মুখে যে বউ শ্বশুর-শাশুড়িকে সেবা-যত্ন করবে, স্বামীর জীবন যে সেবায় আর যত্নে ভরে দেবে। ভাল-মন্দ রেঁধে, খাইয়ে যে বউ-এর পরম তৃপ্তি। স্বামীর কাছ থেকে যে বউ কিছু চাইবে না, শুধু স্বামীকে ভালবাসতে পারলে যে বর্তে যাবে, আনন্দে বিগলিত হয়ে উঠবে। সন্দীপের এই রকম একটি বউ হলেই ওঁরা বোধ হয় খুশী হবেন বেশী। তাছাড়া, দুই বাড়ির সঙ্গে কাল্‌চারের বিস্তর প্রভেদ, সেটা না মেনে উপায় নেই। অলকা নিজের কথাও ভাবে। ভাবে, বাবাকে বলবে—সে সন্দীপকে ভালবাসে, বিয়ে করলে সন্দীপকে ছাড়া আর কারুর কথাই সে ভাবতে পারে না। বাবা হয়ত একটু অবাক হবেন। বড় বড় চোখ করে একবার আমার দিকে তাকাবেন, তারপর গুম মেরে যাবেন। গঙ্গাধর মেসোর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক পাতাতে বাবার একটু বাধবাধ ঠেকাই স্বাভাবিক। সেটা অলকা জানে। মা অতটা সংকোচ নাও করতে পারেন। হয়ত বলবেন, যেভাবে আমি মানুষ হয়েছি, তাতে যত পরিচিত হোক না কেন, বাঙালী বাড়ির সুমিষ্ট সপ্রতিভ ভাল বউ সাজা আমার পক্ষে অতটা সোজা হবে না। আর কেউ না জানুক, মা এটা ভাল করেই জানেন।

নিজের মনে অলকা অনেক কথাই আজ ভাবতে চায়। ভাবে, এই যদি হয়, তবে আর সন্দীপের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করা ঠিক হবে না, সন্দীপ চাইলেও নয়। চিরকাল সন্দীপ ওর বন্ধুই থাকবে, তার বেশী নয়। কথাটা ভাবতেই অলকার বুকটা মুচড়ে ওঠে, ব্যথায় ভরে ওঠে সমস্ত সত্তা, সমস্ত অনুভূতি! ঠিক এই সময়ই টেলিফোন বেজে উঠল। হঠাৎ অলকা ভেবে নিল, যদি সন্দীপ হয়, তবে বুঝবে, যা ও ভাবছে, সব মিথ্যা, সব কল্পনা। যা সে ভাবছে, তা একান্তই ওর ভাবনা, নিজস্ব আশঙ্কা। সন্দীপ ওসব কিছুই হয়ত মানবে না, চিরকালের যোদ্ধা সে,

শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই লড়াই করে যাবে।

—হ্যালো, কে? আশঙ্কায় অধীর অলকা, প্রায় কন্ঠ রোধ হয়ে আসে। অনেক কষ্টে জিজ্ঞেস করল।

—আমি সুরিন্দর। তুমি কী আজকে বিকেলে ফ্রি আছ?

সুরিন্দরের গলা শুনে অলকা কিছুক্ষণ চুপচাপ। নিরাসক্ত স্বরে বলল—না, সুরিন্দর, একটা জরুরী কাজে বেরুতে হবে।

—ও. কে., কাল?

—কালও সময় হবে না।

—আচ্ছা, সেদিন সেমিনার থেকে ওভাবে হট্ করে চলে গেলে কেন? বেরিয়ে এসে তোমার কত খোঁজ করলাম, তুমি উধাও। কি ব্যাপার বল ত?

—সেদিন শরীরটা ভাল ছিল না।

—কি হয়েছে তোমার? সুরিন্দর জানতে চাইল।

—কিছু নয়, এমনি।

—ডাক্তার দেখিয়েছ? সুরিন্দরের গলার স্বরে উৎকন্ঠা।

—ডাক্তার দেখার মত অসুখ নয়।

—কি অসুখ বলই না, বলায় যদি অবশ্য কোন বাধা না থাকে। সুরিন্দর রুদ্ধশ্বাসে উত্তরের প্রতীক্ষা করে।

—এ অসুখ মেয়েলী, কাউকে বলা যায় না।

—তোমার মাকেও নয়?

—না, মাকেও নয়।

—আমাদের বাড়ির বহু পরিচিত একজন ডাক্তার আছেন, যদি অনুমতি দাও, এক্ষুণি তাঁকে নিয়ে যেতে পারি। তোমার একটা থরো চেক্-আ্যাপ হওয়া দরকার।

—না, সুরিন্দর প্লিজ, এখন আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

—তোমার অসুখটা তাহলে অন্য কিছু। আজকাল বড় অন্যমনস্ক থাক। সে যাক, তোমার লেখা কত দূর?

—কিছুই এগোচ্ছে না, লিখতে ভাল লাগে না। কি হবে লিখে, কে পড়বে?

—যদি চাও, যতটা লিখেছ, পড়ে আমার মতামত দিতে পারি।

—তার সময় হয়নি সুরিন্দর। আচ্ছা রেখে দিচ্ছি। গুড বাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুরিন্দর টেলিফোন রেখে দিল।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল অলকার। কেন আজকাল সন্দীপ ফোন করে না? তাই ত সুরিন্দর এত বেশী ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে। যতই সুরিন্দর অলকাকে টানতে চায় ততই সন্দীপের জন্যে অলকার মনটা অশান্ত

হয়ে ওঠে। কারণে-অকারণে অভিমান প্রবল হয়ে ওঠে। সন্দীপের কোন কথা কিংবা কোন অঙ্গীকার প্রবল হয়ে মনের মধ্যে নাড়া দিতে থাকে। তখন ভীষণ ইচ্ছে করে, সন্দীপকে কাছে পেতে, দুটি কথা বলতে। কিন্তু তা হয় না। রাগে-দুঃখে-অভিমানে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। মনে মনে সন্দীপের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়। তর্ক করতে করতে সন্দীপ এক সময় যেন হেরে গিয়ে বলে উঠল, বাবাঃ, আর যার সঙ্গেই পারি না কেন, তোমার সঙ্গে পারব না। রোজই তোমার যুক্তির অস্ত্রটাকে শান্ দিয়ে ধারাল করছ ত, বেশী এগোলে হাত কেটে যাবে। অলকা হেসে মন্তব্য করে—অনেক সময় হেরে যাওয়াও ভাল, তাতে আত্মজ্ঞান হয়। রক্ষে কর, তোমার আত্মজ্ঞান, ওটা সবার জন্যে নয়। কখনও বা সন্দীপকে তর্কে জিতিয়ে দিয়ে খুশীতে ভরে ওঠে অলকা। সন্দীপ যেন ওর খেলার সাথী। সন্দীপের সরলতা, সহজ অভিব্যক্তি অলকার মুক্তাঙ্গন। গোপন সম্পদের মত ওকে অলকা মনের কোণে লুকিয়ে রাখতে চায়।

বড় বড় ছায়া ফেলে যতই সুরিন্দর এগিয়ে আসতে থাকে, ততই সন্দীপের প্রতি অলকার আকর্ষণ বেড়ে চলে। একজনের সাহচর্যের আয়নায় অন্যজনের অলক্ষ্যে বিচার হয়ে যায়। সন্দীপের অকপট চাহনিতে সুরিন্দরের বিদ্যার দম্ভ, অসহিষ্ণুতা, কামনা, লালসার রঙ সব ছড়িয়ে পড়ে। কেন যে এরকম হয়, অলকা নিজেই অনেক সময় তা বুঝে উঠতে পারে না। সুরিন্দর যতদিন অতটা অধীর হয়ে ওঠেনি ততদিন সন্দীপের সঙ্গে সম্পর্কটা ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। মধুর সেই আসা-যাওয়া, হাসি-গল্প ; আজে-বাজে কথা। তার মধ্যে অনাগত ভবিষ্যৎ ছিল, বর্তমানও উঁকি দিত।

ভাবতে না ভাবতে সন্দীপ এসে হাজির। রোমিও-জুলিয়েট লম্ফ-ঝম্ফ শুরু করে দেয়। নির্মলা এসে খবর দিলেন সন্দীপ এসেছে।

আয়নায় নিজের মুখটা একবার দেখে নেয় অলকা। সারা মুখে বিষাদ ও ক্লান্তির ছাপ। রোগা হয়ে গেছে। এসব ঢাকতে অলকা মুখে পাউডারের একটু প্রলেপ দিল। চুলটা ঠিক করে, শাড়িটা পালটে নিল। নিজেকে আর একবার ভাল করে দেখে নিয়ে হাসতে হাসতে ড্রইংরুমে এল।

আজ সন্দীপকেও খুব ঝক্‌ঝকে দেখাচ্ছে। বহাল তবিয়তেই আছে। হয়ত সফলতার উন্মুক্ত আনন্দে অনেক দিন পরে অলকাকে মনে পড়েছে।

এই কথাই অলকা বলল, অনেকটা অনুযোগের মত শোনাল—এতদিন পরে যে ——।

—কারণটা নিশ্চয় অজানা নয়।

অলকা একটু আঘাত পেল। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—তাই বলে তুমি টেলিফোন করতেও পার না; এটা আমি বিশ্বাস করি না।

অলকার কণ্ঠে চাপা অভিমান।

—আমিও ত সেই অনুযোগ করতে পারি। তুমিও ত টেলিফোন কর না। মা তোমার কথা বলছিলেন, অনেক দিন আস না, তোমার বইয়ের কি হল, ইত্যাদি।

সাফাই গেয়ে বলল—বড় ব্যস্ত থাকি আজকাল। সত্যি, অনেক দিন যাইনি। মাসিমা ভাল আছেন ত? আর গঙ্গাধর মেসো?

—হ্যাঁ, বাবা ভাল। ভাল থাকার জিনিস তাঁর হাতের কাছেই থাকে। কিছু একটা নিয়ে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে ভালবাসেন। মার শরীরটা একটু খারাপ।

—কী হয়েছে?

—সেরকম কিছু নয়। জ্বর হয়েছিল, সেটা নিউমনিয়ায় দাঁড়িয়ে যায়।

—তারপর?

—এখন অনেক ভাল। তবে এবার আমি অসুস্থ।

—তুমি? কী হয়েছে তোমার? অলকা সন্দীপের হাসি হাসি মুখের আড়ালে কি রহস্য তা বোঝার চেষ্টা করে।

—না, তেমন কিছু নয়। এই যে সময় পেলেই তোমার খোঁজ করতে ছুটে আসি, এও ত এক ধরনের অসুস্থতা।

অলকা হেসে ফেলল। দুষ্টুমিভরা চোখে সন্দীপের দিকে তাকিয়ে বলল—আমি কেমন আছি সেটা জানার আগ্রহ তাহলে হয়। যাক, শুনেও আনন্দ।

কৌতুক করার সুযোগ পেলে সন্দীপ ছাড়ার পাত্র নয়। তাই বলল—শুধু কি আগ্রহ, দুশ্চিন্তাও বটে। দুশ্চিন্তা হলে মনের যা অবস্থা হয়। কিছু অঘটন ঘটল কি না, তা নিয়ে আবার উদ্বেগ।

স্নিগ্ধ হাসি ছড়িয়ে অলকা বলল—তোমার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, না?

—পরিবর্তন হচ্ছে বুঝি? আমি কিন্তু টের পাই না। তুমি বল বলেই অনেক সময় বিনা প্রতিবাদে তা মেনে নিতে হয়।

—অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন্ কথাটা মেনে নাও, সন্দীপ?

—এই যে, তুমি বল এক, আমি ভাবি আরেক। এ নিয়ে যে মতভেদ, তাকে মেটাতে হলে তোমার কাছে না এসে উপায় নেই।

—আজকাল ত তুমি আসই না।

—আজকাল আমাকে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়। বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর। হাড়ভাঙা খাটুনি। এ ত আর ক্লাসে লেকচার দেওয়া নয়, এ হল সেলস্‌ম্যান্‌শীপ্। তোমাকে প্রসপেক্‌টিভ কাস্টমার ভেবে, যদি তোমাকে খুশী করতে পারি, তবেই লাভ।

—কেমন লাগছে তোমার এ কাজ? অলকার কৌতূহলী প্রশ্ন।

—ওরকম বাপের ছেলে বলেই যা একটু মুশকিল।

—কেন, লোকেরা বেশী খাতির যত্ন করে?

—মোটেই নয়।

—তাহলে?

—প্রশংসা বা তারিফ মুখ দিয়ে বেরুতেই চায় না। প্রডাক্ট কি তা বোঝাতে গিয়ে আমি হামেশাই তর্ক জুড়ে দি। অনেকটা তোমার মতই রোগ, তখন কাস্টমার হয় কেটে পড়ে, নয়ত খুব বন্ধু হয়ে যায়।

—কত রকম অভিজ্ঞতা হচ্ছে তোমার, না সন্দীপ?

—না, অলকা। আগে বরং ভাল ছিলাম। ঐ জন্যেই ত বলে নৌ-বাহিনীর মত চাকরী আর হয় না। যুদ্ধ নেই অথচ কাজ ত দেখাতেই হবে। তাই কাজের নামে বিস্তর আড্ডা মারতাম। এখন ফ্যাক্টরি দেখো, তার জন্যে যখন-তখন এখানে-ওখানে ছোট। এর ওপর আবার দুটো কোম্পানীর বস্‌দের খুশী রাখা। সত্যি, বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি আজকাল।

—আমার কথা ভাবার একটুও সময় পাও না, কেমন?

—তুমি কে হে যে তোমার কথা যখন-তখন ভাবতে হবে?

—আমি কেউ নই বুঝি?

—সেকথা আমি কি বলেছি। তুমি মস্ত একজন কেউকেটা, সে ত আমি জানি। এও জানি, বহু সুবিধেবাদী যারা আমার চেয়ে শতগুণে বিদ্বান তারা তোমার কথা সারাক্ষণ ভাবে।

—আর তুমি?

—আমি ভাবি যখন সময় পাই।

—আর যখন সময় পাও না?

—তখন তোমার স্বপ্ন দেখি।

—আমার স্বপ্ন দেখে কি করবে, আমি ত তোমার কেউ নই। অলকার অভিমান চাপা থাকে না।

—যদি তা ভাব, তাই।

—আমি কী ভাবি, তা কি তুমি টের পাও?

—মেয়েদের কথা বেশী ভাবতে নেই, পুরুষের কাজের ক্ষতি হয়।

—আর মেয়েরা যখন ভাবনায় পড়ে—

—তখন হয়ত-বা পুরুষের উন্নতি।

—তোমার মুখে খুব কথা ফুটেছে।

—হ্যাঁ। আমি ত আজকাল সেলস্‌ম্যান্‌, কথা বেচে খাই।

—আমার কাছে এলে তুমি চুপ করে থাক।

—তবে এত কথা, কার সঙ্গে হচ্ছে, শুনি?

—অন্য কোন অলকা।

—তোমার মধ্যে অনেকগুলো অলকা আছে বুঝি? জানা ছিল না।

অলকা একটু মুচকি হেসে বলল—সব মানুষের মধ্যেই অনেকগুলো মানুষ থাকে। কেউ পরিচিত, কেউবা এত অপরিচিত যে দেখেও তাকে চিনতে পারি না।

—ওগুলো ভাবনা, দুর্ভাবনাও বলতে পার।

—সেগুলো তোমারই বিভিন্ন সত্তা, তোমার অপরিচিত সত্তা। বারবার তারা তোমাকে নানা প্রশ্ন করে, নানা রূপ দেখিয়ে বিব্রত করে।

সন্দীপ নিজেকে ব্যাখ্যা করে বলল—দেখো অলকা, ওসবের দুর্ভোগ থেকে আমি মুক্ত। ভাবনাটা যদিও বা আছে, দুশ্চিন্তা কদাচ নয়।

—আমার সম্পর্কে তোমার কোন দুশ্চিন্তা নেই, না?

—নেই, কারণ তুমি আমার বন্ধু। এরকম বন্ধু তোমার ত অনেক আছে।

অপ্রত্যাশিত একথা শুনে অলকা চুপ করে যায়।

সন্দীপ ভাবে, কথাটা বলা বোধ হয় উচিত হয়নি। অলকা হয়ত একটু আঘাত পেয়েছে। তাই একটু নরম সুরে বলল—কি, রাগ করলে? বন্ধু-বান্ধব তোমার এত বেশী যে, মাঝে মাঝে আমার খুব বিরক্ত লাগে। মনে হয় আমার সাহচর্যে তোমার অযথা সময় যায়। আমি তোমার কোন কাজেই লাগছি না।

—তাই বুঝি, আজকাল তুমি আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ?

সন্দীপ স্বীকারোক্তি করে। বলে—অনেকটা তাই। ভাবি, কি হবে বন্ধুত্ব পাতিয়ে, যার কোন অর্থই নেই।

—অর্থ নেই কেন?

সন্দীপ চুপ করে যায়। কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বলে—সুরিন্দর কুমার তোমার অনেক দিনের বন্ধু, না?

আশ্চর্য হয়ে যায় অলকা। বলল—তুমি সুরিন্দরের কথা কী করে জানলে?

—তুমি ভাব, তুমি যা বলতে চাও না, তা বুঝি আমি জানতে পারি না।

—না, জানতে পারবে না কেন, আলাপ হয়েছে বুঝি?

—শুধু আলাপ হয়নি, জোর করে সুরিন্দর তার সেমিনারে একদিন নিয়ে গেছে এবং তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু বলেছে, উপযাচক হয়ে।

—দেখে শুনে তুমি খুব চটে গেছ, এই ত? কী বলেছে, শুনি?

—সে তোমার বিলেতের বন্ধু, ইদানীং ভিজিটিং প্রফেসর, দশ-বারো-খানা বই লিখেছে, এখনও কি যেন একটা লিখছে। এর অনেকগুলোই নাকি তোমার ইন্‌স্পিরেশন্, ইত্যাদি ইত্যাদি।

—আর তুমি বুদ্ধিমানের মত তা বিশ্বাস করেছ, না?

—বুদ্ধিমানের মত কেন বলছ। অতটা বুদ্ধি আমার আবার নেই। তাছাড়া, কেন ওকে অবিশ্বাস করতে যাব, সে যখন তোমার এত দিনের বন্ধু। তুমি যে ইন্‌স্পিরেশন্ দেবার ক্ষমতা রাখ, সেটা ত আমিই স্বচক্ষে দেখেছি।

—তোমাকে আমি কতটা ইন্‌স্পায়ার করেছি, সন্দীপ?

—এই যে এত খাটছি, কিসের জন্যে?

—নিজের পায়ে দাঁড়াবে বলে!

—সে ত বটেই, কিন্তু।

—কিন্তু কি, বল না?

—বলার কিছু নেই। সুরিন্দর আজ আসেনি?

—রোজ আসে, তাও বুঝি বলেছে? অলকা একটু বাঁকা হাসি হাসল।

—এলে বলবে না?

—না, আজ আসেনি, টেলিফোন করেছিল।

—রোজ বুঝি টেলিফোন করে?

—হ্যাঁ, যখন-তখন।

সন্দীপ চুপ করে যায়। তারপর কি ভেবে যেন বলল—আমি চলি।

—কেন, খুব জেলাসী হচ্ছে?

—তা একটু হচ্ছে বই কি?

—কতটুকু জেলাসী হচ্ছে?

—তার পরিমাপ করা মুশকিল।

—ভীষণ কষ্ট হচ্ছে?

—মোটেই না। তবে ভাবছি।

—কি ভাবছ?

সন্দীপ নিজেকে একটু সামলে নেয়। বলে—না, কিছু না।

অলকা এতক্ষণ বাদে একটু যেন রহস্যময়ী হয়ে উঠল, বলল—তুমি খুব ভুল করছ, সন্দীপ। মেয়েদের মন তুমি কিছুই জান না। একেবারে অনভিজ্ঞ।

—শুনেছি মেয়েদের মন দেবতারাই জানতে পারেন না। তা আমি ত কোন ছার!

রঙ ছড়িয়ে হেসে উঠল অলকা, বলল—যখন যা জানতে চাইবে, আমি প্রস্তুত।

সন্দীপ জোর দিয়ে বলল—আমার কৌতূহল একটু কম। না জানালে আমি জানতে চাই না।

—তাই যদি হয়, তাহলে কি হবে জান ত—সুরিন্দর আরও বেশী করে আসবে কিংবা টেলিফোন করবে।

—আর তুমি সেটা ওয়েলকাম্ করবে, কেমন?

—সেটাই বুঝতে অভিজ্ঞতা লাগে, ভালবাসার গভীরতা লাগে।

সন্দীপ একটু ব্যঙ্গ করে হেসে বলল—অল্প বয়স থেকে যে ভালবাসার সৌরভ ছড়াচ্ছে, তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠব না।

—প্রতিযোগিতা যদি আমার ভাল লাগে? একটু মুচকি হেসে অলকা বলল—আর তাতে যদি আমি উস্কানি দি।

—সুরিন্দর খুশী হবে, কারণ আমি খুব সহজে পথ ছেড়ে দিতে পারি। আমি যোদ্ধা। পথ আমাদের মুক্ত রেখে চলতে হয়।

অলকা এ উত্তরটা আশা করেনি। এক মুহূর্তের জন্যে একটু থমকে গেল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল—আবার কবে আসবে?

—বলতে পারছি না। আজকাল ত দিল্লীর বাইরেই বেশী থাকি। তোমার নিশ্চয় একা লাগে না, সুরিন্দর যখন তোমাকে সঙ্গ দিতে প্রস্তুত।

—হ্যাঁ, আমার সুহৃদদের অভাব নেই। তবু তুমি এসো।

—দেখবো। বলতে পারছি না, কবে সময় হবে।

—আমি অপেক্ষা করে থাকব।

—সে আমার ভাগ্য। বলে সন্দীপ আর দাঁড়াল না। দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এসে গাড়িতে বসল। মুহূর্তে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে হাওয়ার মত অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥ বাইশ ॥

রূপেশ্বর ঘন ঘন কোথায় যান, কোন্ খবরের পেছনে ছোটেন, কি খবর পেয়ে ফ্যাক্টরির প্রডাক্শন চার্টটা নিয়ে অকারণে অত কেন খতিয়ে দেখেন, বোঝা যায় না। তিনি তখন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েন। শশব্যস্ত হয়ে কাগজ, ফাইল সব এদিক-ওদিক করেন। চিঠিপত্র জায়গা মত রাখতে ভুলে যান। খুঁজে না পেয়ে পি. এ-দের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলেন। দিল্লী থেকে কারা সব আসে। তাদের চেহারা দেখেই মনে হয় সেয়ানা সব পলিটিশিয়ান। এও শোনা যায় রাষ্ট্রপতি দপ্তরের কিছু লোকও নাকি

আনাগোনা করছে। বিচিত্র সব চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয় দেবনাগরীতে। সেটা নিয়ে কারা, কখন কোথায় যায়, কেউ জানে না। রূপেশ্বর দিল্লীতে তখন গোপনে টেলিফোন করেন। অনেক সময়ই অফিসে যখন কেউ থাকে না। একমাত্র গঙ্গাধরকে নিয়েই যা মুশকিল। হয় সারাক্ষণ ফ্যাক্টরিতে বসে আছে, নয়ত নিজের ঘরে। রূপেশ্বর ভাবেন, বেটার ছেলের কাজ যেন আর ফুরোয় না। দশ বছরের ফ্যাক্টরির পারস্পেকটিভ্ প্ল্যান করছে গঙ্গাধর। করে ফেল বাছাধন, ওটা বহুত জরুরী, ওটা তোমার চেয়েও মূল্যবান।

পঞ্চাশ দশক থেকে আশি দশকে দেশে সরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান-গুলো একের পর এক গড়ে উঠছিল। গড়ে উঠছিল নানা বাধাবিঘ্ন, নানা চক্রান্ত অতিক্রম করে। কখনও মার খেয়েছে ঘরের লোকেদের কাছ থেকে, কখনও বা বাইরের কুচক্রে ও স্বার্থ-সংঘাতে বিপর্যস্ত হয়েছে, কখনও বা পার্লামেন্টে কথা উঠেছে এদের বিপক্ষে, কখনও বা কাগজ-গুলো পেছনে লেগেছে। এই গড়ে-ওঠার সূচনাকালে, ঠিক কতজন রূপেশ্বর ছিলেন আর কতজনই বা গঙ্গাধর, সে ইতিহাস এখনও কেউ লেখেনি। লেখা থাকলে হয়ত ভাল হত। তবে এটা ঠিক, সারা দেশে গঙ্গাধরেরা না থাকলে এ প্রচেষ্টাগুলো আঁতুর ঘরেই মার খেত।

এদেশে জামাইবাবুদের কদর চিরকালই একটু বেশী। যতই কুচক্রী হোক না কেন তারা। বাংলার সেই কুলীন ব্রাহ্মণ জামাইবাবুকে নিশ্চয় মনে পড়ে, যিনি ৩৬৫টি বিয়ে করেছিলেন। যিনি বাংলার ৪৩-এর দুর্ভিক্ষ শুনে অবাক—সে কী? বাংলায় দুর্ভিক্ষে লোক মারা যাচ্ছে বুঝি? আমি ত কিছু টের পাইনি। রোজ নতুন নতুন শ্বশুরবাড়ি ঘুরে বেড়াতাম, লেহ্য-পেয় খেয়ে কুলীন বউদের খুব আশীর্বাদ করতাম। কই, কিছুই ত টের পাইনি! আসল অবস্থা কি, রূপেশ্বররা কোনকালেই টের পান না, কারা কাজ করে সে খবরও রাখেন না। আর জানেন না, কারা কাজ করে চূড়ান্ত অসম্মানের ভাগীদার হয়। স্বাধীনতার এত বছর পরেও ভারতবর্ষে অযোগ্যদের সঙ্গে যোগ্যদের লড়াই সারাক্ষণ লেগেই আছে। তাই গঙ্গাধরদের ইতিহাসের খোঁজ পেলেও কোন লাভ নেই। সবাই জানে, ভারতবর্ষে অযোগ্যদের দলটাই ভারি। নানা জনের আশীর্বাদপুষ্ট এরা, বড় ভাগ্যবান। সেখানে গঙ্গাধরদের মত লোকেদের ভাগ্য কি আর খোলে?

রাত জেগে, হাড়-ভাঙা খাটুনি খেটে, দৌড়োদৌড়ি করে, বোর্ড মিটিং ডেকে, রাতারাতি তার জন্যে সব তথ্য যোগাড় করে, কর্মীদের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে কখনও জয়, কখনও পরাজয়কে মেনে নিয়ে এত খাটাখাটুনি করে, প্রডাক্শন বাড়াবার চেষ্টা, উৎসাহ জোগাতে পুরস্কার বিতরণ, বোনাস, নানান ইন্সেনটিভ, কখনও বা লড়াই করে, কখনও বা সাস্পেনশনের

ধমকি মাথায় নিয়ে ফ্যাক্টরিকে চালু রাখা, এত সব করেও গঙ্গাধরের নিজের কী লাভ হয়েছে, তা রূপেশ্বর বুঝতে পারেন না। তবে মনে মনে বোঝেন এও এক ধরনের পাগলামি। এ কি গঙ্গাধরের ইতিহাস হয়ে যাবার চেষ্টা? কোথাও না কোথাও গঙ্গাধরদের মত কাজের লোক আরও কিছু নিশ্চয় আছে, না হলে আমরা রূপেশ্বর সিংহ হই কি করে, বাঁচি কি করে? সব যুগেই তোমরা কাজ কর বলেই ত আমরা ফুলটা তুলে নিতে পারি, ফলটা খেতে পারি। আর তা খেয়ে পুষ্ট হই। তোমরা গঙ্গাধর, তোমাদের ভাগ্যই খারাপ। এর জন্যে দায়ী বেশ কিছুটা তোমাদের এক-গুয়েমি আর অবাধ্যতা। দিল্লীকে আরও বেশী তোয়াক্কা করে চলতে হয় হে। রূঢ় কথাবার্তা বলে অত লোককে চটাতে নেই। মন্ত্রীদের আরও বেশী করে তোষামোদ করতে হয়। তাঁদের সব তাগিদই মেটাতে হয়। গঙ্গাধর, তুমি কী মনে করতে পার কোন মন্ত্রীর কথা তুমি নির্বিচারে শুনেছ? সব সময় যদি তোমার নিজের মতটাই চালাতে চাও, বল গঙ্গাধর, কখনও কী ইতিহাস হওয়া যায়?

গঙ্গাধর এত কাজ দেখিয়ে ইদানীং দিল্লী মহলে ইতিহাস হয়ে যেতে চায় কি না, কোথায় তার সফলতা আর কোথায় ব্যর্থতা, রূপেশ্বর নানা সূতোয় টান মেরে মেরে শুধু সেটাই তলিয়ে দেখেন, ভাবেন, আরও বেশী ভাবনায় পড়েন। রূপেশ্বরের ইদানীংকালের নিভৃত কার্যকলাপ ও টপ্-সিক্রেট মুভমেন্ট কেউই ঠিক বুঝতে পারে না। রূপেশ্বর চিরকালই খদ্দর পরেন। আজকাল খদ্দরগুলো যেন আরও একটু বেশী চক্‌চকে ও পরি-পাটি মনে হয়। রোজ খদ্দর পালটান। শুধু নেতাদের মত মাথায় গান্ধী টুপিটাই লাগাতেন না। কেননা, রূপেশ্বর জানতেন, তিনি চেয়ারম্যান, অত দূর যাওয়াটা ঠিক সংকোচ নয়। এ-ব্যাপারে অনেক কষ্টেই নিজেকে সংযত রেখেছেন। তবে রূপেশ্বরের চলাফেরা চাল-চলন, ব্যবহার আর তাঁর চারপাশের লোক সমাগমের সমারোহ দেখে মনে হয়, সরকারী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের চেয়ে তাঁকে রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই বেশী মানাত।

গঙ্গাধরকে ডেকে পাঠালেন রূপেশ্বর। ডেকে না পাঠালে গঙ্গাধর এপথ মাড়ায় না। আজকেই এটা যেন বেশী করে রূপেশ্বরের মনে হয়। যতই এটা ভাবেন, ততই জ্বলুনি বাড়তে থাকে। একটু উত্তেজিতও হয়ে পড়লেন।

রূপেশ্বরের কামরায় ঢুকতে গিয়ে গঙ্গাধরের মনে হল, এ কার ঘরে ঢুকছি, কোম্পানীর চেয়ারম্যান, না, কোন রাজনৈতিক দলের নেতা? হাতের কাছেই ত গান্ধী টুপিটা পড়ে রয়েছে, ওটা মাথায় দিয়ে নিলেই সর্বাঙ্গ-সুন্দর হত! শুধু জিজ্ঞেস করলেন—দিল্লী থেকে কবে ফিরলেন?

-আজই।

—হঠাৎ তলব পড়ল কেন, কি ব্যাপার? গঙ্গাধরের জবাবদিহি করার একই রীতি। রূপেশ্বর ভাল মুডে আছেন কি নেই তা তিনি তাকিয়েও দেখেন না।

ওটা বুঝেই একটু হৃদ্যতার ছোঁয়াচ দিলেন রূপেশ্বর—অরে ভাই, বহুত খবর লে আয়া দিল্লী সে। বাতাউঙ্গা, সব বাতাউঙ্গা। পহলে বৈঠো তো সহী।

—কাজ করছিলাম।

রূপেশ্বর একটু রগড় করার ছলে রাগ করে বললেন—কাজ জাহান্নামে যাক। কাজ কাজ, আর কাজ, তুমি আমাকে পাগল করে দিলে। তোমাকে আমি বলছি, কাজ না-হয় আজকে একটু বসে থাক, ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করুক। কাজ কী মানুষের চেয়ে বড় হয়ে গেল? তুমি যখন আছ ওটা থাকবেই, লেকিন—?

—লেকিন কী?

একটু থেমে দম নিলেন রূপেশ্বর। বিগলিত কন্ঠে বললেন—লেকিন বাত ইয়ে হ্যায় কি,. . . . ফ্যাক্টরির ভীষণ নাম হয়েছে, গঙ্গাধর। দেখে এলাম, বুঝে এলাম, শুনেও এলাম। সব তুমারে লিয়ে। হাঃ হাঃ হাঃ, হাসি ছড়ালেন রূপেশ্বর। তৃপ্তির ঐশ্বর্যে রূপোর পানের কৌটো থেকে এক খিলি পান নিয়ে খেলেন। এক খিলি পান গঙ্গাধরকে দিয়ে বললেন—খাস বনারসী পান লেও একঠো, এসা মিলনা মুশকিল হ্যায়।

গঙ্গাধর হেসে পানটা মুখে পুরে মজা করে বললেন—পান তো বড়িয়া হ্যায় মানতা হুঁ, লেকিন বোলিয়ে ক্যায়া বাত হ্যায়। কিসের জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন?

অন্যদিন হলে সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথাটাই রূপেশ্বর বলতেন। কিন্তু আজ বললেন না। ভাবলেন, খুশীর খবরটা গঙ্গাধরকে ধীরে সুস্থে দেওয়াই ভাল, পাছে ভেবে না বসে কৃতিত্বটা সম্পূর্ণ গঙ্গাধরের একার। তিনি তাকে যে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছেন, কোন ব্যাপারে কখনও যে ইন্‌টার-ফেয়ার করেননি, সেটা বুঝি কিছু নয়। এটা অবশ্য ঠিক, রূপেশ্বর জীবনে বহু লোকের সংস্পর্শে এসেছেন, কিন্তু গঙ্গাধরের মত লোক চোখে পড়েনি। রূপেশ্বরের মুখ থেকে আজ প্রশংসাই বেরিয়ে আসে। খুশীর মেজাজে বললেন—আমি সব সময়ই স্বীকার করি গঙ্গাধর, তোমার জন্যেই আমাদের এত সুনাম। লোকেরা তোমার গুণগানই করে, সেটাও আমি লক্ষ্য করি। তা হোক, সত্যি কথাই তারা বলে। দিল্লীকে মাৎ করে দেওয়া ত আর চাট্টিখানি কথা নয়, তুমি ছাড়া ওটা সম্ভব হত না। আমার জায়গায় যদি অন্য কোন ম্যানেজিং ডাইরেক্‌টার হত তাহলে সব কৃতিত্বই সে আত্মসাৎ করত। আমি খোলা প্রকৃতির মানুষ, আমি ওসব পারি না।

দিল্লী মহলে আমাদের সুনামের জন্যে শুধু আমি যে খুশী তা নয়, স্বয়ং নেহেরুজী আমাদের ফ্যাক্টরি দেখতে আসছেন, ইহ বহুত বড়ী বাত হ্যায়—তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

রূপেশ্বরের ভাবগতিক দেখে গঙ্গাধর আজ একটু অবাক হয়ে যান। বুঝতে পারেন্ন, আনন্দে আত্মহারা হবার আসল কারণটা কি। একটু কৌতুক করে বললেন—কোন্টা বড় খবর? নেহেরুজী আসছেন সেটা, না ফ্যাক্টরি ভাল চলছে বলে দিল্লী খুশী, কোনটা?

—দুটোই। নেহেরুজী ত নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ান, তাই ওটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু তার জন্যে ত আয়োজন করতে হবে। ফ্যাক্টরির যা-কিছু ব্যাপার তুমি করবে। আমি বরং অফিসের দিকটাই সামলাব। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই রূপেশ্বরের ভোল পালটে গেল। কোন কথাটার ওপর কখন জোর দিলে কথার নতুন অর্থ বেরোয় সে ব্যাপারে রূপেশ্বর সিদ্ধহস্ত। এসব চালে বড় একটা ভুল হয় না তাঁর। নেহেরুজীর কথা বলতে বলতেই অন্য কথা পাড়লেন—আচ্ছা, তুমি যে ফ্যাক্টরির একটা পারস্পেকটিভ্ প্ল্যান করছিলে, তার কি হল?

—ওটা তৈরী করতেই ত সময় লাগছে। সব কাজকর্ম করে যেটুকু সময় পাচ্ছি তা দিয়েই ত ওটা করা, তাই সময় লাগবে।

—না, না, যদি দরকার হয়, আরও কিছু লোক লাগাও, ওটা আগে শেষ কর। মিশ্র সাহেব চাইছেন।

গঙ্গাধরের একটু খটকা লাগল। মিশ্র সাহেব চাইছেন, সেটা ত রূপেশ্বরের জানার কথা নয়। মিশ্র সাহেবের সঙ্গে গঙ্গাধরের নিভৃতে যা কথা হয়েছিল, সে ব্যাপারে তিনি রূপেশ্বরকে কেন বলবেন, বলতে হলে সরাসরি আমাকেই বলবেন। মিশ্র সাহেবকে একদিন গঙ্গাধর কথায় কথায় বলেছিলেন, ভবিষ্যতের কথা কখনও আমরা ভাবি না, ফ্যাক্টরির একটা পারস্পেক্টিভ্ প্ল্যান করা খুবই দরকার। আমি একটা পারস্পেক্টিভ্ প্ল্যান করছি, যদি চান ত একবার দেখতে পারেন। মিশ্র সাহেব বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। রূপেশ্বর বলছে বলেই ত আর তিনি এই প্ল্যান তৈরী করছেন না। তাহলে এ কথা কেন?

গঙ্গাধরকে চুপ করে থাকতে দেখে রূপেশ্বর আরও অধীর হলেন। বললেন—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। যদি দরকার হয় আরও লোক লাগাতে হবে। সময় মত ওটা তৈরী হয়ে গেলে, আমার এ্যাডভাইস, তুমি ওটা বোর্ড মিটিং-এ প্লেস করে এপ্রুভ করিয়ে নাও। তুমিই ত বল, বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ অনেক বড়। তোমার কাছ থেকে এ-ব্যাপারে শুনে আমি ওটার কি ভ্যালু তা বুঝেছি।

এ কাজে গঙ্গাধর যখন হাত দিয়েছেন, তখন ওটা উনি করবেনই, তা

রূপেশ্বর চাক বা না-চাক। রূপেশ্বরের এ-ব্যাপারে এত আগ্রহ গঙ্গাধরের কাছে একটু বিসদৃশ ঠেকে। রূপেশ্বরের কাছে বর্তমানই বড়, ভবিষ্যৎ নিয়ে সে কখনও মাথাই ঘামায় না। অফিসাররা ভবিষ্যতের কথা ভাবলে বলে—যত সব আহাম্মকের পাল্লায় পড়েছি, তার মুখে পারস্পেকটিভ্ প্ল্যান। ভূতের মুখে রাম নাম। দিল্লী মহলে কাকে কখন কি বলে এসে ক্রেডিট্ নেয় রূপেশ্বর, তা বোঝা দায়। পলিটিক্সে হাত পাকালে রীতি-রেওয়াজও ঘন ঘন পালটে যায়, সেটা তিনি জানেন; তাতে যারই লাভ হোক। গঙ্গাধর সবই বোঝেন, কিন্তু এনিয়ে মাথা ঘামান না। ফ্যাক্টরির প্রডাক্শনের চেয়ে পারস্পেকটিভ্ প্ল্যানটাই আজ হঠাৎ এত বড় হয়ে গেল কোন্ কারণে, গঙ্গাধরের তা জানা। গঙ্গাধর একটু চেষ্টা করলেই অন্য মহল থেকে রূপেশ্বরের আসল উদ্দেশ্য কি তা জানতে পারতেন। কিন্তু তার কোন প্রয়োজন আছে বলে গঙ্গাধর মনে করেন না। মনে যদিও একটু আশঙ্কার ছায়া পড়ল। গঙ্গাধর বললেন—এবার আমি উঠি।

—আরে বৈঠো বহুত বাত হ্যায়।

গঙ্গাধর উঠে পড়েছিলেন, আবার বসলেন। রূপেশ্বর ড্রয়ার থেকে দুটো চিঠি বার করলেন। প্রথম চিঠিটা আগে একবার দেখিয়েছিলেন, এতে জানানো হয়েছিল প্রধান মন্ত্রীর মাসখানিক পরে ফ্যাক্টরি দেখতে যাবার কথা। তার জন্যে প্রয়োজনীয় সব বন্দোবস্ত যেন করা হয়। ফ্যাক্টরি পর্যায়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিস্তারিত নির্দেশও তাতে দেওয়া ছিল। রাজ্য সরকারের সঙ্গে ফ্যাক্টরি কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠুভাবে লিয়াজোঁ রক্ষা করেন—তাও লেখা ছিল।

গঙ্গাধর চিঠিটা হাতে নিয়ে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—ফ্যাক্টরির যা বন্দোবস্ত তা ত আমি করছিই। ওটা আবার দেখাচ্ছেন কেন?

রূপেশ্বর বললেন—দুসরী চিট্ঠি তো দেখো। বলে অন্য চিঠিটা গঙ্গাধরের হাতে দিলেন। চিঠিটা গঙ্গাধরকে হয়ত দেখাতেন না। এর মধ্যে ব্যক্তিগত কিছু কথাবার্তা আছে, যা গঙ্গাধরকে না দেখালেই ভাল হত। আর ঠিক এই জন্যে চিঠিটা গঙ্গাধরকে না দেখিয়ে থাকতে পারলেন না। এই চিঠিতে রূপেশ্বরের যোগ্যতা সম্পর্কে ওপর মহলের বিশ্বাস ও আস্থার কথা লেখা আছে। আর এর জন্যেই গঙ্গাধরকে চিঠিটা পড়তে দেওয়া। গঙ্গাধর এসব জেনেও না জানার ভান করবে, অত তলিয়ে দেখবে না। গঙ্গাধর রূপেশ্বরকে যতই অযোগ্য ভাবুক, চিঠিটাই স্মরণ করিয়ে দেবে কোন্ মহলের সঙ্গে রূপেশ্বরের যোগাযোগ, কাদের সঙ্গে রূপেশ্বরের ওঠাবসা, আনাগোনা। গঙ্গাধর বুঝবে, আজকের দিনে শুধু কাজ করে গেলেই যোগ্যতা প্রমাণ করা যায় না; উপর মহলে পুশ ও পুল থাকা দরকার।

রাজনৈতিক এলেম্‌ও থাকা চাই। এসব থাকলে কাজ না করেও যোগ্যতা প্রমাণ হয়, সুনাম কেনা যায়। এতে শক্তি ও সুফল অনেক বেশী। গঙ্গাধরকে এ-ব্যাপারে তিনি অনেকবারই হিন্‌টস্‌ দিয়েছেন। কিন্তু কাজ ছাড়া গঙ্গাধর আর সব কিছুকে জোর করে অস্বীকার করে, এটাই ওর গোয়ার্তুমি।

দ্বিতীয় চিঠিটা মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি। লিখেছেন—রূপেশ্বরজী, আপনাদের ফ্যাক্‌টরি দেখতে নেহেরুজী আসছেন, সেকথা আপনাকে জানাবার আগেই দেখছি আপনি চিঠি লিখেছেন। হ্যাঁ, মিনিস্ট্রি ত অনেক আগেই খবর পায়, তাই আপনাদের অনেক আগে থেকে জানিয়েছে। আপনার সুযোগ্য পরিচালনায় ব্যাঙ্গালোর ফ্যাক্‌টরির যেরকম সুনাম হয়েছে, নেহেরুজী নিজে তা দেখতে চাইবেন, এটাই ত স্বাভাবিক। আমার অফিসররা সিকিউরিটির সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেছে। আপনাদের ওখানেও সিকিউরিটির বন্দোবস্ত করেছি। আপনার দিক থেকে আপনারাও নিশ্চয় করছেন। নেহেরুজী লিখেছেন, মহীশূর ও ব্যাঙ্গালোরের ডিটেলড্‌ আইটিনেরারি যেন আমি তৈরী করে রাখি। আমাকে একটু বেশী স্নেহ করেন বলেই এসব কথা লিখে আমাকে চিরকালই বড় বিপদে ফেলেন। সে যাই হোক, হাতে সময় কম। নয়ত আপনাদের ফ্যাক্‌টরির বন্দোবস্ত দেখতে আমি নিজেই যেতাম। নেহেরুজীর সঙ্গে আমি অবশ্য থাকব। এক'দিন খুবই ব্যস্ত থাকব বলাই বাহুল্য। আপনাদের অনুরোধ আপনারা তৈরী থাকবেন। আর একটা কথা এই উপলক্ষ্যে বলে রাখি। নেহেরুজীর কাছ থেকে যে ব্যক্তিগত চিঠি পেয়েছি তাতেও আপনাদের ফ্যাক্‌টরির প্রশংসা আছে। চিঠিটা পড়ে গর্বিত হলাম। আপনার যে এত কাজ করার ক্ষমতা তা জানতাম না। কবে থেকেই ত বলছি আপনি এবার আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে আসুন। এ-ব্যাপারে সাক্ষাতে কথা হবে।

—রঘুরামাইয়া।

কোনরকম মন্তব্য না করেই গঙ্গাধর চিঠিটা রূপেশ্বরের হাতে দিয়ে দিলেন। বললেন—আপনার কি কি কাজ বাকি আছে, জানি না। আমার সব কাজ সারা ওনিয়ে আপনি এতটুকু ভাববেন না।

রূপেশ্বর বললেন—রঘুরামাইয়া যখন চাইছেন, নেহেরুজীকে আমিই ফ্যাক্‌টরিটা ঘুরিয়ে দেখাতে চাই। আশা করি এতে তোমার আপত্তি হবে না।

এ এক অদ্ভুত আব্দার, শুনে গঙ্গাধর একটু আহত হলেন। নেহেরুজীকে উনি নিজেই কেন ফ্যাক্‌টরিটা দেখাতে চান, সেটা বুঝতে গঙ্গাধরের মোটেই অসুবিধা হয় না। মনে পড়ে যায়, জরুরী গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপারেও রূপেশ্বর ফ্যাক্‌টরির মুখোও হন না। অনেক সময় গঙ্গাধর জোর করে

টেনে নিয়ে যেতেন। গঙ্গাধর বললেন—আপনি ত বলছেনই ফ্যাক্টরির গৌরব বেড়েছে। সেই গৌরবের বস্তু নেহেরুজীকে আপনিই দেখাবেন, এটাই ত শোভনীয়। আমার সম্মতি-অসম্মতির প্রশ্ন কেন উঠছে?

রূপেশ্বর খুশী হয়ে বললেন—বহুত আচ্ছা।

এর কয়েকদিন পরে। গোটা ফ্যাক্টরিটা ঝক্ঝক্ তক্তক্ করছে, ধোপদুরস্ত হয়েছে। গঙ্গাধরের খুব ইচ্ছে নেহেরুজী কর্মীদের উদ্দেশ্যে যদি একটা ভাষণ দেন। সুযোগ পেলে নেহেরুজীকে নিজেই একথা বলবেন। ফ্যাক্টরির এই যে সুনাম, এত কর্মীদের একনিষ্ঠ কর্মসাধনাতেই সম্ভব হয়েছে। রূপেশ্বর না মানলেও তিনি তা জানেন। এ স্বীকৃতি নেহেরুজী নিশ্চয়ই দেবেন। রূপেশ্বরকে একথা আগে থেকে জানালেই বিপদ হবে। রূপেশ্বর এ-ব্যাপারে মত ত দেবেই না, উপরন্তু, নানা রকম ফ্যাকড়া তুলে সব ভণ্ডুল করে দেবে। শুধু কর্মীদের বলে রাখলেন, অসময়ে সাইরেন শুনতে পেলে তারা যেন সবাই অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন্ বিল্‌ডিং-এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।

গণ্যমান্য সব ব্যক্তিদের সঙ্গে সিকিউরিটি গার্ড নিয়ে নেহেরুজী হাসতে হাসতে ফ্যাক্টরি দেখতে এলেন। রূপেশ্বর সাহস করে গান্ধী টুপিটা আজ মাথায় লাগিয়েই নিয়েছেন। ভাবেন, নেহেরুজী এতে খুব খুশীই হবেন। নেহেরুজীকে তিনি যতটুকু বুঝেছেন তাতে মনে হয় নেহেরুজী মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে. এদেশে গান্ধীবাদই একমাত্র সোশ্যালিজম্ আনতে পারে। অন্য সব দলের ত কোন নীতিই নেই। অন্য কোন পার্টি এসব নিয়ে ভাবেও না। তাছাড়া, নেহেরুজী ত রূপেশ্বরকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। বিহারে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার একটা অতি অসাধারণ ছবি রূপেশ্বরের কাছে আছে। সেই ছবিতে বাবুজী ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে নেহেরুজী কি একটা 'পলিটিকাল্ জোক্' করে হাসছেন। সেই ছবিতে রূপেশ্বরও আছে। রূপেশ্বর বিহার কংগ্রেসের তখন এক বড় কর্মী ও ভলেন্টিয়ার। ছবিটা বড় করে রূপেশ্বরের ঘরে টাঙান আছে। কত দিনের কথা। নেহেরুজীর তা মনে না থাকারই কথা। নেহেরুজীর সঙ্গে এসেছেন রঘুরামাইয়া নিজে, তাঁর মন্ত্রীসভারও অনেকে। তার মধ্যে বেশ কয়েকজনকে রূপেশ্বর ত এক নজরেই চিনতেই পারলেন। হাত মেলাতে পারলেন না। সবাই ত নেহেরুজীকে নিয়েই শশব্যস্ত।

নেহেরুজী ঘুরে ঘুরে সমস্ত ফ্যাক্টরিটা দেখলেন। গঙ্গাধর দূরে দূরে ছিলেন। রূপেশ্বর ভদ্রতা করেও তাঁকে একবার ধারে কাছে ডাকলেন না। নেহেরুজীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া ত দূরের কথা। সারা ফ্যাক্টরির

কর্মীরা আজ ভাল জামাকাপড় পরেছে। অফিসাররাও রীতিমত সুটেড-বুটেড। গঙ্গাধরের কিন্তু কোন রূপান্তর নেই, সেই রোজ যা পরেন, আজও সেই টুইডের প্যান্ট আর বুশ শার্ট। গলায় দুটো ক্যামেরা ঝুলছে। কাগজের ফটোগ্রাফার বা অন্য মিডিয়ার লোকেদের থেকে গঙ্গাধরকে আলাদা করা যাচ্ছিল না। সেটাই তিনি চেয়েছিলেন। ধারে কাছে থাকলেই ত নেহেরুজীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার ঝঞ্ঝাট থাকে। সেটাও রূপেশ্বর চায় না, গঙ্গাধর জানেন। নেহেরুজীকে সামলাতে রূপেশ্বর একেবারে নাজেহাল হয়ে যাচ্ছেন। গঙ্গাধরের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে হয়ত কাল-ঘাম ছুটে যাবে। ছবি তুলতে তুলতেই গঙ্গাধর খেয়াল করলেন, নেহেরুজীকে বোঝাতেই রূপেশ্বরের দম ছুটে যাচ্ছে। রূপেশ্বর যা বোঝাবেন সেটাই নেহেরুজী নির্বিচারে মেনে নেবেন, এমন মানুষ ত নেহেরুজী নন। তিনি দেশের কথা ভাবেন, ভাবেন বলেই পাবলিক সেক্টর গড়ে তুলতে চান। এর পেছনে অনেক ভাবনা, অনেক আশঙ্কা, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা। দেশের এই অবস্থায় এসব করা সম্ভব কিনা তাও ওঁর জিজ্ঞাসা। এই এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপার নিয়ে ইদানীং নেহেরুজী ভাবছেন। বেশী বোঝাতে গেলে উল্টো ফলও হতে পারে।

রূপেশ্বর হালে পানি পান না। একটা বলতে গিয়ে আরেকটা বলে ফেলেন। নেহেরুর ভাবান্তর দেখে তিনি আরও ঘাবড়ে যান। সব তাল-গোল পাকিয়ে যায়। আরও বেশী উল্টো-পাল্টা বলতে থাকেন। এই রকম এক ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে ফ্যাক্টরির কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ রাজেন্দ্রপ্রসাদের কথা তুললেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদের কথা প্রসঙ্গে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বিশেষ করে, বিহারের কথা যতটুকু বলা যায়, তা বলে প্রসঙ্গ পালটাতে চাইলেন রূপেশ্বর। নেহেরুজী অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন---না, সিংহ আপনি ঠিক বলছেন না। আমি ক্যান্‌ফিউজ্ হয়ে যাচ্ছি। শুনেছি, এই ফ্যাক্টরি দারুণ কাজ দেখিয়েছে। প্রডাক্টিভিটি বাড়িয়েছে। সেটা কেন কি করে সম্ভব হল সেটাই আমি জানতে চাই। এই একই সময়ে অন্য সব ফ্যাক্টরির অবস্থার কোন ইমপ্রুভমেন্ট হল না কেন, সেটা বোঝাতে গিয়ে আপনি যা-তা কি সব বলে যাচ্ছেন। নো, নো, সামথিং ইজ্ রং, সামহোয়্যার। পাবলিক সেক্টর, আ্যাই উড্ লাইক্ টু বিলিভ, হ্যাস এ গ্রেট্ ফিউচার অ্যাণ্ড এ গ্রেট্ প্রস্‌পেক্টস্। কিন্তু এখানকার কাজ সম্পর্কে আপনি কিছুই বলতে পারছেন না।

ছবি তুলতে তুলতেই কথাটা গঙ্গাধরের কানে গেল। যে নিজে কোন-দিন কাজ করেনি, তার কাজের ব্যাপারে বোঝাতে যাওয়াটাই নেহাতই বোকামী। আগ বাড়িয়ে একাজ করতে গেলে এ-রকমই হয়। নিজে

শুধু বিড়ম্বিত হয় না, সবাইকেই অপদার্থ প্রমাণ করে। এতে সবারই অপমান হয়। গঙ্গাধর আর থাকতে পারেন না। দু-জনের মধ্যে এগিয়ে এসে রূপেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন—মে আই টেক্ ওভার? রূপেশ্বর হকচকিয়ে যান। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে ওঠেন—ওয়েল স্যার, মীট্ মাই জেনারেল ম্যানেজার, গঙ্গাধর চ্যাটার্জী। হি উইল্ এক্স-প্লেন্ টু ইউ ইন্ গ্রেটার ডিটেল্।

—ইজ ইট? বাট্ অ্যাই থট্ ইউ আর এ ফটোগ্রাফার! তখন থেকে দেখছি ছবি তুলে বেড়াচ্ছেন। আপনি যে জেনারেল ম্যানেজার ভাবতেও পারিনি।

গঙ্গাধর একটু হাসলেন—ইটস্ মাই হবি। এগিয়ে এসে নেহেরুজীকে সব জায়গায় ও শপে নিয়ে গিয়ে আগে কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে, তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর কথা শুনে নেহেরুজী মুগ্ধ হলেন।

গঙ্গাধর নেহেরুজীর সঙ্গে ফিরে এলেন। রূপেশ্বর স্পষ্ট দেখতে পায়, নেহেরুজী খুব খুশী। যতই এটা তলিয়ে বুঝতে চেষ্টা করতে থাকেন, ততই ভেতরে আগুন জ্বলতে থাকে। নেহেরুজী ও অন্য সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে অফিসাররা দোতলার এড্মিনিস্ট্রেশন্ বিলডিং-এ এসেছেন। সবাই বসলেন, সামান্য চা-পানের ব্যবস্থা। নেহেরুজীকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানান হল। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—চিরকালই আমার সন্দেহ ছিল, এই মিক্সড ইকনমিতে পাবলিক সেক্টর সফল হতে পারে কি না। আমাকে অনেকেই বলেছে এটা সফল হওয়া অসম্ভব। পার্লামেন্টারী রিপোর্টগুলোতও এই নিরাশার কথা আছে। আপনাদের এসব দেখে আজ প্রথম আমার এ-ব্যাপারে সব সন্দেহ দূর হল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, এদেশে পাবলিক সেকটর গড়ে তোলা খুবই সম্ভব। এটা আপনাদের এক বিরাট কৃতিত্ব। সমস্ত দেশবাসী দেখল, একটা বন্ধ হয়ে-যাওয়া ফ্যাক্টরিকে প্রডাক্টিভিটির এই পর্যায়ে টেনে আনা যায়। এক অসম্ভব কাজ আপনারা সম্ভব করেছেন। ভারতের আত্মসম্মান আপনারা বাড়িয়েছেন। এই সেক্টরের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা কতটা আপনারা অনুমান করতে পেরেছেন জানি না। কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখলাম ভারতের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির ছবি। লোকে আমাকে ড্রিমার বলে। যারা বলে, তাদের আপনারা চোখ খুলে দিলেন। স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দিকে এটা একটা বড় পদক্ষেপ।

ভাষণ শেষ হবার পর হালকা মেজাজে চা-বিস্কুট-কেক্ খাবার পরে গঙ্গাধর দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে স্যার। কর্মীদের উদ্দেশ্যে আপনি যদি কিছু বলেন, তবে ওরা আরও বেশী অনু-প্রাণিত হবে। ওরাই ত সব করেছে। আমরা ত শুধু পথ দেখিয়েছি।

কথাটা শুনে নেহেরুজী প্রীত হলেন। রঘুরামাইয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন—সময় হবে কি? আমি ত ওদের কিছু বলতে পারলে খুশী হব। শ্রমিক ও কর্মীদের এখন একত্র করতেও বেশ কিছুটা সময় যাবে। অত সময় কি হবে?

গঙ্গাধর বললেন—স্যর, ওদের একত্র করতে আমার এক সেকেণ্ডও লাগবে না। ওদের আমি বলে রেখেছি। আপনি অনুমতি দিলেই আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি।

নেহেরু মাথা নেড়ে বললেন—ওয়ান্‌ডারফুল।

গঙ্গাধর বাইরে এসে সাইরেন বাজাতে ইঙ্গিত করলেন আর দলে দলে কর্মীরা নীচে এসে দাঁড়াল।

কর্মী ও শ্রমিকদের আসতে দেখে তিনি উল্লসিত হয়ে উঠলেন। হেসে ওদিকে হাত তুলে দেখিয়ে বললেন—জাস্ট সী, হাউ দে কাম্। চ্যাটার্জী হ্যাজ্ অ্যারেঞ্জড্ এভ্রিথিং সো নাইস্‌লি। কথাটা শুনে হেসে রূপেশ্বর মাথা নাড়ছিলেন। কোন কথা তাঁর মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল না। এত চেষ্টা করেও তিনি নেহেরুজীকে খুশী করতে পারলেন না। আর গঙ্গাধর কি এমন জাদু জানে যে, তার পক্ষে কত অনায়াসে তা সম্ভব হল। বুকের ভেতরটা রূপেশ্বরের পুড়ে যাচ্ছিল। গলাটাও শুকিয়ে আসছিল। নেহেরু-জীর সামনে কত সহজ গঙ্গাধর, কত সহজে কর্মীদের কথা বলল, যেন কতদিন আগে থেকে চেনে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কর্মীদের ডেকে নেহেরুজীকে কি ভয়ংকর একটা কর্মক্ষমতার ইম্‌প্রেশন্ দিল। নেহেরুজী নিশ্চয় ভেবে নিয়েছেন, রূপেশ্বর কিছুই না। সবই গঙ্গাধর। সব ব্যাপারেই গঙ্গাধর। সর্বনাশ, সর্বনাশ হয়ে গেছে রূপেশ্বরের, ভবিষ্যৎ এখন একেবারে অন্ধকার।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কর্মীরা এসে নীচে বসল। মাইক-টাইক সব ফিট্ করা। নেহেরুজী মাইকের সামনে এসে কর্মীদের উদ্দেশে বললেন—আমি আজ আপনাদের ফ্যাক্‌টরি দেখলাম। আপনাদের কর্মক্ষমতার পরিচয় আমি বহন করে নিয়ে যাব, অন্যদের বলব। আপনাদের দেখে অন্যরা শিখবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে কিভাবে জানপ্রাণ দিয়ে কাজ করতে হয়। আমরা বিরাট এক কাজ হাতে নিয়েছি। সরকারী ক্ষেত্রে আপনাদেরই মত নানান ফ্যাক্‌টরি গড়ে তোলার কাজ। সেদিক থেকে বিরাট কিছু আমরা করতে যাচ্ছি। আপনারা সবাই তার সঙ্গী। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে ভারত অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে চাইছে। আপনারা সব সহযাত্রী। স্বাধীনতার পরেই দেশ ভাগ হল, লক্ষ লক্ষ লোক উদ্বাস্তু হল, মারা পড়ল হাজারে হাজারে। ভেবেছিলাম, এর থেকে কি মুক্তি আছে? থাকলে পাব কী করে? আমরা সে বিপদ অনেকটা

সামলে উঠেছি। নানা রকম কারখানা গড়ে উঠ্ছে। তিনটে ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলেছি। অন্য আরও কিছু গড়ে উঠছে। কিন্তু ভালভাবে চলছে না। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমরা অনেকটা এগিয়েছি। এখন তৃতীয়তে হাত দিয়েছি। আমরা থামব না—এই আমাদের পণ। দেশবাসীদের দুঃখ-দুর্দশা কোনদিনই ঘুচবে না, যদি না আমরা সর্বস্তরে উৎপাদন বাড়াই। উৎপাদন কী করে বাড়ান যায় সেটাই এখন একমাত্র মন্ত্র। সেই পথের সহযোগীই আপনারা। বড় বড় শিল্প গড়ে না উঠলে কোনদিন আমরা স্বয়ংম্ভর হতে পারব না। স্বয়ংম্ভর হয়ে উঠলেই দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। আমার হাতে সময় কম। থাকলে, আমি দেখাতে পারতাম, সর্বযুগে কর্মীরা, শ্রমিকরাই দেশকে কিভাবে গড়ে তোলে। আপনাদের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ গঙ্গাধর চ্যাটার্জীকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি আমাকে আপনাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছেন। জয়হিন্দ্।

নেহেরু উঠে পড়লেন। ভিড়টা সেদিকেই যেতে থাকল। আর একবার সাইরেন বেজে উঠল। কর্মীরা যে-যার কাজে চলে গেল।

যাবার আগে অবশ্য রূপেশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন নেহেরুজী। বলে গিয়েছিলেন, দিল্লীতে গঙ্গাধর চ্যাটার্জীর 'বাইও-ডেটা' যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এটা গঙ্গাধর জানতেও পারলেন না। রূপেশ্বরের হাত দিয়ে সেই 'বাইও-ডেটা' কোনদিনই গেল না। গঙ্গাধরের কাজ দেখে, নেহেরুজী যে প্রশংসা করে গেলেন সেটাই তাঁর কাল হল।

ঠিক এর পরেই গঙ্গাধরকে তিন মাসের জন্য এড্ভানস্ ম্যানেজমেন্ট্ কোর্সের জন্য পাঠান হল। গঙ্গাধর খুশী হলেন—ভাবলেন, এতদিন পরে একটু পড়াশুনা করার সুযোগ পাবেন। বহুদিন ধরে ইচ্ছা থাকলেও যা হয়ে উঠছিল না।

তিন মাসের মধ্যে রূপেশ্বর কত যে অঘটন ঘটাবেন তা গঙ্গাধর বুঝতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। ছলনাময়ী কুহকী নারীকে হয়ত বা চেনা যায়, রূপেশ্বরের মত মানুষকে কদাচ নয়।

॥ তেইশ ॥

ভারতবর্ষে যা-কিছু হচ্ছে, তা আমি চাই বলে। যা হতে পারছে না, তা আমি চাই না বলেই। আবার যখন চাই, তখন হয়। আমি চাই বলেই

হয়, এ যেমন সত্য ; তেমনি সত্য আমি যেমনভাবে চাই, তেমনিই হয়। অদৃশ্য চাকা যেভাবে ঘোরাই, সেইভাবেই ঘোরে। চাইলে আবার চাকা থেমেও যায়। চলতে চলতে ইচ্ছে মত ব্রেক্ কষি। ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ করে তখন শত শত লোকেরা থেমে যায়। যে-দিকে, যে উদ্দেশ্যে সবাই চলছিল, রাস্তা বন্ধ দেখে তারা অন্য দিকে ঘোরে, অন্য পথ ধরে। গণেশ টাওয়ারের নানা ফাঁক-ফোঁকরের মধ্যে দিয়ে আমি অদৃশ্যভাবে সে সব দেখি ; চিকের মধ্যে জগৎটাকে ঈশ্বর যেমন দেখেন। দেশ ও মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে আমি পরম সন্তোষের নিঃশ্বাস ফেলি। আমি পরাঞ্জপে, আমি ইতিহাস নই, কিন্তু ইতিহাস গড়ে ওঠে আমারই হাতে, অতি নিঃশব্দে, নিভৃতে ; ইতিহাস ভাঙে নতুনভাবে গড়ে উঠবে বলে।

অদৃশ্যভাবে একটা দেশকে নিশ্চয় কেউ চালায়। কি, ঠিক কি-না? সে কী সব সময় প্রধানমন্ত্রী, না, সরকারের আর্থিক নীতি? শুধু অর্থ-সামর্থ্যের জোরেই কি সরকারের আর্থিক নীতি গড়ে ওঠে? না, তা কখনই না। জাতীয় বোধ, জাতীয় চেতনা সবার চেয়ে বড়—সর্বযুগে সর্বকালে। তার পরই হচ্ছে অ্যাটিটিউড্স অব ডিফারেন্ট গ্রুপস্। ওটা শুধু স্বভাব নয়, স্বভাবের গভীরে লুকিয়ে থাকে কর্মধারার যে আদিপর্ব, জাতীয় প্রেরণা, জাতীয় ভাবনা-চিন্তা ও অনুপ্রেরণা।

কর্মকে তাই অত জোর দিয়েছে ভারত, বলেছে কর্মযোগ। কিছু লোক বা দল আছে যারা শুধু কর্মে বিশ্বাসী ; কাজ করে ভাবে সব কিছু আদায় করা যায়। নিজেরা কর্মকাণ্ডের মধ্যে জড়িয়ে আছে বলে ভুল করে ভাবে, ওটাই সব, অন্য জগৎ বা চিন্তার কোন অস্তিত্ব যেন নেই। এ ভাব বেশী দিন টেকে না। এর পরে যারা আসে তারা ভাবময়তায় ভরপুর মানুষ। তাদের কাছে ভক্তি হল স্বভাব, দেখার দৃষ্টি, ভাব-অভাব নিয়ে প্রকৃতি ও ঈশ্বরকে দেখা। তাই ভারতবর্ষ একে ভক্তিযোগ বলেছে। অন্য আর এক পর্যায়ে বিচরণ করেন জ্ঞানযোগী। জ্ঞানের বিপুল সাম্রাজ্যে তাঁদের নিত্য-নতুন অনুসন্ধান। আহরণ করে, সঞ্চয় করে এখানে থেমে থাকা নয়, পুঁথিগত বিদ্যার সীমিত জগৎ নয়। জ্ঞানের যে আদি উৎসধারা, তারই চয়ন, তারই পূজা। এ অন্তহীন, এর শেষ নেই।

এড্‌মিনিস্ট্রেশন্ বিলডিং-এ পরাঞ্জপের জন্য বিরাট যে অফিস ঘর তৈরী হয়েছে, সেখানে বসেই তিনি গণেশ টাওয়ারের আশে-পাশে হাজারো লোকের কাজকর্ম দেখছিলেন। দেখতে দেখতেই তাঁর এসব কথা মনে হচ্ছিল। দিনরাত কাজ হচ্ছে। গণেশ টাওয়ারের বুক পর্যন্ত শেষ। মাথা হতে আর ক-দিনই বা লাগবে?

বিদেশীদের এখানে নিয়ে আসা সত্যিই সার্থক হয়েছে। সবাই এসে দেখুক এঁদের কাজ। ভাল করে দেখলেই বুঝবে, কাজ কাকে বলে।

দিন নেই, রাত নেই, ভারতীয় স্কালপ্‌টার ও ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে সমানে এঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। কাজে নামার আগেই হাজারো ভাবনা। সে-সবের সমাধান করে এঁরা যখন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন, সেটা সত্যিই দেখবার মত। সাধারণের ধারণা, এটা করতে এত বছর লাগবে, ওটা করতে অত বছর। হ্যে, হলেই হল। ওসব স্রেফ কাজে ফাঁকি দেবার কারসাজি। চাইলে, ভারতবর্ষে এখনও অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে। গণেশ টাওয়ারের মাথা সম্পূর্ণ হতে আর ক-দিনই বা লাগবে। মনে আছে, ময়দানব কয়েক ঘন্টার মধ্যে যুধিষ্ঠিরেদর জন্য কত বড় রাজ-প্রাসাদ গড়ে তুলেছিল। আমরা ভাবি, দানব বলেই অসাধ্য সাধন করেছিল। এখনকার চোখে অতীতকে বিচার করার ওটা একটা ভঙ্গী। যা বুদ্ধিতে কুলোয় না, তাকে মানুষের বোধের মধ্যে আনতে আমরা একটা সহজ পন্থা নি। বিশ্বাস হয় না, তাই বলি দানব, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে। ভবিষ্যতে পরাঞ্জপেও নিশ্চয় দানব বলে পরিচিত হবেন, কারণ পরাঞ্জপেও অসম্ভবকে সম্ভব করছেন। যা করতে যুগ যুগ লাগে, তাকে গড়ে তুলছেন কয়েক বছরের মধ্যে।

মানুষই সৃষ্টি করে ঈশ্বর, নীচে থেকে তাই শক্তি উপরে জাগে, আর উপরে যখন তিনি জাগেন—এখন যেমন মনে হচ্ছে গণেশবাবা নিত্য-জাগরণের সাধনায় নিমগ্ন—এ দেখে পরম যে আনন্দ হচ্ছে, পরাঞ্জপে কাকে বলবেন, কেই-বা একথা বুঝবে?

এড্‌মিনিস্ট্রেশনের অফিসে বসে পরাঞ্জপে শুধু জনসাধারণের সঙ্গে দেখা করবেন; তাদের কথা ভাববেন, পথ দেখাবেন। লোকেরা, বিশেষ করে প্রোগ্রেসিভ্‌ ইন্‌টেলেকচুয়ালরা এরই মধ্যে বলাবলি করতে শুরু করেছেন যে, ধর্মকে প্রশ্রয় দিয়ে :ামি নাকি ফান্‌ডামেন্‌টালিজমের শক্তি এদেশে আবার পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছি। যমুনায় একেই জল নেই, সেই যমুনায় মা-গঙ্গার অনন্ত প্রবাহ মিলিয়ে দেবার এ প্রচেষ্টাকে সারা দেশ ভাল চোখে দেখছে না। কিছু কিছু পার্টি আছে যাদের কাছে ধর্মের দেশ বলেই ভারত অপাংক্তেয়। ১৯২৪ সাল থেকে বিদেশী ভাবধারায় হৃষ্ট-পুষ্ট হয়ে এরা এখনও ঠাহর করতে পারেনি ভারতের প্রাণশক্তি কোথায়। তার পরিচয় না পেলে, ভারতবাসীকে ঠিকমত না বুঝলে, শুধু শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে কি প্রোগ্রেসিভ্‌ করে তোলা যাবে? এতদিন চেষ্টা করেও কী কিছু হল? এদেশে পূজা-অর্চনা বন্ধ করা গেল কি? আর, যাবে কী কোনদিন? বিদেশ থেকে এরা সুস্বাদু-পুষ্টিকর খাদ্য দেশে নিয়ে এল, একবার চিন্তাও করল না, দেখল না যে, এদেশের লোক বড়ই দুর্বল। বড় পেটরোগা সব মানুষ, অত চপ-কাটলেট্‌-পোলাও-মাংস সইবে কি করে? পুষ্টির বদলে অগ্নিমান্দ্য। হাজার হাজার বছর

ধরে যে ধারায় মা-গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে এলেন, কার সাধ্যি তাকে ভিন্নমুখী করে? কেউ যদি বলে আমরা করব, চেষ্টা করছি, দেখবেন একদিন সফলকাম হবই। কিভাবে করবে, সেটা আগে বল। সারা দেশের সব মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে ২০ হাজার কোটি টাকা লাগবে। অত টাকা যদি না জোটে, তবে কি কেউ শিক্ষিত হবে না? রসদ, যেটুকু আছে; তা দিয়ে কাজেরই সূচনা হোক না! অকারণ স্বপ্ন দেখে লাভ কী?

তাই বলছিলাম, দেশে ফান্‌ডামেন্‌টালিজম আনতে যদি চেষ্টা করেই থাকি, কিছু কি দোষ করেছি? পরাঞ্জপে মনে মনে প্রশ্ন করেন, আর নিজেই তার উত্তর দেন। একটা কথা না বলে আর পারছি না। তোমা-দের শাসিত রাজ্যেই ত তিন তিনবার ভোট-মহাযজ্ঞ হয়ে গেল। তাতে ত তোমরাই জয়ী হলে। এর পরেও তোমাদেরই অনেক কমিটেড্‌ লোক মন্দিরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে গোপনে হাত তুলে প্রণাম করে। কেউ-বা দাঁড়িয়ে পড়ে, এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে মনে মনে প্রার্থনা সেরে তারপর এগোয়। দুর্গাপূজাকে উচ্ছেদ করতে না পেরে এটাকে এখন 'সোশ্যাল গ্যাদারীং' বলতে শুরু করছ তোমরা। তোমরা, যারা আমাকে একিউজ্‌ করছ, ঠেকে শিখবে, এমনিতে মেনে নেবে না। অত শেখান, অত দেখান আর অত পড়ানর পরেও স্ত্রীর আব্দারে স্বামী ফুল তুলে দেয়, কিন্তু পুজো দেবার সময় বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বোতল নিয়ে বসে। একটা কথা এরা কিন্তু কিছুতেই বুঝতে চায় না। বন্ধুর সঙ্গে ইন্‌টেলেকচুয়াল আলোচনা করলেই কি দেশে পুজো-অর্চনা বন্ধ হয়ে যাবে, বউ মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করবে?

পরাঞ্জপে ভাবেন, নীচে গণেশের যে বিশাল মূর্তি রূপ নিচ্ছে, তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে একদিন। গণেশ টাওয়ারের লাগোয়া ইঁদুর-ঘর। আণ্ডার-গ্রাউণ্ড মন্দিরে বিশাল ডানসিং গণেশ থাকবেন, তাঁর কথাই বলছি আমি। তিনি প্রাণ পেয়ে জেগে উঠলেই টিভি-তে, রেডিওতে বিজ্ঞাপন ত দেবই, কাগজেও বিজ্ঞাপন ছাড়ব এই বলেঃ গণেশ টাওয়ারের পাশে গণেশের মন্দির। আপনারা এই বিশাল অত্যাশ্চর্য গণেশ টাওয়ার দেখে যান, পাশে মাটির নীচের মন্দিরে পুজো দিয়ে আসুন, আর যার যা ইচ্ছে মানত করুন। গণেশবাবাজী আপনাদের সব মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। কত লোক যে এখানে তখন ভিড় করবে, মানশ্চক্ষে আমি তা দেখতে পাচ্ছি। এখনই যা হয়েছে, তাতেই লোকের ভিড়ে আর সুষ্ঠুভাবে কাজ করা যায় না। প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হলে সারা দেশ থেকে তীর্থযাত্রীরা কি এখানে ভিড় করবে না? প্রতি বছর গণেশ টাওয়ারের উদ্বোধন দিবসে বাৎসরিক মেলার আয়োজন করব। সারা ভারতের কৃষ্টি, সাহিত্য, শিল্প, লোকনাট্য, লোকগীতির উৎসবের কেন্দ্র হয়ে উঠবে এই গণেশ টাওয়ার। সারা

দেশ থেকে শিল্পীরা আসবে। বক্তৃতা হবে, সেমিনার বসবে। সামনের খোলা ময়দানে আয়োজন করা হবে পৌষ-মেলার। দেশবাসীকে শিল্প ও কৃষ্টির মাধ্যমে একত্রিত করাই গণেশ টাওয়ারের প্রধান উদ্দেশ্য। এই টাওয়ারকে কেন্দ্র করেই জনসমুদ্রের মিছিল হবে বারো মাস। বারো মাসে তেরো পার্বণ। এটা ভেবেই আমি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্ছি।

এই ভারতবর্ষের ইতিহাসের কোন্ সিম্বল অদৃশ্য শক্তিবলে কি কাজ করে তার হিসেব নিতে হবে বৈকি। আমাদের সিম্বল, শুধু রাজনীতির প্রতীক না হয়ে যদি ধর্ম ও পুজোও বোঝায়, তাহলে রাজনীতি ধর্মের মাধ্যমেই বা প্রচার করব না কেন? যারা এদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েও ধর্ম কিংবা পুজোর নামে এখনও আঁতকে ওঠে, তাদের কথাটা একটু তলিয়ে দেখতে বলি। জনস্রোতকে উল্টোমুখী টানতে, সহজ কথায় জোয়ারের বিপক্ষে, সবাই নৌকো নিয়ে যেতে পারে না। অনেক দেশই পারেনি। এমন কি, অন্য সিস্টেম্ নিয়ে এত দীর্ঘদিন ধরে এক্স্পেরি-মেন্ট্ করে যারা সফলকাম হয়েছে, তারাও আজকাল বিপক্ষ ও বিরুদ্ধ শক্তিকে মূল্য দিয়ে জনগণকে আবার মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে নতুন আইন প্রণয়ন করছে। সুখের দিন ফিরে আসায় কৃষ্টি, সাহিত্য, ধর্ম ও ফিলসফির নানা ফর্ম ও জিজ্ঞাসা নিয়ে মাতছে। যেমন হচ্ছে বর্তমানে রাশিয়াতে, যেমন দেখছি চীনেতে।

আমি আরও একটা কথা ভাবি। কোটি কোটি লোক মেরে খাওয়া-পরার অভাব মিটিয়ে, পুরনো বিশ্বাস, ধর্ম, পুরনো মনোজগৎ ও আধ্যাত্মিকতার জগৎ যদি আবার ফিরিয়ে আনতে হয়, আর তার জন্যে যদি ব্যাকুলতা বাড়ে, তবে যা নিয়ে আমার দেশের মাটি, তাকে অনুর্বর করে মরুভূমিই বা করতে যাব কেন? যদি যাই আমি পুরন্দরে পরাঞ্জপে বলছি, আমি একটা আহাম্মক। আমি সেদিক থেকে গন্ধীজীকে বাহবা দিই। তিনি দেশের সিম্বলটা ঠিকমত বুঝতে পেরেছিলেন বলে আন্দোলনের একটা মাস্ বেইস্ দিতে পেরেছিলেন। ঐ লাঠি আর ঐ লেংটি-পরা মানুষটা দেখে স্কালপ্টারদের এত আনন্দ সাধে কী আর হয়েছে।

গণেশ টাওয়ার এই রকমই একটা সিম্বল হয়ে উঠুক, তাই আমি চাই আর তার জন্যেই আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। ঐ সিম্বলের কাছা-কাছিও যদি যায় তাহলে ডিস্স্ট্যাবিলাইজেশনের যে প্রকোপ দেখা দিয়েছে, ভবিষ্যতে তার সবচেয়ে বড় সিমেন্টিং ফোর্সই হবে এই গণেশ টাওয়ার।

একথাও অনেকে বলছেন যে দেশের উন্নতি, দেশের আসল কাজকর্ম আরও অনেক বেশী গুণ হতে পারত যদি ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা গণেশ টাওয়ারের মত 'নন্-ইস্যু' নিয়ে এতটা মাতামাতি না করত। এসব তুচ্ছ জিনিসকে অগ্রাধিকার দিলে আসল কাজ কিছুতেই হতে পারে না। কারণ,

এইসব গর্ত দিয়েই প্রচুর সহায়-সম্পদ বেরিয়ে যায়! যদি তাই হয়, তবে কি আপনাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি, বিয়ে-শাদী, হাজারো রকমের সামাজিক অনুষ্ঠান, পুজো-পার্বণ করে অযথা এত টাকা ওড়ান কেন? এসব ত কত কল্যাণকর কাজেই ব্যয় করা যেত। ওটাই বা করেন না কেন? আগেকার দিনে রাজা-রাজড়ারা এক একটা উৎসব-অনুষ্ঠানে দানছত্র খুলে বসতেন কেন? না করলে, গরীবেরাই বা যায় কোথায়? তাদেরই বা পেট ভরে কী করে? গণেশ টাওয়ার করায় কত লক্ষ লক্ষ গরীব লোক টাকা রোজগার করেছে। সমালোচনা করার আগে, এসব কি কেউ কখনও ভেবে দেখেছে?

গণেশ টাওয়ার সম্পর্কে অপজিশন দলগুলোর এত গাত্রদাহ কেন? তা আমি জানি। গণেশ টাওয়ারের বিরুদ্ধে নিত্য-নতুন শ্লোগান দিচ্ছে কেন? তাও বুঝি। মিটিং করছে, আর প্রায় রোজই রাষ্ট্রপতির কাছে মেমোরান্‌ডাম্‌ নিয়ে হাজির হচ্ছে কেন? তার কারণও আমার অজানা নয়। জনগণ যে এখন আমাদের দিকেই ঝুঁকছে, এত চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছি। এখানে তারা মনের খোরাক পাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ লোক পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠ্‌ছে। যে-মহৎ চিন্তাধারা থেকে গণেশ টাওয়ারের সৃষ্টি হতে চলেছে, সেই চিন্তা-ধারা থেকে জণগণকে বিচ্ছিন্ন করতে অপজিশনরা অক্ষম, অপারগ। তাই এত সোর্‌গোল তুলেছে।

পুলকেশ গোস্বামীর ডাক পড়ল। অপজিশনের জয়-পরাজয় ও ব্যর্থতার যাবতীয় খুঁটিনাটি এই বাঙালী আর্কিটেক্‌ট ইঞ্জিনীয়ারের নাকি নখদর্পণে। পেটে বিদ্যে আছে আর আছে সাহস। যা মনে হয় আগ-পাছ বিবেচনা না করে দুড়ুম করে বিস্ফোরণ ঘটায়। কাউকে পরোয়া করে না। আমি যে পুরন্দরে পরাঞ্জপে, আমাকেও নয়। গণেশ টাওয়ার এতটা উঠে যাবার পর পরাঞ্জপের আজকে যে আত্মতৃপ্তি আর আনন্দ, তার সার্থকতা বিচার করতে পারে একমাত্র পুলকেশ। ও-ই একমাত্র যে পরাঞ্জপের ভুলও ধরিয়ে দেবার হিম্মত রাখে!

পুলকেশের সঙ্গে কথা বলার আগে চন্দ্রভানু ভর্মার সঙ্গেও কথা বলা দরকার। ইচ্ছে মত এদের সঙ্গে কথা বলব বলেই ত এদের রাখা, কাজ থাক বা না থাক। চন্দ্রভানু এজন্যেও কষ্ট পান। মানুষটা বড় নির্লোভী। সেই আদি ও অকৃত্রিম ভারতীয় ঐতিহ্য—বিবেক। বর্তমান যুগে যার কোন অর্থই নেই। ইদানীং তারই দংশনে মানুষটি দিশেহারা। এলাহী-ভাবে আমার কাজ করার রকম-সকম চন্দ্রভানুর একেবারেই পছন্দ নয়। আমি বুঝি সেটা। প্রচুর লোকের সঙ্গে আমার দহরম-মহরম। উনি ভাবেন, আমি যা করছি, সরকার আগামী দশ বছর আমারই নির্ধারিত নীতি অনুসরণ করে চলবেন। সরকারকে কত নির্বোধ ভাবেন এঁরা। আমি

স্থূলকায় বলে কি আমার বুদ্ধিটাও স্থূলকায় হতে হবে? আমার একটা ভাবনা-রাজ্য আছে। এঁরা জানেন না যে, একজনকে নিয়ে ইতিহাস হয় না, রাজা-রাজড়াদের যুগ ত আর নেই। শক্তিধর যে পুরুষ শত শত মানুষের প্রাণ-মান-সম্পত্তি বিনষ্ট না করে বহু মানুষকে একই কর্মধারায় ও কর্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সে-ই একমাত্র ঐতিহাসিক মানুষ।

এসব নিয়ে চন্দ্রভানু ভর্মা চিন্তা করেন। কোন দিশা না পেয়ে আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে চান। আমাকে দেখলেই ভেতরে ভেতরে জ্বলে ওঠেন। সেটা দেখে খুব এন্‌জয় করি। ইতিহাস যে ভূমিকা আমাকে দিয়েছে তা পূরণ করতে গিয়ে অনেক আপনজনকেও চটাচ্ছি। এসব কথা একান্তে যখন ভাবি, বেশ মজা লাগে। আমার কর্মক্ষমতার পরিমাপ করতে পারেন না বলেই এঁরা নানা ধরনের জল্পনা-কল্পনা করেন। তা করুন না, কাউকে ত আমি বাধা দিচ্ছি না। এঁরা কেউ জানেন না, গণেশ টাওয়ার নিয়ে আমাকে কত রকমের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। আমি শুধু এই ভেবে আশ্বস্ত হই যে, গণেশ টাওয়ারের উদ্দেশ্য একদিন সফল হবেই। কিছু-না-কিছু খবর ত রোজই বেরুচ্ছে। বিশেষ কিছু একটা ঘটলেই সম্পাদকীয়ও লেখা হচ্ছে। বিষয়ান্তর নিয়ে আলো-চনার সূত্রপাত হলেও প্রায়শঃই আজকাল গণেশ টাওয়ার নিয়ে তা শেষ হয়। এমন কি কয়েকটি সংবাদপত্র একথাও বলছে যে, আমিই নাকি ডিস্‌স্টাবিলাইজেশনের একটা বড় ফোর্স। আমার পেছনে নাকি বহি-র্শক্তি কাজ করছে। এরকম একটা কন্‌ট্র্যাভারসিয়াল ফিগার হতে না পারলে জীবনটাই বৃথা। নতুন কিছু করতে গেলে কন্‌ট্র্যাভারসি ত হবেই। এত নতুন কথা নয়।

চন্দ্রভানু ভর্মা সঙ্গে পদত্যাগপত্র নিয়ে দেখা করতে এসেছেন। পদত্যাগ-পত্রটি হাতে দিয়ে বললেন—ডেকেছেন, একেবারে রেজিগ্‌নেশন লেটার নিয়ে চলে এলাম।

—বেশ করেছেন। বলে পরাঞ্জপে হোঃ হোঃ করে অট্টহাস্য হাসলেন। গণেশ টাওয়ার নিয়ে কাগজে ও নানান জায়গায় যেসব সমালোচনা হয়েছে, সেগুলো পড়ে আপনি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন, না? আর এক মুহূর্তও আপনি আমাদের সঙ্গে থাকতে চান না, এই ত! একটু বাঁকা হাসি হাসলেন পরাঞ্জপে। পদত্যাগপত্রটি নিজের টেবিলের ড্রয়ারে রেখে বললেন—পরে দেখব। ও-নিয়ে অন্য সময় ভাবা যাবে। আপাতত আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা আছে।

চন্দ্রভানু মনে-প্রাণে আজ চটেছিলেন। নিজের রাগ নিজের মধ্যে চেপে রেখে বললেন—আমার যা বলার তা পদত্যাগপত্রে বলেছি, আর

কোন কথা আমি আলোচনা করতে চাই না।

পরাঞ্জপে স্মরণ করিয়ে দিলেন—গণেশ টাওয়ার ছাড়াও ত ভারতবর্ষে অনেক কিছু হচ্ছে। তার যে-কোন একটা বিষয় নিয়েই আমরা আজ আলোচনায় বসতে পারি।

চন্দ্রভানু ভর্মা ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিলেন, সামান্য একটু উস্কানিতে যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। আশ্চর্য, বিরাট বপু নিয়ে পরাঞ্জপে বসে আছেন, নির্বিকার। নৈর্ব্যক্তিক, ব্রহ্মজ্ঞভাব। কোন কিছুই তাঁকে উত্তেজিত করতে পারে না। সব ব্যাপারেতেই আছে অথচ কোন কিছুতেই নেই এমনি একটা মনোভাব। সামনা-সামনি কোন অপ্রিয় কথা বলবেন না বলেই চন্দ্রভানু চিঠিতে অনেক কথা লিখেছেন। এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ চিঠিও পরাঞ্জপে পড়ে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না। চন্দ্রভানু রাগে গর্‌গর্‌ করতে থাকেন। তা প্রকাশ না করে চুপ করে রইলেন।

পরাঞ্জপে বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা একেবারেই পছন্দ করেন না। তাই চন্দ্রভানুর নীরবতার কারণ ব্যাখ্যা না করে থাকতে পারলেন না। বললেন—কী, চুপ করে রইলেন যে! ও বুঝেছি, আমার সঙ্গে কোন বিষয়ে বুঝি আলোচনা করতে চান না। আমি অতি নগণ্য ব্যক্তি। আমার সঙ্গে কথা বলে লাভ কি! পত্র-পত্রিকা পড়ে, আমার কাজ করার নমুনা দেখে আপনারও নিশ্চয় বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, ভারতবর্ষে কাজের বাধা বলে যদি সত্যি কিছু থাকে ত সে হলাম আমি। আমি হলাম বিরাট এক শক্তি বা ফোর্স, কেমন? আপনি মুখ খুললেন না। অথচ দেখুন আপনার মনের কথা যোগীর মত কেমন বলে দিলাম।

আর থাকতে না পেরে চন্দ্রভানু ফেটে পড়লেন—আপনার মন বলে কি কিছু অবশিষ্ট আছে? বলেই নিজেকে একটু সামলে নিলেন। কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন—আমি কথা বাড়াতে চাই না, কেন ডেকেছেন, বলুন।

পরাঞ্জপে একটু রহস্য করে বললেন—ভেবেছিলাম হাল্‌কা হাসি-গল্প করব, তা দেখছি আকাশে মেঘ। যা গরম পড়েছে, একটু-আধটু বৃষ্টি হলেও হতে পারে। প্রকৃতি বড় নির্মম, বড় খামখেয়ালী!

চন্দ্রভানু ক্ষিপ্ত হয়ে উত্তর দেন—প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে নিশ্চয়ই আমাকে ডেকে পাঠাননি।

—আলবৎ নয়। আপনাকে দেখে আমার এক বৃহৎ শক্তির কথা মনে পড়ে গেল। যেমন আমাকে দেখে আপনার। আজকাল প্রায়ই মনে হয়, আমার মত এত বড় একটা শক্তি যখন ভারতবর্ষের চারিদিকে ফুলে-ফলে বাড়ছে, আসল কাজ হবে কী করে? কোন নির্দিষ্ট পথ কিংবা আইডিয়েল সামনে দেখতে না পেয়ে, যারা কাজের লোক,

যাদের দ্বারা দেশের-দশের উপকার হত, তারা অকারণে মার খাচ্ছে। কারণ কি, না, আমারই সর্বত্র প্রাধান্য বেড়ে গেছে, তাই। কি, ঠিক কিনা?

—এ-বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। এই মুহূর্তে যা আপনি ভাবছেন। তা নিয়েও কোন মন্তব্য করব না।

পরাঞ্জপে একটু হাসলেন। বললেন—আচ্ছা, তাহলে অধ্যাত্মবাদ নিয়েই না হয় কিছু বলুন।

—মানে? চন্দ্রভানু বিস্মিত হলেন।

—মানে? মানে খুবই সোজা। গণেশ টাওয়ারকে আপনি স্পিরিচুয়্যাল কাজ বলে ভাবেন?

—যে অর্থে আপনি একে 'স্পিরিচুয়্যাল' বলে চালাতে চাইছেন, সে অর্থে কিন্তু নয়।

—তবে?

—বলতে রাজী নই।

হঠাৎ কোন কিছু আবিষ্কার করে ফেলেছেন, এমন একটা উল্লাস প্রকাশ করে পরাঞ্জপে বললেন—এবার বুঝেছি। সেরকম 'আহা-মরি' কিছু দেখতে পাচ্ছেন না বলেই কিছু বলতে চাইছেন না। কাগজের গুল-তাপ্পিতে দেখছি আপনিও সহমত।

—না, তা ঠিক নয়।

—তবে কি উভয় সংকটের মধ্যে পড়েছেন, এতদিন আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশে আমার সম্বন্ধে যা ধারণা করেছেন, তা ত মনের মধ্যে আঁকা আছে, কেমন? সম্প্রতি কাগজের মন্তব্যও পড়েছেন। কোন্‌টা ঠিক—আপনার এতদিনের ধারণা, না, কাগজের মন্তব্য? কোনটাই পুরোপুরি মেনে নিতে পারছেন না বলেই ভয়ানক একটা কন্‌ফ্লিক্‌টে পড়েছেন আপনি, এই ত? আর এর ক্ল্যারিফিক্যেশন্‌ চাইতেই আপনি দীর্ঘ এক রেজিগ্‌নেশন্‌ লেটার লিখে এনেছেন, কি, ঠিক বলছি?

—আমার চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবেন।

—আমি টাকা পয়সা নিয়ে আপনার সঙ্গে কোন রকম কৃপণতা করিনি ত? আপনার ন্যায্য পাওনা দিইনি বা ঐ ধরনের কিছু?

—এ-ব্যাপারে আপনি আশাতিরিক্ত উদার, আমি সেটা সব সময় স্বীকার করি।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন পরাঞ্জপে। বললেন—এতক্ষণে, তবু বা কিছু বললেন। এতে আমি পরম সন্তোষ পেলাম। আর কি কি বিষয়ে আমি উদার, একটু বলবেন?

—সব ব্যাপারেই। সেটাই আমার সবচেয়ে বড় অভিযোগ।

—মানে, কাগজগুলো বা অপজিশন্ যা বলছে তা-ই সত্যি। আমি ও আমার শক্তি ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক, এই ত!

চন্দ্রভানু কিছুক্ষণ নীরব রইলেন। পদত্যাগপত্রে এই ধরনের একটা শক্তি'র প্রভাবের কথা তিনি বলেছেন। এ-বিষয়ে আর কিছু উল্লেখ করতে চান না, বলে চুপ করে রইলেন।

—আমার আর একটা কথার উত্তর দেবেন?

—বলুন।

-অলকা নাকি একটা বই লিখছে। বইটা কী আমাকে নিয়ে?

—এইজন্যে কী আমাকে ডেকেছেন?

—উত্তর দিন। হ্যাঁ কিম্বা না।

—অলকা কিছু লিখছে কি-না এবং লিখলে কি বিষয়ে লিখছে, ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবেন।

—সেটা ত পরের কথা। আপনি কী জানেন?

—অলকা কি নিয়ে লিখছে সে-বিষয়ে একটা ধারণা থাকলেও আমি বলতে পারছি না।

—কেন?

—আমি জোর-জবরদস্তিতে বিশ্বাস করি না। মেয়ে কি করে না করে, আমি জিজ্ঞাসা করি না। কিছু লিখছে জানলেও দেখার আগ্রহ প্রকাশ করি না। মেয়েদের পূর্ণ স্বাধীনতায় আমি বিশ্বাসী। প্রয়োজনবোধে অলকাকে ডেকে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

—শুনেছি ও ত আগুন। আপনার চেয়েও এক কাঠি সরেস।

চন্দ্রভানু বিদ্রূপ করার সুযোগ ছাড়লেন না। বললেন—তাই বুঝি কম আগুনের উত্তাপ নিতে চান?

আবার শব্দ করে হেসে উঠলেন পরাঞ্জপে। বললেন—যদি অভয় দেন ত আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

—বলুন।

—জাস্ট্ এ কিয়্যুরসিটি, কিছু মনে করবেন না। আপনার মধ্যে যে সুপ্ত আগুন আমি দেখেছি, অলকা কী তারই প্রকাশ?

চন্দ্রভানু কোন উত্তর না দিয়ে উঠে পড়লেন—আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন কি-না, কবে জানতে পারব?

—দেখছেন ত, কি রকম ব্যস্ত! একটু সময় লাগবে।

—কত সময় লাগবে?

পরাঞ্জপে হেসে বললেন—দেশের একজন মহাপুরুষ পাশ্চাত্য জাতির ব্যস্তবাগিশপনা দেখে মন্তব্য করেছিলেন—ইউ লিভ্ ইন্ টাইম, বাট উই লিভ্ ইন্ ইটারনিটি।

চন্দ্রভানু কিছু না বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। মনে মনে ভাবেন, ডাহা পাগল!

পরাঞ্জপে বললেন—যেতে চান, আসুন।

চন্দ্রভানু চলে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুলকেশ গোস্বামী এল। যেন রঙ্গমঞ্চ। একজন এ্যাক্‌টিং করে বেরিয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অন্যের প্রবেশ।

পুলকেশ একটু মুচকি হেসে বললে—কী ব্যাপার, খুব ঘন ঘন তলব করছেন যে? কি ব্যাপার?

—কিছু অন্যায় নিশ্চয় করিনি, পুলকেশ।

—আপনাদের মত দু-চারজন মহাপুরুষ যাঁরা এদেশে আছেন, তাঁরা কি কখনও অন্যায় করতে পারেন?

—বাঃ বাঃ, বহুত খুব, এ না হলে তোমাকে আর মার্ক্সিস্ট্ বলে কেন?

—এ কথার সঙ্গে মার্ক্সিজমের কি সম্পর্ক, ঠিক বুঝলাম না।

—এও সেই শ্রেণীচেতনা। যে শ্রেণীর মধ্যে আমরা পড়ি, তাতে যদি আমরা কিছু অন্যায়ও করি; কিছু এসে যায় না। আমাদের হাতে কৃষ্টি, ঐতিহ্য, আইন, আদালত, ধর্ম—সেই সবের প্রলেপ এমনভাবে লাগাই, অর্থাৎ মুখোশগুলো এমনভাবে পরে থাকি যে, যারা অভিযোগ আনে, তাদেরই আমরা একঘরে করে রাখি, এই ত!

পুলকেশ আবার একটু হাসল।

—তুমি ভাবছ ব্যঙ্গ, না?

পুলকেশ জিজ্ঞেস করল—ব্যঙ্গ করার অধিকার কাদের, বলুন ত?

—ব্যঙ্গটাও কি শ্রেণীচেতনা? ওরে বাবাঃ, আমি কোথায় দাঁড়াব পুলকেশ? তোমাদের ক্ষেত্র-হিন্দি বেল্ট্ ছাড়িয়ে গেল নাকি? কালকে সেই রকমই একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

—স্বপ্নটা তাহলে চট্‌পট্ বলেই ফেলুন। মনেরই একটা ভাবনা বলে স্বপ্নকে আমি জানি।

—দেখলাম, সারা দেশে লাল-ঝাণ্ডা উড়ছে। কিছু লাল-ঝাণ্ডা গণেশ টাওয়ারের মাথায়ও, টাওয়ারটাকে ভাঙবার চেষ্টা করছে। স্বপ্নের মধ্যেই ভাবছিলাম, ঝাণ্ডাধারী মানুষ কোথাও নেই অথচ শুধু ঐ ঝাণ্ডা-গুলো এত বড় একটা টাওয়ার ভাঙবার চেষ্টা করছে। খুবই আশ্চর্য লাগল। ঝাণ্ডাগুলোর হিম্মত দেখতে হয়! স্বপ্ন দেখার পর আমার মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। আমি জানি যে, তোমাদের গড়া সরকারের চেয়ে তোমাদের পার্টি বড়। কিন্তু তোমাদের পার্টির চেয়ে কী তোমাদের পতাকা আরও বড় আরও বেশী শক্তিশালী?

এনিয়ে পুলকেশ কোন কথাই বলতে চাইল না। কথাটা ঘুরিয়ে বলল—স্বপ্ন দেখেছেন, না, ঝিমুতে ঝিমুতে কথাগুলো ভেবেছেন?

—না, না, বিশ্বাস কর, ভোরের স্বপ্ন। অনেকে বলে, ভোরের স্বপ্ন নাকি মিথ্যা হয় না।

—কমিউনিজম্ সারা ভারতে একদিন ছড়িয়ে পড়বে, এতে আপনার সন্দেহ আছে নাকি?

পরাঞ্জপে হেসে ফেললেন। বললেন—আগে ছিল। স্বপ্নটা দেখার পর আমি প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে পড়েছি।

পুলকেশ বলল—কি রকম?

—এই যে গণেশ টাওয়ার ভাঙবার চেষ্টা। গোষ্ঠীনিরপেক্ষ দেশে, নন্-কমিউনাল দেশে, গণেশ টাওয়ারের মত এরকম একটা জঘন্য ধর্মীয় ব্যাপারে চারিদিক থেকে এত রকমের এত সাহায্য আসে কী করে? সরকারের কাছ থেকেই বা এত সাহায্য ও সমর্থন আসে কী করে? কারণ দেশটার শতকরা দু-ভাগ মাত্র তোমাদের মত ইন্‌টাল্যেক্‌চুয়াল্। ৭০ কোটি লোকের মধ্যে শতকরা দু ভাগ মানে ১ কোটি চল্লিশ লাখ, কেমন? বাকিরা সবাই আমার মতই, ধার্মিকই বল, আর অন্ধবিশ্বাসই বল, যাই বল কেন, ওটা আছে, আর ওটা থাকবে। সারা ভারতে লাল-ঝাণ্ডা যদি না ওঠে, ত বুঝবে এইজন্যে উঠবে না যে, তোমরা গণেশ টাওয়ারের মাহাত্ম্য বুঝবার এতটুকু চেষ্টা করনি। শুনে দেখে শুধু রিজেক্ট করেছ। একটা কথা তোমাকে বলি পুলকেশ, বিদ্যা বল, ইন্‌টাল্যেকচুয়াল্ জ্ঞান বল, ওটা ধার করা হতে পারে। কিন্তু বাণী ওঠে মানুষের অন্তর ছুঁয়ে, দেশের মাটি ভেদ করে।

পুলকেশ অধৈর্য হয়ে বলে উঠল—এসব কথা বলতে নিশ্চয় ডেকে পাঠাননি। বলুন, কি খবর?

—তুমিই বল।

—আমরা ত সংবাদের বাহক। আপনারা হলেন সংবাদের উৎস।

—গণেশ টাওয়ারটা যেরকমভাবে ধরাধর উঠছে, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

—যে সৃষ্টি করে, তারই আনন্দ। বাকিরা ত সব দর্শক।

—বাঃ সুন্দর কথাটা বললে। আসল কথাটা কিন্তু এড়িয়ে যাচ্ছ।

—এড়িয়ে যাচ্ছি না। কোন কিছুতেই আমার আনন্দ হয় না। আমি চোখ-কান খুলে শুধু দেখি, অব্‌জারব্ করি।

—তাহলে কি আমাকেই দেখছ, না, ঐ গণেশ টাওয়ারকে?

পুলকেশ গোস্বামী জানলা দিয়ে বাইরের কাজকর্ম একবার দেখে নিল। শত শত লোক, রাজমিস্ত্রি, মজুর-মজুরনী, ইঁট-কাঠ-পাথর, ক্রেন্, ট্রাক, ছোটাছুটি, সাহেবদের আসা-যাওয়া। কিন্তু এসবই ত বাইরের রূপ। গণেশ টাওয়ারের ভেতরে কি বিরাট কর্মকাণ্ড ও বিরামহীন ছুটোছুটি

চলছে, বাইরে থেকে তা বোঝার কোন উপায়ই নেই।

পরাঞ্জপে সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন, বললেন—অন্য একটা পৃথিবী, তাই নয়?

—আর সে পৃথিবীর রচয়িতা পরাঞ্জপে স্বয়ং। পুলকেশ হেসে বলল। আমার কিরকম মনে হয় জানেন, গণেশ টাওয়ারের ইতিহাস যেদিন লেখা হবে, সেদিন আপনাকে বাদ দিয়েই হয়ত লেখা হবে, আপনার কোন অবদান কেউই স্মরণে রাখবে না। স্পন্‌সরড্ ইতিহাস। সত্যকে মিথ্যা করে ছেড়ে দেয়!

—দুঃখ করার কিছু থাকবে না, পুলকেশ। ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল কথা, গোপনে আপনার কাজ করে যাওয়া, নামকে কেউই বড় করে দেখেনি, কর্মই বড়, সেটাই বড় করে দেখে। দক্ষিণ ভারতে এত মন্দির, এত আর্কিটেক্‌চার। কে তৈরী করেছে, সে-সব নামও বিশেষ জানা নেই। অজন্তা-ইলোরা, কারা যে করে গেছেন, আমরা তার ত কিছুই বিশেষ জানি না। তাই কাজ করে যাওয়াটাই বড়। কর্মটাকে অত বড় করে দেখি বলেই আমরা ফল নিয়ে মাথা ঘামাই না। দূরে সরিয়ে রাখি।

—কেন ডেকেছেন, বললেন না ত?

—না, মনটা প্রসন্ন ছিল, তাই ভাবলাম পুলকেশকে একটু ডেকে গল্প করি। গণেশ টাওয়ারের ভেতরে তুমি খুব ব্যস্ত ছিলে, না?

—তা একটু ছিলাম, সাহেবদের সঙ্গে তর্কাতর্কি হচ্ছিল।

—তবে যাও, কাজ ফেলে গপ্প নয়। আর হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে বেশী তর্ক কোর না। কথার চেয়ে ওরা কাজ করে বেশী।

পুলকেশ মাথা নেড়ে নীচে নেমে যায়। পরাঞ্জপে তাকিয়ে দেখেন। দেখে খুশী হয়ে ওঠে মনটা। মনে হয়, গণেশ টাওয়ারের চূড়াটা তৈরী হয়ে গেছে। আর কয়েকটি লাল পতাকা তাকে ভাঙবার চেষ্টা করছে। টেগোরের একটা গান মনে পড়ে যায়—তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।

॥ চব্বিশ ॥

আগেকার দিনে রাজা-রাজড়ারা যখন যুদ্ধে যেতেন, রণসজ্জায় মহাবীরকে সাজিয়ে দিতেন রানীরা। পুরনারীরা দাঁড়িয়ে শঙ্খ বাজাত, কেউ বা দাঁড়িয়ে থাকত মঙ্গলঘট নিয়ে। যুদ্ধে জয়ী হোন কিংবা মৃত্যু-

বরণই করুন, সেদিকে বীরপুরুষের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাঁদের বীরত্বের উজ্জ্বল ইতিহাস কালের দরবারে লেখা হয়ে আছে। গঙ্গাধর তিন মাসের জন্যে ট্রেনিং-এ যাচ্ছেন, সে কি বিজয়-উল্লাস তাঁর, তিনি যেন একজন বিনম্র ছাত্র। জিজ্ঞাসা আর অনুসন্ধিৎসুতায় মুখর তাঁর মুখ। মৈত্রেয়ীকে সেকথাই তিনি বললেন—কাজ নিয়েই এতকাল ব্যস্ত ছিলাম। পড়াশুনা করার সময় একেবারেই পাইনি। তিন মাস খুব চুটিয়ে পড়ব। হাতের কাছে যা পাব।

গঙ্গাধরের ভাবগতিক দেখে মৈত্রেয়ী বেশ একটু কৌতুক বোধ করলেন। মানুষটার মধ্যে এমন একটা সরলতা ও ছেলেমানুষি আছে যা প্রতিদিন দেখেও দেখার সাধ মেটে না। প্রতিমুহূর্তে মনে হয়, যে মানুষটা সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, এতদিন একসঙ্গে ঘর করেও ঠিক এঁকে চিনলাম না। এতদিন পরে আশঙ্কা-মুক্ত হয়ে পড়াশুনা করতে পারবেন বলে কি না আনন্দ, কত খুশী। ওনার অবর্তমানে এই তিন মাসে অনেক কিছু অঘটন ঘটতে পারে, সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। দুশ্চিন্তার সামান্য একটু কাল-মেঘও দেখছি না। ফ্যাক্টরির উন্নতির জন্যে এত কিছু করলেন, অথচ তার জন্যে কোন মায়া-মমতা নেই। প্রয়োজনে যা করণীয় করেছেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে অন্য কেউ সে কাজ করবে। সরকারের কাজ কি আর পড়ে থাকে? কিভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সেই পারস্পেকটিভ্ প্ল্যানটাও রেখে যাচ্ছেন, আর ভাবনার কি আছে? ওঁর দশ বছরের এই প্ল্যানে প্রডাক্শনের যাবতীয় ব্যবস্থা চালু রাখার সমস্ত মেথড্ই দেওয়া আছে। কিভাবে ফ্যাক্টরির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে, তার জন্যে কত অতিরিক্ত পুঁজি লাগবে, বাইরে থেকে কোন্ কোন্ জিনিস কতটা আমদানী করতে হবে, প্রয়োজনীয় কি কি জিনিস এ-দেশেই তৈরী হতে পারবে, তার ফলে দেশের কত টাকা বাঁচবে—সব কিছু অঙ্ক কষে, ছকে বেঁধে রেখে যাচ্ছেন। মৈত্রেয়ী ভাবলেন, রূপেশ্বরের অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকলেও ফ্যাক্টরির বিশেষ ক্ষতি হবে না। গঙ্গাধরকে এ সহজ কথাটাও বোঝান যায়নি। কেননা, তাঁর কাছে ব্যক্তিটা একান্তই গৌণ, সম্মিলিত প্রচেষ্টাই মুখ্য।

গঙ্গাধরকে ট্রেনিং-এ পাঠাবার পেছনে রূপেশ্বরের কী কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে? মৈত্রেয়ীর এ আশঙ্কাও হয়। রূপেশ্বর সবই খুব গোপনে করছেন, দু-একজন কিন্তু তাঁর অভিসন্ধি আঁচ করতে পেরেছেন। তাঁরাই মৈত্রেয়ীকে সাবধান করে দিয়েছেন। মৈত্রেয়ীও এও লক্ষ্য করেছেন, রূপেশ্বরের ব্যবহারটাও ইদানীং কেমন যেন বিসদৃশ। মৈত্রেয়ী শুনেছেন রূপেশ্বরের কাছে চিরকালই নানা ধরনের লোকজন আসা-যাওয়া করে। নিজে কাজ করতে গিয়েও এসব দেখেছেন কিছুটা। কিন্তু ইদানীং যারা আসে-যায়,

তারা যেন কেমনতর লোক। এ-নিয়ে মৈত্রেয়ী যখন কথা পেড়েছেন, গঙ্গাধর শুধু মাথা নেড়েছেন, কোন জবাব দেননি। তিনি যে একেবারে চোখ বন্ধ করে আছেন তা নয়। চোখে তাঁরও পড়েছে। কিন্তু এদের এত বড় করে দেখতেও তিনি রাজী নন। রূপেশ্বরের অদ্ভুত পরিবর্তনের কথা তুলতেই গঙ্গাধর হেসে জবাব দিয়েছিলেন—কি জান, এ হচ্ছে, কাজ নেই অথচ গদি আছে। এসব লোকেদের মোসাহেবদের সংখ্যা চিরকালই একটু বেশী থাকে। ওনিয়ে তুমি ভেবো না। এদিকে তলে তলে মৈত্রেয়ী কানাঘুষো শুনছেন, গঙ্গাধরের চরম ক্ষতি করতে রূপেশ্বর এবার বদ্ধপরিকর। রূপেশ্বরের পি. এ.-দের মধ্যে একজন গঙ্গাধরকে খুবই শ্রদ্ধা করে। সেও এরকম একটা ইঙ্গিত দিয়ে গেছে মৈত্রেয়ীকে। তাই পরে একদিন সুযোগ পেয়ে কথাটা গঙ্গাধরের কানে তুলেছিলেন মৈত্রেয়ী—ইদানীং রূপেশ্বরের ভাবগতিক আমার কিন্তু ভাল ঠেক্‌ছে না। বেশ ঘোরাল মনে হয়। গঙ্গাধর বলেছিলেন—তা হয়ত ঠিক। কিন্তু, কি করবে, বল? আমাকে নিয়েই ত ওর যত দুর্ভাবনা, যত বিপদ!

—ফিরে এসে যদি দেখ সব পালটে গেছে, তখন?

—কী আর করব, চলে যাব। ওসব নিয়ে আমি ভাবছি না। আমার এখন একটাই কাজ। পাবলিক সেক্‌টর প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি, চলার পথে কোথায় থেমে যাচ্ছি, আর কি কি কারণে থেমে যেতে হচ্ছে, তা সবিস্তারে জানা। এ সিস্‌টেমে রূপেশ্বররা থাকবেই। এ সত্ত্বেও কিভাবে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, সেটাই ভেবে দেখার বিশেষ দরকার। মিক্সড্ ইকনমিতে স্ট্রাক্‌চারাল কন্‌স্ট্রেন্ থাকবেই। একে অতিক্রম করতে হলে হিউমান এ্যাটিটুডকেই মোটিভেট্ করতে হবে। ওটাও দারুণ [illegible]ধার সৃষ্টি করে। যারা আমরা কাজ করি, এসব জেনে-শুনেই ঝাঁপ দি।

ওসব মেনে নিয়েই আমরা কিছু করবার চেষ্টা করছি। প্ল্যানিং-এর ইতিহাস, ১৯৪৮ ও ১৯৫৬-র ইন্‌ড্রাসট্রিয়াল পলিসি রেজলিউশন্ পরবর্তীকালে যেভাবে অদল-বদল করা হয়েছে এবার সেগুলো ভালভাবে দেখবার সুযোগ পাব। শুনেছি, পাবলিক সেক্‌টর গড়ে তোলার প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানিয়ে বাংলার সর্বজনগ্রাহ্য জনপ্রিয় নেতা জে. এম. সেনগুপ্ত এক ভাষণ দিয়েছিলেন, সম্ভব হলে, সেটাও দেখে নিতে চাই। নেহেরু দেশটাকে কিভাবে গড়ে তুলতে চাইছেন, তা ওঁর বক্তৃতাগুলো পড়লেই অনেকটা বোঝা যাবে।

মৈত্রেয়ী আর কিছু বললেন না। কাজের স্বীকৃতি যাঁর ভাগ্যে নেই তার জন্যে আফসোস করে কি লাভ। এই মানুষটার সেই একই কথা: কাজটাই বড়, কে করল বা না করল সেটা বড় কথা নয়। তাঁকে ইঙ্গিত

দিয়েও কোন লাভ নেই।

গঙ্গাধরকে রূপেশ্বর সরাবার চেষ্টা করলে, কর্মীরা হয়ত রুখে দাঁড়াতে পারে। বড় মহলে এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ধর্না দেবার জন্যে যদি মৈত্রেয়ীকে এসে ধরে, তখন মৈত্রেয়ীর কি করণীয়? গঙ্গাধরের কাছ থেকে মৈত্রেয়ীর একথা জেনে-নেওয়া দরকার। তাই একদিন চা তৈরী করতে করতে কথায় কথায় মৈত্রেয়ী বলেছিলেন—দেখো, রূপেশ্বর তোমার যদি কোন ক্ষতি করতে চায় ত যারা তোমায় ভালবাসে, তারা প্রতিবাদ করতে পারে। একটা বিশ্রি অবস্থার সৃষ্টি হবে। আমি শুধু সেটাই ভাবছি।

গঙ্গাধর রীতিমত অবাক হলেন। মৈত্রেয়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—কারুর যদি প্রতিবাদ করার ইচ্ছে হয় ত করবে, তাতে তোমার বা আমার কী করার আছে।

—অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার স্বভাব আমারও। আমার সঙ্গে এতদিন ঘর করে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ।

—সে আমি জানি। তুমি অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে জয়ী হয়েছ। অনেক সময় আমি বাধা দিয়েছি, প্রতিপক্ষের ভূমিকা নিয়েছি। তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে বহুদিন ধরে বহু চেষ্টা করে কেউ যদি সফলকাম হয়, তাতে করবার কি আছে। এটা ত সাধনার ফল। সাধনা বলতে যদি তোমার আপত্তি হয়, বলো না। কিন্তু এটা যে তার কৃতিত্ব, সেটা ত মানবে। এতে তোমার কি করার আছে, আমি বুঝতে পারছি না। তাকে তুমি চ্যালেঞ্জ করবে? গিয়ে বলবে, এ অন্যায় করলে কেন? কাজের ধারাই যখন এই, তখন মাঝে মধ্যে এই ধরনের অন্যায় হবেই। এতে কিছু করার নেই, মৈত্রেয়ী। এটাই এখন রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—এরা যদি আমাকে এসে ধরে, বলে, একটা কিছু প্রতিকার করুন, তখন?

—শুধু একটু ম্লান হেসো। আমার ব্যাপার নিয়ে তোমার ওপর মহলে যাওয়া বা আমার কথা বড় কর্তাদের কানে তোলা, আমার সপক্ষে কিছু বলা তা আমার স্ত্রী হয়ে তোমার শোভা পায় না। ও ধরনের কোন-কিছু করাটাই আমাদের অসম্মান। সেটা নিশ্চয়ই তুমি চাও না। তাই যা ঘটবে, তা গ্রেসফুলি মেনে নেওয়াটাই সবচেয়ে বড় সাহসের পরিচয়।

গঙ্গাধর খুশী মনেই চলে গেলেন ট্রেনিং কোর্সে। প্রায়ই চিঠি লেখেন মৈত্রেয়ীকে। কত স্বপ্ন কত ভাবনা-চিন্তাই না এই মানুষটার। কত কি করার জন্যে মানুষটা সব সময়ে উন্মুখ হয়ে আছে। তার কতটুকুই বা সরকার নিতে পেরেছে। চিঠিগুলো পড়ে ব্যথায় অন্তর ভরে যায়, মন অধীর হয়ে ওঠে। এদিকে রোজই শুনছেন, রূপেশ্বর হয় দিল্লীতে লোক পাঠাচ্ছে, নয়ত ফোন করছে। এরই মধ্যে বোর্ডের একটা মিটিং হয়ে গেল।

ওঁর পারস্পেকটিভ্ প্ল্যানটাও বোর্ডকে দিয়ে নাকি পাশ করিয়ে নিয়েছে। এমন সর্বাঙ্গ সুন্দর নিখুঁত প্ল্যান দেখে মিশ্র সাহেব তারিফ না করে থাকতে পারেননি। প্রশংসাই করুন আর হাত তালিই দিন, এখন বোধ হয় এঁদের কারুরই আর গঙ্গাধরকে চাই না। কিছু করার নেই ভেবে ভেতরে ভেতরে গুমরাতে থাকেন মৈত্রেয়ী। যা প্রাণ চাইছে তাই করে বেড়াচ্ছে রূপেশ্বর। এখন খোলা মাঠে বল পিটিয়ে যাচ্ছে যথেচ্ছভাবে, বাধা দেবার কেউ ত নেই। মিশ্র সাহেব ব্যাঙ্গালোরে এলে মৈত্রেয়ীকে টেলিফোন করেন। মৈত্রেয়ীর হাতের রান্না খেতে ভালবাসেন। কত গল্প করেন, গঙ্গাধরের কত সুখ্যাতি করেন। কিন্তু গঙ্গাধরের ওপর কত যে অন্যায় করা হচ্ছে, সেকথা মৈত্রেয়ী মুখ ফুটে বলতে পারেন না। গঙ্গাধর যা চান না, মরে গেলেও মৈত্রেয়ী তা করেন না। চেনাজানা মৈত্রেয়ীর আরও অনেকে আছে। কাউকে তিনি কখনও গঙ্গাধরের বিষয়ে সামান্যমাত্র আভাসও দিতেন না। মনে মনে সবাই ভাবত, মিশ্র সাহেব যার বাড়ী আসে যান, রূপেশ্বর যত চেষ্টাই করুক না কেন, গঙ্গাধরের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগাতে পারবে না। এটা যে কত বড় ভুল, একমাত্র মৈত্রেয়ী তা জানেন, কাউকে বোঝাতে পারেন না। যেটুকু কানাঘুষোয় মৈত্রেয়ী শুনেছেন মিশ্র সাহেবকে সেটুকুই বললে যথেষ্ট কাজ দিত। কিন্তু মৈত্রেয়ী ভাবেন, কেউ-না-কেউ রূপেশ্বরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেই। বড় কর্তাদের মধ্যে ও দিল্লী মহলে যাঁরা ওঁর কাজের এত প্রশংসা করেন, তাঁরা অন্ততঃ প্রতিবাদ করবেন, এত বড় অন্যায় হতে দেবেন না। যদি একান্তই কেউ তা না করে, মৈত্রেয়ী নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেবেন, গঙ্গাধরদের মত মানুষদের সত্যিকারের আঘাত দেবার মত কোন লোক এখনও জন্মায়নি।

কয়েকদিন অন্তরই চিঠি আসে গঙ্গাধরের। নতুন নতুন জিনিস নিয়ে ভাবছেন, চিন্তার নতুন হোরাইজন্ খুলে যাচ্ছে। তক্ষুণি চিঠি লিখে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে নিজের আনন্দটুকু ভাগ করে নিতে চান। গঙ্গাধর একটা ভারি সুন্দর চিঠি লিখেছেন ঃ

মৈত্রেয়ী,

তোমার অবসর আজকাল নিশ্চয় কম। নীলুকে পড়ান ত আছেই, তার ওপর ফ্যাক্টরির ওয়েলফেয়ারের কাজ। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, রান্নাবান্না সেরে তুমি বেরিয়ে পড়েছ। কাজ-কর্ম করে ফিরতে দেড়টা। নীলু স্কুল থেকে ফিরল, দু-জনে এক সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া সারলে। একটু বিশ্রাম করতে না করতেই আবার বেরিয়ে পড়ছ। আর দেখো, আমার এখন কি অফুরন্ত অবসর। কাল লাইব্রেরীতে প্রচুর বইপত্র নিয়ে বসেছিলাম। বেশ লাগছে। অদ্ভুত একটা জিনিস লক্ষ্য করছি। তুমি

নিজে যদি চিন্তা কর আর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাও, তাহলে তোমার দেখার নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। সেটা বিদ্বান বা স্কলারদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বরং কাজ করে যারা ভাবে, তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার আরও গভীরে যেতে পারে। তাদের ভাবনার আর চিন্তার মধ্যে অরিজিনালিটি থাকে। অনেকদিন পড়াশুনো করিনি বলে মনে মনে একটা আফসোস ছিল। ভাবতাম, চিন্তার জগৎ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। এখন দেখছি, সেটা ঠিক নয়। লিভিং মাইণ্ডে যে চিন্তার স্রোত ওঠে, সেটা খুব একটা বিচ্ছিন্ন নয়। যা তুমি ভাবছ, আর তুমি যা করছ, সে ব্যাপারে পড়াশুনা করলে আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। কর্মী মানুষের চিন্তাকে রূপ দেয়, সেটা আবার নতুন করে জানলাম, জেনে আশ্বস্ত হলাম।

তোমাকে আর একটা কথা না বলে পারছি না। যা আমরা এতদিনে করতে পেরেছি, তার পুরো ইতিহাস জেনে একটা কথাই আমার এখন মনে হচ্ছে, আমরা কি করতে চাইছি আমাদের কাছে তা খুব স্পষ্ট নয়। এতে অনেক প্রজেক্টই যখন শেষ হবার কথা, তখন হচ্ছে না। এই দেরীর জন্যে খরচা বেড়ে যাচ্ছে, এস্টিমেট্ ঠিক থাকছে না। কখনও কাজ আটকে যায়, সময়মত বিদেশী সাহায্য আসে না বলে। কখনও কখনও দেখা যায়, কলাবরেশন্ সুবিধাজনক শর্তে হয়নি বলে। অনেক কাজ একই সঙ্গে হাতে নেওয়ার ফলে দেরী হয়। এসবই যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আমাদের নেই। ফলে, প্রচুর ওভারল্যাপিং হচ্ছে। এতে দেশের কি পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে, তা সব সময় আমরা বুঝতে পারি না। উদাহরণের কোন প্রয়োজন নেই। এর ভূরিভূরি প্রমাণ মিলবে যোজনা কমিশনের অনেক রিপোর্টেই। কিছু কিছু তাঁরা স্বীকারও করছেন। তার সমাধানের কোনো পথও তাঁরা বাৎলাতে পারেননি। পড়তে পড়তে যেসব দাগিয়ে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম তার কিছু নমুনা দেব। তা আর আজ দেওয়া যাবে না। বিকেলে যাঁদের সঙ্গে রোজ বেড়াতে যাই, তাঁদের ডাক পড়েছে। তাই চিঠিটা অর্ধপথেই শেষ করতে বাধ্য হচ্ছি। শেষ করার আগে আর একটা কথা শুধু তোমাকে বলতে চাই। এত বড় একটা দেশকে দেখতে হলে দেখবার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা ও সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা একান্তই প্রয়োজন। সেটারই বড় অভাব। এসব সত্ত্বেও যাঁরা কিছুটা কর্মক্ষমতা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের লেখাপত্র পড়ে সত্যের আলো দেখতে পাচ্ছি।

নীলু মন দিয়ে পড়াশুনো করছে ত? ওর এখন গড়ে ওঠার সময়, তোমার সঙ্গটা ওর কাজে লাগবে। যা-কিছু কর, শরীরটা যেন সুস্থ থাকে, সেটা দেখো। আমি বহাল তবিয়তে আছি। ইতি গঙ্গাধর

মৈত্রেয়ী চিঠিটা পড়ে ভাবলেন, আশ্চর্য, ফ্যাক্টরির সম্বন্ধে একটা

কথাও লেখেননি। কারুর কথা জানবার এতটুকু আগ্রহ পর্যন্ত নেই। রূপেশ্বর কি করল, তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তাও নেই। তার সফলতায় দুঃখ হলে, সেটাও যেমন উপেক্ষনীয়, তেমনি তার বিফলতাতে উল্লসিত হওয়াও অর্থহীন। এতটা নিস্পৃহ নির্বিকার মানুষ খুব কমই দেখেছেন মৈত্রেয়ী। চিঠিটা দু-তিন বার পড়লেন। ফ্যাক্টরির পরিবেশ হতে বহু দূরে এক অনাবিল চিন্তারাজ্যে তিনি বিচরণ করছেন। মৈত্রেয়ী মনে মনে ঠিক করলেন, উত্তর দেবার সময় এখানে কি হচ্ছে বা না হচ্ছে, তার লেশমাত্র আভাসও দেবেন না। ওনার বিরুদ্ধে যেসব অন্যায় করা হচ্ছে তা অসহ্য হলেও, মুখ বুঁজে সহ্য করা ছাড়া মৈত্রেয়ীর অন্য কোন পথ নেই। তবুও একটা কথা না ভেবে পারলেন না মৈত্রেয়ী। অন্যায়কেও কি এরা অন্যায় বলে ভাবতে ভুলে গেছে, প্রতিবাদ করতেও ভুলে গেছে?

দিনের বেলা মৈত্রেয়ীর এক তিল সময় নেই। চিঠি লেখার জন্যে মনের যে অবসর দরকার, দিনের বেলা তা হয়ে ওঠে না। নিজের কাজ চির-কালই মৈত্রেয়ী রাতে সারেন; কখনও বই পড়েন। নিজের বলে যদি কিছু থাকে সে ঐ রাতটুকু; রাত আড়াইটার আগে ঘুম আসে না। একবার ভাবলেন সব কথা ওনাকে জানিয়ে চিঠি লেখেন। মনের মধ্যে অনেক কথা গুমরে মরছে, কিন্তু চিঠি লেখার সময় ওসব কিছুই লিখলেন না।

মৈত্রেয়ী লিখলেন—তুমি ত জান, রাতে ছাড়া আমার চিঠি লেখার সময় হয় না। রাতে লেখার কিন্তু একটাই অসুবিধা। সারা দিনের দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও কর্মকাণ্ডের রূপটাই মনে ভেসে ওঠে। সেটা সব সময় সুখের নয়। তুমি আনন্দে আছ, নিজের চিন্তার জগৎ নিয়ে আছ, এটা তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পেরে আমি কত যে নিশ্চিন্ত হয়েছি তা তোমায় লিখে বোঝাতে পারব না। আমার, বাবার কথা মনে পড়ে। রেডিও কিভাবে চলে, বাবা তোমার কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন। বাবার কথাগুলো মনে পড়ে কি? বাবা বলেছিলেন, 'দেখো গঙ্গাধর, রেডিও কিভাবে চলে তার মেকানিজম্ আমি ঠিক জানি না। এতে কোন দোষও দেখি না। কেননা, আমি ত বাঁধ-তৈরীর ইঞ্জিনীয়ার।' তখন এদেশে গোনাগুনতি রেডিও, বাবার একটা ছিল। মনে আছে, বাবা একেবারে ছাত্রের মত কাগজ-পেন্‌সিল নিয়ে তোমার কাছে বসেছেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। তার তুমি জবাব দিয়ে যাচ্ছ। কখনও বা পেন্‌সিল দিয়ে ডায়াগ্র্যাম্ এঁকে বোঝাচ্ছ। সে এক দেখবার মত দৃশ্য। ঘন্টা দেড়েক বাদে বাবা হাসতে হাসতে মার কাছে এসে বলেছিলেন—'গঙ্গাধরের ফান্ডা-মেনটাল্‌সটা খুব ভাল। ভবিষ্যতে ও খুব বড় ইঞ্জিনীয়ার হবে, দেখো।'

সেদিন ছাত্র হয়ে বাবা তোমার সামনে বসেছিলেন। এতদিন পরে সেই চিত্রটা আবার যেন নতুন করে দেখতে পাচ্ছি। এতদিন পরে তুমি

আবার ছাত্র হয়ে বসেছ, হাতে তোমার কাগজ আর পেন্‌সিল। এসব কথা ভুলে গেছ কিনা জানি না। আমার কিন্তু এসব কথাই আজকাল বেশী করে মনে পড়ে।

এখানকার খবরের মধ্যে তোমার পারস্পেক্‌টিভ্‌ প্ল্যানটা বোর্ড মিটিং-এ পাশ হয়ে গেছে, শুনেছি। কাজ থেমে নেই, ফ্যাক্‌টরির কাজ আগের মতই এগিয়ে চলেছে। এখন আর তোমার খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আর তোমার জানার মত কোন খবর নেই, তাই রূপেশ্বরের কথা লিখলাম না। তোমারও ত ট্রেনিং কোর্স শেষ হতে চলল। কবে আসছ? অনেক কিছু লেখার ছিল। সেসব সাক্ষাতেই বলব। ঘুমে চোখ জুড়ে আসছে।

—তোমার মৈত্রেয়ী

ট্রেনিং কোর্স শেষ হয়ে গেল। গঙ্গাধর একটা পরিতৃপ্তির ভাব নিয়ে ব্যাঙ্গালোরে ফিরলেন। মৈত্রেয়ীর মুখে একটা বিষাদের ছায়া লক্ষ্য করলেন। কথাবার্তায় বা ব্যবহারে তা বোঝার উপায় নেই। সব সময় কি যেন একটা চেপে রাখতে চেষ্টা করছেন। কয়েকবার কিছু বলতে গিয়েও মৈত্রেয়ী চেপে যান। তাঁর প্রতি কত বড় অন্যায় করা হয়েছে, তা তিনি নিজেই একবার দেখুন! দুঃখ কষ্ট আগে নিজে পান। তার-পরে মৈত্রেয়ী যা ভাবছেন, তা তাঁকে বলার সময় পাবেন। আঘাত যে পাবেন গঙ্গাধর, মৈত্রেয়ী তা জানেন। গভীর দুঃখে মনের কথা হয়ত দু-চারটে বলবেন, নয়ত একেবারে চুপ করে যাবেন।

গঙ্গাধর চিরকাল যা করেছেন, আজও তাই করলেন। সাত সকালে ফ্যাক্‌টরিতে গেলেন। নিজের টেবিল-চেয়ারটা অনেকদিন ঝাড়া হয়নি মনে হল। চারিদিকে ধুলো জমে আছে। বুঝলেন, এঘরে এতদিন কেউ আসেনি। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমার পি, এ-দের কি হল? তারাও কী এখানে বসত না? তাদেরও কি রূপেশ্বর কাজে লাগিয়েছিল? রূপেশ্বরের তাহলে কর্ম্মক্ষমতা আজকাল বেড়েছে!

টেবিলে-ফাইলপত্রে যেসব চিঠিপত্র ছিল, তা গঙ্গাধর এক এক করে সব খুলে দেখলেন, পড়লেন। মিনিস্ট্রির একটি আদেশপত্র দেখে একটু প্রীত হলেন, গঙ্গাধরকে ম্যানেজিং ডাইরেক্‌টর করা হয়েছে এবং রূপেশ্বরকে বদলী করা হয়েছে দিল্লীতে। ভাবলেন এটাই ত স্বাভাবিক। একবার ভাবলেন টেলিফোন করে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলবেন। রিসিভার তুলতে গিয়ে মৈত্রেয়ীর বিষণ্ণ মুখখানা হঠাৎ চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে খটকা লাগল। এ সুখবরটা মৈত্রেয়ী নিশ্চয়ই দিত। দেয়নি যখন, তখন কিছু গড়বড় আছে। মৈত্রেয়ী বরং জোর করে হেসেছে, মন্তব্য জুড়ে রূপেশ্বরের সুখ্যাতি করেছে। দু-একটা চিঠি উল্টোতে-না-উল্টোতেই

মিনিস্ট্রির আরও একটা আদেশপত্র চোখে পড়ল। প্রথম আদেশপত্রের দিন পনেরো পরের আদেশপত্র এটি। গঙ্গাধরকে দিল্লীতে বদলী করা হয়েছে আর রূপেশ্বরকে সসম্মানে নিজের জায়গায় বহাল রাখা হয়েছে।

তাঁর অনুপস্থিতিতে রূপেশ্বর পলিটিকস্ করার খোলা মাঠ পেয়েছিল। গঙ্গাধর তা বুঝলেন। বেশ একটু কষ্ট হল। কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। আরও কোন জরুরী কাগজপত্র আছে কিনা দেখে নিলেন। বোর্ডের মিটিং-এর এজেণ্ডাতে চোখ বুলিয়ে নিলেন। এসব আদেশপত্র বেরুবার আগেই বোর্ডের মিটিং-এ গঙ্গাধরের তৈরী পারস্পেক্টিভ্ প্ল্যানটা পাশ করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। গঙ্গাধর এতদিনে ধরতে পারলেন, রূপেশ্বর ইদানীংকালে পারস্পেক্টিভ্ প্ল্যানটার ওপরে এত বেশী জোর দিত কেন? তিন মাসে আর যা-যা ঘটেছে, ফাইলপত্র-চিঠি ঘেঁটে সেগুলো বুঝে নিলেন গঙ্গাধর। এ তিন মাসে বহু চিঠি লিখেছে রূপেশ্বর। আমার অনুপস্থিতিতে তবু কিছু কাজ করেছে। গঙ্গাধর হিসেব করে দেখলেন, এক হপ্তা পরেই তাঁকে দিল্লী ফিরে যেতে হবে। কে কি কাজ করছে, তা একটু দেখে নেবেন ভাবলেন। কিন্তু তার কি আর কোন প্রয়োজন আছে? এখন কাজ যা হবে, তা রূপেশ্বরের নির্দেশেই হবে—সামলাবে দীপক সান্ন্যাল। রূপেশ্বরের চোখে সেই সবচেয়ে যোগ্য লোক। নিজের মনেই একটু হাসলেন। হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

যাবেন না ভেবেও পুরনো অভ্যাসমত ফ্যাক্টরিতে একটা চক্কর মেরে এলেন। গঙ্গাধরকে দেখে সবাই একটু থমকে দাঁড়াল। দু-চারজন হয়ত কিছু বলবে বলে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু কি ভেবে বলতে পারল না। ছুটে পালাল। বিভিন্ন শপে গেলেন। তখন দশটা বেজে গেছে; কাজ করতে করতে শপ্-ইন্-চ ´ এগিয়ে এলেন। ইঞ্জিনীয়াররাও কি যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু একটি শব্দই তাদের মুখ থেকে বেরিয়ে এল—স্যর, আপনি? গঙ্গাধর মাথা নাড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন—কাজ ঠিক-মত চলছে ত? মাথা নেড়ে তাঁরা সাড়া দেয়। গঙ্গাধর বুঝতে পারেন, প্রতিবাদে আর বিক্ষোভে এরা সব ফেটে পড়ছে। এই সময়ে সামান্য একটু উস্কানি দিলে গোটা ফ্যাক্টরিতে আগুন জ্বলে উঠবে। কাজ এরা ভালবাসতে শিখেছে বলেই গঙ্গাধরকে এত ভালবাসে। সেটা ত ক্ষোভের কথা নয়, আনন্দের কথা। এইটুকুই গঙ্গাধরের পুরস্কার।

ঘরে ফিরে এসে পি, এ.-কে তিনি একটি চিঠি ডিক্টেক্ট করলেন। সর্বশেষ আদেশপত্রের রেফারেন্স দিয়ে লিখলেন—আগামী সপ্তাহে নির্ধারিত দিনে তিনি দিল্লী ফিরে যাচ্ছেন। টাইপ করা চিঠিটায় সই করে ওটা দিল্লীতে পাঠিয়ে দিতে বলে রূপেশ্বরের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

রূপেশ্বরের কোন ভাবান্তর নেই। আগের মতই আন্তরিকতার সঙ্গে

তিনি গঙ্গাধরকে আহ্বান জানালেন—আও, আও! কালকে এসেছ আমি জানি, একবার ভাবলাম যাই। পরে দেখলাম অনেক রাত হয়ে গেছে। বল, কেমন কাটালে তিন মাস, কৈসে বিতায়া ভই?

গঙ্গাধর একটু মুচকি হেসে বললেন—খুব ভাল। এখানে এসে দেখছি, আপনি আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, ভালই করেছেন।

—আরে ভাই কেয়া কহুঁ। বলে সাত কাহন শুরু করলেন। তুমি ছাড়া ফ্যাক্‌টরি কি করে চলবে, দিল্লীকে বলে বলে হয়রান। কিন্তু—

গঙ্গাধর বাধা দিলেন—কিন্তু দিল্লী কিছুতেই শুনল না, কেমন? থাক, ওসব কথা। আমি আগামী সপ্তাহে চলে যাচ্ছি।

—সে কী? মিনিস্ট্রি তুমকো তিন মহীন টাইম তো দিয়া হ্যায়—।

—না, গঙ্গাধর একটু রূঢ় স্বরেই বললেন। যেতে যখন হবে, সাত দিনই যথেষ্ট। মৈত্রেয়ী ও আমার ছেলে সন্দীপ এখানেই থাকবে। সন্দীপের ফাইনাল ইয়ার। ওকে নিয়ে আর টানাটানি করতে চাই না।

—ও তো ঠিক বাত হ্যায়। কৌই বাত নহী। ছয় মাস ত তোমার কোয়ার্টারেই থাকতে পারবেন বহীনজী।

গঙ্গাধর গম্ভীর স্বরে বললেন—আমি না থাকলে মৈত্রেয়ীও এখানে থাকবে না। কাছে-পিঠে দু-খানা ঘরের একটা বাড়ি পেলেই ওদের হয়ে যাবে। আমি এখন একা যাচ্ছি। দেখি এর মধ্যে ব্যবস্থাপত্র ঠিক করে ফেলতে পারি কি না। দু-তিন দিনের বেশী সময় লাগার কথা নয়।

রূপেশ্বর সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন—আমি ত ভাবছিলাম, তিন মাস পরে যাই হোক একটা ব্যবস্থা হতে পারত।

গঙ্গাধর এবার কঠিন স্বরে বললেন—না, তার প্রয়োজন হবে না।

সাত দিনের মধ্যেই দিল্লী যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেল। গঙ্গাধরের কথার নড়চড় হবার উপায় নেই।

ছয় দিনের দিন বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হল গঙ্গাধরকে। সে একটা দেখবার মত দৃশ্য। ফুলের মালায় ভরে গেছে, এক একটা মালা ছয়-সাত ফুট লম্বা। প্রত্যেকেই মালা পরাল গঙ্গাধরকে—ঝাড়ুদার থেকে অফিসাররা। সবায়েরই চোখ ভেজা, কারুর কারুর চোখে জল। সবার চোখেমুখে প্রতিবাদের চিহ্ন স্পষ্ট। সবাই এক বাক্যে যেন বলতে চাইছে, কেন এ ঘোর অবিচার? কে এবং কারা এ অবিচার করতে সাহস পায়? আপনি একবারটি বলুন যে, ওরা আপনার প্রতি অন্যায় করেছে। আমরা আগুন ধরিয়ে দেব, আগুন জ্বলবে সারা ফ্যাক্‌টরিতে। সে আগুনে রূপেশ্বরকে আমরা জ্যান্ত আহুতি দেব। শুধু একবারটি বলুন। আপনি, একবারটি বলুন।

গঙ্গাধরের সম্বন্ধে কেউ কিছুই বিশেষ বলতে পারল না। বলতে উঠে

দু-একটা কথা বলতেই স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে, দু-চোখ জলে ভরে যায়। এ দৃশ্য দেখে রূপেশ্বরই কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বলতে উঠে তিনিই অনেক কথা গড় গড় করে মুখস্থের মত বলে গেলেন। বললেন, প্রত্যেকটি শপে গঙ্গাধরের হাত। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে, কর্মীর মধ্যে গঙ্গাধরের প্রভাব। এ ফ্যাক্টরির ইতিহাসে গঙ্গাধর চ্যাটার্জীর নাম অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে। এই বিদায় সংবর্ধনায় মৈত্রেয়ীকে দেখা যায়নি। অনেকেই তাঁকে নিয়ে আসতে গিয়েছিল, কিন্তু পারেনি।

বাড়িতে ফিরে গঙ্গাধর শুধু একটি কথা বলেছিলেন—দেখো মৈত্রেয়ী, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হলাম না, এতে আমার কোন দুঃখ নেই। দুঃখ শুধু এই যে, ওরা আমাকে আমার নিজের কাজের ফিল্ড থেকে সরিয়ে নিল।

মৈত্রেয়ী একেবারে নীরব। চুপচাপ বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে আস্তে-আস্তে বললেন—হ্যাঁ, কিছু দিনের জন্যে হয়ত তাই। দেখো, আবার তুমি তোমার কাজের ফিল্ড ফিরে পাবে, এখানে নয়, অন্য কোথাও।

গঙ্গাধর স্তব্ধ হয়ে মৈত্রেয়ীর দিকে চেয়ে থাকেন। মৈত্রেয়ীর দু-চোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারা নেমে আসে।

॥ পঁচিশ ॥

বাইরে মেঘ করে এল। সূর্য প্রায় ডুবি ডুবি। মেঘের আড়ালে রঙ ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাইরে এসে সন্দীপ সেদিকে তাকিয়ে ছিল। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের আমেজ উপভোগ করতে হলে কোন হোটেলেরই ঘরে বসে আকাশ দেখা সম্ভব নয়। ব্যাঙ্গালোরের এ হোটেলও এর ব্যতিক্রম নয়। সন্দীপ তাই বাইরে এসেই বসল।

সাজান-গোছান সুশোভিত ব্যাঙ্গালোর। জাভার ও নানা দেশের বিশাল গাছ। মহীশূরের রাজার আমলে মালীদের তাই খুব কদর ছিল। সারা মহীশূরই ভরা ছিল নানা বাহারী ফুলে। এখন ফুলের চেয়ে বড় বড় গাছেরই কদর।

জগজীবন রামের মৃত্যুতে দপ্তর ছুটি। সন্দীপ বেকার বসে আছে, হাতে কাজ নেই। প্লেনে যেতে হলে সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। ভেবেছিল শনিবারে কাজ সেরে রবিবার ফিরে যাবে দিল্লীতে। তা আর হবার নয়। এই সব চিন্তার আড়ালেই আকাশ মেঘলা হয়ে এল, ঠিক যেন ওর মনের মত। আজকাল কাজের বিরাম নেই, আকাশ দেখার সুযোগও তাই হয় না। হোটেলের নীচে এক পাশে বিরাট লনে বসার জায়গাটা ভারি সুন্দর। গরমকালে অনেকে বিয়ার নিয়ে বসে। যারা নীচে আসে, তারা একটু নিরালা পরিবেশ চায়। দু-চারজন যারা বসে ছিল, মেঘলা আকাশ দেখে ভেতরের ডাইনিং হলে চলে গেল। বৃষ্টি পড়লেও সন্দীপ উঠবে না। মনটা বড় অশান্ত। ভিজলে যদি মনের একটু শান্তি হয়! বিজনেস্ বেশ ভালই হচ্ছে। অশান্তিটা সেজন্যে নয়। নিজের ব্যক্তিগত জীবনের কথা ভেবেই এ অস্থিরতা।

আজকালকার দিনে প্রায় সবারই দু-চারজন বান্ধবী থাকে, তা নিয়ে কারুরই মা-বাবা আজকাল ভাবে না। সময় কাটাবার আধুনিক এই রীতি-নীতিকে সমাজ মেনে নিয়েছে। আগের দিনের মত এনিয়ে আর কেউ কটাক্ষ করে না, উঁকিঝুঁকিও মারে না। গোপন করলেও কারুর কোন ক্ষতি নেই।

মা-বাবা সারাজীবন লোকজন ঘেঁটে আর অমানুষিক পরিশ্রম করে এখন একটু নিরালায় ঘরোয়া পরিবেশে থাকতে চান। লোকজন এলে আগের মতই খুশী হন; আলাপ-আলোচনায় আধুনিক যুগের প্রতি সমর্থন প্রকাশ পায়। ওঁদের দু-জনের মনের আড়ালে অন্য কোন স্বপ্ন। সন্দীপের জন্যে হয়ত এমন একটি মেয়ে ঘরে আনতে চান, যাকে নিয়ে সমাজ হয়ত গর্ব করবে না, কিন্তু সবাই সুখী হবে। অলকাকে দিয়ে মা-বাবার আকাঙ্ক্ষা কী পূরণ হবে? বাবা হয়ত কিছু বলবেন না। মা বলবেন, তোর যা পছন্দ, আমারও তাই। সন্দীপ ভাবে, ঘরের বউ ঘরকে ভালবাসতে না পারলে, ওঁরা মনে কষ্ট পাবেন। সন্দীপ মা-বাবাকে এ বয়সে আর কষ্ট দিতে চায় না। অথচ কি যে উপায়, সন্দীপ ভেবে পায় না। অলকাকে ভালবাসা যায়, ভালবাসতে ভালও লাগে, কিন্তু ঘরের বউ করে আনা যায় কি না, সন্দীপ এখনও অতটা তলিয়ে দেখেনি।

অগ্নিশিখা দূর থেকেই দেখতে সুন্দর। মনের অন্ধকারে সেই দ্যুতির এক দুর্বার আকর্ষণ! সন্দীপ ভাবে, পড়াশুনোর জগৎ নিয়েই ত সে থাকতে পারত। কিন্তু কলেজে উঠে ওদিকে আর মনই গেল না। হঠাৎ-ই একদিন নেভীতে যোগ দিল। অভিজ্ঞতাকে মূল্য দিয়েছিল সেদিন। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারও সে ভরে এনেছে, কিন্তু এতদিন পরে অসামরিক জীবনে ফিরে এসে দেখছে, এদেশে এখন দুটো জিনিসের খুব কদর, এক অর্থ,

নয় বিদ্যার। টাকা হয়ত হবে। কিন্তু এখন আর লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। সন্দীপের এ আক্ষেপকে অলকা এক কথায় উড়িয়ে দেয়। বলে, আমার নাকি সুগভীর একটা মন আছে, অতি বিদ্বানের মধ্যেও যার অভাব। অলকার এটা মোহও ত হতে পারে। ভুল ভাঙতে কতক্ষণ! মুখে যাই বলুক না কেন, সন্দীপ দেখেছে, সেমিনারে আলোচনায়, যুক্তি-তর্কে বা বইপত্র নিয়ে অলকা যখন মশগুল থাকে তখন সে অন্য জগতের মেয়ে, আনন্দে অধীর, পূর্ণতায় ভরপুর। ওর কথাটা হয়ত ঠিক, বিদ্বান ও স্কলারদের মধ্যে আজকাল একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব। একে অপরকে টেক্কা মারার সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। নীতিবোধটা এখানে স্রেফ একটা মুখোশ। অলকা হয়ত এরই পরিচয় পেয়ে শ্রান্ত ও ক্লান্ত। এদের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেই সন্দীপের কথা মনে হয়। ঘরে-বাইরে লোকজন আর প্রতিদিনের কাজের চাপে হাঁপিয়ে উঠে আমরা যেমন বন-বাদাড়, নদী-নালা ভালবাসতে চাই-এও অনেকটা সেই রকম, এক ধরনের বিলাসিতা। যদিও অলকা স্বীকার করে না।

সন্দীপের যে মন তর্ক করে, এসব যুক্তি তারই। যে মনটা যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না—সে মন মুগ্ধ হয়, আকর্ষণ অনুভব করে, সেখানে অলকা অনন্যা। অলকার চাহনিটাও ভারি সুন্দর, কাল-ঘন-গভীর চোখের মণি। অনেক সময় অপলক চেয়ে থাকে। কাকে দেখে, কার কথা ভাবে? সুরিন্দরের কথা ত নয়! সুরিন্দর সম্পর্কে অলকার মনোভাব জেনে সন্দীপ একটু অবাকই হয়েছে। সুরিন্দর ওর বহুকালের বন্ধু, তাও অলকা স্বীকার করতে চায় না।

সুরিন্দরের কথা ত অলকা খোলাখুলি বলেনি। তাহলে কি সুরিন্দরকে ওর মনে ধরেনি? তাই-ই হবে। অলকা যে ধরনের প্রাণবন্ত মেয়ে তাতে সুরিন্দরের সেখানে ঠাঁই না পাওয়াই স্বাভাবিক। তাহলে সুরিন্দর কোন্ আকর্ষণে এখানে ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে আসে? কোন্ আশায় এত দিন ধরে বুক বেঁধে পড়ে আছে অলকার সামান্য একটু সান্নিধ্য লাভের জন্যে? সোজাসুজি এর উত্তর কিন্তু অলকা দেয়নি। ঘুরিয়ে বলেছে, কথা বলার মধ্যে যথেষ্ট হেঁয়ালিপনা ছিল।

দীর্ঘদিন ওর পেছনে পড়ে থাকার নানা কারণ থাকতে পারে। হতে পারে অনমনীয় অলকাকে সুরিন্দর নিজের তাঁবে আনতে চায়, বিদুষী বুদ্ধিদীপ্ত অলকার একটু স্বীকৃতি চায়। এও এক ধরনের দুর্বলতা, এক রকমের পাগলামিও। সুরিন্দরের নানান প্রশ্নের মধ্যে সে-রকমেরই একটা আভাস পেয়েছিল সন্দীপ। সুরিন্দর সমাজের যে স্তরে উঠেছে সেই স্তরের যোগ্য সকল বিদ্বানদের মানসিকতার সঙ্গে সন্দীপের ঘনিষ্ঠ কোন পরিচিতি নেই। তবুও আচারে ব্যবহারে যেটুকু বোঝা যায়, বিদ্যার একটা আলাদা

সামাজিক মর্যাদা আছে। সন্দীপ ত সেখানে বেমানান। অন্ততঃ সন্দীপের নিজের ত তাই মনে হয়। সন্দীপ ভাবে, অলকার মন আপনা থেকে সাড়া দেয় না, সাড়া দেয় খানিকটা বীতস্পৃহ হয়েই। অনেকটা নিমজ্জমান লোকের মত খড়কে আঁকিড়ে ধরা। অলকা কি সন্দীপের মনোবল, আর সুরিন্দরের বিদ্যার আভিজাত্য দুটোই একসঙ্গে চায়? কাউকেই সে বর্জন করতে চায় না, আবার কাউকেই ধরে থাকার আগ্রহ নেই। নিজের এই বিপরীতমুখী পরস্পর বিরোধী মানসিকতা সম্বন্ধে সজাগ বলেই কি সুরিন্দরকে ইদানীং অলকার এত অসহ্য লাগে। এটা সাময়িক। কথাটা তুললেই অলকা একটু হেসে বলবে—ও তুমি বুঝবে না। ভাবখানা এই—নারী চরিত্র বোঝার সাধ্যি আমার নেই। আমি একেবারে 'র', বাস্তবিকই অলকাকে বুঝে ওঠা দায়। দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ্য অলকা। বুঝে উঠতে না পেরে সন্দীপ যদি সরে যায়, তবে সে অপরাধও সন্দীপের।

টিপ্‌টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে। সন্দীপ তবুও বসে থাকে। হাওয়া দিয়েছে। আকাশে মেঘগুলো উড়ে যাচ্ছে। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে বিকেলের আলো এখনও উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। আলোর একটু ছোঁয়াচ পেয়ে সন্দীপের মনে হল এ বৃষ্টি নিশ্চয় থেমে যাবে। দু-এক ফোঁটা মাথায়, হাতে, মুখে পড়ছে। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ ভালই লাগছে। বৃষ্টি মাথায় করে বসে রইল। পুরো ভিজে গেলে ঘরে গিয়ে কাপড়জামা পালটিয়ে নেবে। স্নান ত করতেই হবে। দুবেলা স্নান না করলে সন্দীপের চলে না। বহুদিনের অভ্যাস। কাজের শেষে ড্রিংক্‌স্ নিয়ে বসার আগে স্নান সেরে পরিষ্কার হয়ে বসা চাই। না হলে সন্দীপ ড্রিংক্‌স্ এনজয় করে না। হোটেলে ডিনার টেবিলে ক্বচিৎ-কখনও ড্রিংক্‌সের অর্ডার দেয়; বেশী পয়সা লাগে, জমিয়েও খাওয়া যায় না। বোতল রাখা থাকে ঘরে। ক্লায়েন্টদের সঙ্গে একটু ভাবসাব হয়ে গেলে তাদের নিজের ঘরেই ডাকে। নিজের ড্রিংক্‌সের প্রয়োজনে ক্বচিৎ-কখনও নীচে যায়। কাউকে খেতে বললে অবশ্য আলাদা কথা; তখন ডিনার টেবিলে যেতেই হয়।

অলকা এখন কি করছে, সন্দীপ ভাববার চেষ্টা করে। হয়ত বইপত্র আর ফাইলের মধ্যে ডুবে আছে। সুরিন্দর এল। কোন একটা বিষয় নিয়ে তুমুল তর্ক বেঁধে গেল। যদিও দু-জনের মধ্যে কী ধরনের কথা-বার্তা হয়, সন্দীপ তা জানে না। সুরিন্দরের বিদেশ-প্রীতি আর অলকার স্বদেশ-প্রীতি। এ দুয়ের মধ্যে টক্কর লাগলে শেষ পর্যন্ত কে জয়ী হবে সন্দীপ তাও অনুমান করতে পারে। অলকাকে তর্কে হারাবার ক্ষমতা সুরিন্দরের আছে, এ বিশ্বাস সন্দীপের নেই। সুরিন্দর এত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ধরে বলে মনে হয় না। তবু যে-কোন কারণেই হোক, বিশেষ একটি মহলে, সুরিন্দরের খ্যাতি আছে, বিদেশে ত বটেই, এখানেও। লোকে বলে সুরিন্দর ব্রিলিয়েন্ট। দু-জনের

চিন্তাধারার মধ্যে মতবিরোধ থাকতেই পারে। বিশেষ করে, ইদাঁনীং অলকা আর অত ভেবেচিন্তে মতামত দেয় না। নানা ফ্রাস্ট্রেশনে ভুগছে অলকা। অন্যদিকে রয়ে-সয়ে মতামত দিতে অভ্যস্ত সুরিন্দরের এটা চোখে লাগে। অপছন্দ হলেও ভালবাসার খাতিরে অনেক কিছুই নীরবে সহ্য করে।

পরাজয় কাকে বলে সন্দীপ জানে না। কৃতী যোদ্ধা বলে ওর সুনাম ছিল একদিন। অভাবনীয় সংকটে মাথা ঠিক রেখে শত্রুকে পরাজিত করার জন্য খেতাবও পেয়েছে সন্দীপ। সুরিন্দরকে কাত করা সহজ। তাতে কী অলকা খুশী হবে?

যতই অলকার কথা ভবতে থাকে ততই অলকাকে দেখতে ইচ্ছে করে। মঙ্গলবারের আগে ত দিল্লীতে ফেরা যাবে না। এবার একটা কিছু করতেই হবে। কিন্তু কি করবে, কিভাবে করবে ভেবে পায় না। দু-নৌকোয় পা দিয়ে আর কতদিন চলবে। অনেক ভেবেও তার কূলকিনারা পায় না। অন্ধকার হয়ে এল। সন্দীপ উঠে পড়ল। স্নান সেরে একটু রাম খাবে। বড় ক্লান্ত, মন বিষাদ।

এদিকে অলকাও দিল্লীর আকাশের দিকে তাকিয়ে। মনটা বিবস, অনড়। কাজে অনীহা, গতি শ্লথ। মন ও মেজাজ খারাপ। গণেশ টাওয়ার ফাউণ্ডেশন্ থেকে বাবা যে পদত্যাগপত্র দিয়েছেন, তিনি সেটা অলকাকে বলেননি। এড়িয়ে গেছেন। এ নিয়ে অলকা দু-চার কথা বলবে, রাগারাগি করবে তার জন্যেই হয়ত চুপচাপ কাজটা সেরেছেন। অলকার বক্তব্য, সরে এলেই কি সমস্যার সমাধান হয়? কোন কিছু যদি বাবার পছন্দসই না-হয়, তবে তিনি সে সম্বন্ধে বলবেনই বা না কেন? সব সময় সব ব্যাপারে কেন এত কম্প্রোমাইজ করেন, বুঝে পায় না অলকা। গণেশ টাওয়ার করে দেশের বা দশের আদৌ কোন উপকার হবে কি না, এটাই বাবার প্রশ্ন। ভবিষ্যৎ নিয়ে বর্তমানে কেউ যখন আর অত ভাবছে না, তখন বাবাই-বা অত দুর্ভাবনায় পড়েন কেন? অপছন্দ হলে প্রতিবাদ কর, পথের ভুল হলে তাকে সংশোধন কর। তা না, চুপিসাড়ে সরে দাঁড়ালেই কি সমস্যার সমাধান হবে? দেখ, গণেশ টাওয়ার করে এরা কি করতে চাইছে। এতদিন ধরে এদের সঙ্গে যুক্ত থেকে বাবা কি সেটা ভাল করে বুঝতে পেরেছেন? বাবাকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করল অলকা। এরা গণেশ টাওয়ার নিয়ে এত যে ফেঁদে বসেছে, এরা কি করছে, কারা এর পেছনে আছে? তুমি কি এসব জান?

চন্দ্রভানু ভর্মা হকচকিয়ে যান। বলেন—না, মানে, পরাঞ্জপে ত নিশ্চয় আছে।

—সে ত আমিও জানি, দশজনেও জানে। তবে এতদিন ওদের সঙ্গে কাজ করে তোমার কি লাভ হল?

—আমি ওসব জানতে চাই না। চন্দ্রভানু ভর্মা গম্ভীর কন্ঠে একটু বিরক্ত প্রকাশ করলেন।

—বাঃ, এতদিন যেখানে কাজ করলে, তারা কি করতে চাইছে তা তুমি জানবে না, বুঝবে না। এটা আবার কি ধরনের কথা।

—আহাঃ, তুই বুঝতে পারছিস না কেন, অলকা। আমি ত শুরু থেকেই ওসব জানতে চাইনি। শেষ দেখার প্রশ্নই ওঠে না।

—কেন, দেখলে ক্ষতি কি? অলকা চন্দ্রভানুকে চেপে ধরে।

—যাদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারি না তুই ত জানিস, তাদের সঙ্গে কাজ করা আমার স্বভাবে নেই। ভেবেছিলাম, পরাঞ্জপে তার কাজ করার রীতিনীতি পালটাবে, কন্‌ক্রিট্‌ কিছু একটা করবে। পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনার নামে আমরা যে বিশাল ফাঁদ পেতে বসেছি, এতে দেশের লোকের অবস্থার বিশেষ কিছুই সুবিধা হচ্ছে না, এও সেরকমই একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, এটাতে সফিস্‌টিকেশন্‌ দেওয়া হয়েছে। বিদেশ থেকে বড় বড় মহা-রথীদের আনা হয়েছে, রাত দিন তাঁরা খাটছেন। কিন্তু কেন? পরাঞ্জপে এদের দিয়ে যা করাতে চাইছে, তা কি আমি, পুলকেশ, রামদেওধর বা আমাদের দেশের ইঞ্জিনীয়াররা করতে পারতাম না।

অলকা বলল—নিশ্চয় পারতে। দুর্গাপুর স্টীল ফ্যাকটরির বিরাট বড় অফিসর সেদিন যা বলেছিলেন, তা কেন ঘটে, বলতে পারবে? তিনি বলেছিলেন, দেখুন, আমরা এখানে সফিস্‌টিকেটেড্‌ স্টীল তৈরী করি। পলিসি চেঞ্জ করে ক'বছর ধরে এরা এ ধরনের স্টীল বাইরে থেকে আনাচ্ছে। ফলে আমাদের তৈরী স্টীল গুদামে পড়ে আছে। রেলওয়ের থেকে আমরা বরাবরই বড় বড় অর্ডার পাই। কি হল, কে জানে, তারাও অর্ডার দেওয়া বন্ধ করে দিল। আমাদের কাছ থেকে আর তারা স্টীল কেনে না। আমাদের কোন কিছু করার নেই, এইভাবেই চলবে। তুমি কী বলতে চাও, এরকম একটা ভুল আত্মঘাতী পলিসির জন্যে ভদ্রলোক রাতারাতি রিজাইন্‌ করে বসে থাকবেন? তুমি কী বলতে চাও, অন্য কারুর ভুল পলিসির প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি তাঁর কাজে ইস্তফা দেবেন? তিনি যদি পদত্যাগ না করেন, তাহলে কি তিনি মরালী অন্যায় করলেন? যারা দেশের কথা না ভেবে দেশের এত বড় ক্ষতি দিনের পর দিন করে যাচ্ছে, তাদের ত কেউ কিছু বলে না। তাদের এই সর্বনাশা পলিসির বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হয় না। তারা দিব্যি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়িয়ে যাচ্ছে। ভোগ সুখে আছে, বিদেশ ভ্রমণ করছে। দেখ গিয়ে বছরে হয়ত দু'দশবার বাইরে যাচ্ছে। তুমি কী বলতে চাও শুধু সাফার করবে সেই মানুষটা যে প্রডাক্‌শন্‌ করে বিক্রি হচ্ছে না বলে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে? এ হয় না বাবা। আমি শুধু বলতে চাই, এত বড় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐ অফিসরটি কেন হৈ-চৈ

করলেন না, কেন রুখে দাঁড়ালেন না গঙ্গাধর মেসোর মত। তাই বলছিলাম, তুমি কেন রুখে দাঁড়ালে না? চুপিচুপি একটা চিঠি লিখে কেন ইস্তফা দিয়ে চলে এলে, আমাকে জবাব দাও!

চন্দ্রভানু খুব বিব্রত বোধ করেন। নিরাসক্ত হয়ে বললেন, আমি কোনকালেই গঙ্গাধর হতে পারব না। আমি জানি, গঙ্গাধর এইসব করতে গিয়ে নিজের মানসিক শান্তি কতটা খুইয়েছেন, নিজের উন্নতির পথে নিজেই কুড়ুল মেরেছেন। নেট লাভ, শরীর-স্বাস্থ্য ভেঙেছে। ভারত সরকার তাঁকে বড় বড় নামকরা পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং-এর বা বড় বড় কমিটি কমিশনের চেয়ারম্যানও করেনি। বড় অন্য কোন পোস্টও দেয়নি। আমি এও জানি, দুর্গাপুরে বড় মেসিন তৈরীর কারখানায় রাশিয়ান এক্সপার্ট-দের সঙ্গে ন্যায্য বিষয় নিয়ে যখন লড়েছিলেন, তখন ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ ছিলেন ইণ্ডাসট্রিয়াল মিনিস্টার, তিনি তাঁকে কোনরকম সমর্থন জানাননি। গঙ্গাধর কিন্তু রাশিয়ান এক্সপার্টদের ছেড়ে কথা বলেননি। যখন দেখলেন, তারা কোনরকম কাজ করছে না, কাজ শেখাচ্ছে না, দিব্যি আরামে আর আয়াশে দিন কাটাচ্ছে, শুধু দেশের অর্থ ধ্বংস করছে, তখন গঙ্গাধর ব্রিটিশ এক্সপার্টদের বেলায় যা করেছিলেন, তাই করলেন। এতটুকু দ্বিধা না করে রাশিয়ানদেরও এক এক করে তাড়ালেন। কিন্তু কি লাভ হল? দেশের পলিসির সঙ্গে এ ধরনের কার্যকলাপের মিল হল না। শেষে ফকরুদ্দিনের সঙ্গে ঝগড়া করে কাজ ছেড়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে বসে রইলেন। এই ত লাভ?

চন্দ্রভানু একটু থামলেন। চোখেমুখে তাঁর আগুন জ্বলে উঠল। দৃঢ় প্রত্যয়ে তিনি বললেন—গঙ্গাধর, নিজের কথা না ভেবে, কোনদিকে না তাকিয়ে এসব করেছেন। আমি তোকে বলছি, সব ব্যাপারটা জেনে, আমি ভেবেছিলাম, গঙ্গাধর যদি অনুমতি দেয়, তাহলে আমি নিজে রাষ্ট্রপতির কানে এ-ব্যাপারটা তুলব। সেদিন আমার কিছু করার সুযোগ ছিল। আমি তখন রাষ্ট্রপতির একটা কাজ করছিলাম। কিন্তু কিছুই করিনি। কোনরকম কথা বললে পাছে গঙ্গাধর আমাকে ভুল বোঝেন। মানুষটার সম্মানে আমি টু-শব্দটি করিনি। শুধু ঘটনাগুলো নীরবে দেখে গেছি। সেই যে মানুষ গঙ্গাধর, তার সঙ্গে তুই আমার তুলনা করছিস, অলকা? অনেক কিছু না জানার এই এক মস্ত সুবিধে। মুখে যা আসে, তাই বলে ফেলা যায়। চন্দ্রভানু এবার চুপ করলেন।

চন্দ্রভানুকে গম্ভীর দেখে অলকা একটু অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল—না, গঙ্গাধর মেসোর সঙ্গে আমি তোমার তুলনা করতে চাইনি। আসলে দুর্গাপুরের অবস্থা শুনলাম এখন আরও শোচনীয়। নানারকম ইউনিয়ন, কথায় কথায় দাবী আর কর্মীদের হাত তোলা ত আছেই। কাজ না করার

চিরাচরিত রীতি দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছে, সেদিকে কারুরই কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। অফিসররাও হয়েছে সব তেমনি। হচ্ছে-হবে করেই সময় চলে যাচ্ছে। কেউ প্রতিবাদ করতে চায় না। আদৌ পারে কিনা সন্দেহ আছে। আমি তাদের সঙ্গেই গঙ্গাধর মেসোর তুলনা করতে চেয়েছিলাম। তুমি গঙ্গাধর মেসোর বন্ধু বলেই তোমার কথা এসে পড়েছিল। কারুর সঙ্গে তুলনা না করেই বলছি, ভবিষ্যতের জন্যে আমরা সবাই যদি সব কিছু ছেড়ে দি, তাহলে কি— ?

চন্দ্রভানু বললেন—আমরা সবাই আসল কথাটাই ভুলে যাই। তোকে আমি বলছি, পরাঞ্জপে খুব পাওয়ারফুল একটা শক্তি। এরা ডিসস্ট্যাবিলাইজেশনের যে ধুয়ো তুলছে, এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন সত্যি আছে। আর থাকবেই বা না কেন, এ দেশ এগোক, এদেশের সত্যিকারের উন্নতি হোক, পৃথিবীর সেরা শক্তি হিসাবে ভারত একদিন দাঁড়াক, সেটা কেউই চায় না। না, বৃহৎ শক্তি, না তাদের সহযোগীরা। তলে তলে এরা সবাই একজোটে শত্রুতা করে যাচ্ছে। সেটা আমাদের বুঝে সেইমত কাজ করে যেতে হবে। যাহোক তাহোক করে কাজ করে যাওয়াটাকে বেশী মূল্য দেব, না, বাঁচার জন্যে যা-যা করণীয় তা করতে শক্তি সঞ্চয়ে আরো বেশী মন দেব এটাই আমার প্রশ্ন ? পরাঞ্জপে ভাবছে, শক্তির একটা সিম্বল খাড়া করে দিলেই সে দেশকে আত্মশক্তিতে জাগিয়ে তুলবে। এটা অনেকটা পেনিসিলিন ইন্‌জেকশনের মত। এত সহজ নয়। সাধারণ মানুষকে দেখ, সারা জীবনের সাধনাতেও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। আমাকে কী ধরে নিতে হবে, অত্যাশ্চর্য একটা গণেশ টাওয়ার খাড়া করলেই দেশ আবার জেগে উঠবে ? সিম্বলই বড়, মানুষ কিছু নয় ? এ ভ্রান্ত ধারণার সঙ্গে আমি সহমত নই, কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারছি না। আসল কথা বোঝা ত দূরের কথা ; কিছু না-বুঝেই পরাঞ্জপে যা তা করে যাচ্ছে, আর তা নিয়ে শুধু তার অহংকারই বাড়ছে। এসব দেখে শুনে বুঝলাম গণেশ টাওয়ার গড়ে তোলে সেইসব লোকরা, সেইসব ব্যুরোক্র্যাটরা, সেইসব নেতারা, যারা ভাবে, দৃঢ় বিশ্বাসও বলতে পারিস, এ দেশের লোকের সামনে কোন একটা ধর্মের ধুয়ো তুলে দিলেই কাজ হয়ে যায়। গণেশের এই সিম্বল দেখিয়ে যদি এদের একবার একত্রিত করা যায়, তাতেই ঋদ্ধি ও সিদ্ধি দুই-ই হবে। এদের মতিভই সর্বনেশে। এরা যা চাইছে, তারই মূল্য বেশী। জনগণের স্বার্থ এরা ততটুকুই দেখে, নিজের কার্যসিদ্ধি করতে যতটুকু প্রয়োজন। পরাঞ্জপে আমার কাছে তাই মস্ত এক অপরাধী। এবার তোর অন্য প্রশ্নের উত্তর দেব। বলে একটু থেমে কি যেন চিন্তা করে বলতে শুরু করলেন। তুই যেসব অফিসরদের কথা বলছিস, তারা অন্যায় দেখে রুখে দাঁড়ায় না, তাদের আমি দেশদ্রোহী বলি। তেমনি গণেশ টাওয়ারের

মত নন-ইস্যু নিয়ে যারা মাতে আর এলাহী চালে কোটি কোটি টাকা পাবলিক মানি বরবাদ করে, তাদের আমি এদের চেয়েও বড় দেশদ্রোহী ভাবি। আমি আর কম্প্রোমাইজ করতে পারলাম না, অলকা। তুই আমাকে ক্ষমা কর। চন্দভানু আর দাঁড়ালেন না। নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন।

চন্দ্রভানুর পদত্যাগ পত্রের কপি অলকা দেখল না। মার সঙ্গে এনিয়ে কোন আলোচনা করল না অলকা। দিদি বাবাকে সমর্থনই করেছে। বলেছে, বাবা এতদিন কি করে এদের সঙ্গে লেগে ছিলেন, সেটাই আশ্চর্য লাগে, অলকা। অলকা শুধু মাথা নেড়েছিল, কিছু বলেনি। বাড়িতে সবাই অলকার প্রতিবাদ আর বিরুদ্ধ মতামত শুনতেই অভ্যস্ত। অলকা কিছু না বললেই বরং সবাই ঘাবড়ে যায়।

চন্দ্রভানু স্কাল্পচার ছেড়ে ক'দিন ধরে গেল্টিং নিয়ে খুব মেতে রইলেন। অলকা বুঝতে পারে, বাবার মনে এখনও ঝড় বয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদের এও একধরণের নমুনা। বাবাকে দেখে দেখে অলকা অভ্যস্ত।

এই ঘটনায় অলকার মনেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অলকা ভাবে, সুরিন্দরকে ডেকে বলে দেবে সে যেন এ বাড়িতে বা কলেজে অলকার সঙ্গে আর দেখা না করে। তাতে কী সন্দীপকে আরও কাছে পাবে? সন্দীপের ব্যক্তিত্বের যেটুকু পরিচয় অলকা পেয়েছে, তাতেই মনে হয়েছে সন্দীপের মধ্যেও গঙ্গাধর মেসোর একটা সুপ্ত প্রজ্বলিত শিখা আছে। ভাঙবে তবু মচকাবে না। সুরিন্দরের সঙ্গে আলাপ করেছে। সুরিন্দর তাকে কায়দা করে বুঝিয়েও দিয়েছে যে সে অলকার অনেকদিনের বন্ধু। অলকার ওপরে তার দাবীই সর্বাগ্রে। অলকা তাকে নাকি এমন ইন্‌স্পিরেশন্‌ দিয়েছে যে ভক্ত হনুমানের মত এক লাফে সোজা ভারতবর্ষের মাটিতে। এখন কার দাবী বেশী, সন্দীপই ঠিক করুক।

সেদিন হালকা চালে অলকাকে যেসব কথা সন্দীপ বলে গেল, তার মধ্যে যথেষ্ট সংযম ছিল। ঈর্ষার একটা দাবানলও ধিকিধিকি জ্বলছিল। সন্দীপ এই প্রথম ভাবছে অলকাকে ভালবাসা যায় কিনা। ভালবেসে সে কী হারাবে, কতটুকুই বা তার লাভ, খতিয়ে দেখছে? সন্দীপ, এসব প্রশ্নের উত্তর আমি ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না। আমিই তোমাকে বলে দিচ্ছি, আমাকে পেলে তুমি ঠকবে বেশী। তবু দেখ, কী বিচিত্র নারীর মন। এসব জেনেও তোমার মন নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলছি। যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন করছি? তার উত্তর আমিও জানি না। শুধু জানি, ছিনিমিনি খেলছি। আর জানি না বলেই বোধ হয় মনে এত সংশয়, এত ব্যথা। বাবা কেন প্রতিবাদ করতে পারেন না, নিঃশব্দে কেন পদত্যাগ পত্র দিয়ে আসেন, এ প্রশ্ন আবার আমিই করি। অথচ কি দুর্ভাগ্য দেখ, নিজেরই

প্রশ্নের সমাধান আমি নিজেই জানি না। জানি, দু-জনের মন আমি ভাওছি, সেটা কী আমার অপরাধ। আমার প্রতি দুজনের দুরকম দুর্বলতা। আর সেটা বুঝি বলেই তার সুযোগ নিয়ে আমি দু-টি হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করছি। কারণ, এ বিচ্ছেদ, আমি কেন জানি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। জানি না কেন, অকারণে মন পুড়ে যায়, শরীর জ্বলে যায়, কি এক দুর্বার অধিকারের খোঁজে আমার সমস্ত সত্তা কেঁদে ওঠে। আমি তখন আর থাকতে পারি না। মন কেঁদে বলে ওঠে, না, আমার এ অধিকার আমি কিছুতেই ছাড়ব না। ব্যথায়, বিচ্ছেদে জীবনকে মলিন করার কোন অধিকার আমার নেই। আমি সুখ চাই, ঘর চাই, সংসার চাই, ছেলেমেয়ে চাই। এমন কিছু করতে চাই, এমন একটা রিসার্চের কাজ কিংবা এমন একটা বই লিখতে চাই যা চিরকাল আদরের বস্তু হয়ে থাকবে। সন্দীপের সঙ্গ পেলে, আমি দেখেছি অনেক বলভরসা পাই। সন্দীপের সাহচর্যে আমি শতধারায় উন্মোচিত হই, শতধারায় প্রবাহিত হই। শুধু ভাবছি এই কারণে জোর করতে গিয়ে সন্দীপের জীবনটাকে দুঃখে ভরিয়ে দেব না ত। সন্দীপ এমনিতেই বড় একাচোরা হয়ে যায়। একটা ইন্‌ফিয়্যারিটি কমপ্লেক্সে ভোগে। কিছুতেই ওকে বোঝাতে পারি না, মানুষের ভেতরের শক্তিটাই বড়, তথাকথিত বিদ্বানদের এক লহমায় চুপ করিয়ে দিতে পারে। সন্দীপের সঙ্গে আমি কোন ব্যাপার নিয়ে খুব বেশী একটা আলোচনা করি না, লিখতে লিখতে লেখা বন্ধ করে ওর মতামত নিই না, বই পড়তে পড়তে বলি না, বইতে ত এই পাচ্ছি, তোমার কি মত। এইসব করি না বলেই ওর এই কমপ্লেক্স। কখনও যদি বা জিজ্ঞাসা করি, সেই একই উত্তর দেবে। ওত আমি জানি। বাবা ত সবসময় বলেন, আত্মশক্তিতে একটা দেশ গড়ে ওঠে। সেই আত্মশক্তির অধিকারী হয়ে তুমি নিজেকে এরকম কেন ভাব সন্দীপ, বেলুনের মত অতটা চুপসে যাও কেন? তোমার মধ্যে আত্ম-শক্তির মহামন্ত্র জাগাবার ক্ষমতা আমি রাখি, অহংকার করেই তা বলছি। আর এও জানি, সে সুযোগ তুমি আমায় দেবে না। আমার মনে আজ শত সংশয়। এটাই আমার ট্র্যাজেডি। এই মুহূর্তে যা আমি ভাবছি হয়ত তার আদৌ কোন অর্থ নেই সন্দীপ, তুমিই আমার একমাত্র সঙ্গী। আমার চোখের ভাষায় বুঝতে পার না, আমার মনের কথায় তা শুনতে পাও না। তুমিই আমার, সুরিন্দর নয়। বিশ্বাস কর, তুমিই আমার একমাত্র বন্ধু, আর কেউ নয়।

বাইরে ঝড় উঠল। গাছগুলো উন্মত্ত হাওয়ায় নড়তে লাগল। চারিদিকে এবার খরা। বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। মাঠে ফসল শুকিয়ে গেছে, সমস্ত উত্তর ভারতে হাহাকার। কার অভিশাপে, ধরিত্রী এমন নিষ্ফলা হয়? কে জানে? কে শুষে নেয় বৃষ্টি, অনুরাগ, সজল অশ্রুধারা? সন্দীপ কি

এখন দিল্লীতে? অনেকদিন ফোন করা হয়নি। মাসীমা কেমন আছেন?

অলকা এগিয়ে যায় টেলিফোন করতে। পর মুহূর্তে ভাবে এই ঝড়ের মধ্যে মাসীমা বা গঙ্গাধর মেসোকে বিব্রত করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না। কিন্তু মন বাধা মানে না। ওর সত্তায় আজ সন্দীপের চাহনি, তার সংলাপ। সন্দীপের গলা শুনতে পেলে হয়ত মনটা একটু শান্ত হতে পারে।

—হ্যালো, মৈত্রেয়ী ফোন তুললেন।

ভাগ্যিস গঙ্গাধর মেসো ধরেননি। ধরলে কি বলত? —আমি অলকা, মাসীমা, অলকা হেসে বলল।

—ওঃ তুমি? কেমন আছ? তোমাদের সব খবর কি? অনেকদিন আসনি। আমাদের ভুলে গেলে নাকি? দেখ ত ঝড়ে জানলাগুলো আওয়াজ করছে। ধীরেনটা যে কোথায় যায়। ফোনটা একটু ধর। এক্ষুণি আলো চলে গেলে আবার তোমার মেসোর খুব কষ্ট হবে, টেবিলে বসে কি যেন লিখছেন। তুমি একটু ধর, ছেড়ে দিও না যেন। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

—হ্যাঁ, মাসীমা আমি ধরে আছি, আপনি জানলা বন্ধ করে আসুন।

ঠক্ করে আওয়াজ হল। মৈত্রেয়ী টেলিফোন রেখে জানলা বন্ধ করতে গেলেন। অলকা শুনতে পেল, গঙ্গাধর মেসো একবার টেবিলে থেকে মাথা তুলে বললেন—কে, ওঃ অলকা। তা ও কি বলছে? দু-জনের মধ্যে আর যা কথা হল, অলকা তা শুনতে পেল না। একবার ভাবল, টেলিফোনটা রেখে দেয়। কিন্তু পরক্ষণে ভাবল, না সেটা হয়ত আরও অভদ্রতা হবে। সন্দীপ নিশ্চয় নেই, থাকলেও ফ্যাক্টরিতে কিংবা বাইরে ট্যুরে গেছে। নইলে এসে টেলিফোনটা ধরত। মাসীমার ব্যবহারটা ভারি মিষ্টি। মানুষকে প্রকৃত ভালবাসতে জানেন। অলকা সন্দীপের কথা যত ভাবে, সন্দীপ নিশ্চয় অতটা ভাবে না। অলকা জানে মাসীমা তাকে খুব পছন্দ করেন।

—হ্যাঁ, বল অলকা, এই ঝড়ের মধ্যে ফোন করছ, বাবা-মা ভাল আছেন ত?

—হ্যাঁ, ভাল আছেন, মাসীমা। তবে গণেশ টাওয়ার ফাউণ্ডেশন থেকে রিজাইন্ করে বাবার খুব মন খারাপ।

-কবে রিজাইন্ করলেন? কি ব্যাপার?

—সে অনেক কথা মাসীমা, টেলিফোনে অত কথা বলা যাবে না। বাবার রেজিগ্‌নেশনের পরে আমাদের বাড়ির টেলিফোন যদি ট্যাপ হয় ত খুব একটা আশ্চর্য হব না।

—সে ত নিশ্চয়। কোন জটিল সিচুয়েশন নয় ত? চন্দ্রভানু আমাদের খুব প্রিয়। গঙ্গাধর মেসোর যদি কোন সাহায্যের দরকার হয়, তিনি

কিন্তু—।

—জানি, মাসীমা। আসলে, কর্মকর্তাদের মতিগতি পছন্দ না হলে তাদের মুখের ওপরে রেজিগ্‌নেশন লেটার ছুঁড়ে দিতে বাবার এক মিনিট দেরি হয় না।

—ওঃ, এই। ও আর বলতে হবে না। তোমার গঙ্গাধর মেসোকে এ-ব্যাপারে কেউ বীট্‌ করতে পারবে না। বলে খুব একচোট হাসলেন মৈত্রেয়ী। সে যাক, তোমাদের খবর কি? তুমি যে আজকাল আসই না।

—ভাবছিলাম লিখতে লিখতে আটকে গেলে আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রে গিঁটগুলো ছাড়াব। লেখাও এগুচ্ছে না আর আপনার কাছে যাওয়াও হচ্ছে না। বলে অলকা একটু হাসল। শিগ্‌গীরই যাব, মাসীমা, আপনারা ভাল আছেন ত?

—বুড়ো বয়সে আবার ভালো থাকা। বেঁচে আছি বলতে পার। সন্দীপ দিল্লীতে না থাকলে আজকাল একটু ফাঁকা লাগে। ব্যাঙ্গালোর থেকে ওর মঙ্গলবারে ফেরার কথা।

-খুব ট্যুর করছে আজকাল, না মাসীমা?

—কি করবে বল? আবার নতুন করে জীবনে দাঁড়াতে গেলে একটু ত খাটতেই হবে। কাজের বহর দেখে মনে হচ্ছে অল্পদিনের মধ্যেই ও বেশ গুছিয়ে নিতে পারবে।

—হ্যাঁ, সন্দীপ দেখবেন খুব উন্নতি করবে।

—তা জানি না। তবে এটা বুঝি, খুব সহজে লোককে চটাতে পারে, বাপেরই ত ছেলে!

—গঙ্গাধর মেসোর চেয়ে সন্দীপ অনেক বেশী প্রাক্‌টিকাল্‌ মনে হয়—।

—তাই নাকি? তুমি হয়ত টের পাও। আমার কাছে সন্দীপ এখনও সেই ছোট ছেলে। কোথায় যেতে হলে যাকে সঙ্গে নিতাম, কারুর বিপদ হলে নিজের সংসার-ধর্ম ভুলে যখন ঝাঁপিয়ে পড়তাম, তখন সন্দীপই আমাকে দেখত। জোর করে টেনে আনত। বাড়িতে এনে কিছু খাইয়ে দিত। তোমার গঙ্গাধর মেসোকে আমি কতটুকু বা পেয়েছি। সন্দীপই আমার সব। বলতে বলতে মৈত্রেয়ীর গলাটা একটু ধরে এল। তাড়াতাড়ি সামলে নিলেন।

—কি চুপ করে গেলে যে। আমি বোধ হয় একটু বেশী ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম, না? তা তুমি ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। তুমি ত আর পরও নও। আমি ইমোশনাল্‌-এর ব্যাপারে খুব সচেতন, উনি ওটাকে কোনকালে প্রশ্রয় দেননি। তাই মনের যা কথা, তা আমি বড় জোর ওনার কাছেই বলি। অনেক সময় জান, সন্দীপকেও বলি না। মা ও ছেলের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দু-জনের মধ্যে একটা

দূরত্ব রয়ে গেছে। হঠাৎ হঠাৎ সেটা প্রকাশ পায়। তখন সন্দীপের কষ্ট হয় বুঝতে পারি। কি করব বল, সারা জীবনটাই ওনার সঙ্গে এড্‌জাস্ট্ করতে করতে কেটে গেল। এখন অন্য রকম হতে চাইলেও পারি না।

—আমি জানি মাসীমা। আমরা কি দিয়ে তৈরী, আমরা হয়ত নিজেরাই তা জানি না।

—ঠিক বলেছ, কবে আসছ? ঝড়টা থেমে গেল, দেখলে?* বৃষ্টি এবার ত হবেই না মনে হচ্ছে। খুব দুর্দিন আসছে, অলকা। তোমার কী মনে হয়?

—দিনকাল কবে ভাল ছিল, মাসীমা, যে খারাপ হবে।

মৈত্রেয়ী একটু হেসে বললেন—ঠিক বলেছ।

—আচ্ছা, রেখে দিচ্ছি, মাসীমা। অলকা টেলিফোন রেখে দেয়। ঝড় থেমে গেছে। অলকার মনও অনেক হাল্‌কা। সন্দীপকে নিয়ে মাসীমাদের ছোট্ট মিষ্টি সংসাব। সেখানে বড় জোর প্রতিবেশী হওয়া যায়, ওদের একজন হওয়া খুবই শক্ত।

নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ে অলকা।

॥ ছাব্বিশ ॥

গঙ্গাধরের জীবনতরী ভাসতে ভাসতে চলে। কখনও বোম্বাই, কখনও আম্বালা, কখনও বা দিল্লী। দিল্লীতে ফিরে গঙ্গাধর বড়কর্তাদের বিশেষ কারুর সঙ্গেই দেখা করেননি। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে কোন কথাও বলেননি। এ নিয়ে কেউ তাঁকে বিদ্রূপ বা কটাক্ষ করুক সেটাও তিনি চাননি, তা ঘটতেও দেননি। ফ্যাক্টরীতে কাজ করতেই তাঁর ভাল লাগে, বুরোক্র্যাসির গায়ে মিষ্টি মিষ্টি হাত বুলিয়ে নিজের খুশী মত পোস্টিং পাওয়া যায়, একথা গঙ্গাধর জানেন। কিন্তু কাউকেই তিনি কিছু বলেননি। গঙ্গাধর আলাদা জাতের মানুষ। আর পাঁচজনের মত বুরোক্র্যাসির জাল বিছিয়ে তাঁকে শায়েস্তা করা যায় না। এ জালে চুনোপুঁটিরা ধরা পড়ে, হাঙ্গর ধরা যায় না। তাকে জল থেকে টেনে তুলে আনা যায়, নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে নিরাপদ স্থানে রাখতে হয়। গঙ্গাধরকেও এক রকম টেনে আনা

হয়েছে ব্যাঙ্গালোর থেকে। এখন ঝামেলা বেঁধেছে তাঁর পোস্টিং নিয়ে। কোথায় তাঁকে রাখা যায়। গঙ্গাধরকে আর বেশীদিন ক-পীস্ করে সাজিয়ে রেখে কারুরই বিশেষ সুবিধে হচ্ছিল না। গঙ্গাধরকে সরিয়ে রূপেশ্বরের কি লাভ হয়েছিল তা কেউ জানে না। গঙ্গাধরের রেপুটেশন কিন্তু দিল্লী দরবারে শতগুণ বেড়ে গেল।

পাবলিক সেক্টরের যেসব প্রতিষ্ঠান ভাল চলছে, সেখানে গঙ্গাধরকে পাঠিয়ে কোন লাভ নেই। যেটা চলছে না, সেটাকে আবার নতুন করে ঢেলে সাজান দরকার। গঙ্গাধরকে সেখানে পাঠানোই ভালো। এতদিনে দিল্লীর ব্যুরোক্র্যাসি এটুকু বুঝেছে যে অচলকে সচল করা গঙ্গাধরের পক্ষেই সম্ভব। গঙ্গাধরকে নিয়েই দিল্লীর ওপর মহলে বেশ কয়েকটি মিটিং বসল। বিপক্ষে ও স্বপক্ষে অনেক কথা হল। শোনা গেল, দুর্গাপুরে এই ধরনের একটা ফ্যাক্টরির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করে তাঁকে পাঠান হচ্ছে। পার্লামেন্টারী কমিটি অবশ্য ঐ ফ্যাক্টরিটাকে বন্ধ করে দিয়ে সরকারের মান বাঁচানোর পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন।

অনেকের জীবনেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাঁদের কাজ শুধু গড়ে তোলা, নিশ্চিন্ত অবসরে ফল বা ফসল ভোগ করা নয়। ষাট থেকে সত্তর দশকের গোড়ার দিকে গঙ্গাধরদের মত ডাইন্যামিক্ ও কমিটেড মানুষদের কোথায় কাজে লাগালে সবচেয়ে বেশী সুফল পাওয়া যাবে, সরকার সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল বা সচেতন ছিলেন না। গঙ্গাধরেরা চিরকালই বোঝাই বয়। অচলকে সচল করে। দু-দিন নিশ্চিন্ত হয়ে কোন স্টেশনেই বিশ্রাম নিতে পারে না। গঙ্গাধরের পোস্টিং হল দুর্গাপুরে। বাংলার বাঘ বাংলায় এবার ফিরে এলেন। বঙ্গবাসী এবার বোঝার সুযোগ পেল, কাজের লোক বলতে কি বোঝায়। শুধু ইউনিয়ন খাড়া করে ইউনিয়নবাজী করলেই হয় না, আইডিয়াল থাকাও খুবই জরুরী।

ফ্যাক্টরি দুর্গাপুর স্টেশন থেকে প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ কিলোমিটার দূরে। এক বিরাট প্রান্তর। চারিদিকে ধু ধু করছে মাঠ, এখানেই ফ্যাক্টরি—কিছু শেড্ ও কিছু মেসিন। ফ্যাক্টরি জন্ম থেকেই রিকেটি। শুধু পুষ্টির অভাবই নয়, বাঁচার প্রশ্নটাই এখন বড়।

গঙ্গাধর লেগে পড়লেন। নতুন করে গড়ে তোলার কাজে। একদিন মৈত্রেয়ীকে কাছে ডেকে বললেন—কত কাজ দেখছ ত। তুমি কিছু কর।

—আমি, আমি কী করব? মৈত্রেয়ী আর এসব কাজে থাকতে চান না। অনেক শিক্ষা হয়েছে। ব্যাঙ্গালোরের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে ভেবেছিলেন আর নয়। এবার ঘর-সংসারের কাজ সুন্দর করে করবেন। ভালমন্দ জিনিস রান্না করে মানুষটাকে খাওয়াবেন। অনিয়ম করে করে গঙ্গাধর তাঁর শরীরটার আর কিছু অবশিষ্ট রাখেননি। এবার শক্ত হাতে না ধরলে

গঙ্গাধরকে আর বেশীদিন বাঁচান যাবে না। চুপ করে থেকে ভাবছিলেন এসবই মৈত্রেয়ী। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়ে এসেছেন এমনই এক ফ্যাক্টরিতে যেখানে কোন কাজকর্ম হয় না। নামেই প্রডাক্শন চালু হয়েছে। অফিসর হয়ে যাঁরা এসেছেন, সবই টিপিক্যাল সরকারী চাকুরে। যতটুকু কাজ না করলে নয় ততটুকুই। একটু বেশী কাজ করতে হলেই মাথায় বাজ পড়ে। এই ফ্যাক্টরিটাকে ত বন্ধ করতে বলা হয়েছে। একে আবার প্রাণশক্তিতে উন্মুখ করতে হলে গঙ্গাধরের প্রাণ যে নিঃশেষ হবে, এই দুশ্চিন্তায় মৈত্রেয়ীর রাতে ঘুম আসে না।

মাঠের একদিকে গোটাকয়েক স্টাফ কোয়ার্টার। আলাদা অফিস বলতে কিছু নেই। কয়েকটা কোয়ার্টার নিয়েই অফিস। ফ্যাক্টরি ছাড়িয়ে একটু দূরেই কাঁচা রাস্তা। বাজার করতে হয় দুর্গাপুরে ছোট, না-হয় আসানসোলে যাও। বেশীর ভাগ কর্মীরা ঘর ভাড়া করে থাকে; একটা ঘরে সাত-আট জনের থাকার ব্যবস্থা। শীফট্ ডিউটি বলে রক্ষে; তিন-চারজন রাতে ফ্যাক্টরিতে কাজে যায়, বাকি দুই-তিনজনের তাই শোবার জায়গা হয়। সবাইকে একসঙ্গে শুতে হলে ওরকম একটা ঘরে থাকা সম্ভব নয়। ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। মৈত্রেয়ীর রাগ-অভিমান এখনও যায়নি তাই এসব নিয়ে তিনিও কাউকে কিছুই বলেননি। কাজ যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা নিজের অজান্তেই কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। মৈত্রেয়ীরও তাই। এবার আর এসবে জড়াবেন না ঠিক করেছিলেন। কিন্তু পারলেন না। একটু ভেবে নিয়ে তাই বললেন--এখানে ত দেখছি কিছুই নেই।

গঙ্গাধর শুধু মাথা নাড়েন। তাই ত তোমাকে বলছি। এখানে আরও অনেক বেশী কাজ।

—বাঃ, তোমার মাইনে-করা লোকগুলো কি করছে?

কথা বলতে বলতে গঙ্গাধর প্ল্যান করছিলেন। বললেন—এরা ত আছেই আর থাকবেও চিরকাল। কাজের চেয়ে অকাজই এরা বেশি করে। কাজের লোক খুঁজছি। এক-আধজনকে পেয়েছিও। ভদ্রলোককে তুমি দেখে থাকবে, বেশ কাজের মানষ। অধর লাহিড়ীর মত আরও দু'একজন দরকার। আমার একার পক্ষে এতসব সামলান সম্ভব নয়। আমি দিল্লীকে এ-ব্যাপারে জানিয়েছি। দিল্লী জানিয়েছে, আমার যাকে চাই, তাকেই তারা দেবে।

মৈত্রেয়ী বললেন—তাহলে মন্দের ভাল। অধর লাহিড়ী ত তোমার কাছ থেকে এত বড় একটা সার্টিফিকেট পেলেন। মনে হচ্ছে খুবই কাজের লোক।

হ্যাঁ, ওঁর কাজ দেখে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি। ভাবছি, সিভিল ইঞ্জি-

নীয়ারিং-এর কাজগুলো ওঁকেই দেব। স্টাফ্ কোয়ার্টার, রাস্তাঘাট সবই ভালভাবে করতে পারবেন। স্টাফ্ ওয়েলফেয়ার, ফ্যাক্টরি এক্সপ্যানশন, এমন কি কো-অরডিনেশনের কাজটাও ওঁর ওপরে ছেড়ে দেব। দেখে মনে হয়, কাজের প্ল্যান করে ওঁকে বুঝিয়ে দিলে উনি খুবই তাড়াতাড়ি সেগুলো করে ফেলতে পারবেন। উনি তোমাকেও সাহায্য করবেন। কর্মীদের ওয়েলফেয়ারের একটা প্ল্যান তুমি করে ফেল।

মৈত্রেয়ী একটু হাসলেন। বললেন—ভেবেছিলাম আর ওসব নয়। ব্যাঙ্গালোরে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করতে গিয়ে শেষবেশ আমি কষ্ট পেয়েছি। তুমি ত নির্লিপ্ত। অতটা নির্লিপ্ত হয়ে আমি কাজ করতে পারি না। তা এখন কি করতে হবে বল?

—আগে একটা প্ল্যান কর ত। কি কি কাজ, আর মোটামটি কত টাকা লাগবে। তার ব্যবস্থা করতে হবে ত। হাসপাতাল, স্কুল, ক্যান্টিন যেটা আছে সেটাকে নতুন করে কিভাবে বাড়ান যায়, বাজার-হাট —সবই চাই। সবই করতে হবে। প্রতিদিনের যা যা প্রয়োজন এই নির্জনপুরীতে কর্মীরা যাতে অনায়াসে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা। ঘন ঘন আসানসোলে আর দুর্গাপুরে সবাইকে ছুটতে হবে না। একটা স্বয়ং সম্পূর্ণ ইউনিট হবে এই ফ্যাক্টরি।

কদিন একনাগাড়ে ঘুরে ঘুরে, সব তন্ন তন্ন করে দেখে মৈত্রেয়ী আগেই মোটামুটি একটা প্ল্যান তৈরী করেছেন। ভেবেছিলেন, আস্তে আস্তে কথার ছলে সেসব কথা বলবেন। এত তাড়াতাড়ি তাঁর ডাক পড়বে, ভাবতে পারেননি। মৈত্রেয়ী কাগজের সীট কটা এগিয়ে দিলেন গঙ্গাধরের হাতে।

গঙ্গাধর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন—আরে, এরই মধ্যে তুমি সব দেখেশুনে প্ল্যান করে ফেলেছ। রিয়েলি, নো কমপ্যারিসন। প্ল্যান ও এস্টিমেট ভাল করে দেখে বললেন, যা করতে চাইছ, একসঙ্গে সব করা যাবে না। আস্তে আস্তে করতে হবে। একসঙ্গে অত টাকার ব্যবস্থা করা যাবে না। এর মধ্যে থেকে যা যা না করলে নয়—সেগুলো আলাদা করে তা লিখে দাও। সবেরই কিছু ব্যাকগ্রাউণ্ড থাকা চাই। আমিও যেসব ভেবেছি তোমার ওর সঙ্গে এজেণ্ডায় ঢুকিয়ে দেব। এজেণ্ডা নোটসে গোটা ব্যাপারটা আমি বুঝিয়ে বলব; একটার সঙ্গে অন্যটার কি সম্পর্ক তা বুঝিয়ে প্ল্যান করলে এরা সহজে বুঝতে পারবে, আমি কি করতে চাই।

মৈত্রেয়ী হেসে বললেন—একটার পর আরেকটা ফ্যাক্টরি, যা চলছে না প্রায় বন্ধ হব হব, সেখানেই তোমাকে টেনে আনছে। কতদিন আর এভাবে চলবে, শুনি? আজকাল কেবলই মনে হয়, এসব অর্থহীন, কোন মূল্যই নেই এসবের।

গঙ্গাধর একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—এর অন্য আর একটা

দিক আছে। দু-চারটে এইসব ফ্যাক্টরি যদি আমি গড়ে তুলতে পারি, তবে নেতারা বুঝবে, ইচ্ছে থাকলে ও ঠিক পথে চালাতে পারলে এই ত্রিশঙ্কু অবস্থার মধ্যেও সরকারী ক্ষেত্রে ফ্যাক্টরি গড়ে তোলা যায়। ব্যাঙ্গালোর ফ্যাক্টরির ব্যাপারেই ত দেখলে। সরকার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। এখন নিজের গতিতেই ও ফ্যাক্টরি চলবে। কোন রূপেশ্বরেরই আর দরকার নেই। তা রূপেশ্বর কৃতিত্বটাই নিক এর জন্যে। শুধু একটা ফ্যাক্টরি দিয়ে এর বিচার করলে হবে না, মৈত্রেয়ী। সমস্ত দেশকে নিয়ে এর বিচার করতে হবে। নতুন কিছু করতে হলে তার শুরু নিয়েই যত ঝামেলা। এর সাকসেস্-এর ওপরই এর ভবিষ্যত। ভবিষ্যতে সরকার অনেক জিনিসে হাত দেবে, দেশের উন্নতির পক্ষে যা অপরিহার্য। পাবলিক সেক্টর নিয়ে অত মাথা ঘামাবে না, অনেক ডাইলুট্ করে আনবে। এসব চিন্তা করেই আজ আমাকে এইসব না-চলা ফ্যাক্টরিকে চালু করতে হবে। প্রফিট্ দেখাতে হবে। ইমারত একবার ঠিক মত খাড়া করতে পারলে তাকে যতই ধাক্কা মার তার যেমন কিছু হয় না, তেমনি এইসব অচল শিল্পগুলো ভারতে একবার সচল করতে পারলে, চারিদিকে এইসব শিল্পই পাবলিক সেক্টরে গড়ে উঠবে। তখন এর বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা করেও কেউ বিশেষ কিছু সুবিধে করে উঠতে পারবে না।

মৈত্রেয়ী অতশত ভাবেননি। তাই বললেন—তুমি ঠিকই বলেছ। আমি রাজি। আমার দ্বারা যতটা সম্ভব, নিশ্চয় করব।

গঙ্গাধর জীবনটাকে একরকম চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন। একই কাজ, একই অঙ্গীকার, একই বিফলতার ব্যর্থতা আর সফলতার আনন্দ বারবার তাঁর কাছে নতুন নতুন রূপ নিয়ে আসে। যেসব ফ্যাক্টরি ঠিকমত গড়ে ওঠেনি, বন্ধ হব হব প্রায়, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করে সজীব, সতেজ করে তোলার গোটা দায়িত্বটাই যেন গঙ্গাধরের। রূপেশ্বররা সব জায়গাতেই আছে। রূপেশ্বররা না থাকলে তাদের খুদে প্রতিনিধিরা আছে। তারা ক্ষমতা থাকুক বা না-থাকুক কাজে বাধা দিতে ওস্তাদ, সব সময়ই ওৎ পেতে থাকে। কাজে অনীহাও এক ধরনের বাধা। গঙ্গাধর স্থিরগতিতে এগুতে পারছেন না। মাঝে মাঝে ধাক্কা খান। তিনি হুঙ্কার ছাড়লেই তারা পালায়।

আগে সিভিল ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন রবি রায়, চিরকেলে সরকারী চাকুরে। সবই, হচ্ছে আর হবে। অধর লাহিড়ী আসায় ধড়ে প্রাণ এল, কাজ এগুতে লাগল। অল্প দিনেই তিনি বুঝে নিলেন গঙ্গাধরের কাজ করার পদ্ধতিটা। গোটা জিনিসটা ভেবে নিয়ে তিনি ব্লু-প্রিন্ট তৈরী করেন। সেটা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করার পর ফাইনাল ব্লু-প্রিন্টটা বোর্ডের সামনে পেশ করা হয়। অনুমোদন পাওয়ার পরই কাজ শুরু হয়ে যায়। একই সঙ্গে

রাস্তাঘাট, কমিউনিটি হল, অফিস ঘর, কর্মীদের কোয়ার্টার সব তৈরী হচ্ছে। কমিউনিটি হল প্রায় হল-হল। ক্যান্টিনের অত বড় বিল্ডিং-এর কাজও প্রায় সম্পূর্ণ।

ফ্যাক্টরিতেও পূর্ণ গতিতে প্রডাক্শন চলছে। গঙ্গাধরের রুটিন সেই একই। সকাল আটটার মধ্যে অফিসে হাজির। সারা দিনের কাজের চিত্রটা মনের মধ্যে এঁকে নেন। কোন কোন বিভাগে কি কি সমস্যা, তা ভেবে নিয়ে তার সমাধানও ঠিক করে রাখেন। তিনি ফ্যাক্টরি ইন্স্পেকশনে বেরিয়ে মুখে মুখে অর্ধেক সমস্যার সমাধান করে দেন। বাকীটা লিখে পাঠানঃ কি করতে হবে, কার সঙ্গে কার যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। প্রডাক্শন কেন সাফার করছে, সেগুলো কিভাবে ওভারকাম করতে হবে। আটকে যাবার কারণ নিয়ে অনেক সময় আবার শপ্-ইন্-চার্জদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। কোথায় কি গণ্ডগোল হচ্ছে তা দেখিয়ে তার সমাধানও করে দেন।

ইন্স্পেকশন সেরে গঙ্গাধর ঘন্টা দু'য়েক নিজের ঘরে বসেন। বিভিন্ন বিভাগীয় ফাইলপত্তর, নোটস, ব্যয়বরাদ্দের দাবী, অফিসরদের চিঠিপত্র, পেনডিং পেপারস সব দেখে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন সঙ্গে সঙ্গে। কোন বিভাগের কাজের সিদ্ধান্ত নিতে দেরী হওয়া, কিংবা কোন কিছুর মীমাংসা করতে দেরী হওয়ায় কাজটা আটকে যাওয়া, এরকম কোন ঘটনা ঘটে না। আর এরজন্যে গঙ্গাধরকে অপরিসীম পরিশ্রম করতে হয়। ঝড়ের বেগে ডিকটেশন দেন পি,এ,-কে। পি,এ,-রা চিঠিপত্তর টাইপ করতে ব্যস্ত থাকলে, নোট, চিঠি সব নিজের হাতেই লিখে দেন। মিনিস্ট্রি থেকে চিঠির কি উত্তর এল, তার কি অ্যাক্শন নেওয়া হল, সব খেয়াল করেন। ত্রুটি দেখলেই অফিসরদের ডাক পড়ে। ভয়ে তাদের বুক তখন দুরু-দুরু। গঙ্গাধরের কাছে ফাঁকি দিয়ে পার পাওয়া যায় না। গাফিলতির স্বপক্ষে যুক্তি দিতে যাওয়া আরও বিপদ। তাহলে, কাজের বোঝা আরও তিনগুণ চাপবে। গাফিলতির সাফাই না গেয়ে সত্য বলে ফেলাই ভাল। তাতে বরঞ্চ সুফল ফলে।

গঙ্গাধরের কোন সময়ই ফুরসুৎ নেই, কি দিনে কি রাতে। কখন কাকে নিয়ে তিনি ফ্যাক্টরির মধ্যে চলে আসবেন, কোন শপে এসে দাঁড়াবেন, কেউ জানে না। সবাই সবসময় সন্ত্রস্ত। মেসিন বন্ধ—এ তাঁর অসহ্য, ভীষণ চটে যান। পর পর এরকম অঘটন ঘটলে, তার স্বপক্ষে যথাযথ কারণ দেখাতে না পারলে সাস্পেন্ড হওয়াও বিচিত্র নয়। কর্মীরা, শপ-ইন্-চার্জেরা সব ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে; দিনে কাজ, রাতে কাজ। কাজ থেকে কারুর রেহাই নেই।

কাজের মধ্যে তিনি শৃঙ্খলা নিয়ে এলেন। সব কিছু নিয়মে বেঁধে দিয়ে গঙ্গাধর খুব তাড়াতাড়ি সুফল পেলেন। দু-বছর যেতে-না যেতেই সর্বোচ্চ

উৎপাদন ক্ষমতা দেখিয়ে ফ্যাক্টরি পুরস্কার পেল। গঙ্গাধর অঘটন ঘটাতে পারেন।

সারা ভারত থেকে রথী-মহারথীরা পুরস্কার নিতে গেছেন। গঙ্গাধর একজন পুরনো কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে উপস্থিত। কাজ ত ওরাই করেছে, পুরস্কার তাই ওরাই নেবে। আগ বাড়িয়ে তিনি নেবেন কেন?

এসব দেখে অধর লাহিড়ী একেবারে অবাক। অবাক হওয়ার আরও কারণ ছিল। সেদিন রবিবার, অনেকগুলো প্ল্যান করেছেন। ছুটির দিনে এম.ডি-র বাসায় যাওয়া ঠিক হবে কি না ভাবছিলেন। গিয়ে দেখেন, গঙ্গাধর তাঁর ডেপুটিদের নিয়ে ঘরেই অফিস ফেঁদে কাজে বসেছেন। যেতেই গঙ্গাধর অধরকে বললেন—কি মনে করে?

—কয়েকটা প্ল্যান করেছি, দেখাবার ছিল। ছুটির দিন তাই ইতস্ততঃ করছিলাম। ভাবছিলাম হয়ত একটু বিশ্রাম করছেন?

—না, আমাদের বিশ্রাম-টিশ্রাম নেই। দেখে কি মনে হচ্ছে? বাড়িও আমাদের অফিস। অধরের প্ল্যানগুলো সবাই মিলে দেখলেন। মৈত্রেয়ী দেখলেন সবচেয়ে আগ্রহ নিয়ে। এর মধ্যে ছিল স্কুল বিল্‌ডিং আর ম্যাটার-নিটি সেন্টার। একটা স্কুল আছে, শুধু নামেই, ওটাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন মৈত্রেয়ী। প্রতি বছর একটি করে ক্লাস বাড়িয়ে হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত করাই মৈত্রেয়ীর উদ্দেশ্য। এর জন্যে রাজ্য সরকারের অনুমোদন চাই, অর্থ চাই। এর জন্যেই মৈত্রেয়ী ছুটোছুটি করছেন। প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে দেখা করে প্রায় জোর-জবরদস্তি করে অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে এলেন। সব ব্যাপারেই অধর তাঁকে সাহায্য করে। মামুলি সব ম্যাটারনিটি কেস নিয়ে কর্মীদের যাতে চিত্তরঞ্জনে বা অন্য জায়গায় ছুটতে না হয় তার জন্যে ম্যাটারনিটি সেন্টার করার প্রচেষ্টা। একটা টেকনিকাল স্কুলও তাঁর খোলার ইচ্ছে, উদ্দেশ্য ঃ ফ্যাক্টরির অর্ধশিক্ষিত সেমি-স্কিলড্ কর্মীরা যাতে পড়াশুনো করে টেকনিকাল ট্রেনিং পেয়ে আরও এগিয়ে যেতে পারে। প্রস্তাবটা দিয়েছেন গঙ্গাধরই। রাজ্য সরকারের অনুমোদন ও অর্থ, দুই-ই চাই। এরজন্যে মৈত্রেয়ীর কম ছুটোছুটি করতে হচ্ছে না। কাজের পরে যে যার বাড়ী ফিরে গেলেন।

প্রতিদিনের মত অধর লাহিড়ী দিনের শেষে কাজেব হিসেব দিতে গঙ্গাধরের অফিসে এলেন। চার্ট দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কোথায় কোন্ কাজটা শেষ হবে বা কোথায় কোন কাজটা আটকে যাবার সম্ভাবনা। কর্মীদের কোয়ার্টারের কথাটাই তুলে বললেন—ওটার জন্যে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তাতে হবে না। আটকে যাব। এখন থেকে না ভাবলে কাজ বন্ধ রাখতে হতে পারে।

গঙ্গাধর শুনে বললেন—বোর্ড এম.ডি-র কোয়ার্টারের জন্যে আলাদা অর্থ

অনুমোদন করছে না?

—হ্যাঁ, স্যার। যদি বলেন ত ওটার প্ল্যানটাও তৈরী করি।

—না, ওটা এখন থাক। কালকে আপনাকে আমার ডিসিশন জানাব।

বাড়িতে এসে চা খেতে খেতে গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলেন— আচ্ছা মৈত্রেয়ী, তোমার এ বাড়িটা খুব কি অপছন্দ?

—কেন বল ত? মৈত্রেয়ী ভাবলেন, হয়ত এনিয়ে কোন কথা উঠেছে, তাই হয়ত যাচাই করে নিতে চান।

—না, আরও যদি বিরাট বাড়ি চাও, তোমাকে তা দেওয়া হবে। ভোগ করার কতটা আকাঙক্ষা আছে জানি না ত। তাই ভাবছি, যদি চাও ত এখন বলে ফেল।

গঙ্গাধরের মুখে এই হালকা মেজাজের কথাবার্তা মৈত্রেয়ী অনেকদিন শোনেননি। আগে আগে কত লোকের পেছনে লাগতেন। উস্কানি দিতেন, উল্টোপাল্টা কথা বলে নাজেহাল করে দিতেন। ক্ষেপিয়ে মজা দেখার স্বভাব। হাসি-মস্করা করার সুযোগ কখনও ছেড়ে দিতেন না। যাকে ক্ষেপাতেন, সে অনেক সময় পালিয়ে বাঁচত। উনি তখন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠতেন। শ্যালীকে পেলে ত আর কথা নেই, নাস্তানাবুদ না করে ছাড়তেন না। পিছু লাগার সময় আজকাল আর পান না।

মৈত্রেয়ী মজা পেয়ে বললেন—ভোগ করার ইচ্ছে থাকলে ত অন্য কপাল করে আসতাম।

—কেন, তোমার কপালটা খারাপ কিসের শুনি। অমন কৃতী তোমার বাপ, এমন আহামরি তোমার স্বামী—।

মৈত্রেয়ী একটু হেসে বললেন—ভোগ করার উপযুক্ত সব মানুষ ত তোমরা। ভোগ করার জন্যে মানুষের হাতে সময় থাকা দরকার। তোমাদের কারুর কি সে সময় আছে? সে যাক। তোমার চেয়েও আজকাল আমি ব্যস্ত থাকি।

—হ্যাঁ, টের পাচ্ছি। আমার বেশ কয়েকজন ডেপুটিকে তুমি দেখছি হাত করেছ। তারা তোমার কথাই বেশী শোনে। শুনলাম স্কুল, হাস-পাতাল, কমিউনিটি সেন্টারের জন্যে ঘন ঘন মিটিং করছ। আবার নাকি একটা টেক্‌নিক্যাল স্কুল খুলছ। আমাকে বসাক বলছিল, বাইরে থেকে যত টাকা ওঠাতে পারবে তার ম্যাচিং গ্রান্ট নাকি আমাকে দিতে হবে। হ্যাঁ, করতে যদি পার তবে নিশ্চয় দেব। দেখো, পাবলিক সেক্‌টর করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এর সোসিয়াল বেনিফিট বহুজনের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। সেটা করতে পারলেই এর সার্থকতা।

মৈত্রেয়ী বললেন—ওসব না হয় পরের কথা, তুমি কোয়ার্টার চেঞ্জ করার কথা ভাবছ নাকি?

—আরে না। এম.ডি-র জন্যে বড় একটা বাড়ি করার জন্যে বোর্ড টাকা বরাদ্দ করেছে। আমি প্রতিবাদ করিনি। ভাবছিলাম, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে টাকাটা অন্য কাজে লাগাতে পারি।

—কি করবে?

কর্মীদের কোয়ার্টারের জন্যে যা প্ল্যান করা হয়েছে, তা করতে হলে বরাদ্দ টাকায় কুলোবে না। দিল্লীকে ত জান, কোয়ার্টারের জন্যে টাকা বাড়াতে চট্ করে রাজী হবে না। তাই ভাবছি, এম.ডি-র কোয়ার্টারের টাকাটা কর্মীদের কোয়ার্টারের জন্যে আপাতত ব্যয় করা যেতে পারে।

—ওঃ, তাই বল। সে ত খুব ভাল কথা। এতে আমার আপত্তি হবে কেন। পূর্ণ সম্মতি।

গঙ্গাধর নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন—বেশ, আমার সিদ্ধান্ত অধরকে কাল জানিয়ে দেব।

অধর ত একথা শুনে হতবাক। এম.ডি. কোয়ার্টারের টাকা দিয়ে কর্মীদের কোয়ার্টার উঠবে? এ কোন-দেশী কথা। অধর ভাবছিলেন, ভবিষ্যতে এ আদর্শের কি কেউ কোন মূল্য দেবে?

অধর নীরবে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে গঙ্গাধর বললেন—কি, ওভাবে তাকিয়ে কি ভাবছেন? ইউ গো এহেড্। যে বাড়িতে আছি, তাতেই এখনকার মত চলে যাবে।

॥ সাতাশ ॥

নেহেরু পার্ক। বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর। সন্দীপের গা ঘেঁসে অলকা বসেছিল। পাখিদের মৃদুমন্দ গুঞ্জরণ কানে ভেসে আসে। সূর্যের সোনালী রঙে সন্দীপের মুখ উজ্জ্বল। অলকা একমনে সন্দীপের মুখখানা দেখে।

একটা শকুন শিকারের সন্ধান পেয়ে ডানা ঝাপ্টাচ্ছিল। সন্দীপ সেদিকে তাকিয়েছিল। বলল—শিকার পেলে প্রাণী-জগতের খিদেটা হঠাৎ বেড়ে যায় যেন।

অন্যমনা অলকা বলে ওঠে—খাদ্য-খাদকের সম্পর্কটাকেই বা তুমি অত বড় করে দেখছ কেন? ও ত আছেই, থাকবেও। মানুষ এই সম্পর্কের উর্ধ্বে উঠতে পারে বলেই তার আনন্দ।

সন্দীপ একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল—তুমি নানাভাবে জীবনকে আস্বাদন করতে পার, না অলকা?

—হ্যাঁ, অলকা একটু হাসল। বলল—তোমার সান্নিধ্যে আমার উন্নতি হয়েছে। অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বেড়েছে, কিন্তু শঙ্কা কাটেনি।

সন্দীপ একেবারে নিশ্চুপ। একটু ভেবে নিয়ে বলল—তোমাকে সুখী করতে পারব, এ যদি আমি জানতাম, তবে তোমাকে নিশ্চয় কেড়ে নিতাম। সুরিন্দরের বাধা কাটিয়ে উঠতে আমার খুব একটা বেশী সময় লাগবে না, অলকা।

অলকার বুকটা কেঁপে উঠল, বলল—তবে, কি বাধা, সন্দীপ? আমরা কেন সুখী হব না বল, উত্তর দাও।

—জানি না, অলকা। অনেক সময় ভাবি মজ্জাগত যে বাধা, তাকে কাটিয়ে ওঠা হয়ত একটু মুশকিল।

অলকা ম্লান হাসল—ও বুঝেছি, তোমার মা বাধা দেবেন?

—বিদুষীদের মা চিরকাল ভালবাসেন। আর তোমাকে আমি ভালবাসি জানলে, মা তোমাকে সাদরে ঘরে তুলে নেবেন, এও আমি জানি।

—সত্যি বলছ, সন্দীপ?

—হ্যাঁ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

—আর গঙ্গাধর মেসো?

—বাবাও তোমার যোগ্য স্থান দেবেন, আমার ধারণা।

অলকা আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। মনের আবেগ সামলাতে না পেরে বলে ফেলে—তবে আমি কেন অকারণে ভেবে মরি—।

—তোমার কি মনে হয়, বাঙালী-পাঞ্জাবী বলে মা-বাবার আপত্তি হবে?

—না, তা ঠিক না। হাস্যোজ্জ্বল একটি সুন্দরী বাঙালী বধূ হলেই তোমার মা-বাবা খুশী হবেন বেশী।

—ও তোমার মনের ভুল। ওসব ঝেড়ে ফেল। আমরা কবে বিয়ে করছি বল?

—সন্দীপ? অলকা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

—হ্যাঁ, অলকা। ভেবে দেখলাম, তোমার মা-বাবারও যখন আপত্তি নেই, তখন অকারণে আমরা সারা জীবন দীর্ঘশ্বাস ফেলব কেন? যা সহজ, তা যদি সহজে গ্রহণ করতে না পারি, তবে কি নিয়ে বাঁচব?

—সত্যি বলছ? আর কোন বাধা নেই। আনন্দে উদ্ভাসিত অলকা।

—হ্যাঁ, সত্যি। বল অলকা, কেন আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার ছেড়ে দেব? অকারণ ভয় আর আশঙ্কাকে কেন অত প্রাধান্য দেব?

—হ্যাঁ ঠিক। তবে—।

—আবার তবে কি? সন্দীপ প্রশ্ন করল।

—এত যে দ্বিধা, এত যে দ্বন্দ্ব, এটা কি? এসবের কারণ কি তুমি জান, সন্দীপ?

—কারণটা আমার দিক থেকেই বেশী, না! বলে সন্দীপ চুপ করে রইল।

অলকাকে বন্ধু হিসেবে ভাবা যায়, ভালবাসা যায়, কিন্তু সহধর্মিণী হিসেবে নয়। সংসারের তুচ্ছ আবর্তে, শত দাবীর টানা-পোড়েনে অলকাকে টেনে আনতে সন্দীপের মন চায় না। অথচ এ বাধা কাটিয়ে উঠতে না পারলে, অলকা চিরকাল সন্দীপকে দোষারোপ করবে, বলবে, কাপুরুষ কোথাকার। বলবে, পুরুষ হয়েও পৌরুষ দেখাতে পারেনি সন্দীপ। সন্দীপ আজ মরিয়া হয়ে তন্নতন্ন করে নিজেকে বিচার করতে থাকে। একবার ভাবে অলকাকে সব কথা খুলে বলে মনের সব জট খুলে নেবে। সব কথা সব সময় বলতে সন্দীপ অভ্যস্ত নয়। তাই শুধু বলল—তোমার দিক থেকে কি বাধা আছে আগে বল, তারপর না হয়—।

—তোমাকে আমি সত্যিই খুব ভালবাসি, সন্দীপ। বাধা যেটুকু, হয়ত এই কারণেই। তুমি কি বলবে? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, আমাকে না দেখতে পেলে তোমার ভেতরে কিছু হয়? ব্যথা করে, একা মনে হয়?

—হ্যাঁ, অলকা। বলে সন্দীপ অলকার হাত দু-টি নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে বসে রইল। অলকা আরও কাছ ঘেঁসে বসল সন্দীপকে গভীর সত্তায় অনুভব করতে। সন্দীপ অলকাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে চুমু খায়। কি এক অজানা বিচ্ছেদের আশঙ্কায় ওকে জড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ দু-জনেই নিশ্চুপ। অলকাকে আস্তে করে বাহুমুক্ত করে বলল—না, আর কোন বাধাই আমরা মানব না।

সন্দীপকে এই প্রথম এত কাছাকাছি পেয়েও অলকা দেখল আকাশ ছুঁয়ে একটা দীর্ঘছায়া নেমে আসছে। কলেজে যাচ্ছিল। সামনে অগণিত, অসংখ্য গাড়ি; সবাই উর্ধ্বগতিতে ছুটছে। কারুর হাতে এক মুহূর্ত সময় নেই। বাসগুলো লোকজনে উপছে পড়ছে। অসম্ভব এক কর্মমুখরতা চারিদিকে। অলকা গাড়িতে বসে ভাবছিল, সূর্যের রঙটা কি মনোরম! সূর্যের আলো যে দিকে, সেদিকেই অসংখ্য লোক হেঁটে যাচ্ছিল। দেখতে ভারি সুন্দর লাগছিল। মানুষের মিছিলের এক সজল পেইন্টিং। তাদের চলার দীপ্ত ভঙ্গীটা সূর্যের আলোয় অসামান্য হয়ে উঠছিল। সূর্যকে আড়াল করে ঘন ছায়া নামল আকাশ ছুঁয়ে। ছায়া মাথায় নিয়ে চলেছে অসংখ্য মানুষ; স্ত্রী-পুরুষ দুজনে হেঁটে যাচ্ছে খোলা প্রান্তর দিয়ে। অলকার কেন জানি মনে হল, জীবনের সব সজীবতা ঐ কাল ছায়া এক মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলল। এরা কিন্তু টের পায়নি। যেমন হাঁটছিল, তেমনি হাঁটছে। এইসব ভাবতে ভাবতে একটা গাড়িকে প্রায় ধাক্কা মারছিল অলকা। ড্রাইভার যা-তা

গালাগালি দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। অলকা নিজেকে সামলে নিয়ে গাড়ী চালাতে থাকল। তখনও ভেবে চলেছে। ছোট্ট ঐ একটু আলোছায়ায় আবর্তিত মনটা ওর নিজের কাছে যেন আরও স্পষ্টতর হয়ে উঠল। এ মানসিকতার কোন মূল্য দেবে না সন্দীপ, বলবে—তুমি যে আজকাল স্বপ্নলোকেই বিচরণ করছ, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখলেই প্রমাণ পাবে। অলকার মনে হল আকাশ ছুঁয়ে ঐ ছায়াটা নামার সঙ্গে সঙ্গে সন্দীপ তাকে রাহুমুক্ত করল।

সন্দীপের মুখের দিকে অলকা একবার তাকাল, একটু যেন অবিশ্বাসের সুরে জিজ্ঞেস করল—তুমি বলছিলে না, তোমার পৌরুষে আমাদের সব বাধা কেটে যাবে।

—না, ঠিক তা নয়, সন্দীপ বলল। আমি বলতে চেয়েছি, বাধা আমাদের মনে, সেটা আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি।

অলকা একটু হাসল। —জানি, মনেই আমাদের মুক্তি আর এই মনেই আমাদের গ্রন্থি। মুক্তি চাই না, গ্রন্থি চাই, তোমায় পেতে চাই। বল, কিভাবে তা সম্ভব? মনের বাধা কিভাবে কাটানো যায়?

একটু মুচকি হেসে সন্দীপ বলে উঠল—অত সিরিয়াসলি ভাবলে কোন সমস্যারই সমাধান হয় না। হিন্দি সিনেমার হিরোর মত আমারও কিছু কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে, কি বল অলকা?

—কী কাজ? সুরিন্দরকে ঘুষি দিয়ে কাৎ করবে?

—না, না। তোমার ইমাজিনেশন্ দেখছি খুব পুয়োর। ও-দিকে এ নায়ক যাবেই না। নিউ ওয়েভ সিনেমার মত নায়ক খুব চিন্তাশীল ব্যক্তি। ছোটবেলা থেকে শিখেছে, পৃথিবীর অনেক সমস্যারই সমাধান করা যায় স্রেফ উপেক্ষা করে। এ নায়ক সুরিন্দরকে সেই উপেক্ষার আগুনেই আগে দগ্ধ করবে, আর নায়িকাকে বলে দেবে সেও যেন তাই করে। এটা হল বৈষ্ণবী পন্থা। চোরের গায়ে হাত না দিয়ে জ্যান্ত তাকে একটা বস্তায় পুরে মুখটা সেলাই করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া। বিনা রক্তক্ষয়ে ব্রিটিশ সিংহের মত সে আবার ব্রিটেনে ফিরে যেতে বাধ্য হবে।

অলকা হো-হো করে হেসে উঠল। মজা পেয়ে বলে ফেলল—উপেক্ষার এত বড় ঐতিহাসিক কাহিনী তখন নিশ্চয় স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে যাবে। ইতিহাসের ক্যাপসুলেও এ-ঘটনা লিপিবদ্ধ হবে, কি বল?

—উঁহ, তা হবে না। বুঝতে পারছ না কেন, এ ইতিহাস ত সুরিন্দরের মত লোকেরাই লিখবে। রাগে-দুঃখে-অভিমানে ইতিহাসকে বিকৃত করবেই? কারুর কিছু বলার থাকবে না। সুরিন্দর তখন তিন-চারজনের অবদানই শুধু দেখবে। সবচেয়ে আগে নিজেরটা। সে নিজেকে ত মস্ত বড় এক ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্ট ভাবে। ব্যবহারিক জীবনে ঠিক উল্টো, কট্টর

দক্ষিণপন্থী। তারপরই তুমি আসবে। তুমিও কম বড় সোশ্যালিস্ট নও, 'গরিবী হটাও' করে দেশের জন্যে প্রাণপাত করে যাচ্ছ তুমি। তুমি ত শহীদ। শেষ-বেশ আমি। প্রাইভেট সেক্টরের পিট চাপড়ে টোয়েন্টি-ফাস্ট সেনচুরির দিকে তাকিয়ে দেশের স্বার্থে পৃথিবীর দরজা-জানলা আমি একে-বারে উজাড় করে খুলে দেবো। আর সেটা ঘটবে বিদ্যাবুদ্ধির অপ্রাচুর্যতার মাধ্যমে আর মিডিয়ার জাদুতে। সর্বত্রই শুধু তিন জেনারেশনের এক একটি নাম উচ্চারণ করে করে বাকি প্রত্যেকের অবদানকে একেবারে বিস্মরণের সীমায় নিয়ে যাব। সবার কথা, সবার অবদানকে সব সময় স্বীকার করলে কাজ হাসিল হয় না। দেশের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। জেনে-শুনে না জানার ভান করলে অনেক লাভ, সেটা নিশ্চয় মানবে।

—তারপর। থামলে কেন? অধীর আগ্রহে কথাগুলো শুনতে শুনতে অলকা বলে উঠল।

—তারপর বাকি থাকল তোমার ও আমার মা-বাবা। তাঁরা কি ভাববেন, কি বলবেন, ওসব ঝামেলার মধ্যে না-গিয়ে আমরা সোজা কোর্টে চলে যাব। বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষীসাবুত নিয়ে 'কিক্ ব্যাক' দিয়ে ব্যাক-ডেট ম্যানেজ করে আমরা আমাদের ফিউচার একেবারে সিমেন্টের কনক্রিটের মত বেঁধে ফেলব। দৃঢ় সংকল্পে দুটি নামের রেজিস্ট্রেশন করে ফেলব। ট্রেড্ মার্ক—অলকা ভর্মা আর সন্দীপ চ্যাটার্জীর। অলকা সন্দীপের চিরকালের দাসী। একেবারে বাধ্যের বউ। সন্দীপ যা বলবে, যেমনভাবে বলবে, অলকা তেমনভাবেই শুনবে, শুনতে বাধ্য হবে। অলকার লেখাপত্র চুলোয় যাবে। পাঞ্জাবী কায়দায় অলকা বলে উঠবে, কই বাত নহী। বাইরের জগৎ থেকে সে তখন অন্তরের জগতে প্রবেশ করতে চাইবে। বহির্জগতের সুখ তুচ্ছ করেই মানুষ অন্তর্জগতে ঢোকে আনন্দ লাভের জন্যে। শ্রীমতী অলকা তার আত্মত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রতিফলন দেখতে চাইবে তার ছেলেমেয়ের মধ্যে। ভাল জাতের বীজ। ফলনও তাই ভাল। শ্রীমতী অলকার তখন একমাত্র স্বপ্ন, তার সুপ্ত ইচ্ছা কিভাবে ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে।

—কি ব্যাপার? জিভের আড় ভেঙেছে দেখছি, সুন্দর কথা বলছ। শুনতেও খুব ভাল লাগছে।

—এ-ধরনের প্রশংসায় কিন্তু আমার খুব আপত্তি। তোমার প্রশংসার অর্থ সাংঘাতিক। আমি যেন চিরকালের ছাত্র আর তুমি চিরকালের মাস্টারনি। অবিশ্যি, প্রিয় ছাত্র যখন মাস্টানির কথা হুবহু নকল করে ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরে, মাস্টারনিও তখন আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে।

অলকা এই আলাপ-আলোচনার সব সুতো ছেড়ে দিয়ে শুধু একটি সুতো ধরে রইল। বলল—রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলেই মাস্টারনি খুশী। অনেক ত বললে। এবার কাজের কথা বল। বন্ধু-বান্ধবদের মাস্টারনি

এই সুখবরটা কবে জানাবে? আত্মীয়-স্বজনকেই বা কবে?

—আরে, এটা ত শেষ অধ্যায়। বিরাট জন সমাবেশ। ভীষণ ভিড়। ঠেলাঠেলি। সবাই অলকাকে দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। অলকাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেছে। কেউ জানত না সুরিন্দর চুপি চুপি ঘোড়ায় চড়ে এসে তোমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে সোজা বিলেতে পাড়ি মেরেছে। মহাসমারোহে তোমার শাদী হল। সন্দীপ বেচারা তখন আর কি করে। মনের দুঃখে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায় আর চোখের জল ফেলে। এসব ভুলতে গিয়ে যখন রেস্তোরাঁবাজীতে খুব মেতে উঠেছি, তখন দেখি আমার মা সদাহাস্যময়ী পতিব্রতা এক সরল বাঙ্গালী মেয়েকে আমার জন্যে ঠিক করে ফেলেছেন। বেগতিক দেখে মাকে সব খুলে বললাম। মা তাড়াতাড়ি বাবাকে বলেকয়ে নিজে উড়ো জাহাজে করে বিলেতে হাজির হলেন, সুরিন্দরকে কষে চাবুক মারবেন বলে। বল ত, কি হল? তারপর, তোমাকে উঠিয়ে এনে (বিলেতে তোমার সমারোহে বিয়ে হয়ে গেলেও মার পরোয়া নেই, মাকে জান ত, একবার যা ভাবেন, তা করে ছাড়েন) মহা-ধুমধাম করে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। কি খুশী ত। একবার না-হয় কল্পনায় এটা ভাবলে।

অলকা সন্দীপের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল—সুরিন্দরের সঙ্গে বিলেতে যাবার সময়, ভাগ্যিস, তুমি হিন্দি সিনেমার হিরোইজম দেখাওনি। নয়ত, সুরিন্দর বেচারীর ব্যারা হাল হত।

সন্দীপ হাসল। বলল—পৃথিবীতে হিরোইজম দেখাতে বদ্ধপরিকর হলে সবই সম্ভব। অবাস্তব জগতে প্রতি মুহূর্তে তা ঘটছে। ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা সেগুলোই গলাধঃকরণ করি। আমাদের আধুনিক জীবনের যে সংকট, তার থেকে উত্তীর্ণ হবার একমাত্র উপায় হিন্দী সিনেমার সেই স্বপ্নময় ভাবালুতা। সুরিন্দরকে যেমন ভাবে এন্‌টারটেন করতে বাধ্য হচ্ছ, সেইভাবে করে যাও। আখেরে ভালই হবে।

অলকাকে কে যেন সজোরে চাবুক মারল। আঁতকে উঠে বলল—কী সব বলছ তুমি? কি বলতে চাও?

—সুরিন্দর বহুদিন তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে, অলকা। তোমার ওর প্রতি এতটুকু দরদ নেই কেন, আমি সেটা ভেবেই অবাক হই।

—ও যেন কেমন ধারা। ওকে আমি ঠিক বরদাস্ত করতে পারি না।

—তা ত বটেই। ও ভারতকে ভালবাসে না। ভারতকে তুমি যেভাবে দেখতে চাও, ও সেভাবে দেখতে অভ্যস্ত নয়—এটাই কি ওর মস্ত বড় অপরাধ?

—জোঁক দেখেছ ত। সে শরীরের যে কোন একটা জায়গায় বসে শুধু রক্ত শোষণ করে যায়। তার আর কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ থাকে না।

—সব জীবেরই বাঁচার অধিকার আছে। শোষণ করেই সে তার বাঁচার অধিকার জানায়। লেগে থাকার যে প্রাণশক্তি, তাকেই বা মূল্য দেবে না কেন?

অলকা কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। সুরিন্দর যে অলকাকে কতটা ভালবাসে সেটা অলকা কোনদিনও ভেবে দেখেনি। শত মেয়ের আলিঙ্গনকে তুচ্ছ করে, অত নাম-ধাম, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি সব কিছুকে উপেক্ষা করে শুধু অলকাকে খুশী করতে সে ভারতবর্ষে ছুটে এসেছে। সন্দীপ একথা এমন করে না বললে, সুরিন্দরের এ দিকটার কথা অলকা এভাবে কখনও ভেবে দেখত না। অলকা সুরিন্দরকে ভালবাসতে পারেনি, সেটা অলকার ব্যর্থতা। সুরিন্দরের ভালবাসার তাই বলে কি কোন মূল্য নেই?

সন্দীপ বলল—কি, মনে ধরেছে, কথাটা? চুপ করে গেলে যে।

—ভাবছিলাম।

—হ্যাঁ, ভাব।

—কি, ভাবব?

—কি ভাববে, তাও আমি বলে দেব?

—সেরকমই অবস্থা হয়েছে আমার।

—খুব খারাপ অবস্থা, সময় থাকতে সাবধান হও।

—আমাদের কথাবার্তা হঠাৎ এমনভাবে ঘুরে গেল কেন, সন্দীপ? কেন তুমি আজ সুরিন্দরের কথা তুললে?

—তুলেছি, কারণ আমিও যে তোমাকে ভালবাসি, অলকা। ওর গভীর অনুরাগ আমি ঠিক উপেক্ষা করতে পারি না। ওর অনেক কিছু আমি জানি না। তবুও ওকে চিনি। চিনেছি আর যেটুকু জেনেছি তাতে শত দোষ সত্ত্বেও সুরিন্দর তোমায় ভালবাসে। তুমি সব সময়ই ওর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখ, তাতে সে কী আঘাত পায় না, বল? এটা যদি আমার বেলায় হত?

—কি বলছ, সন্দীপ? একটু চুপ করে থেকে বলল—আচ্ছা সন্দীপ, সুরিন্দরের কথা বলতে তোমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না?

—ওটা থাক। আমার কষ্টটা আপাতত না হয় নাই ভাবলাম। ওর কথাই না হয় একটু ভাবলে। হ্যাঁ, তুমি ছাড়া আর কাউকে আমিও ভাবতে পারি না। তবুও, কেন জানি না, মনে হয়, তোমার ওপর কারুর যদি সবচেয়ে বেশী অধিকার থাকে, তা সুরিন্দরের। আমার নয়। ওর ভালবাসাকে আমি অ্যাডমায়্যার করি অলকা, একথা বলতে যদিও আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

—তুমি কি আমাকে কঠিন শাস্তি দিতে চাও, সন্দীপ?

—কঠিন শাস্তি? যদি বল, তাই। দেবার আগে আমি যে কত বড়

শাস্তি মাথা পেতে নিলাম কই, সেটা ত দেখলে না।

—হ্যাঁ, কথাটা যেভাবেই বল না কেন ওরকমই দাঁড়ায়। অলকা অন্যমনস্ক হয়ে বলল।

—না, আমি সেই বাধামুক্ত হতে বদ্ধপরিকর নায়কের কথা বলছি না। জীবনকে একটু তলিয়ে দেখছি, এই যা। জেলাসি যে আমার হচ্ছে না, তা ভেবো না। কিন্তু এ জিনিসটা আমি সম্পূর্ণ একটা আলাদা পার-স্পেক্টিভে দেখবার চেষ্টা করছি। সুরিন্দরের জীবনের সব ঘটনা কিংবা ওর মনের কথা আমি কিছুই হয়ত জানি না। সামান্য একটু মিশে, ওর কথাবার্তা শুনে আমি এটুকু বুঝেছি যে সুরিন্দর জানে তুমি আমায় ভালবাস। খুঁজে খুঁজে তাই আমাকে বার করেছে। মিষ্ট ভদ্র ব্যবহার করে আমাকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে গেছে। ওর সমস্ত কথায় শুধু তুমি আর তুমি। তোমার গুণাবলীর কাহিনী। সেমিনারে ডেকে নিয়ে যাবার পেছনেও তুমি। আমি তোমাকে ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, আমি খুব বিরক্ত হয়েছিলাম। এবার ব্যাঙ্গালোরে এ-নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমার সামনে হঠাৎ আলোর দ্বার খুলে গেল। ভেবেছি, অনেক ভেবেছি, আমার কষ্ট হবে ঠিকই, খুবই কষ্ট হবে। কিন্তু তোমার ওপরে কারুর যদি অধিকার থাকে, সে সুরিন্দরের।

—আর নয় সন্দীপ, প্লীজ, চুপ কর। তোমার দাবী তুমি কিভাবে ছেড়ে দিচ্ছ, তা তুমি জান না।

—খুব জানি, একটা কথা বললে বিশ্বাস করবে?

—বল।

—আমি তোমাকে সত্যিই খুব ভালবাসি, সেটা তুমি জান?

—হ্যাঁ, আমি জানি, তা অনুভবও করি। তাই অন্য কিছু আমি ভাবতে পারি না।

—আমিও তাই। আমিও তোমায় ভালবাসি, আমার প্রকাশ হয়ত নেই। আবার এই ভালবাসা এতই বেশী, এতই সজীব যে, তা থেকে আমি তোমাকে মুক্ত রাখতে চাই। আমাকে ভুল বুঝ না। ভেবো না, আমি স্বার্থপর, শুধু স্বপ্ন নিয়ে সুখ নিয়ে বাঁচতে চাই। আমি অনেক ভেবেছি। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক চির উজ্জ্বল হয়ে থাক, তুমি আমার। চিরকালের আমার।

—আমাকে তুমি কত বড় মহৎ শাস্তি দিচ্ছ, তা যদি তুমি বুঝতে, তাহলে এত নির্বিকারভাবে একথাগুলো বলতে পারতে না। অলকা সন্দীপের হাত সজোরে চেপে ধরল। বলল—আমি যদি আর কিছুও না পারি, তোমাকে অন্ততঃ ভুল বুঝব না, সন্দীপ, এটুকু প্রতিশ্রুতি দিতে পারি। চল, রাত হল। মা-বাবা চিন্তা করবেন।

—হ্যাঁ, চল। আজকের নেমতন্নটা কি না রাখলেই নয়?

—না, চল। যে সিদ্ধান্তই আমরা নিই, কেউ যেন তা টের না পায়।

সন্দীপ আজ একটু একা থাকতে চায়। নিজের জীবনের কত বড় ক্ষতি করে বসে আছে, নিরালায় বসে তা একটু ভাবতে চায়। সমাজ কোন মানুষকেই রেহাই দেয় না। একা থাকতে দিতেও তার ভয়ংকর আপত্তি। তাই বলল—আমি ভুলে গিয়েছিলাম তুমি ছাড়াও সমাজে আরও অনেক মানুষ আছে। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য অনেক বেশী।

অলকা বলল—আমি ত সেকথাই তোমাকে বোঝাচ্ছিলাম। তোমার দুর্ভাবনা যে বেশী। তার খেসারত দিতে হবে না?

সন্দীপ হেসে বলল—খেসারত তুমিও কম দিচ্ছ না অলকা।

॥ আঠাশ ॥

গণেশ টাওয়ারের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। তিন বছরের মধ্যে এত বড় একটা কাজ শেষ করা যায়, কেউ বিশ্বাসই করেনি। শুধু পরাঞ্জপের মত মানুষের পক্ষেই এ সম্ভব। যাঁর সামান্য একটু ইশারায় শত শত মানুষ কাজে নেমে পড়ে, দিনরাত মাথা গুঁজে কাজ করে। যাঁর ইঙ্গিতে বিদেশী এক্‌সপার্টরা রাতদিন ছুটোছুটি করেন। যাঁকে খুশী করতে ভারতের সেরা ইঞ্জিনীয়াররা হামেহাল হাজির। এছাড়া আছে রাম দেওধর, পুলকেশ। সবাই এরা সময়মত শলা-পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রভানু ভর্মা পদত্যাগ করার সময় তাঁর যুক্তি ও নীতি বোধ পরাঞ্জপেকে জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর পদত্যাগ পরাঞ্জপে এখনও তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন। হ্যাঁ বা না কিছুই জানাননি চন্দ্রভানুকে। পরাঞ্জপের যুক্তি, গণেশ যেহেতু দেবতা এবং গণদেবতা, তাঁর মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে কোন মানুষেরই এর থেকে নিষ্কৃতি নেই, তা সে মজুর-মজুরনী হোক বা চন্দ্রভানুর মত শ্রদ্ধাবানই হোন।

চন্দ্রভানু পদত্যাগপত্র দেবার সপক্ষে যা কিছু লিখেছেন তা যদি তিনি প্রমাণ করতে পারেন, তাহলে গণেশ টাওয়ার তৈরী করার কোন অর্থই থাকে না। চিঠিটা বার কয়েক পরাঞ্জপে পড়েছেন। মনে মনে বেশ

ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু ক্রোধের বশে কিছু করতে নেই ভেবে চুপ করে গেছেন। আর এটা ত বাবা গণেশেরই শিক্ষা। তরী নিয়ে তীরে যখন তিনি এসেই গেছেন, তখন আর কিছুদিন যাক না, চন্দ্রভানুকে না-হয় ডেকে একটা ফয়সলা করা যাবে। কত কন্‌ট্রাক্‌টার আর কত আর্কি-টেক্‌টই ত কাজ করছে, তার হিসাব কে রাখে!

ইদানীং রামলীলা ময়দানে লোকের ভিড় লেগেই আছে। অনেকেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কেউ থমকে দাঁড়িয়ে যায়। কেউ কেউ আবার মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে। সকাল-সন্ধ্যায় অসংখ্য, অগণিত মানুষের ভীড়। কে যে এদের ডেকে আনে, কেন এত ভীড়—পরাঞ্জপে গণেশ-শীর্ষে তাঁর 'অসাধারণ' কামরায় বসে ভাবেন আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। কখনও বা নিজের মনেই হাসেন। ভক্তিতে গদগদ হয়ে অনেক সময় অনাগত ভবিষ্যতের দিকে একবার মাথা ঠেকান। এই ধর্মের দেশে এরকম একটা অবিশ্বাস্য কর্মকাণ্ড শেষ করতে পারলে বড় সুখ! একটা সর্বাঙ্গসুন্দর থিয়েটার করার মত। যারা দর্শক তারা শুধু ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছে। দর্শকরা কখনও উত্তেজিত আবার কখনও বা ভাবে তাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত। কখনও বা অদ্ভুত এক ধরণের আওয়াজ করছে। গণেশ টাওয়ার একটা সিম্‌বল, এই সিম্‌বলের ভারতজোড়া অকল্পনীয় শক্তি। মানুষকে, রাজনীতিকে, ভোটপর্বকে ওলটপালট করতে তার যে কি মহৎ অবদান, তারই পরিপূর্ণ রূপ এখনই দেখতে পাচ্ছেন পরাঞ্জপে এই গণেশ-শীর্ষে তাঁর ঘরে বসে।

চারিদিকে রাজদরবারের মত লোহার বিমের গেট। প্রবেশ পথে গণেশেরই এক মস্ত বড় রিলিফ। গণেশের বহির্দেশে চতুর্দিকে গোলা-কৃতি আবেষ্টন। এই দেয়ালের ভেতরের দিকে অসংখ্য দপ্তর। হলঘর, লাইব্রেরী, সেমিনার রুম, কন্‌ফারেন্স হল্‌। ভেতরে ঢুকতে চারিদিকের দেয়ালে খোদাই-করা অসংখ্য গণেশ আর অসংখ্য ইঁদুর। ইঁদুরের নানা কর্মকাণ্ডের শত শত রিলিফ চিত্র। মানুষের লাঠিতে পলায়নপর ইঁদুর, মৃত্যুর ফাঁদ থেকে সদ্যমুক্ত হাস্যোজ্জ্বল ইঁদুর, জালবদ্ধ সিংহকে মুক্তোদ্যত ইঁদুর, ঝাঁড়ু হাতে মারমুখী হরিজনের হাতে মৃত শহীদ ইঁদুর, লোভী ট্রেডা-রের ঘরে ফসল ধ্বংসোন্মুখ ইঁদুর, যষ্টিপ্রহারে উদ্যত ভুঁড়িওয়ালা লোভী ব্যবসায়ীকে উপেক্ষারত ইঁদুরের লীলায়িত ভঙ্গী, পণ্ডিতসমাজকে উপহাসরত ইঁদুর, উপেক্ষার ধৃষ্টতায় অবলোকনরত ইঁদুর। তেমনি গণেশেরও অসংখ্য রিলিফ চিত্র। সৃষ্টিতে উন্মত্ত গণেশ, ধ্বংস লীলায় স্থিত নির্বিকার সদা প্রসন্ন গণেশ, নৃত্যরত গণেশ, ধানের শীষ হস্তে তৃপ্তির হাসিতে সমুজ্জ্বল গণেশ, জীবন-মৃত্যুর বিচিত্র খণ্ড চিত্রের সূচনা ও পরিসমাপ্তিতে সদা অচঞ্চল স্থির সমাহিত গণেশ।

মধ্যিখানে বিশাল নৃত্যরত গণেশ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হয় বিরাট শুঁড় বেঁকিয়ে আকাশ ছুঁয়ে তিনি নৃত্যরত। আনন্দে উদ্ভাসিত তাঁর মুখ। জীবনের সকল দুঃখ, সকল জ্বালাকে উপেক্ষা করে তিনি নেচে চলেছেন। সবাইকেও আহবান জানিয়ে বলছেন, অত ভাব কেন, এসো, সবাই মিলে আনন্দ করি। দুহাত তুলে নাচি। সব দুঃখ, সব জরা, সব গ্লানি সব ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে যাক্। সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত চিরপ্রবহমান জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখ, মৃত্যুকে নয়। গণেশের পায়ের তলা দিয়ে অগনিত মানুষের যাতায়াত। কৃষ্ণ যেমন অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে স্তম্ভিত, বিমোহিত করেছিলেন, এখানে এসে গণেশের অন্তরের রূপ দেখেও তেমনি সবাই উদ্বেলিত হয়ে পড়বে। এলিভেটর দিয়ে উঠলে গণেশের কটিদেশ, তার চারিপাশে নানা আকৃতির ঘর, মাঝখানে গোলাকৃতি চত্বর। এখান থেকেই লিফ্‌টের ব্যবস্থা। লিফ্‌টে করে গণেশের বক্ষদেশে পৌঁছন যায়। এখানেও চাতালের চার-পাশে ছোট বড় ঘর, মধ্যে একটা হলঘর। লিফ্‌টে করে আরও উঠে গেলে গণেশের শীর্ষ দেশ। এখানে এক বিশাল হলঘর, তাতে লেখা 'প্রবেশ নিষেধ'। পরাঞ্জপের দপ্তর হবে এখানেই। এখানেই তিনি আত্ম-সমাহিত ও ধ্যানস্থ হবেন। নানা পলিসি ম্যাটার নিয়ে ভাববেন, মীমাংসা করবেন। দেশের হাজার সমস্যার সমাধান করার নিভৃত অবসর পাবেন।

গণেশ-শীর্ষের অংশটাতেই এখন কাজ হচ্ছে। একপাশে একটা টেবিল-চেয়ার। এখানে বসেই পরাঞ্জপে আজ নানা সূক্ষ্ম কাজ, বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য লীলাকাণ্ড অবলোকন করছিলেন গণেশের শুঁড়, চোখ-মুখের উন্মুক্ত জায়গাগুলো দিয়ে। এই উন্মুক্ত স্থানগুলো এমনভাবে বন্ধ করা হবে যে এয়ারকন্‌ডিশনার ফেল করলে পয়োজনবোধে এগুলোকে কম্পিউটারের সাহায্যে খুলে বাইরের হাওয়াকে ভেতরে টেনে আনা যায়। তাই বার বার তিনি উঠে গিয়ে ফোঁকরগুলো দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিলেন। যে গণেশ-জীর কৃপায় এই বিশাল পর্ব যে সাঙ্গ হতে চলেছে, তা ভেবে আনন্দে উল্ল-সিত হয়ে ঘন ঘন উল্লাসধ্বনি করছিলেন।

ভাবছিলেন—ভারতবর্ষের এই সংকটের দিনে ঋদ্ধি আর সিদ্ধি—যে যা চাইবে সে তাই পাবে। গণেশ টাওয়ারের উদ্বোধন হবে। প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে গণেশ টাওয়ারের উদ্বোধন করালেই ভাল হয়। সেই চেষ্টাতেই তিনি আছেন। আজকাল কাগজে কাগজে, টি, ভি,-র বিজ্ঞাপনে, রেডিওর খবরে ও পরিক্রমায় শুধু গণেশ টাওয়ারেরই কথা। এ বছরের সবচেয়ে বড় খবর গণেশ টাওয়ার নির্মাণ। কোন্ সংস্থা কোন্ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গণেশ মহলের কোন্ অংশটি পাবেন, তা নিয়ে রীতিমত কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে ; তাই লটারী হচ্ছে। কিন্তু এলট্‌মেন্টের কলকাঠি নাড়ছেন

পরাঞ্জপে নিজেই। এলট্‌মেন্ট পেয়েই এক একটি প্রতিষ্ঠান ছুটে আসছে, বলছে, না, না মেইন গণেশ টাওয়ারে আমাদের জায়গা দিন, ইঁদুর মার্কা গণেশ মহলে দেবেন না। পরাঞ্জপের মুখে সে কি অপূর্ব এক স্মিত হাসি। আর ঐ একই কথা বলে চলেছেন—কি করব বলুন, লটারীতে যা আপনার ভাগ্য নির্দিষ্ট হয়েছে, সেটাই আপনার। কারুর কিছু বলার নেই এতে। গণেশ এমন এক দেবতা যেখানে উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। গণেশের পা যেমন পবিত্র, তাঁর বাহন ইঁদুর ত তেমনি। পাথরে খোদাই-করা ঐ যে গণেশ আর ঐ যে ইঁদুর—এই বহির্মহলের কথা আপনারা একবার ভেবে দেখুন ভাল করে। ইঁদুর মানে তৎপরতা আর প্রাচুর্য। গণেশজীর কৃপায় এ থেকে কখনও আপনারা বঞ্চিত হবেন না। সেটাই ত আপনারা চান। কি, বলুন? চান না? পরাঞ্জপের বক্তৃতার তোড়ে ক্লায়েন্টরা প্রায় ভেসে যাওয়ার উপক্রম। সবাই খুশী হয়ে একবাক্যে বলে ওঠে, তবে তাই দিন।

অফিস, কটেজ এম্‌পোরিয়াম, খাদি-কুটির, কফি-হাউজ ও নানান ধরণের আরও অনেক এম্‌পোরিয়ামের এলট্‌মেন্ট শেষ হয়ে যাবার পরই, গণেশ টাওয়ার উদ্বোধনের দিন স্থির হবে। ঘরের দরজা-জানলা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেকে জানবে কার কোথায় স্থান। ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হয় বহু পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানের অফিসও এখানে শেষ পর্যন্ত উঠে আসবে। অদৃশ্য এক সম্ভাবনায় সবাই অধীর হয়ে ভাবছেন এবং বিশ্বাসও করছেন যে, এখানে অফিস উঠিয়ে আনলেই ভবিষ্যতে আর পড়ে পড়ে লস্‌ খেতে হবে না। পুঁজির পরিমাণ ও লভ্যাংশ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে উৎসাহের প্রাচুর্য একটু বেশী। চিরকালই ত তাঁরা মেরে চলেছেন। আর মুখে গেয়ে চলেছেন—জয়, জয় গণেশবাবা কি জয়! এখানে দপ্তর খুললে লালাজীরা মনে করছেন, দেবকৃপায় তাঁদের লাভের অংশটা আরও দশ গুণ বেড়ে যাবে! পরাঞ্জপেও ত তাই চান। তিনি ভাবলেন, রেস্‌ট্রিকশন্‌ ও কন্‌ট্রোলের যুগ এবার যাবে। সব দেশের দ্বার ভারতের জন্যে সমানভাবে খুলে যাবে। এই বিশ্বাসে যে পারো এসো। ইঁদুর মহলের ঘরগুলোই তোমরা পাবে। শঙ্কা করার কোন কারণ নেই। ইঁদুরের কৃপা ও করুণায় সব ভরে যাবে।

পরাঞ্জপে নীচে নামলেন গণেশ মন্দির দেখতে। গণেশ টাওয়ারের বেইস্‌মেন্টের বিশাল মন্দিরে নৃত্যরত গণেশের মূর্তি। বহু লোক একসঙ্গে এখানে পুজো দিতে পারবে। ছয়-সাত জন পুরোহিত একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পূজার ডালি নিতে পারেন তার ব্যবস্থা আছে। পুজোর ব্যবস্থা না থাকলে গণেশ টাওয়ারের কোন মানেই হয় না। গোটা ব্যাপারটাই শুধু অত্যাশ্চর্য একটা দর্শনীয় বস্তু হয়ে থাকবে। শুধু ট্যুরিস্টদের ভিড় বাড়বে আর

ফরেন কারেন্সী আয় হবে। যাঁরা ভক্তিতে গদগদ হয়ে গণেশবাবার কাছে আসবেন, তাঁরা তাঁদের ভক্তিরস কি অফিসের দোরগোড়ায় ঢেলে যাবেন? আর এতে ক্ষতি ত গণেশ টাওয়ার ফাউণ্ডেশনেরই। বর্তমান ভারতে শুধু এলিটদের নিয়ে আর বিশেষ কোন কাজ হচ্ছে না। সোশ্যালিজম এখন এমন একপর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে সব ব্যাপারেই গরীব-দুঃখীদের পার্টিসিপেসনের প্রয়োজন, তাদের না ডাকলে বা তাদের কথা বড় বড় গলায় না বললে সোশ্যালিজমের ক্ষতি হয়। গরীব, দুঃখী ও মধ্যবিত্তদের মিলন—সর্বযুগেই বিপ্লবের মূলে ছিল, এটা ইতিহাস বলে। যদি পুজোপার্বণের মাধ্যমে এদের সব এক করা যায়, তাহলে গরীব-দুঃখীদের চির দুঃখ আর মধ্যবিত্তদের চিরন্তন কোন্দল, এই দুই বিপরীত-মুখী ফোর্সকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির একই পথে প্রবাহিত করা সম্ভব। পুজোপাঠ যতই নন-প্রগ্রেসিভ্ আইটেমই হোক, ওটা ভারতবর্ষে একান্ত অপরিহার্য।

পরাঞ্জপে ভাবেন, এ-ব্যাপারে পুলকেশকেই জিগ্যেস করতে হবে। পুজোপাঠ সম্পর্কে ও বরাবরই বীতরাগ। ঐতিহাসিক কারণেই পুলকেশের এই মনোভাব। এটা ঠিক নয়। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। যে-দেশে যে আচরণ, সে-দেশে সেই আচরণে অনীহা জন্মালে আখেরে নিজেদেরই ক্ষতি! ভারতের ঐতিহ্য রাজনীতি নয়, ধর্ম সর্বস্ব। পরাঞ্জপে নিজের মনেই প্রশ্ন করেন। এইসব ভাবতে ভাবতে গণেশ টাওয়ারের চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। মাঝে মাঝে এক্সপার্টদের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। সহাস্যে তাঁরা গ্রীট্ করেন, গুড মর্নিং মিঃ পরাঞ্জপে। পরাঞ্জপে হেসে পাল্টা জবাব দেন। অসংখ্য কর্মী, অসংখ্য মজুর-মজুরনী; কেউ এটা নিয়ে ছুটছে, কেউ সেটা নিয়ে দৌড়চ্ছে। পেছনের ক্রেনগুলো বিকট আওয়াজ করে পাথর-ইট-লোহা সিমেন্ট-সুরকি, মসলা ওঠাচ্ছে, ঢালছে। গণেশ টাওয়ারের ভেতরে অসংখ্য কর্মরত মানুষ। পুলকেশকে একবার দেখতে পেলেন পরাঞ্জপে। লিফট্ দিয়ে উঠে গেল ওপরে। রাম দেওধর নেমে এল। পরাঞ্জপে ভাবেন, হ্যাঁ, কাজ হচ্ছে বটে। অত্যাশ্চর্য ব্যাপার ঘটাচ্ছেন এই বিদেশী এক্সপার্টরা। সমস্ত গণেশ টাওয়ারটা এয়ার-কণ্ডিশণ্ড। সেটা করতেই এঁরা হিমসিম খাচ্ছেন। ইলেক্ট্রিসিটি ফেল করলে, কম্পিউটারে অটম্যাটিক ইলেক্ট্রিসিটি জেনারেট করবে তার পূর্ণ ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উইলিয়ম জোনস্ এটাকেই বড় গলায় বলেন, স্ট্যাণ্ড-বাই অক্সিলিয়ারি পাওয়ার সোর্স। বিদেশের হালের আবিষ্কার। টেক্নিকাল টার্মে একে বলা হয় সুপার কণ্ডাক্টিং ম্যাগনেটিক জেনারেটরস্। বিজ্ঞানের উন্নতির সর্বশেষ অবদান এটা। এর সুযোগ নেবার জন্যেই ত বিদেশীদের ডাকা। নইলে কি আর দেশী ইঞ্জিনীয়াররা এটা করতে পারত না? বিজ্ঞানের এই সর্বশেষ অবদান

আমাদের গ্রহণ করতে হবে এই ক্রমবৈজ্ঞানিক উন্নতিশীল জগতের সঙ্গে পাল্লা দিতে। এটাই পরাঞ্জপের নীতি, তাই এটাই ভারত সরকারেরও নীতি ও আদর্শ। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, ভি, আই-পি-দের ক্ষেত্রে পাওয়ার চলে যাবার কথা যেমন ভাবা যায় না, তেমনি গণেশ টাওয়ার ফাউণ্ডেশনের পাওয়ার নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেলবে এটাও অকল্পনীয়। শুধু দিল্লী ইলেক্‌ট্রিক পরিবহণ কেন, ভারত সরকারের অনেক মন্ত্রীদেরও এ হিম্মত হবে না। তবুও বলা যায় না, গণেশ টাওয়ারের গণ-সিম্‌বলের প্রায়রিটির পারা আবার কখন যে তির্যক গতিতে নীচে নামবে। এখন ত ক্রমাগত উপরের দিকেই উঠছে। এলিট্‌ বা ব্যুরোক্যাটদের ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। কোনদিন তাঁরা বলে বসবেন, ওসব পণ্ডশ্রম, নেহাৎই আন্‌প্রো-ডাক্‌টিভ্‌ কাজ, তাহলেই বিপদ! পরাঞ্জপে ওসব রিস্‌কের মধ্যে যেতে চান না। জনসমুদ্রের এত বড় একটা প্রয়োজন কেউ যদি কোনদিন ইগ্‌নোর করে, গণেশ টাওয়ারের পাওয়ার ঘন ঘন চলে যেতে থাকে, যা দিল্লীতে আজকাল প্রায়শই ঘটছে, তাহলে সেই পরিস্থিতির সঙ্গে মোকা-বিলা করার সব রকম ব্যবস্থাই পরাঞ্জপে করে রাখছেন। অনাগত ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা ভেবেই বিদেশী এক্‌সপার্টদের পরামর্শে স্বয়ংক্রিয় স্ট্যাণ্ডবাই অকসিলিয়ারি পাওয়ারের ব্যবস্থা রাখতে তিনি সম্মত হয়েছেন। এখন স্বয়ংভর হবার সময়। পরনির্ভরতা যত কমে, ততই মঙ্গল। পাওয়ার চলে গেলে এই টাওয়ার যাতে পাওয়ারহীন না হয়ে পরে, তারই জন্যে গণেশ টাওয়ারের পাওয়ার জেনারেটারের এই যন্ত্রটা কম্পিউটারের সাহায্যে নিজে থেকেই যাতে পাওয়ার জেনারেট করতে পারে তারই ব্যবস্থা।

পরাঞ্জপের মনে পড়ে যায়, এ-ব্যাপারটা নিয়ে যখন নানা আলোচনা চলেছিল এক্‌সপার্টদের মধ্যে, তখন অ্যাসকারী হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন, 'ইউরেকা', 'ইউরেকা'। তিনি বলেছিলেন, গণেশের শুঁড় দিয়ে বাইরের হাওয়া টেনে আনার সুযোগও আছে। তখন সবে কথা উঠেছে যে এয়ারকণ্ডিশন্‌ ফেইল করলে গণেশ টাওয়ারের ভেতরের লোকেরা অক্‌সিজেনের অভাবে মারা পড়বে। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যে গণেশের দুটো চোখ, চারটে হাত, এসবে সুড়ঙ্গের ব্যবস্থা করলে তার ভেতর দিয়ে বাইরের উইণ্ড ফোর্সকে ভেতরে টেনে আনা সম্ভব। বাকী সময় ওগুলো বন্ধ থাকবে। এই রকম সব এক একটা অসাধারণ আবিষ্কার, অসাধারণ মুহূর্তের কথা মনে পড়ে পরাঞ্জপের।

ইঁদুর মহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসে তখন প্রচণ্ড ভীড়। এলট্‌-মেন্টের হাজার হাজার এপ্লিকেশন সর্ট আউট করা হচ্ছে।

পরাঞ্জপে শশব্যস্ত হয়ে উপরে উঠে গেলেন। বিদেশীদের কেন তিনি

নিয়ে এসেছিলেন, তাই নিয়েই ত চন্দ্রভানুর যত রাগ। অত রাগ করতে নেই চন্দ্রভানু। এতগুলো দেশের এত সব স্টলওয়ার্ট এসে তাঁদেরই কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস রেখে যাবেন এদেশে। এটা কি কখনও ভেবেছেন চন্দ্রভানু। কাজ শেষ হলেই এঁরা সবাই নিজের নিজের দেশে ফিরে যাবেন। গণেশ টাওয়ার চিরকাল এর ইতিহাস বুকে ধারণ করে থাকবে। চন্দ্রভানু, এটা কি কম কথা? পরাঞ্জপে নিজের মনেই আবার একটু হাসলেন। গোটা পৃথিবী, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন রূপ পরাঞ্জপের মনে ভেসে ওঠে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস তিনি ফেললেন। ভাবতে থাকেন, একসময় সমস্ত য়ুরোপকে 'লাল' করে তোলার কম প্রচেষ্টা হয়নি। ইতিহাসই তার সাক্ষী। ডেমোক্র্যাটিক সোশ্যালিস্টের এক দল হিটলারকে গদিতে বসাতে সাহায্য করেছিল। তারা ভেবেছিল, হিটলার আর কদিন। তাঁর এক্সজিটও ইতিহাসে লেখা। হিটলার ফ্যাসিজম্ নিয়ে এলেন পৃথিবীতে। চুক্তি করেছিলেন রাশিয়ার সঙ্গে। সেই মিত্র রাশিয়াকে আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি নিজের সর্বনাশ ডেকে এনে ছিলেন। এইসময় পুলকেশকে একটু পেলে ভাল হত। আমার ইতিহাস-চেতনার ভুলগুলো পুলকেশ ধরিয়ে দিতে পারত। লেনিনও স্বপ্ন দেখেছিলেন সমস্ত পৃথিবী একদিন লাল হয়ে যাবে—ট্রট্স্কিরও তাই ধারণা ছিল। এই নিয়েই তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল স্টালিনের সঙ্গে। ট্রট্স্কি নির্বাসিতও হয়েছিলেন এই কারণে। স্টালিন কিন্তু সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের দেশকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আর এতেই তাঁর সাফল্য। তখন কমিনটার্ণ ভীষণ পাওয়ারফুল। পুলকেশ থাকলে কন্ভার্স করে নেওয়া যেত। কোন নেতা যদি দেশে বিদ্রোহ আনতে অক্ষম হতেন তাহলে তাঁকে দল থেকে বার করে দেওয়া হত। চীন তা মা[illegible]নি। নিজেকে অন্যভাবে গড়ে সে নতুন নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিল। পলিটিক্স নিয়ে বেশীক্ষণ চিন্তা করা পরাঞ্জপের ধাতে সয় না; ওটা পুলকেশরই কাজ। আজকে ও ভয়ানক ব্যস্ত। ওকে আজ ডেকে আনা যাবে না। তবে এসব পলিটিক্সের এত কথা কেন আমি ভাবছি সে কথা কি আপনি জানেন ভর্মাজী। আপনাকে শুধু বোঝাতে চাই যে ইতিহাসের একটা ইন্ভিসিবল্ পাওয়ার আছে। তাকে মানুন আর না মানুন, সে আছে, থাকবেও। আপনিই ত একদিন বলেছিলেন, মানুষের সর্বস্ব ত তার ঐ পেট। সেটা অতিক্রম করে উর্ধ্বে উঠতে পারলে তবেই ঋদ্ধি আর প্রজ্ঞা। গণেশ ত তারই সিম্বল। গণেশ টাওয়ার থেকেই একদিন এই বাণী আবার নতুন করে উঠবে, সারা পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে পড়বে। আপনি ত এসব বুঝতে চান না, ভর্মাজী। পদত্যাগপত্র দিলেই এ সমস্যার সমাধান হয় না। একটু ভাবতে হয়।

॥ উনত্রিশ ॥

পাবলিক সেক্‌টর ফ্যাক্‌টরিগুলোর মধ্যে গঙ্গাধরের ফ্যাক্‌টরির উৎ-পাদনের হার সর্বোচ্চ হওয়ার পুরস্কার গঙ্গাধরের নির্দেশমত ফ্যাক্‌টরির সবচেয়ে পুরনো যে কর্মী সেই গ্রহণ করল। তাকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাধর দিল্লী থেকে ফিরলেন। ভারি খুশী তিনি। সেই খুশীর হাওয়া বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়ল।

বাগানে সুন্দর গোলাপ ফুটেছে। মৈত্রেয়ী ফুল ফোটাতে ভালবাসেন। বাংলার মাটি সোনা, জমি পাট ক'রে বীজ পুতলেই বিনা আয়াসে ফসল। নিজের বাগানের সব্জি পড়শীদের ঘরে পাঠিয়ে মৈত্রেয়ী খুশী হন। সময়াভাবে কদিন সব্জী পাঠানো হয়ে উঠছিল না।

গঙ্গাধর আজ মৈত্রেয়ীর বাগান পরিচর্যায় লেগে গেলেন। গঙ্গাধরকে বাগানের কাজ করতে দেখে মৈত্রেয়ী আর বেরুলেন না। গঙ্গাধর বাড়ির কাজ করছেন, এ দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য মৈত্রেয়ীর আজকাল বড় একটা হয় না। সমস্ত মন এক করে গঙ্গাধর যখন কাজ করেন, সর্বাঙ্গসুন্দর হয় সে কাজ। মৈত্রেয়ীর ভারি ভাল লাগে এসব দেখতে।

মালীকে নানা রঙের গোলাপের কয়েকটা ডাল কেটে দিতে বললেন গঙ্গাধর। মৈত্রেয়ীর হাতে সেগুলো দিয়ে বললেন—নাও, সাজিয়ে রাখ ফ্‌লাওয়ার ভাসে। অনেক কপি হয়েছে। মুলো, পালং শাক, লাল ডাঁটায় ভরে গেছে সব। লাল ডাঁটার চচ্চড়ি গঙ্গাধরের খুব প্রিয়। কিছু কিছু তুলে তিনি আশে-পাশের দু-একটা বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। এসবে মৈত্রেয়ীর বড় আলসেমী। অথচ রোজই তাঁকে এসব করতে হয়। আজ গঙ্গাধর স্বেচ্ছায় করছেন দেখে খুব মজা লাগছিল তাঁর। গভীর আগ্রহে মৈত্রেয়ী সেই সব দেখছিলেন। গঙ্গাধরের ডেপুটিদের মধ্যে দু-জন সবচেয়ে কাজের মানুষ—অধর লাহিড়ী আর বিধুরঞ্জন বসাক। কয়েকটি বাঁধা কপি, ফুল কপি, ডাঁটা, মুলো, পালং শাক, বীনস্‌ ঝুড়ি করে গঙ্গাধর এদের দু-জনের বাড়িতে পাঠালেন। নিজের বাড়ির জন্যেও কিছু সব্জি রাখলেন।

অনেকদিন আর মালীকে এক নাগাড়ে এত কাজ করতে হয়নি। জায়গা পরিষ্কার করা, মাটি খুঁড়ে সার দেওয়া। একটা পাতাও কোথাও পড়ে থাকার জো নেই। টবগুলোতে মালী রোজই জল দেয়। খুঁড়ে দেয় না। সব টবের মাটি খুঁড়ে আজ জল দিতে হল। ঘন্টা খানেকের মধ্যে সব কাজ সারা। সারাটা বাগান ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। গঙ্গাধরের হাতে নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল। সব্জি ক্ষেতও তিনি সুন্দরভাবে পরিষ্কার করে নতুন সাজে সাজালেন।

ঘরে বসতে যাবেন এমন সময় কি মনে হওয়ায় গঙ্গাধর আলমারী থেকে ক্যামেরাটা নিয়ে এলেন। মুখে সেই চিরকেলে দুষ্টুমি হাসি। মৈত্রেয়ীও সঙ্গে সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলেন। গঙ্গাধরের রগড় দেখতে ভালই লাগছে তাঁর।

গঙ্গাধর হেসে বললেন--আজ ত বেশ সেজেগুজে আছ দেখছি, এদিকে গোলাপ গাছটার সামনে একটু দাঁড়াও দেখি। বেরুচ্ছিলে নাকি?

মৈত্রেয়ীও আজ খুব খুশী। বললেন--না, সেরকম কোন তাড়া নেই। ছবি তোলার আর কি লোক পাও না? আমাকেই কী এখন টারগেট করবে?

গঙ্গাধর খেদ করে বললেন--কোথায় আর আজকাল ছবি তোলা হয়! সেই ব্যাঙ্গালোরে তোমার যা ছবি তুলেছি। এখানে বছর তিনেকের মধ্যে ত ক্যামেরায় হাতই পড়েনি। দেরী কোর না। এরকম রোদ্দুরে ফার্স্ট ক্লাস ছবি ওঠে।

গঙ্গাধর বেশ কয়েকটা ছবি তুললেন মৈত্রেয়ীর। হাসি হাসি মুখে মৈত্রেয়ী নানান ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন। প্রতিবারই গঙ্গাধর একটা-না-একটা উল্টো-পাল্টা মন্তব্য করেন। কখনও মৈত্রেয়ীকে চটিয়ে দিয়ে মজা দেখছিলেন, কখনও বা রগড় করে নিজেই হাসাচ্ছিলেন। দশ-বারোটা ছবিতে মৈত্রেয়ীর নানা ভঙ্গী ধরে নিলেন।

ছবি তোলা হলে দু-জনেই ঘরে এসে বসলেন। কি ব্যাপার, সাহেবকে আজকে যে মহা খুশী দেখছি! দিল্লী থেকে কোন ভাল খবর এনেছ না কি?

গঙ্গাধর বললেন--সারা দেশ থেকে সব বড় চাঁইয়েরা এসেছিলেন। ডায়াসে উঠে হাসি হাসি মুখে তাঁরাই পুরস্কার নিলেন। আমার ফ্যাক্টরির সবচেয়ে পুরনো কর্মী ডায়াসে উঠে পুরস্কার নিতে গেল। ব্যাপারটায় সেক্রেটারী খুব খুশী হয়েছেন বোঝা গেল। তাঁর ভাষণে কথাটা তিনি উল্লেখই করে ফেললেন। বললেন--কর্মীদের দরদ ছাড়া প্রডাক্-টিভিটি বাড়ান অসম্ভব। গঙ্গাধর আমাদের সেটা বোঝবার সুযোগ দিলেন। সত্যিই ত কাজ ওরাই করে, আমরা শুধু পথ বাতলে দি, কোন সমস্যা

হলে সমাধান করে দি। কাজ ত আমরা করি না, ওরা করে। ওদের সামনে টারগেট বেঁধে দিই। সেক্রেটারীর কথা নিয়ে চায়ের আসরে, ডিনার টেবিলেও কত কথা, কত গাল-গপ্প। এসবে আমার কোন উৎসাহ ছিল না, শুধু শুনে গেলাম। নতুন কিছু একটা পেলেই উপর মহল খুশী। পুরনো কথা নূতনভাবে আবিষ্কার করার সুযোগ পেলেই এঁদের আনন্দ। বাস্তবিকই ফ্যাক্টরিটাকে বর্তমানে যে অবস্থায় আনা গেছে, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ত কর্মীদেরই। চিরকালই জানতাম, আমরা চাইলে সবই পারি।

চায়ের পেয়ালাটা গঙ্গাধরের দিকে এগিয়ে দিয়ে মৈত্রেয়ী বললেন—ব্যাঙ্গালোর ছাড়ার পর তোমার শরীর যে-রকম ভেঙে গিয়েছিল, তোমার মানসিক অবস্থা যা হয়েছিল, তাতে আমি ত ভেবেছিলাম তুমি এবার আর এত পারবে না। সে শক্তিও নেই, সে মনোবলও নেই। তা দেখলাম, তুমি এবারও পারলে। কাজের মধ্যেই তুমি আবার মনোবল ফিরে পাবে এটাই শুধু ভাবতাম। কিন্তু এতটা পারবে ভাবিনি।

সেদিন অফিসেও এ নিয়ে অনেক আলোচনা। গঙ্গাধর সব শপ্ ফ্লোরে গিয়ে কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়ে এলেন। তাদের সঙ্গে ছবিও তুললেন। নতুন হল ঘর যেটা তৈরী হয়েছে, সেখানে সবারই ডাক পড়ল। সামনের সারিতে বসলেন অফিসররা, পেছনে কর্মীরা। হল ঘরের উদ্বোধন। উদ্বোধনের সময় তিনি কর্মীদের জন্যে নতুন এক প্রস্তাব পেশ করলেন। গঙ্গাধর বললেন—উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি তা আপনারা জানেন। আর এ সম্ভব হয়েছে আপনাদের সমবেত প্রচেষ্টায়। সর্বোচ্চ উৎপাদনের জন্য আমরা যে পুরস্কার পেয়েছি তা আমি আপনাদের প্রত্যেকের শপে গিয়ে দেখিয়েছি, আপনাদের তারিফ করেছি। সারা দেশে আমাদের এখন সুনাম। এটা যে শুধু আমাদের মিনিস্ট্রি ও সরকারই জানেন তাই নয়, সরকার পরিচালিত যত প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের বড় কর্তাদেরও নজরে এটা আনা হয়েছে। উৎপাদনের এই মান আমরা যাতে বজায় রাখতে পারি সেদিকেই আমাদের নজর রাখতে হবে। এটা সবায়েরই আনন্দ ও গর্বের বস্ত হবে। কর্মীদের সহর্ষে করতালি। আপনাদের এও মনে রাখতে হবে ভাল হওয়ার বিপদও অনেক। আমাদের আগের চেয়ে আরও বেশী বেশী পরিশ্রম করতে হবে। উৎপাদনের টারগেট অতি-ক্রম করে যেতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা তা পারবেন। আমরা আমাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব। আপনারা সবাই আমার সহায় হবেন। আপনারা নিশ্চয় জানতে চাইবেন, এত কাজ করে আপনাদের কি লাভ? ফাইল থেকে তিনি একটা অর্ডার বার করে তার রেলিভেন্ট অংশটা পড়ে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন—আমি বরাবর দেখেছি ওভার টাইম দিতে গিয়ে সরকারের তিন গুণ পয়সা বেরিয়ে যায়। আমার

বিশ্বাস কেউ যদি আট ঘন্টা মন দিয়ে কাজ করে প্রচুর কাজ করতে পারে। ওভার টাইম বিল পাশ করার ব্যাপারে এত সময় লাগে কেন, সে অভিযোগও আমি শুনতে পাই। সরকারী পয়সা বলেই যুক্তিহীনভাবে খরচ করার আমি বিপক্ষে। ওভার টাইমের রিপোর্ট খুঁটিয়ে না দেখে আমি তা পাশ করি না। এ ব্যাপারে আমি নানা প্রশ্ন তুলি বলে আমার অফিসররাও ওভার টাইম বিল আমার কাছে পেশ করার আগে, কেন ওভার টাইমের প্রয়োজন হয়েছিল, তার একটা আলাদা নোট্ বিলের সঙ্গে অ্যাটাচ্ করে দেন। নয়ত আমি ওভার টাইম নাকচ করে দি। এটা কেন করি সেটা নিশ্চয় আপনারা বুঝবেন।

গঙ্গাধর একটু থামলেন, চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন। সবাইকে আজ তিনি খুশীর মেজাজে ডেকেছেন। হল ঘর উদ্বোধন করতে এসে ভাষণ দেবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না। তাই কাজের কথা দিয়েই উদ্বো-ধনের কাজ সারলেন। কর্মীরা এক মনে তা শুনছে।

গঙ্গাধর বললেন--এত কথা বলার দরকার ছিল না। বলছি, কারণ কতগুলো ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তা দূর করা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আজ থেকে ফ্যাক্টরিতে একটা নতুন সিস্টেম চালু করতে চাই। আপনাদের আট ঘন্টা কাজ। আপনারা গড়-পড়তায় আট ঘন্টায় যা উৎপাদন করেন, তার হিসেব আমার কাছে আছে। প্রত্যেকের গড়-পড়তা আউটপুটও আমি জানি। সে হিসেবও কষা আছে। এখন আপনারা এই আট ঘন্টায় যত বেশী উৎপাদন দেখাতে পারবেন, তত বেশী ইন্সেন্-টিভ পাবেন। আপনাদের এতে লাভই বেশী। ওভার টাইম করতে গিয়ে আপনারা যেমন-তেমন করে এই আট ঘন্টা কাটিয়ে দেন। বেশী পয়সার জন্যে ছুটির পরেও পরিশ্রম করেন। তাতে রোজগার হয় বটে, কিন্তু আপনাদের স্বাস্থ্য নষ্ট নয়। মানসিক ক্লান্তি ঘটে। আপনারা যদি এই আট ঘন্টায় একটু বেশী খেটে ওভার টাইমের চেয়ে বেশী রোজগার করেন, আমি আশা করি তাতে আপনাদের নিশ্চয় কোন আপত্তি হবে না। কথাটা আপনারা ভাল করে ভেবে দেখবেন। কথা শেষ করেই গঙ্গাধর উঠে পাশের চেয়ারে গিয়ে বসলেন। হাততালি পড়ল। কর্মীরা গঙ্গাধরের প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল। এবার ছবি তোলা। চা, সিঙ্গাড়া ও মিষ্টির ব্যবস্থা।

উৎপাদন বাড়াবার এ অভিনব বাবস্থা চালু হবার দু-তিন মাস পরে দেখা গেল, ওভার টাইম করে কর্মীরা যা রোজগার করত, একই সময়ে তারা সেই একই পরিমাণ টাকা রোজগার করছে। অনেক সময় তার চেয়েও বেশী। দারুণ উৎসাহ পড়ে গেল সারা ফ্যাক্টরিতে। মাঝখানে একটা বোর্ড মিটিং-এ এনিয়ে আলোচনাও হয়েছে। দিল্লীর মাননীয়

সেক্রেটারী আশ্বাস দিয়ে গেলেন যদি এতে সুফল পাওয়া যায়, তবে যত পাবলিক সেকটর আনডারটেকিং আছে, সবগুলোতেই এই নতুন ইন্‌সেন্‌টিভের ব্যবস্থা চালু করা হবে।

ইন্‌সেন্‌টিভের ব্যবস্থা চালু হবার কয়েক মাস পরেই দেখা গেল অফিসের স্ট্যাফ, অ্যাসিসটেন্ট ও কেরানীদের মধ্যে চাপা একটা বিক্ষোভ। সারা হপ্তা কাজ করে তারা যা রোজগার করে তার দু-গুণ কামাচ্ছে ফ্যাক্‌টরির কর্মীরা। এক ডেলিগেশন নিয়ে অফিসের স্টাফরা গঙ্গাধরের সঙ্গে দেখা করল। এর পেছনে কয়েক জন ইউনিয়নের নেতারও হাত ছিল। গঙ্গাধর আগেই তা শুনেছিলেন। তিনটে ইউনিয়নই আজকাল বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। যত প্রডাকশন বাড়ছে, ফ্যাক্‌টরির কর্মীদের সঙ্গে এদের মতান্তরও বাড়ছে। নিজেদের মধ্যে মতের বিভিন্নতা দেখা দিচ্ছে। এই সুযোগে ইউনিয়নের নেতাদের কর্মতৎপরতাও বাড়ছে। এটাই গঙ্গাধরের আশঙ্কার কারণ। কয়েকজন ইউনিয়ন নেতার কর্মক্ষমতায় গঙ্গাধরের আস্থা খুব কম। কর্মক্ষমতায় নিজেরা অপারগ বলে অন্যদের এগিয়ে যাওয়াটাকে এরা খুব একটা ভাল চোখে দেখে না। এদের অনেকেই আবার অফিসে কাজ করে। ফ্যাক্‌টরির কর্মীদের ক্ষেপিয়ে তোলাই এদের এখন প্রধান কাজ। কর্মীরাও ভাবে নেতারা কর্মীদের স্বার্থ নিয়ে যখন এত চিন্তা করেন তখন এঁরাই তাদের প্রকৃত সুহৃদ। এস্‌টাব্‌লিশ্‌-মেন্ট্‌ কখনই কর্মীদের, শ্রমিকদের সুহৃদ হতে পারে না। গঙ্গাধর প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে এদের ভুলটা দেখিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিশেষ ফল হয়নি। কর্মীরা ও শ্রমিকরা অনেক বেশী আয় করছে বলে চারিদিকে স্বার্থ-সংঘাতের একটা দূষিত বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এটাও গঙ্গাধরের নজর এড়ায়নি। ইন্‌সেন্‌টিভ্‌ সিস্‌টেম্‌ তুলে নিলে পরিবেশটা হয়ত আবার স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু যা নিয়ে একস্‌পেরিমেন্ট শুরু করছেন, তাকে অর্ধ-পথে ছেড়ে দিতে তিনি রাজী নন। শেষ না দেখে গঙ্গাধর তাঁর কোন সিদ্ধান্তই পাল্টান না।

ডেলিগেশনের মধ্যে আছেন ইউনিয়নের কয়েক জন নেতা। কর্মীরা যে এতে খুব একটা সায় দেয়নি, তা তাদের সংখ্যা দেখেই বোঝা যায়। গঙ্গাধর ইশারায় সবাইকে বসতে বললেন। জনা বারো নেতা ও কর্মী এসেছে। প্রথমে তাদেরই বলতে দিলেন গঙ্গাধর। তারা বেশ গরম হয়ে আছে বুঝলেন। ভেতরে ভেতরে রীতিমত রেষারেষি শুরু হয়ে গেছে। ব্যাপারটা সহজভাবে বোঝাতে কেউ-ই পারল না। একজনে এক কথা বলে ত অন্যজনে তাকে বাধা দিয়ে অন্য কথা বলে। তাকে বাধা দিয়ে আবার একজন নতুন এক পয়েন্ট তুলে তর্ক জুড়ে দেয়। এভাবে হাওয়াটা ক্রমশঃ গরম হয়ে উঠল।

এতক্ষণ গঙ্গাধর সব শুনছিলেন। এবার তিনি শুরু করলেন—আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের কথা শুনলাম। সবার বক্তব্য দেখছি মোটা-মুটি একই। আপনারা যাঁরা অফিসে কাজ করেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েক জন নানা ইউনিয়নের মাথা, তাও আমি জানি। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবেন না। অন্যায় কিংবা অযৌক্তিক কোন কথা আমি কিছুতেই মেনে নেব না। গত মাসে শপের মেসিন এক আধবার বন্ধ রাঁখার চেষ্টাও হয়েছিল। এ ব্যাপারে যে যুক্তি দেখান হয়েছে, তা আমি মেনে নিতে পারিনি। আপনারা অনেককে উস্কানি দিচ্ছেন, সেও আমি জানি। আপনাদের একটা কথা আমি বলতে চাই, আপনারাও যদি শ্রমিকদের মত সারা সপ্তা কাজ করেন, তাহলে যে ক-ঘন্টা বেশী পরিশ্রম আপনারা করবেন, তার জন্য আপনাদের আয় নিশ্চয়ই বাড়বে। এ সুযোগ আপনাদের আমি দিতে চাই। আমি জানি শুধু উৎপাদন করলেই হয় না, তার বিতরণ ও বিক্রির ব্যাপারটাও থাকে। এখানে আপনাদের অনেকেই সেল্ ও ডিসট্রিব্যুশন ডিপার্টমেন্টের লোক। আপনারা ওদের মত পুরো হপ্তা কাজ করতে রাজী আছেন কি না, কালকের মধ্যে লিখিতভাবে আমাকে জানালে আমি সেইমত অর্ডার দেবো। সবাই খুব গম্ভীর মুখে একে একে বেরিয়ে গেল।

গঙ্গাধর নিজের ফাইলে মন দিলেন। ফ্যাক্টরিতে কিভাবে গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে, তার পূর্বাভাস পেলেন গঙ্গাধর এই মিটিং-এ। অন্যায়কে তিনি মাথা পেতে কিছুতেই মেনে নেবেন না। তাতে ঘটনার মোড় যে দিকেই ঘুরুক।

কিছুদিনের মধ্যেই গণ্ডগোলটা ভাল রকম পাকিয়ে উঠল। মৈত্রেয়ী ইদানীং টেক্‌নিকাল স্কুলটার জন্য খুব ছুটোছুটি করছেন। তিনিও নানা লোকের মুখে নানা খবর পাচ্ছিলেন। মৈত্রেয়ীর পক্ষে খবর নেওয়া আরও সহজ। তিনি বরাবরই কর্মীদের সঙ্গে মিশতেন, তাদের খোঁজ-খবর করতেন, দরকারে-অদরকারে সাহায্য ও পরামর্শ দিতেন। হাওয়া যে কোন্‌দিকে বইছে মৈত্রেয়ী তার আভাস পাচ্ছিলেন।

সেদিন গঙ্গাধরের হাতে চায়ের পেয়ালা তুলে দিয়ে মৈত্রেয়ী তাই কথাটা পাড়লেন—স্ট্রাইক যে ঘনিয়ে এল।

—জানি।

—কিছু কর।

—অন্যায় আব্দার মেনে নিতে বল?

—না, বোঝাবে।

গঙ্গাধর মাথা নাড়লেন। বললেন—কি জান, এখন যে উত্তেজনা, এ অনেকটা আগুনের মত। বোঝাতে যাওয়া মানে আগুনে হাওয়া দেওয়া।

এরা তিনটে দল করেছে। কাজ করতে চায় না বলেই ত।

মৈত্রেয়ী হাসতে হাসতে গঙ্গাধরকে মনে করিয়ে দিলেন। জানত—এটা বাংলার মাটি, ভুলে যেও না কিন্তু। বাবা-বাছা করে কাজ করালে এরা করে, হুমকি দিলে বেঁকে বসে।

—প্রয়োজনে হুমকি দিতে হয় বৈকি! বাংলার মাটি নরম বলেই কি নরম হতে হবে? এ আমি বিশ্বাস করি না।

—অত বেশী উত্তেজনা তোমার কি সইবে? শরীরটা ত ভেঙে যাবে। গঙ্গাধর চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখে মুখে একটা বিষাদের ছায়া। পরে কি ভেবে বললেন—মানুষকে জোর করে কিছু শেখান যায় না, মৈত্রেয়ী। ভেতরে বোধশক্তি না হলে কিছুই হয় না। সে যাক, তোমার টেক্‌নিকাল স্কুলটা কতদূর এগোল?

—এর মধ্যে তুমি সে-সবও ভাবছ?

—আমাদের কাজ আমাদের করে যেতে হবে। সময়ই এর মূল্যায়ন করবে।

মৈত্রেয়ীর চোখ ফেটে জল এল। মানুষটা বড় একা হয়ে পড়ছেন। তার ওপর শরীরটাও ভাল নেই। কর্মীরা মিটিং করে বলছে, বাংলার বাঘ, ফিরে যাও, ফিরে যাও। মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ। সেদিন ওদের ক্যাম্পে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন মৈত্রেয়ী। সেখানে তিন দলেরই নেতারা ছিলেন। মৈত্রেয়ী হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—কার মুর্দাবাদ চাইছ তোমরা। মৈত্রেয়ীকে দেখে অত গরম গরম কথার মধ্যেও তারা কেমন যেন কেঁচো হয়ে গেল। একটু হেসে বলল—মাসীমা, আপনি? আসুন, আসুন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কার মুর্দাবাদ বলছিলে?—না, এমনি। ওরাও মনে মনে জানে কর্মীদের কত বড় বন্ধু গঙ্গাধর, তাঁকে মুর্দাবাদ বলা ওদের পক্ষে কত শক্ত। আন্দোলনটাকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসতে দিনের পর দিন এদের প্রচুর পরিশ্রম ও অনেক ষড়যন্ত্র করতে হয়েছে।

ওসব কথা গঙ্গাধরকে কিছুই বললেন না মৈত্রেয়ী। শুধু বললেন—সময় হলে যখন এরা বুঝবে, তখন তুমি বোধহয় আর এদের মধ্যে থাকবে না।

—সেটাই স্বাভাবিক। টেক্‌নিকাল স্কুল কতদূর এগোল, বল দেখি শুনি। আমার ডেপুটীরা বলছে তুমি নাকি তাদেরও ছোটাচ্ছ, সঙ্গে নিয়ে যাও, কি ব্যাপার?

—এর মধ্যে কয়েকবারই প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে দেখা করেছি। রিজিওনাল টেক্‌নিকাল ডিরেক্‌টরেটের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর গান্ধী, সেটা আমি জানতাম। বাবাকে খুব ভালবাসতেন। ওখানকার রিজিওনাল ডি-রেক্‌টর চক্রবর্তী, কাট বাঙ্গাল্। আমার কাজ কত দূর এগোল জিজ্ঞেস

করতেই ভদ্রলোক সোজা বললেন—আপনারে একটা সত্য কথা কই, মন্ত্রী না কইলে কিস্সু হইব না। আমি হেসে বললাম—মন্ত্রী কইলে কী আপনি পাহাড়ে বা জঙ্গলে একটা টেক্‌নিকাল স্কুল খুইলা দিবেন? ভদ্রলোক দমবার পাত্র নন। বললেন—চাকরী যদি রাখতে চাই সেইটাও করতে হইব। আমার কাছে সময় নষ্ট না কইরা আগে প্রফুল্ল সেনের কাছে যান, কাজ হইব। তখন আমি বললাম—জাহাঙ্গীর গান্ধী আপনাদের ডিরেক্‌টরেটের চেয়ারম্যান না, তাঁর নম্বরটা একটু মেলান ত। তিনি বললে হইব ত? —খুব হইব, চেনেন বুঝি? যখন বললাম চিনি, ভদ্রলোকের চেহারা এক মুহূর্তে পালটে গেল। বললেন—আর কিছু করার লাগব না, হইয়া যাইব।

—না, তুমি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও আর একবার দেখা কর। ওরা কিছু করুক।

—দেখা করেছিলাম। আর একদিন আসতে বলেছেন। জান ত, এসব কাজ তাড়াতাড়ি হয় না। তা এসব করে লাভ কী?

গঙ্গাধর না বুঝতে পারার ভান করে বললেন—লাভ মানে?

—এরা কী এসবের মর্যাদা দেবে? আর গড়ে তুললেও কী এরা সেটাকে রাখতে পারবে?

—ভবিষ্যতের কথা ভাবার অধিকার আমাদের ততটুকুই, যতটুকুতে কাজ হয়। আমি অধরকে সেদিন ডেকে বলেছি, হল ঘরটা ত কোন কাজেই লাগছে না, ওটাকে কী একটা সিনেমা হলে রূপান্তরিত করা যায়? শুনে একটা ফিল্ম প্রজেক্ট করল। দেখলাম 'একস্‌টিকস্‌'টা খারাপ। আগের থেকে প্ল্যান না করে করলে যা হয়। আমি ওঁকে বলেছি, আপনি দেখুন, এটার কিছু করা যায় কি না।

মৈত্রেয়ী স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কর্মীদের এন্‌টারটেন্‌মেন্ট বলতে এখানে কিছু নেই। একদিন কথায় কথায় মৈত্রেয়ী বলেছিলেন, ছেলেরা দুর্গাপুর শহরে, আসানসোলে সিনেমা দেখতে যায়। যদি এখানে একটা কিছু করা যেত, তাহলে ওদের কত সুবিধে হত। সেদিন থেকেই গঙ্গাধর হল ঘরটাকে সিনেমা হল হিসেবে খাড়া করা যায় কি না ভাবছেন।

অধরকে ডেকে বললেন—ফ্যাক্‌টরীতে ওয়েস্ট মেটিরিয়ল ত অনেক পড়ে আছে। অসংখ্য কাঠের টুকরো কোণে কোণে লাগালে একস্‌টিকসের কিছু ইমপ্রুভমেন্ট হয় কি না, দেখুন ত।

অধর সেটা করে আবার গঙ্গাধরকে ডেকে ফিল্মটা দেখালেন। সারা হল ঘরে বসে-দাঁড়িয়ে শুনলেন সাউণ্ডটা কেমন আসছে। ভিজুয়াল কেমন হচ্ছে। বললেন—হ্যাঁ, আগের চেয়ে অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে, তবে এখনও অনেক জায়গা আছে, যেখান থেকে ভাল শোনা যাচ্ছে না।

অধর বললেন—কলকাতা থেকে একজন একস্‌টিকসের এক্‌সপার্টকে ডাকলে ভালো হয়।

--ডাকুন, কি বলেন দেখুন।

একস্‌টিকসের এক্‌সপার্ট এসে নানা রকম সাজেশন দিয়ে গেলেন। তা রূপায়িত করতে ২০।২৫ হাজার টাকা খরচ। তাঁকে অধর বোঝালেন—এটা দেখুন ফ্যাক্টরীর পক্ষে একটা লাক্‌সারী আইটেম্‌। অত টাকা খরচ করার সাধ্য আমাদের নেই।

গঙ্গাধর বললেন—এক কাজ করুন, উনি যা বলেছেন, তার কিছুটা করে দেখুন, কাজ হয় কি না।

সেইমত মেরামতি করে অধর আবার গঙ্গাধরকে ডাকলেন। গঙ্গাধর শুনে বললেন, এবার ঠিক আছে। কবে চালু করবেন?

—যবে আপনি বলবেন।

—না, এদের যা অবস্থা দেখছি, এদের নিশ্চয় এখন সিনেমা দেখার মুড নেই। উত্তেজনা কমুক, তখন দেখা যাবে।

হল ঘরটাকে সিনেমা হলে পরিণত করার পেছনের ইতিহাসটা মৈত্রেয়ীকে বিস্তারিত না বলে গঙ্গাধর শুধু বললেন—তুমি কী মনে কর, সিনেমা দেখালেই এরা ভাল করে কাজ করবে? এখানে সিনেমা দেখার সুযোগ পাচ্ছে বলে দুর্গাপুর-আসানসোল যাবে না? এত করে এদের এন্‌টারটেইনমেন্টের ব্যবস্থা করছি বলেই কী এদের ক্ষ্যাপামি যাবে? সিনেমা হল ত তৈরী, কাল থেকেই সিনেমা দেখান যায়।

—তৈরী?

—হ্যাঁ, অধর অনেক খেটেছেন ওটাকে ঠিক-ঠাক করতে।

মৈত্রেয়ী চুপ করে রইলেন। কর্মীদের ক্যাম্পে যে রুদ্র মূর্তি তিনি দেখে এসেছেন, সেটাকে আর যাই হোক সুস্থ পরিবেশ বলা যায় না। শুধু বললেন—কেন যে এদের জন্য এত করছ, তাই মাঝে মাঝে ভাবি।

গঙ্গাধর বললেন—চল, বেরুন যাক।

—কোথায়? মৈত্রেয়ী অবাক হলেন।

—চলই না, দেখে আসি ওরা কি করবে, কি ভাবছে।

—তুমি ওদের ক্যাম্পে যাবে?

—দেখা যাক ত, চল। ওরা আল্‌টিমেট্‌লি কি ডিসিসন নেয়, দেখা দরকার। আমি জানি ওরা খুব ভুল করছে। উত্তেজনায় অনেক সময় ওদের স্বার্থ কোথায় বোঝে না ত, দুরদার কাজ করলে ওদেরই বিপদ। যদি সম্ভব হয় গাইড করব।

—তুমি যাবে ওদের গাইড করতে? তোমার মাথা খারাপ?

—কেন, তুমি ত আছই, তুমি ওদের সঙ্গে অনেক বেশী মেশো। আমি

গেলেই অন্যায়?

—না, অন্যায় নয়, যেতে পার। কিন্তু এখন এই উত্তেজনার মুখে ওখানে যাওয়া কী ঠিক হবে? আমি যাই, সেটা আলাদা কথা। ওরা আমাকে আপন করে নিয়েছে, কিন্তু তুমি?

—চলই না, ভুল করছে জানি, কিন্তু কতটা ভুল করছে একবার দেখা দরকার।

মৈত্রেয়ী জানেন, যখন তিনি সংকল্প করেছেন, তখন যাবেনই, তাই বাধা দিলেন না। তবু মৈত্রেয়ী সঙ্গে থাকলে ওরা হয়ত বেফাস কিছু বলবে না। অযথা উত্তেজিত হবে না।

গঙ্গাধর মৈত্রেয়ীকে নিয়ে কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ হাজির হবার জন্য ক্যাম্পের দিকে পা বাড়ালেন।

॥ ত্রিশ ॥

অলকার বই-লেখা অর্ধ-পথে পড়ে রইল। কি হবে লিখে? কাদের জন্যে লেখা? কারা এ পড়বে? সত্যি কথা লিখলে বই ছাপা হয় না। যা সত্য নয়, যা মিথ্যা তাই লিখলেই বই বাজারে চলে। দেশ এগিয়ে গেছে, একবার শুধু তাকিয়ে দেখ, এটাই অলকা বলতে চায় তার বইতে। সেদিন যাদের হাতে সরকার ছিল, তারা ভীত ত্রস্ত পদে এগিয়েছে। সবার জন্যে দেশটাকে গড়ে তুলতে দেয়নি যে কায়েমী স্বার্থ, তার ইতিহাস ভয়ংকর। যারা ইতিহাসের নানা পর্যায়ে দুর্ভিক্ষে বা অন্য যে কোন জাতীয় বিপর্যয়ে আঙুলটি নেড়ে পর্যন্ত দরদ দেখায়নি, সাহায্য করা ত দূরের কথা; তাদের হাতে সেদিন দেশ গড়ার দায়িত্ব ন্যস্ত হলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াত, তাও অকল্পনীয়। সেও আর এক কায়েমী স্বার্থের ইতিহাস। যারা পুঁজি খাটিয়ে ফ্যাক্টরি করে তার সব রস শুষে খেয়ে সরকারের হাতে রুগ্ন প্রতিষ্ঠানটি তুলে দিয়ে মনে করে নিজেদের দায়িত্ব পূরণ করল, ওদের প্রকৃত স্বরূপই অলকা তুলে ধরতে চায় তার লেখায়। এও অনেকটা

গরুর দুধ দেওয়ার মত। দুধ ফুরলেই আপদ হয়ে দাঁড়ায়। তখন আপদটাকে বিক্রি করে দাও। এইসব স্বার্থান্বেষীর হাতেই ইদানীং ডিমোক্র্যাসির সুদর্শনচক্র। তবু অলকা ভেবেছিল, যেটুকু কাজ হয়েছে দেশের আর যারাই তা করে থাকুক, দেশ ত অনেকটা এগিয়েছে, ওটুকুই যদি সত্যের আলোতে তুলে ধরা যায়, তবে সেটাও কম বড় কথা নয়। কিন্তু অলকা বড় ক্লান্ত। লেখার আর ধৈর্য নেই। ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে দুর্নীতি। এসব কথা, এসব গুপ্ত ষড়যন্ত্রের কথা লিখতে নেই। লিখলে অনেকেরই ক্ষতি হয়। নিজের জীবন বিপর্যয়ে সব আকাঙ্ক্ষাই কেমন অসার মনে হয় অলকার।

অলকা ফাইলপত্র সব গুটিয়ে রাখল। শেষটা লেখার নয়, দেখার। এতটুকুও বাতাস নেই। চারিদিকে মেঘ করে এসেছে। অলকা কিন্তু জানে এ আকাশের বৃষ্টি ঝরাবার ক্ষমতা নেই।

কদিন ধরে অলকাকে যে খুব আনমনা দেখাচ্ছে তা শকুন্তলা লক্ষ্য করেছে। নিজের জীবনের ট্র্যাজেডির ভারবোঝা যদি শুধু অভিমান ভরে সারা জীবন বইতে হয়, জীবনের অলিতে-গলিতে যে ঘনায়মান অন্ধকার, তাতে প্রতিনিয়ত যদি মাথা ঠোকাঠুকি করতে হয় তবে বুক ফেটে যায় ব্যথায়, সত্তার প্রকৃত স্বরূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শকুন্তলা এই নিদারুণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করছে বলেই হাসিখুশীতে ভরা, প্রতিবাদে সোচ্চার ছোট বোনটাকে এই জগদ্দল বোঝার হাত থেকে মুক্ত রাখতে চায়। কিন্তু অলকাকে দেখে মনে হয় সে সেদিকেই পা বাড়াচ্ছে। সময় মত বাধা না দিলে সমূহ বিপদ। একথা ভেবেই শকুন্তলা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। যা ঘটবার তা ঘটবে, বাধা দিয়ে কোন ফল হয় না।

উপরে এসে শকুন্তলা দেখল অলকা একগাদা বই, কাগজপত্র ও ফাইলের মধ্যে বসে সেগুলো গুছিয়ে রাখছে। বোধ হয় লিখতে বসেছিল। কিন্তু মুখের ভাবে লেখার সেই জীবনপণ আর নেই। ঘরে ঢুকে শকুন্তলা এটা-সেটা দেখে। জানলার সামনে গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। মেঘলা আকাশ। অলকার কোন হুঁশ নেই।

শকুন্তলা আর থাকতে না পেরে প্রশ্ন করে—কি রে অলকা, কি ভাবছিস?

—দিদি তুই!

—তোর ত দেখছি কোন খেয়ালই নেই। কি ভাবছিস এত? আজ-কাল তুই বড্ড মনমরা হয়ে থাকিস। বাবাও তা লক্ষ্য করেছেন, জিজ্ঞেস করছিলেন আমায়।

অলকা নিজেকে আড়াল করবার জন্যে প্রথমেই বই লেখার সমস্যার কথা তুলল। বলল, এরকম বই লিখলেও বই কখনও ছাপা হবে না।

তার পেছনেও কায়েমী স্বার্থ কাজ করবে। তাই লোক বুঝে, দেশের লোককে খুশী করার জন্যে যদি কিছু লেখা যায়, তারই কদর কেন, তারও দীর্ঘ এক ব্যাখ্যা দিয়ে ফেলল দিদিকে।

শকুন্তলা বলল—ওঃ, তাই বুঝি তোর মন খারাপ। তা তুই লিখে যা-না। ছাপা, বই বিক্রির ভার না-হয় আমিই নেব। তোর বই ঘাড়ে নিয়ে বেচতে আমার কোন লজ্জা নেই। হ্যাঁ-রে, মন খারাপের এটাই কি আসল কারণ, না অন্য কিছু।

প্রবল ঝড়ের মুখে পড়লে যেমন হয়। একটু আশ্রয়ের মরীচিকা দেখলে মনে হয়, এখানে দাঁড়ালেই বুঝি বেঁচে যাব, শান্তি পাব। অলকার মনের অবস্থাও ঠিক এই রকম। একবার ভাবে, এ পর্যন্ত যা ঘটেছে, সব দিদিকে খুলে বলে। কিন্তু বলার একটাই বাধা। সন্দীপ যে যুক্তি দেখিয়ে তার জীবন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে, সে যুক্তি দিদি কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। সুরিন্দরকে দোষারোপ করবে। দিদির ব্যক্তিত্বের ওপর অলকার পূর্ণ আস্থা। তিনদিনের মধ্যেই সুরিন্দরের এখানে আসা বন্ধ হবে। দশ দিনের দিন সুরিন্দর বিদেশে ফিরে যেতে বাধ্য হবে। আর ওত ফিরে যাবার জন্যে তৈরী হয়েই আছে। যত দিন থাকতে পারত, তত দিন হয়ত আর থাকতে পারবে না। দেশে বিদেশী মন নিয়ে থাকা সত্যিই মুশকিল। সুরিন্দরকে বিয়ে করার বাধাটা কোথায়, তাও দিদিকে খুলে বলা যাবে না। সন্দীপ বলেছে, সুরিন্দর অলকার বহুদিনের বন্ধু। অমিত তেজে তার পেছনে লেগে আছে। অতএব, অলকার ওপর যদি কারুর দাবী থাকে, সে ভাগ্যবান সুরিন্দর, সন্দীপ নয়। সন্দীপের এ যুক্তি দিদি শুনলে বলবে, সন্দীপ কাপুরুষ। বাঙালীরা ওরকমই হয়। নানা দুর্ভাবনায়, নিছক কাল্পনিক স্বপ্নে বিভ্রান্ত হয়ে শেষ মুহূর্তে তারা পিছিয়ে পড়ে। অথচ এই যুক্তির পেছনে সন্দীপের যে অসীম মনোবলের পরিচয় আছে, সেটা অলকা ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। সুরিন্দরকে বিয়ে করার কথা এখনও অলকা ভাবতে পারে না। কিন্তু অলকার কোন কথায় সন্দীপকে দিদি ভুল বুঝুক এটাও অলকার সহ্য হবে না। এত সব ভেবেই অলকা চুপ করে রইল।

অলকা কোন কথাই বলছে না দেখে শকুন্তলা একটু অধৈর্য হয়েই বলে উঠল—কি রে, চুপ করে রইলি কেন, কিছু বল?

—কিছু বলার নেই, দিদি। তোরও জীবনে ওরকম একটা সময় গেছে। তুই ত কখনও কাউকে কিছু বলিসনি। আজ যে আমাকে খুব বলছিস।

—তুই যে অনেক বেশী স্পষ্ট—কি কথাবার্তায়, কি স্বভাবে। তুই কী আমার মত চিরকাল চুপ করে থাকতে পারবি? বঞ্চনার বোঝা

বওয়া অত সোজা নয় রে পাগলী। যাই হোক একটা কিছু ঠিক করে ফেল্।

—ঠিক করার কিছু নেই। ঠিক হয়ে আছে।

—শকুন্তলার মুখখানা খুশীতে ঝলমল করে উঠল—ওঃ, তাই নাকি! সন্দীপকে তাহলে বিয়ে করছিস্? আমাদের দিক থেকে কোন আপত্তি হবে না। আংকেল বা আন্টির যদি আপত্তি থাকে? তাই-বা কেন, বল ত আমি প্রস্তাব করি।

—না দিদি, তোর দু'টি পায়ে পড়ি, ওর মধ্যে তুই যাস না।

—কেন, কী হল? সন্দীপ কী তোকে পছন্দ করে না? আর তুই? তোর ত আবার উল্টো ব্যাপার।

—আমার কী উল্টো ব্যাপার, দিদি?

—তুই ত আবার সন্দীপকে ছাড়া—। সে যাক, সন্দীপ কি বলছে, আগে শুনি।

—সন্দীপ আমাকে অত পছন্দ করে বলেই ত এত সমস্যা।

—সে আবার কী কথা রে?

—তুই বুঝবি না দিদি, ব্যাপারটা খুব কমপ্লিকেটেড্ হয়ে গেছে।

—খুলে না বললে বুঝব কি করে? তবে আমি জানি মানুষের সম্পর্কটা সব সময় স্ট্রেট্ লাইনে চলে না। তবে কি সুরিন্দর কোনরকম গণ্ড-গোল করছে? ওকে আমি দু-দিনে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি। তুই ত জানিস, আমার বিলেতের বন্ধুদের। তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও তোর জানা। তারা এখনও আমার খোঁজ-খবর করে। তুই এখনও খুলে বল, দেখ্ আমি কিভাবে কী করি।

—না, দিদি না, সুরিন্দরের কোন দোষ নেই।

—তবে কার দোষ?

—দোষ আমার ভাগ্যের।

—ওসব কথা রাখ। আমরা পাঞ্জাবী। ভাগ্যকে আমরা মানি না। অনেকবার আমরা মার খেয়েছি, তবু আমরা নতুন করে ভাগ্য গড়েছি। আমার যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তুই একবার বল। আমাদের দু-বোনের একই অবস্থা হবে, সে আমি কিছুতেই সইতে পারব না।

—সুরিন্দরকে বিয়ে করলেই ল্যাঠা চুকে যায়। আর কোন সমস্যাই থাকে না।

—তুই কী সেটাই চাস? তবে তারই ব্যবস্থা করি।

—না, দিদি। লক্ষ্মীটি আরও কিছুদিন সময় দে আমাকে। সবাই মিলে আমাকে তোরা মারিস না। বলে অলকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্তব্ধ হয়ে শকন্তলা কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ঘর

ছেড়ে উঠে গেল।

শকুন্তলা ভেবেছিল অলকার মনের অবস্থা কাউকে কিছু বলবে না। অলকা সারাক্ষণই কিছু-না-কিছু করত। আর কিছু না-হোক লোকের পেছনে পড়ত। অকারণ প্রতিবাদ করে বেড়াত। এই রকম মুখরা মেয়েকে নীরব হয়ে থাকতে দেখে কার না কষ্ট হয়? নির্মলার জিজ্ঞাসার উত্তরে দু-চার কথা বলেছে শকুন্তলা। স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। নির্মলা এসব নিয়ে অলকার সঙ্গে কোনদিন কোন কথা বলেননি। আজও হয়ত বলবেন না। নির্মলার সব রাগ তাই গিয়ে পড়ল সহনশীল নির্বিকার চন্দ্রভানু ভর্মার ওপর। মেয়েদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা নিয়ে তিনি কোন কথা বলবেন না, এ যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। এইভাবে নির্মলার সারা জীবনটাই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছেন। সন্দীপের দিক থেকে বাধা যদি থাকে তবে সুরিন্দর কি দোষ করল? এরজন্যে মেয়েদের কোন কথাই বলা যাবে না চন্দ্রভানুর আদেশ। নিজের মতামত জোর করে মেয়েদের ওপর চাপাতে চান না চন্দ্রভানু। একটু কিছু বললেই নিজের ঘরে উঠে চলে যান। নিজের ঘর থেকে তিন দিন আর বেরোন না।

বাড়িতে অলকাকে নিয়ে টুকরো টুকরো কথাবার্তা চলতে থাকে। চন্দ্রভানু মাঝে মধ্যে দু-একটা কথা বলে চুপ করে যান। এনিয়ে নির্মলার যন্ত্রণার শেষ নেই। আর এনিয়ে শকুন্তলার বিরক্তি। চন্দ্রভানুর সেই একই নীরবতা ও নিজের ঘরে নিজের বনবাস। এসব দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি শুরু হল। গঙ্গাধর বা মৈত্রেয়ীর কথা কেউ তুলল না, কেউ একথাও বলল না যে, সন্দীপের অলকার সঙ্গে মেশা উচিত হয়নি। ওদের মেলামেশা করাটাও যেন স্বাভাবিক, কারুর কিছু বলার নেই। সুরিন্দর যদি অলকার দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াত তাহলে এ বাড়িতে সুরিন্দরের আর রক্ষে ছিল না।

বাড়ির এ গুমোট হাওয়ার মধ্যে নির্মলা হাঁপিয়ে উঠলেন। অলকা আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে। নির্মলা লক্ষ্য করলেন, আগে বাড়িতে ফিরে এসে খাতাপত্র নিয়ে বসত। এখন সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। রোমিও-জুলিয়েটকে আদর করে। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে বাপের মতই মৌনব্রত পালন করে।

শকুন্তলা তখনও বাড়ি ফেরেনি। নির্মলা ঘরে ঢুকে দেখেন চায়ের পট তেমনি পড়ে আছে। অলকা জানলায় দাঁড়িয়ে। শিমুল গাছটার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু আশ্চর্য হয়ে বললেন—কি-রে, তুই চা খাসনি?

—ওঃ, তাইত, করে দাও না, মা।

চায়ের কাপে চা ঢালতে ঢালতে নির্মলা জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে তোর?

—কই, কিছু না ত। আমি কি তোমাদের জন্যে নিজের মনেও একটু থাকতে পারব না? তোমরা সবাই মিলে এত প্রশ্ন করছ কেন?

—তোকে আমি এমন কি কথা জিজ্ঞাসা করেছি যে অমন করে উঠলি।

—এই ত, গম্ভীর হয়ে আছি বলে তুমি কত প্রশ্ন করছ।

—বাঃ, সব সময়ে যে আনন্দে-হাসিতে মুখরা, সে যদি আনমনা হয়ে থাকে, তবে কেঁউ কিছু বলবে না! এই ত চা পড়ে আছে, খাচ্ছিস না। ঐ ত ফাইলপত্র উঠিয়ে রেখেছিস, লিখছিস না। তোকে ত এরকম কখনও দেখিনি। সন্দীপ কিছু বলেছে?

—হ্যাঁ, সন্দীপের জন্যে আমি মরে যাচ্ছি কি না!

—সেরকমই ত মনে হয়।

অলকা হতবাক। এই ভাবটা ঢাকতেই একটু হাসল অলকা। বরাবরই অলকা দেখেছে, মা কী এক অদৃশ্য শক্তিতে সব কিছু আগে থেকে টের পান। অলকা লক্ষ্য করেছে কারুর সঙ্গে কোনদিন কথা কাটাকাটি হলে কিংবা কিছু ঘটলে, মা ঠিক সেকথা জিজ্ঞাসা করবেন। নয়ত এমনিতে কোন প্রশ্ন করেন না। অলকা যা বলে শুনে যান, কখনও পাল্টা প্রশ্নও করেন না। অলকার প্রতি নির্মলার এত আস্থা যে অলকার ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে তিনি থাকেন না। অনেকটা চন্দ্রভানু পছন্দ করেন না বলেই। নির্মলার সন্দেহ হবার কারণও ঘটেছে। আজকাল সন্দীপ বড় একটা আসে না। টেলিফোনও করে না। অলকাও সন্দীপের কথা বলে না। ওদের দুজনের সম্পর্কটা যে আর স্বাভাবিক নেই, জটিল হয়ে উঠেছে, মায়ের মন তা বুঝতে পারে। অলকাই আশঙ্কার জাল বুনে চলেছে মাকড়শার মত।

নির্মলা অলকাকে একবার ভাল করে দেখে নিলেন। সে হাসি আর নেই। সে স্বতঃস্ফূর্ত সজীবতাও নেই। নির্মলার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। তিনি একটু সামলে নিয়ে সহজ হয়ে জিগ্যেস করলেন—হ্যা-রে সন্দীপ বুঝি দিল্লীতে নেই?

অলকা বলল—না।

—সুরিন্দর নাকি শীগ্গীরি চলে যাবে?

—আমিও তাই শুনেছি।

—যাই করিস বুঝে-শুনে করিস। আমি আর কি বলব তোকে। বলেই নির্মলা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। অলকা ডাকল—মা, শোন।

—বল্।

অলকা এগিয়ে এসে মায়ের হাত ধরে বলল—আমার কিছু হলে তোমরা খুব বিচলিত হয়ে পড়, না মা?

নির্মলার ইচ্ছে হল অলকার বুক-পিঠে হাত বুলিয়ে আশ্বাস দিয়ে বলেন,

আমি আছি তোর ভয় কি মা। চন্দ্রভানুর কথা ভেবে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললেন—সব মায়েরাই মেয়ের কষ্ট বোঝে, এ আর নতুন কথা কি মা? তুই হাসতে ভুলে গেছিস। তোর কি কষ্ট, না বললে কি করে বুঝি বল।

—ঐ যে বললে তুমি সব বোঝ?

—বাঃ, তোরা সব আজকালকার মেয়ে। খোলাখুলি সবারই সঙ্গে মিশবি, সমস্যা পাকিয়ে উঠলে নানা রকম ভাববি। মনে করবি মা কেন বুঝতে পারে না আমার সমস্যাটা। কিছু না বললে মা-ই বা কী করে জট ছাড়ায় বল্। তোদের আমি স্বাধীনতা দিয়েছি। তোদের বাবার জন্যে তোদের কোন সময় কোন কথা বলিনি। তাই তোরা না বললে তোদের কথা মা কী করে বুঝবে?

অলকা আকুলভাবে নির্মলাকে জড়িয়ে ধরল। একটু চুপ করে থেকে বলল—তুমি কিছু বল না বলেই ত তোমাকে আমি সব কথা খুলে বলি। সবাই অবাক হয়। ভাবে, বুড়ো ধাড়ী মেয়ে, মাকে কি করে সব কথা খুলে বলে। আমার বন্ধুরাও অবাক হয়। তারা ত জানে না, মা আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না বলেই ত মাকে আমি কিছুই লুকোই না। ওরা জানে না, তুমি আমাদের কত বিশ্বাস কর, কত ভালবাস। সব কিছু দিয়ে আমাদের কিভাবে তুমি বেঁধে রেখেছ। তোমার কাছে কিছু লুকোবার কথা আমি ত ভাবতেই পারি না, মা। একটু হেসে অলকা বলল—আচ্ছা মা, সন্দীপ আর সুরিন্দর, এদের মধ্যে কাকে বিয়ে করলে তুমি খুশী হও?

—আমি কী করে বলব, তোর কাকে পছন্দ?

—ধর যদি তুমি হতে, কাকে বিয়ে করতে?

এতক্ষণে নির্মলা হেসে ফেললেন, বললেন—বাঃ, এ ত ভারি অদ্ভুত কথা।

অলকা আব্দার ধরল—বলো না।

—বুঝেছি, তোর সমস্যা।

—হ্যাঁ, অলকা একটু থামল। কি ভেবে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল—বিয়ে যদি করতেই হয় ত কিছুদিনের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

নির্মলা একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। ভাবেন, নিশ্চয় একটা গণ্ডগোল পাকিয়েছে, অলকা। নিজের আশঙ্কাটা যথাসাধ্য আড়াল করে বললেন—তা বাপু যা-ই করিস, শকুন্তলার মত অমন বোকামি করিস না। ও ত একাই বেশ থাকে দেখি। তোর স্বভাব ত আমি জানি। প্রাণখোলা মানুষের ওসব সইবে না।

—কেন মা? আমার সহ্য ক্ষমতা কম? আমার প্রকৃতি কী নরম? লোকেরা কিন্তু তা বলে না। বরঞ্চ উল্টোটাই জানে।

—লোকেরা কি ভাবে-না-ভাবে তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। যদি শকুন্তলার মত হতিস ত তোকে নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তাই ছিল না। তোকে দেখার একজন মানুষ চাই, নয়ত তুই নিজের আগুনে নিজেই জ্বলে মরবি।

অলকা হেসে ফেলল। বলল—বাবাঃ, এত আগুন আমার ভেতরে আছে যে, একদিন নিজের আগুনেই নিজে জ্বলে মরব। আমার মৃত্যুর জন্যে কেউই দায়ী হবে না। সেত অনেক ভালো, মা।

—নিজের আগুনে নিজের মরা ভালো। কিন্তু সে আগুন যখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তখনই ভয়ানক হয়ে দাঁড়ায়। তখন আশেপাশে যা পায় তাই পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়।

—চারিদিকে আমি আবার আগুন ছড়াবো কি করে?

নির্মলা হেসে উঠলেন। অলকাও হেসে মায়ের হাতখানা ধরে খাটে বসিয়ে আব্দারের সুরে বলল—তাহলে বলে দাও, এই ভয়ঙ্কর অন্তর্শক্তিকে সামলাবার জন্যে কোন্ শক্তিধরের গলায় মালা দেব।

নির্মলা অলকার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে আদর করে বললেন—হ্যাঁ, তুই সেই রকমই মেয়ে কিনা। আমি বললেই মালা নিয়ে ছুটবি।

—এখন সেরকমই দাঁড়িয়েছে।

—কী দাঁড়িয়েছে?

—দুয়ের মধ্যে কাউকে বিয়ে না করলে আগুন জ্বলবে, আর সে আগুনে আমি জ্বলবো। বলেই নিজের মনেই হো হো করে হেসে উঠল অলকা।

-খুব যে হাসছিস, ভাবছিস, আমি মজা করছি?

—তুমি যে আমার জন্যে এত ভাব, বুঝতে পারিনি মা।

—হ্যাঁ, তা বুঝবি কেন? নির্মলা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—ভাবনার জন্যে ত তোর বাপই আছে। মা কেন ভাববে। সব দায়-দায়িত্ব ত তোর বাপের। বাপের আশকারায় যা-ইচ্ছে তাই তোরা করিস। আর আমি অশান্তির ভয়ে চুপ করে থাকি।

অলকা মাকে জড়িয়ে ধরল। বলল—না, মা। তা নয়, মা। তুমি কত লক্ষ্মী মা আমার। মাগো, তোমার মত মা কজন পায়? তুমি যা বলবে অতি বাধ্য মেয়ের মত তা আমি মাথা পেতে নেব। যা বলবে একটু আস্তে আস্তে বোল। বাবা না জানতে পারে। তোমার এ আদেশের কথা আমি ঘুণাক্ষরে কাউকে জানাব না, বাবাকেও নয়। কি খুশী ত?

নির্মলা অলকার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—কষ্ট পাস না, জীবনকে অত সেন্টিমেন্টালি নিতে নেই। ভালবাসার জনকেই যে

সবাই পায়, তাও নয়। যাকে চায়, যা চায়—সবই যদি সবাই পেত, তাহলে দুঃখ বলে কোন জিনিসই থাকত না।

—তুমি কার কথা বলছ, মা?

—সন্দীপের কথা।

—সন্দীপের কথা বলছ কেন?

—তুই যে ওকে ভালবাসিস।

—তুমি কি করে জানলে, মা?

—মা হলে বুঝবি। সব জানা যায় রে। মা-ই ত পেটে ধরে। তাই সব বুঝতে পারে।

—আমাদের ছোট্ট এই দুটি পরিবারের মধ্যে কি মধুর সম্পর্ক। আমি বোধ হয় সব নষ্ট করে দিলাম, মা। অলকার দু-চোখ জলে ভরে এল।

নির্মলা কিছু যেন শুনতে পাননি, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে নিজের মনেই বলে যেতে থাকলেন—সন্দীপকে ভালবাসবি, এটাই ত স্বাভাবিক। তোর যে প্রাণ আছে। আর তাছাড়া তোরা ত একই সঙ্গে মানুষ হয়ে উঠেছিস। দূরে দূরে থাকলেও মানুষ হয়েছিস অনেকটা আপন জনের মত। সেদিন ফোন করেছিলাম, মৈত্রেয়ী তোর কত প্রশংসা করল। তুই নাকি বেশ সপ্রতিভ হয়েছিস। তোর সব ব্যাপারেই কৌতূহল আর জিজ্ঞাসা আছে বলছিল—আরও কত কি—।

—তুমি কী বললে?

—আমি বললাম, অলকাকে ত ছোটবেলা থেকে তুমি দেখে আসছ। তাই মেয়ের মত তোমার অপত্য স্নেহ ওর ওপর। ও মেয়েকে নিয়ে ঘর করলেই টের পাবে। শুনে মৈত্রেয়ী হাসতে লাগল। একটু পরে বলল—জানি, তবে একটা কথা আছে নির্মলা, আমরা ত আজকাল প্রতিবাদ করতে প্রায় ভুলে গেছি। বিরুদ্ধ মত, বিরুদ্ধ শক্তি দেখলেই আমরা ঘাবড়ে যাই। ভাবি অমনতর হয় কেন। দশ জনের মত কেন হল না। অলকা দশ জনের মত নয় বলেই তোমার হয়ত একটু আশঙ্কা।

—তারপর?

—তারপর সন্দীপের সঙ্গেও কথা বললাম।

অলকা আর কৌতূহল চাপতে পারল না। জিজ্ঞেস করল—কি কথা হল?

—এই কেমন আছি, ইত্যাদি। অলকা কেমন আছে, বাড়ি আছে কি না।

—বললাম নেই, কখন ফিরবে তাও জানি না। পরে ফোন কোর। ফোন নিশ্চয় করেনি, নয়ত শুনতাম। এর মধ্যে এমন কি অঘটন ঘটে গেল, জানিনা বাবা। তুই-ই জানিস, তুই বলতে পারিস। অলকা আর কোন কথা বলল না। চুপ করে রইল।

নির্মলা উঠে পড়লেন। বললেন—চলি, শকুন্তলার আসার সময় হল।

—সমস্যার কোন সমাধান হল না, মা।

—সমস্যার সমাধান করবেন তোর বাবা। কত তোকে উপদেশ দেবেন, তুই হাঁ করে তখন শুনিস। তবে একটা কথা আমি তোকে বলে রাখছি। গঙ্গাধরদের সঙ্গে আমাদের সুন্দর মধুর সম্পর্ক, ওখানে কিছু উনিশ-বিশ হলে তোর বাবা কিন্তু সহ্য করবেন না, সেদিকে খেয়াল রাখিস।

—আমি তবে কাউকেই বিয়ে করব না।

স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নির্মলা। যন্ত্রণায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে খুব শান্ত হয়ে বললেন—এতদূর এগিয়েছিস ?

—না, সে ভয় নেই তোমার। সন্দীপ খুব ম্যাচুয়রড।

—সন্দীপকে আমি চিনি।

—তবে আমার আর কি ভাবনা।

—অগত্যা সুরিন্দরই বাকি থাকে, এই ত।

—সুরিন্দরকে বিয়ে করা যায়, মা ?

—কেন না। তুই না ভালবাসলেও সুরিন্দর ত তোকে ভালবাসে। তাছাড়া, সুরিন্দর জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে। রোজগারও ভাল করে। তোর বাপের আপত্তির কারণ, ওদের পরিবার পার্টিশনের পর প্রচুর টাকা কামিয়েছে। বিলেত-আমেরিকা করে আলট্রা-মর্ডান হয়ে গেছে। তাই ওদের সঙ্গে সম্পর্ক পাতান চলে না। সুরিন্দরের মা-বাবাও ত তোকে পছন্দ করে। আপত্তি কী ? তুই বলবি, মনের মিল না-হলে কি করে ঘর করব ? আমাকে দেখছিস না। সারাটা জীবন খালি এডজাস্ট করে কাটিয়ে দিলাম। আমার নিজের বলতে কী কোন সখ-আহলাদ ছিল না ? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু সব হয় না রে, পাগলী ! যা করবি, একটু ভেবে-চিন্তে নিয়ে করিস। সারা জীবনের ব্যাপার, মনে রাখিস। বলেই নির্মলা ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেলেন। অলকা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বাইরে শকুন্তলার হাঁক ডাক শোনা যায়। রোমিও-জুলিয়েটের আনন্দো-ল্লাস ভেসে আসে।

॥ একত্রিশ ॥

গণেশ টাওয়ার সম্পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই পরাঞ্জপে ইতিহাস হয়ে গেলেন। শেষ ক্ষণটির জন্যে তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। এ মহৎ

কীর্তি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁকে যে শুধু ভবিষ্যতের দিশারা দেবে তাই নয়, এর আদর্শ দেশের মজ্জায় মজ্জায় বিপ্লব ঘটাবে। জীবন্ত ইতিহাস হবে, স্মরণীয় ইতিহাস।

গণেশ টাওয়ার সম্পূর্ণ হবার পরেও বোঝা যায় না এর পেছনে কারা আছেন। পার্লামেন্টে প্রশ্ন তোলা হল। অপজিশনের সংসদ সদস্যরা এ বিষয়ে আলোচনার দাবী পেশ করলেন সংসদে। তাঁদের সব দাবী একে একে খারিজ হয়ে গেল। শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী উত্তর দিলেন—গণেশ টাওয়ারের পেছনে রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য নেই। যত-টুকু সরকার জানেন, এটা বিশ্ব সাংস্কৃতিক ও সদ্ভাবের একটা অভিনব প্রচেষ্টা। ভারতীয় আর্টে ধর্মের উদার দৃষ্টির যেখানে সমন্বয় ঘটেছে, সেই ধর্মীয় একাত্মতাবোধও এ প্রচেষ্টার একটা অঙ্গ। যা কিছু হচ্ছে আইন অনুসারেই হচ্ছে।

আকাশ-ছোঁওয়া গণেশ টাওয়ারের আজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সারা শহর ভেঙে পড়েছে রামলীলা গ্রাউণ্ডে। রাজনৈতিক দলের বড় বড় মাথা, শিল্পপতি, বিজনেস্‌ম্যান, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি, ডিপ্লোম্যাট, বুরোক্যাট ও সেক্রেটারীমহল সবাই নিমন্ত্রিত হয়েছেন গণেশ টাওয়ার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। প্রধানমন্ত্রী আসছেন উদ্বোধন করতে। টাইট সিকিউরিটির ব্যবস্থা। সহস্র চোখ শকুনির মত উড়ে এসে বসেছে এখানে-ওখানে। কাগজে কাগজে পরাঞ্জপের ছবি বেরুল—ঐতিহাসিক গণেশ টাওয়ার নির্মাণের সমাপ্তি-পর্বের নানা টুকরো টুকরো হাস্যোজ্জ্বল কাহিনী নিয়ে। সংগ্রামের বিপুল হতাশা ও আনন্দমুখর দিকগুলো মুখরিত হয়ে উঠল কাগজের লেখাগুলোতে। টি, ভি, ও রেডিওতে খবর প্রচারিত হল। কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ। বড় বড় অক্ষরে লেখাঃ আজ গণেশ টাওয়ারের উদ্বোধন। উদ্বোধন করছেন প্রধানমন্ত্রী, 'গণেশায় নমঃ' মন্ত্র উচ্চারণের সফলতার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। গণেশ মন্দিরে পুজো দেবার সম্যক ব্যবস্থাঃ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সময় বেলা ৪ ঘটিকা। ঘন্টাধ্বনি মুখরিত আরতির ব্যবস্থা সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়। দলে দলে সবান্ধব সপরিবার যোগ দিয়ে জীবন সার্থক করুন।

ব্যারিকেডের সামনে-পেছনে শুধু জনসমুদ্র। গণেশ টাওয়ারের সামনে সাদা-কালো, হরিৎ ও ছাই রঙের মাথাগুলো সমুদ্রের ঢেউয়ের মত কখনও সামনে এগোচ্ছে আবার কখনও পিছু হটছে। শুধু দিল্লীর আশে-পাশের এলাকা থেকেই নয়, গণেশ টাওয়ার দেখতে এসেছেন সারা ভারতের লোকেরা। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্র থেকে সাধারণ মানুষ, ট্রেডার, ব্যবসাদার, শিল্পপতি, পার্টি মহলের লোকজন, পদস্থ কর্মচারী ও বুরোক্র্যাটরা এসেছেন। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে মেয়ে-বউ, বুড়ো-বড়ির

ভিড়ই সবচেয়ে বেশী। এছাড়া, আমন্ত্রিত সর্ব দলের সর্ব মানুষ, এম. পি. ও এম. এল. এ.রা। কেউ এসেছেন খদ্দরের টুপি পরে, কেউ বা পাগড়ি, কেউ আবার চুড়িদার-চাপকান, কেউ এসেছেন সুটেড্-বুটেড্ হয়ে, কেউ কেউ আবার খদ্দরের সিল্কের পাঞ্জাবী পরে। এ মহাযজ্ঞে অনুপস্থিত শুধু দুটি বামপন্থী দল। অত ব্যস্ততার মধ্যেও পরাঞ্জপে সেটা লক্ষ্য করলেন। দুই দলই পৃথক পথক চিঠিতে জানিয়েছেন, এধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের তাঁরা বিপক্ষে। ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও আঞ্চলিকতাবাদ সারা দেশের হাওয়াকে কলুষিত করছে। গণেশ টাওয়ার তার চেয়ে বড় কিছু উদ্দেশ্যকে সফল করবে বলে তাঁরা মনে করেন না। দেশের ও পার্টির বৃহত্তর স্বার্থে আপনাদের এ মহাযজ্ঞে আমরা উপস্থিত থাকতে অক্ষম বলে দুঃখিত। আশা করি, আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি আপনারা নিজ-গুণে মার্জনা করবেন। পরাঞ্জপে একবার ভেবেছিলেন পুলকেশকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, কতবার তোমরা এই একই ভুল করবে? কবে তোমরা এদেশের একজন হয়ে উঠবে? এখনও যদি না পার, পুলকেশ, তবে জেনো, এ-দেশের মাটিতে তোমরা কোনকালেই শেকড় গাড়তে পারবে না। পুলকেশকে এখন পাওয়া গেলেও এ ঐতিহাসিক প্রশ্ন করার যথোপ-যুক্ত সময় এটা নয়। তাই সাত পাঁচ ভেবে পরাঞ্জপে নিরস্ত রইলেন। এ ধরনের ভুলের মাশুল পরবর্তা কালকেই দিতে হয়। কার্যকারণ ছাড়া জগতের কোন কিছুই হবার উপায় নেই। এটা তোমরা বোঝবার চেষ্টা কর পুলকেশ! হাজার হাজার বছর ধরে যে স্রোতধারা ভারতের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মকে শত বৈচিত্র্যের মধ্যে ধরে রেখেছে, তাকে মানি না বললেই কী সমস্যার সমাধান হয়।

প্রধানমন্ত্রী বড় বড় রথী-মহারথীদের সামনে, জনগণের বিপুল হর্ষ-ধ্বনির মধ্যে তাঁর ভাষণে বললেন—ভারতবর্ষ বিশ্ব সভায় আবার যে জেগে উঠছে, গণেশ টাওয়ারই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। এই বিশাল গণেশ টাওয়ার গড়ে তোলার পেছনে শুধু যে আমাদের দেশ আছে তাই নয়, আছে ফ্রান্স, আছে ইটালী, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় এ সম্ভব হয়েছে। যেসব বিদেশী এক্সপার্টদের অক্লান্ত ও একান্ত সহযোগিতায় ভারতীয় স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়াররা এ মহান কার্য সুসম্পন্ন করতে পেরেছেন, তাঁদের আমি আমার তরফ থেকে, ভারতের তরফ থেকে স্বাগত জানাই। কৃষ্টি ও দৃষ্টির আদান-প্রদানেই দেশ সমৃদ্ধ হয়। অতীত ইতিহাসে এ আদান-প্রদান যতদিন বহুবিস্তৃত ছিল ততদিন আমরা অন্যান্য দেশের কাছ থেকে যেমন গ্রহণ করেছি, তেমনি আবার দিয়েছিও উদার হস্তে। এটা আমাদের ভুললে চলবে না।

ভারত এখন সপ্তম বৃহত্তম শক্তি। এ শক্তিকে আমরা বিশ্ব শান্তির

কাজে লাগাচ্ছি। বিশ্বজোড়া শান্তি যদি আসে, তবে ভারতের অবদান, সেইসঙ্গে গণেশ টাওয়ারের অবদান অক্ষয় অমর হয়ে থাকবে। অত্যাশ্চর্য এই গণেশের দিকে আপনারা একবার তাকিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন আধুনিক টেকনলজিকে আমরা কিভাবে কাজে লাগিয়েছি। আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও ধর্মকে বিসর্জন না দিয়ে। পাঁচ হাজার বছরের প্রাণ স্পন্দনকে বাঁচিয়ে রাখবে গণেশ টাওয়ারের এই অমূল্য ঐশ্বর্য। গণেশ—জনগণের দেবতা, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষের দেবতা, সর্বজনের দেবতা। এতদিনে তিনি বুঝি প্রসন্ন হলেন। এতদিন পরে তিনি আমাদের স্মরণে এলেন, তাঁকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে ধন্য হলাম। এটা দেশের পক্ষে, দেশবাসীর পক্ষে এক পরম পাওয়া। গণদেবতা তাঁর পাতালপুরীর জ্ঞানভাণ্ডারও খুলে দিয়েছেন। ঐ দেখুন, আপনাদের ঐ অতল-গহ্বর থেকে তিনি ডাকছেন। আপনারা নীচে গিয়ে তাঁর পুজো দিতে পারবেন। চাইলে লিফ্‌টে করে উপরে উঠে গিয়ে তাঁর অনন্তের আলোর রাজ্যে বিচরণ করতে পারবেন। এ যুগের একজন মহাপুরুষ বলে গেছেন—ঈশ্বরের হদিস যিনি পেয়েছেন তিনি কাঁচের ঘরে বাস করেন—চারিদিকে তাঁর আলো, আলো ভেতরে, আলো বাইরে। আলোয় আলোকময়। গণেশ টাওয়ারের স্থাপত্য-রত্ন এই, এরও ভেতরে আলো—বাইরে আলো। তিনিই আমাদের আলো দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। গতি থাকলেই অগ্রগতি, অগ্রগতিই আধুনিকতা। এগিয়ে যাবার সিদ্ধ মন্ত্র ঃ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। জয় হিন্দ্‌!

বিপুল করতালির মধ্যে উদ্বোধনী ভাষণ শেষ হল। পরাঞ্জপে প্রধান-মন্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলেন স্যর উইলিয়ম জোনসের কাছে। পরিচয়ের পর করমর্দন হল। জোনসের পাশেই অ্যাসকারী বসেছিলেন। আমেরিকার রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে ছিলেন হেনরী কিসিঞ্জার। ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের পাশে বসে হাস্যোজ্জ্বল মুখে ভাষণ শুনছিলেন মলিয়ের। পরাঞ্জপে এক এক করে সবায়ের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আলাপ করিয়ে দিলেন। স্মিতহাস্যে প্রধানমন্ত্রী তাঁদের সবায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চললেন। রাম দেওধর, পুলকেশ গোস্বামী ও অন্যান্য ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা সবাই এক জায়গায় পাশাপাশি বসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে করমর্দন করে প্রধানমন্ত্রী দুচার কথা বললেন। একটু দূরে অলকা, সন্দীপ, সুরিন্দর ও চন্দ্রভানু ভর্মা বসেছিলেন। পরাঞ্জপে চন্দ্রভানুকে খুঁজছিলেন। সদলবলে গণেশ টাওয়ার সেমিনার রুমে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে যখন যাচ্ছেন তখন চন্দ্রভানু-কে দেখতে পেলেন। ইশারায় তাঁকে ভেতরে আসতে বলে তিনি প্রধান-মন্ত্রীর সঙ্গে এগিয়ে গেলেন। বিদেশী এক্সপার্টরা এসে বসলেন ভারতীয় স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়ারদের সঙ্গে। আমন্ত্রিত জার্নালিস্ট, গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও

এসে বসলেন। প্রধানমন্ত্রী এঁদের সবাইয়ের সঙ্গে অল্প-বিস্তর হাসিঠাট্টা করতে করতে চা-মিষ্টি খাচ্ছিলেন। সবাই আশা করেছিল প্রধানমন্ত্রী এখানে ঘরোয়াভাবে কিছু বলবেন। বিদেশী এক্সপার্টদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে তিনি তাঁদের আর একবার ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

বাইরে তখন ভীষণ হৈ হট্টগোল। বেশ কয়েক শো লোক গাঁদা ফুলের মালা নিয়ে এসেছে গণেশের পায়ে চড়াবে বলে। শয়ে শয়ে পুলিশ, সি, আর, পি, আর সিকিউরিটির ফোর্স ভক্তিতে গদগদ লোকগুলোকে সামলাচ্ছে। লাইন করে একে একে তারা গণেশ টাওয়ারের দিকে মাথা উঁচু করে প্রণাম করছে। তারপর নীচে নেমে গিয়ে পুজো দিয়ে আসছে। অনেকে সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যা-আরতি দেখতে এসে, গণেশজীর শ্রীচরণ দর্শন করবে বলে একটু এদিক ওদিক ঘুরে আসতে গেল। মাঝে মাঝে মিলিত কন্ঠের চিৎকার ধ্বনি শোনা যাচ্ছে ঃ জয় বাবা গণেশজী কী জয়! কেউ আবার চিৎকার করে উঠছে, জয় গণেশায় নমঃ। মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতের লোকেদের উৎসাহ সবচেয়ে বেশী। চতুর্দিকে হৈ চৈ-চেঁচামেচি ও জয়োল্লাস ধ্বনি। আনন্দের তুফান বইছে। মাইক থেকে অনবরত ঘোষণা করা হচ্ছে ঃ আপনারা ধাক্কাধাক্কি, হুড়োহুড়ি করবেন না। সারি বেঁধে একে একে এগিয়ে চলুন। নীচে গিয়ে পুজো দিয়ে আসুন। বাবা গণেশের আশীর্বাদ আপনারা লাভ করবেন। বিপুল সংখ্যায় সাধু-সন্ন্যাসীও লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। মজুর-মজুরনী, কৃষক, শ্রমিক, সবার হাতেই গাঁদার মালা। এক একজন করে ভেতরে যাচ্ছে। গণেশবাবার পুজো দিয়ে মনে মনে ধন-ঐশ্বর্য-সুখ সবকিছু কামনা করে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। চোখে মুখে তৃপ্তি ভরা। চিত্তে দর্শনলাভের অনাবিল আনন্দ। গণেশ দর্শন না করে কেউ ঘরে ফিরবে না। লাইনটা এঁকেবেঁকে গণেশের তলদেশে পিপীলিকার মত নেমে যাচ্ছে।

সেমিনার রুমে প্রেস কন্‌ফারেন্স বসেছে। সারা দেশের সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার, এমন কি বিদেশী সাংবাদিকরাও এখানে একত্রিত হয়েছেন। ডায়াসে বসে আছেন এক্সপার্টরা। তাঁদের পাশে রাম দেওধর, চন্দ্রভানু ভর্মা, পুলকেশ গোস্বামী ও অন্যান্য ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা। পরাঞ্জপে সংক্ষেপে গণেশ টাওয়ারের সাংস্কৃতিক দিকটা ব্যাখ্যা করলেন। গণেশ টাওয়ারের প্রিন্টেড্ ব্রুশিওরের এক এক কপি সবাইকে দেওয়া হল। কর্মসাধনার সম্পূর্ণ ইতিহাস এতে ছাপা হয়েছে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করে চলেছেন। হাসতে হাসতে কখনও পরাঞ্জপে উত্তর দিচ্ছেন। কখনও বা এক্সপার্টরা। শেষের দিকে কয়েকজন বিদেশী এক্সপার্টদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইলেন। একজন দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করলেন—স্যার জোনস্, আপনি ত এতদিন ভারতবর্ষে থাকলেন।

এতবড় একটা কাজ করলেন, আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে কিছু একটু বলবেন ?

স্যর জোনস্ স্মিত হেসে জবাব দিলেন—এ প্রশ্নের একটাই উত্তর। আমরা এটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছিলাম। হোয়েদার উই কুড ডু ইট্। নাউ ইটস্ বিফোর ইউ।

অন্য এক সাংবাদিক মিঃ অ্যাসকারীকে জিগ্যেস করলেন—মিঃ অ্যাসকারী, স্থাপত্যে ইটালীর অবদান সারা বিশ্বে এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়। সেই দিক থেকে, আপনার কি মনে হয়, গণেশ টাওয়ার সবাইকে চমক লাগিয়ে দেবে ?

অ্যাসকারী একটু হেসে বললেন—অন্যেরা চমকে যাবে কিনা জানি না। কিন্তু আপনি ত চমকে গেছেন। (তিনি হেসে হেসে মাথা নাড়ছিলেন) এটা চমকে দেবার কথা নয়। ভারতে এতদিন থেকে এটুকু বুঝেছি, এখানকার কৃষ্টি ও সংস্কৃতি চমক লাগায় না। নিঃশব্দে আকর্ষণ করে, নেশা ধরায়। বিদেশীদের মনে হতে পারে ভারতে দেখার মত কিই বা আছে। আপাতদৃষ্টিতে হয়ত তাই। ওটা তার বাইরের রূপ। এখানে আবর্জনা, নোংরা, বস্তি, কুটিরের নিরাভরণ দরিদ্রতা, সবই আছে। হ্যাঁ, ভাল রকমই আছে। বেশীর ভাগ বিদেশীদের চোখে এই সবই ধরা পড়ে। আমরা সত্যি খুবই ভাগ্যবান। কিছুদিন এখানে না থাকলে এখানকার জীবনের আসল রূপ ও সৌন্দর্য উপলব্ধি করা যায় না। এখানে অনেকদিন থেকেও অনেকে এর পরিচয় পান না। হয়ত তাঁদের দেখবার চোখ নেই, হয়ত তাঁরা ভাগ্যহীন। ভারতের বহিরঙ্গের যে রূপ, তা দেখে প্রথম প্রথম আমরাও বিচলিত হতাম। এখানে থেকে ইঞ্জিনীয়ার, স্থপতি ও সাধারণ মানুষদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমাদের কাজ করতে হয়েছে। আস্তে আস্তে আমাদের ধারণা তাই পালটেছে। গণেশ এমন এক সিম্বল—যা শুধু অভিনব নয়, বিদেশীদের চোখেও চিত্তাকর্ষকও বটে। তাঁর বিভিন্ন বিচিত্র ফর্ম আবিষ্কার করতে করতেই আমাদের সময় কেটেছে। কাজে আনন্দও পেয়েছি প্রচুর। বাইরে গিয়ে একবার দেখুন, কি প্রচণ্ড ভিড়, উল্লাসধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। দীজ্ পিপল্ উইথ দেয়ার প্রফাউণ্ড ফেইথ ইন দি ট্রুথ মে সারপ্রাইজ ইউ, বাট্ ইট্ ইজ ইণ্ডিয়া। সেই ভারতকে যতই আমরা বোঝবার চেষ্টা করেছি, ততই ইন্‌ট্রিগ্‌ড হয়েছি। ততই আমাদের অনুসন্ধিৎসা বেড়ে গেছে। ইণ্ডিয়া ইজ এ ভাস্ট কান্‌ট্রি, ফুল অফ্ লাইফ অ্যাণ্ড ভাইটালিটি। অ্যাণ্ড অ্যাই থিংক হার কালচার ইজ ইভলভড় আউট অব হার ভাস্টনেস্।

অপর এক সাংবাদিক মিঃ কিসিঞ্জারকে প্রশ্ন করলেন—মিঃ কিসিঞ্জার, আপনাদের স্টার ওয়ার প্রোগ্রাম আর গণেশ টাওয়ারের মধ্যে পার্থক্য

কি? মাপ করবেন। আমার খুব জানার আগ্রহ হচ্ছে। মিঃ কিসিঞ্জার উঠে এলেন মাইকের সামনে। সভায় হাসির রোল উঠল। কিসিঞ্জার বললেন—তফাৎ একটু আছে বৈকি। (আবার হাসি) স্টার মানে তারা, ওটা সুরক্ষার প্রশ্ন। এটা হল আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা (আবার হাসির হট্ট-রোল)। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে আত্মজিজ্ঞাসাই আত্মবিশ্বাস আনে। ব্যক্তিকে রক্ষা করে। "ইট্ ইজ্ ডিফিকাল্ট্ টু ডিফাইন্ দ্য মোটিভেশন্ অব আর্ট। বাট অ্যা নেশন্ ক্যান্ এক্সপ্লেইন্ হোয়াই ইট্ ওয়ানটস্ মোর প্রোটেক-শন্। বলেই তিনি ধপ করে বসে পড়লেন।

একমুখ দাড়ি নিয়ে একজন জার্নালিস্ট জিজ্ঞাসা করলেন—মলিয়েরর ভারত সম্বন্ধে আপনার কি অভিজ্ঞতা?

মলিয়ের উঠেই বললেন—ফ্যানটাস্টিক্! কথাটার উচ্চারণ ভঙ্গিমা দেখে অনেকে হেসে উঠলেন। মলিয়ের বলে চললেন—এবার যখন দেশে ফিরব, অনেকেই হয়ত প্রশ্ন করবেন, ভারতবর্ষ কেমন দেখলেন। আমি তাঁদের বলব, দাঁড়ান, ভেবে দেখতে দিন। (হাসি)। খুব পীড়া-পীড়ি করলে বলব, এক কাজ করুন, চট্ করে দু-মাস ওখানে থেকে আসুন। আবর্জনা আর জঞ্জাল, নোংরামি আর দরিদ্রতা ছাড়া যদি কিছু চোখে পড়ে, তখন আমায় বলবেন, তখন না-হয় আমি কিছু বলব। ঐ যে যাঁরা মন্দিরে জাগ্রত দেবতার দর্শনে যাচ্ছেন, অ্যাসকারীর মত আমিও তাঁদের কথা ভেবেছি। এঁদের সরল বিশ্বাস ও ভক্তি, দুই-ই দেখেছি। ইট্ ইজ সো কন্‌ফিউজিং টু আস! এ কী অন্ধবিশ্বাস? ইফ্ ইট ইস ব্লাইণ্ড ফেইথ, তাহলে এর মধ্যে এই স্বতঃস্ফূর্ততা ও বিশ্বাসের সজীবতা আসে কী করে? দিস পারটাবস্ আস। দক্ষিণ ভারত শিক্ষায়-দীক্ষায় অনেক এগিয়ে গেছে, সেখানে তাহলে এ ধর্ম বিশ্বাস কর্পূরের মত উবে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যায়নি। তবে ওটা কী? আমার মনে হয়, এ বিশ্বাসের আসল স্বরূপটা না জানতে পারলে ভারতের আর্ট, ও তার মোটি-ভেশন-এর মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। আর এই মোটিভেশনের মূল সূত্রটি ধরতে না পারলে ভারতীয় কালচার, স্থাপত্য ও তার বিকাশ বোঝা সত্যিই দুরূহ। আমরা যে সম্যক বুঝতে পেরেছি, তা বলব না। বাট উই উইল গো ব্যাক্ উইথ অ্যা ট্রেজার অব মেম্‌রিস্।

মলিয়েরের কথা শেষ হতেই একজন বিদেশী সাংবাদিক বলে উঠলেন—মিস্টার পরাঞ্জপে যদি সম্মতি দেন ত চন্দ্রভানু ভর্মাকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। পরাঞ্জপে মাথা নাড়লেন। তিনি চন্দ্রভানুকে জিজ্ঞাসা করলেন—মিস্টার ভর্মা, ভারতজোড়া আপনার সুনাম ও সুখ্যাতি। আপনি কি মনে করেন গণেশ টাওয়ার সম্পূর্ণ করে আপনি বেশ খুশী হয়েছেন, তৃপ্তি পেয়েছেন?

পরাঞ্জপে প্রমাদ গোনেন। এই বুঝি ভর্মাজী তাঁর পদত্যাগপত্র ও তা গৃহীত না হওয়ার কারণ ফাঁস করে তাঁকে সবার সামনে অপদস্থ করেন। তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন, চন্দ্রভানু কি বলেন তা শোনবার জন্যে।

খানিকক্ষণ, চুপ করে থেকে চন্দ্রভানু বললেন—আমরা ভারতীয় শিল্পী। ভারতীয় শিল্পীরা অল্পতেই খুশী। হাসির সোরগোল উঠল।

আর বেশী কথা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না ভেবে পরাঞ্জপে তাড়াতাড়ি উঠে ঘোষণা করলেন আজ এখানেই সভা ভঙ্গ। এই ঘোষণা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই এক এক করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেলেন।

রাতে বিদেশী এক্সপার্টদের সম্মানার্থে পরাঞ্জপের ডিনার। এখানে সবাই আমন্ত্রিত। অলকা ইশারা করতেই চন্দ্রভানু ভর্মা বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। পরাঞ্জপে বাধা দিলেন। বললেন—অলকা, তোমরা যাও। ভর্মাজীকে আমি পৌঁছে দেব। অলকারা চলে গেল। রাম দেওধর ও পুলকেশ একটু অপেক্ষা করে পরাঞ্জপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে গেলেন। পরাঞ্জপে হেসে বললেন—রাম দেওধর, পুলকেশ আপনারা ডিনারে আসছেন ত? দু-জনেই মাথা নাড়ল। পরাঞ্জপে বললেন—তখন কথা হবে।

চন্দ্রভানু ভর্মা ও পরাঞ্জপে কিছুক্ষণ চুপচাপ মুখোমুখি বসে রইলেন। পরাঞ্জপে বললেন—চলুন, একবার বাইরে ঘুরে আসি। কেমন লাগছে আপনার?

চন্দ্রভানু ভর্মা হেসে বললেন—কী শুনলে আপনি খুশী হবেন? হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন পরাঞ্জপে। বললেন—চলুন, এবার গণেশ-শীর্ষে যাওয়া যাক। ওখানে নিভৃতে বসে আপনার সঙ্গে মন খুলে দু-চারটে কথা বলা যাক।

॥ বত্রিশ ॥

ফ্যাক্টরিতে আসন্ন ধর্মঘটের গরম আবহাওয়া। মৈত্রেয়ী কোন বাধানিষেধ মানেন না। সর্বত্রই তাঁর যাতায়াত। সবায়ের সঙ্গেই মেশেন, কথা বলেন। কর্মীদের জন্যে সত্যিকারের দরদ থাকলে এইরকম

উত্তেজনার মধ্যেও তাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করার কোন ভয় থাকে না। উল্টে ওতে অনেক কাজ হয়। কোন কিছু করার আগে ওরা একটু ভাবে, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একটু থমকে দাঁড়ায়। ধর্মঘট যে অবশ্য-ম্ভাবী মৈত্রেয়ী তা অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু গঙ্গাধরকে এ-ব্যাপারে কিছু বলতে চাননি। কেননা, দুই পক্ষের মধ্যে অদৃশ্য এক প্রাচীর খাড়া হয়ে গেছে। কেউ কারুর দিকটা দেখতে পায় না বলে অদৃশ্য প্রাচীর যে পরস্পরের দৃষ্টিকে শুধ ঘোলাটে করেছে তাই নয়, উত্তেজনা ও অনমনীয় মনোভাবটাও বাড়িয়ে দিয়েছে।

গঙ্গাধর এমনিতেই ধর্মঘট বরদাস্ত করতে পারেন না। মেসিন বন্ধ থাকলে তাঁর মাথায় আগুন চড়ে যায়। এর পেছনে যত বড় যুক্তিই থাকুক না কেন। নিজেদের দাবীর জন্যে শপের মেসিন বন্ধ রাখার কারসাজিকে তিনি গোপন ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেন না। কর্মীদের, শ্রমিকদের যা কিছু অসুবিধা, যাতে তাদের ক্ষতির সম্ভাবনা, সেটা তিনি আগেই বুঝতে পারেন। অনেক সময় এমনও হয়েছে যে অন্য কেউ বলে দেবার আগেই তিনি ওদের ডেকে তা বলে দিয়েছেন। ওদের মুখে হাসি দেখতে তিনি দিল্লীতে ছুটতে রাজী। কিন্তু এ এক অদ্ভুত পরিবেশ। যুক্তিবিহীন, অনমনীয় তিনটে দলের নেতাদের স্বার্থ এক জায়গায় জটলা বেঁধেছে। তাই ওদের মধ্যে গিয়ে গঙ্গাধর যদি অপমানিত হন, মৈত্রেয়ীর তা ভীষণ লাগবে।

হিন্দ্ মজদুর সংঘ, আই, এন, টি, ইউ, সি ও কমিউনিস্ট নেতাদের আসাযাওয়া বাড়তে থাকে। দাবীর সপক্ষে হাত তোলা, কর্মীদের সংঘ-বদ্ধ করে সোচ্চার চিৎকার ঃ 'তানাশাহী চলবে না, চলবে না', 'ম্যানেজ-মেন্ট নিপাত যাক, নিপাত যাক'। একটার সঙ্গে অন্যটার পারম্পর্য রেখে নানা রকম স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। এইসব উত্তেজনার মধ্যে দাবীর যৌক্তিকতা ডুবে যায়। যেটা থেকে যায় সেটা ম্যানেজমেন্টের পক্ষে খুব সুখকর ব্যাপার নয়।

কর্মীদের ক্যাম্পে তখন রীতিমত ঝড়। ৬৫-দফা দাবী ছেঁড়া কাগজের মত সারা ফ্যাক্টরিতে উড়ে বেড়াচ্ছে। আর এই দাবীগুলো যন্ত্রবৎ কর্মীদের উত্তেজনায় অধীর করে তুলছে। কর্মীদের আজ গুরুত্বপূর্ণ দাবীগুলো সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা। প্রতিদিনই ইউনিয়নের নেতাদের পরামর্শে কর্মী ও শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে নানা-রকম স্লোগান দিয়ে কাজ শুরু করে।

এইরকম এক পরিস্থিতির মধ্যে গঙ্গাধর ও মৈত্রেয়ী কর্মীদের ক্যাম্পে গিয়ে হাজির হলেন। দু-চারটে ভাঙা চেয়ার। ধুলোভরা বিরাট এক সতরঞ্জি। সারা ফ্যাক্টরির লোক এখানে জমা হয়েছে। একদল

দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করে কি সব বলছে। অন্যদিকে একটা জটলা। ম্যানেজমেন্ট, এস্‌টাব্লিশমেন্ট যতই ভাল হোক না-কেন, কর্মীদের, শ্রমিকদের কিছুতেই ভাল করতে পারে না। কেন তারা ভাল চায় না, কেন তারা শ্রমিক স্বার্থের পরিপন্থী, তাদের কায়েমী স্বার্থ শ্রমিকদের দিয়ে কিভাবে রক্ষা করা হয়, তার কার্যকারণ ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে কিছু লোক উত্তেজনাময় বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছিল। বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে এক দল উন্মত্ত হয়ে নানারকম স্লোগান দিয়ে যাচ্ছিল। মুর্দাবাদ রব ঘন ঘন শোনা যায়।

গঙ্গাধর আর মৈত্রেয়ীকে এভাবে আসতে দেখে এরা হকচকিয়ে যায়। ভাবে, এও ম্যানেজমেন্টের এক ধরনের চালবাজি। ভিড় ঠেলে ওঁরা দু-জনে ফ্যাক্টরির নেতাদের সামনে এসে হাজির হলেন। ওঁদের দেখে, দু'একজন এগিয়ে এসে বলল--মাসীমা, আপনি? আপনারা?

মৈত্রেয়ী হেসে বললেন--হ্যাঁ, দেখতে এলাম কতটা তোমরা উত্তেজিত হয়েছ। আর কার মুর্দাবাদ করছ।

অকল্পিত, অভাবনীয় কিছু ঘটলে কর্মীরা যেমন ঘাবড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়, সেইরূপ তারা থমকে গেল। ম্যানিজিং ডিরেক্টরকে সামনে দেখে একটু সপ্রতিভ হয়ে ওরা দুটো ভাঙা চেয়ার টেনে এনে বলল--বসুন, স্যর।

ওঁরা চেয়ারে বসলেন না। সবার সঙ্গে গোল হয়ে সতরঞ্জিতেই বসে পড়লেন।

মৈত্রেয়ী প্রথমে কথা বললেন।-- আজ ত তোমাদের দাবী দাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার কথা, না?

মৈত্রেয়ীর কথার উত্তর দেবার অবকাশ আর এরা পেল না। বড় বড় নেতারাও এসে হাজির হলেন। কয়েকজন উঠে গিয়ে নেতাদের সঙ্গে করে এনে বসালো। এম. ডি.-র ধারে কাছে যারা ছিল, তাদের মধ্যেই একজন উত্তর দিল--হ্যাঁ, মাসীমা।

গঙ্গাধর লক্ষ্য করলেন মিটিং-এ ফ্যাক্টরির বাইরের লোকজনই বেশী। গঙ্গাধরের উপস্থিতিটাকে তারা ভাল চোখে দেখছে না। গঙ্গাধর বললেন-- আমি এসেছি বলে আপনাদের ভাবনার কিছু নেই। একটু থেমে আবার বললেন--আপনারা মিটিং করুন। আমি কর্মী হিসেবেই এখানে এসেছি। এম. ডি. হিসেবে নয়। আপনারা বিনা দ্বিধায় আপনাদের দাবী নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করুন।

সবায়ের মনেই একটা শঙ্কা। মিটিং শুরু করবে কি করবে না, এই নিয়ে সবায়ের দ্বিধা। দু-একজন নেতা উঠে একটু দূরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করলেন। গঙ্গাধরকে ফিরে যাবার জন্যে অনুরোধ

করবেন ঠিক করলেন। পরমুহূর্তে কি ভেবে তা থেকে নিরস্ত হলেন। এমত অবস্থায় কি করা উচিত কেউই ভেবে পায় না। অনন্যোপায় হয়ে মিটিং শুরু করে দিল। গঙ্গাধর ও মৈত্রেয়ীর উপস্থিতিতে তারা সবাই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিশেষ করে ফ্যাক্টরির কর্মী যারা। আলোচনা চলতে লাগল। গঙ্গাধর হঠাৎ এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড করে বসলেন। তিনি আলোচনায় যোগ দিলেন। তিনি এমন কয়েকটি প্রয়োজনীয় দাবীর কথা তাঁদের বললেন যা ৬৫-দফার মধ্যে ছিল না। এই সমস্ত দাবীর কথা কারুরই খেয়াল হয়নি। গঙ্গাধর যেসব দাবীর কথা বললেন কর্মীরা তার তাৎপর্য বুঝে সেগুলো ৬৫-দফার দাবীর অন্তর্ভুক্ত করতে বলল। নেতারা প্রমাদ গুনলেন। এরকম হতে থাকলে মহাবিপদ। তাঁরা এক একটা দাবী পেশ করে তার সপক্ষে গরম গরম স্লোগান ও ভাষণ দিতে লাগলেন। গঙ্গাধরের দাবীগুলো ৬৫-দফা দাবীর অন্তর্ভুক্ত হল। ফলে, ওদের আগেকার দাবী কিছু বাদ পড়ল। গঙ্গাধর এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—যাবার আগে আমি আর একটা কথা বলে যেতে চাই। আপনাদের অনেকগুলো দাবী পূরণ করা আমার ক্ষমতার বাইরে। দিল্লীকে রাজী করিয়ে এগুলো পূরণ করতে সময় লাগবে। আপাততঃ আপনারা সেইসব দাবীগুলোর ওপর জোর দিন, যেগুলো আমার পক্ষে পূরণ করা সম্ভব। ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেবার আগে সব দিক ভেবে দেখবেন। ধর্মঘটে দু-পক্ষেরই ক্ষতি।

গঙ্গাধর মৈত্রেয়ীকে নিয়ে মিটিং থেকে বেরিয়ে এলেন। মৈত্রেয়ী চাননি গঙ্গাধর এদের মিটিং-এ যান। এত সব উত্তেজনার মধ্যেও গঙ্গাধর নিজের বক্তব্য যেভাবে রাখলেন, তা দেখে মৈত্রেয়ী অবাক। তাঁর এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। পথে দুজনেই চুপচাপ। যেতে যেতে আর কোন কথা হল না।

কথা ছিল অধর লাহিড়ীর ওখানে একবার ঢুঁ মারবেন। কিন্তু ওখানে না গিয়ে সোজা বাড়ী ফিরলেন। খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে গঙ্গাধর বললেন—মৈত্রেয়ী, একটু চা বা কফি পাঠিয়ে দেবে?

মৈত্রেয়ী রান্না ঘরের দিকে চলে গেলেন। ধর্মঘটের ব্যাপার নিয়ে একমনে গভীরভাবে গঙ্গাধর চিন্তা করতে চান, এটা তারই ইঙ্গিত। এসময় তাঁকে কোন প্রশ্ন করা বৃথা। গঙ্গাধর কফি পেলেই বেশী খুশী হন। মৈত্রেয়ী কফি নিয়ে এসে গঙ্গাধরের হাতে দিয়ে বললেন—এই নাও। মনটা একটু শান্ত হলেই নিজেই যেচে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে পরামর্শ করবেন। সারাজীবন মানুষটার সঙ্গে ঘর করে মৈত্রেয়ীর এসব জানা হয়ে গেছে।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে গঙ্গাধর জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কফি?

—একটু পরে খাব। এখন ভাল লাগছে না।

—খুব বিচলিত হয়ে পড়ছ, না?

—না। চিন্তিত হয়েছি এই ভেবে যে ওরা যে সিদ্ধান্তই নিক, সেটা শ্রমিক বা কর্মীদের স্বার্থের অনুকূল হবে না। সেটায় নেতাদেরই স্বার্থ-সিদ্ধি হবে।

—আন্দোলন নিয়ে একটু গভীরভাবে ভাবলে দেখা যাবে আন্দোলন যেসব রিয়েল ইস্যু নিয়ে শুরু হয়, আন্দোলনের শেষের দিকে এতে রাজনীতি ঢুকে যায়। শ্রমিকদের স্বার্থহানি হয়। শ্রমিকদের স্বার্থেই আন্দোলনকে সব সময় জীইয়ে রাখা হয় না। নেতাদের স্বার্থ তাতে জড়িয়ে পড়ে। ইন্‌সেন্‌টিভের যে ব্যবস্থা আমি ক-মাস ধরে চালু করেছি, তাতে আমি দেখেছি, শ্রমিকরা প্রতি মাসে পাঁচশো-ছয়শো টাকা করে বেশী আয় করছিল। রাজনীতির চাল ছাড়া এদের যে উত্তেজিত করা সম্ভব ছিল না। তাই মিটিং-এ ওসব স্লোগান শুনতে পেলে ঃ 'ম্যানেজমেন্টের মুখোশ খুলে গেছে'। তাই শুনতে পেলে না—ম্যানেজমেন্ট মুখে বলছে শ্রমিকের জন্যে তাদের কত দরদ! অথচ মাইনে বাড়াতে অরাজী। আসল জায়গায় ফাঁকি। ভাইসব, মনে রাখবেন, শ্রমিকদের স্বার্থ ম্যানেজমেন্টের স্বার্থের পরিপন্হী। পৃথিবীর ইতিহাসে তাই অত লড়াই, সংগ্রামের ইতিহাস তাই এত রক্তাক্ত, কলুষিত। আপনারা একবার মাথা উঁচু করে দাঁড়ান, দাঁড়িয়ে বলুন, তুমি যত শেরে বাংলা হও, যত দরদী হও, আমাদের দাবী তোমায় মানতে হবে, মানতে হবে। গঙ্গাধর একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন—কি মৈত্রেয়ী, ঠিক মত বলতে পারছি ত? মৈত্রেয়ীর দিকে তাকিয়ে গঙ্গাধর মৃদু হাসলেন। এ হাসিতে শ্লেষ ছিল, না বিষাদের ছায়া ছিল, ঠিক বোঝা গেল না।

মৈত্রেয়ী ঘাড় নাড়লেন। বললেন—তোমার সামনে ম্যানেজমেন্টের ওপর কটাক্ষ করতে ওদের এ- টু বাধল না। সত্যিই আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। ভাবি, ইউনিয়নবাজী করতে গেলে কি রীতিনীতির বালাই থাকে না।

—ওটা নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি, ওরা আলোচনায় বসে ব্যাপারটা সুষ্ঠুভাবে যদি মিটিয়ে নেয় তবে ধর্মঘট হয়ত হবে না। কিন্তু বোঝাপড়া করার পরেও যদি ওরা উল্টোপাল্টা কাজ করে বা আমায় কোন ফাঁদে ফেলতে চায়, তাহলে কিন্তু আমি রুখে দাঁড়াব। যে পরিস্থিতি হবে, আর ওদের যে পরিমাণ ক্ষতি হবে, তা ভেবেই আমি শঙ্কিত হয়ে উঠছি।

মৈত্রেয়ী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—যা হবার হবে, তুমি আর কত ভাববে।

পরের দিন অফিসে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা-সভায় ইউনিয়ন লীডারদের সঙ্গে একটা চুক্তি হল। আপাততঃ মাইনে বাড়ান না হলেও তিন মাসের মধ্যে তাদের দাবীর অনেকগুলোই ম্যানেজমেন্ট মেনে নেবেন। যেসব দাবী দিল্লীর অনুমোদন সাপেক্ষ, সেগুলো আপাততঃ ছেড়ে দিয়ে টাউন-শীপের দাবীগুলো সবার আগে পূরণ করার চেষ্টা করা হবে। এর মধ্যে

আছে ঃ ক্যান্টিন ভাল করে চালাবার ব্যবস্থা চালু করা, কো-অপারেটিভ্ সংস্থাকে আরও সুবিন্যস্ত করতে হবে, কমিউনিটি হল স্থাপন করা, অডিটরিয়ামে সিনেমা চালু করার অবিলম্বে বন্দোবস্ত করা, গেস্ট হাউস ও রাস্তাঘাট বাড়ান। যে কাজগুলো চালু হয়েছে, কিন্তু নানা কারণে থেমে আছে, তা পুনরায় চালু করার ব্যবস্থা। নেতারা আশ্বাস দিলেন, আগামী কাল থেকে ফ্যাক্টরির কাজ আবার জোরদারভাবে চালু হবে। 'গো-স্লো' নীতি সর্বতোভাবে বর্জন করা হবে।

সাতদিনের মধ্যেই দেখা গেল এর কোনটাই মানা হচ্ছে না। স্লোগান, গুলতানি করা, দাবী জানানো, প্রতিবাদ মিছিল, কোন কিছুই কমল না। ঘাটতি সমানে চলতে লাগল। এছাড়া, আশে-পাশের সব ফ্যাক্টরি থেকে শ'য়ে শ'য়ে কর্মীরা এসে রোজই জটলা পাকায়, স্লোগান দেয়। ফ্যাক্টরিতে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে ইউনিয়ন লীডারদের সঙ্গে যেসব চুক্তি হয়েছিল, দেখা গেল, তা মানা হচ্ছে না। বাইরের কর্মীরা যদি এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে, হাঙ্গামা বাধায়, তাকে সামাল দিতেও এরা রাজী নয়।

গঙ্গাধর ভাবেন, এ অবস্থা আর বেশীদিন চলতে দেওয়া উচিত হবে না। এসব বন্ধ করতে তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। দুর্গাপুর মার্কেটে, আসান-সোলের সর্বত্র এবং আরও অনেক জায়গায় গঙ্গাধরের আদেশে নোটিশ লাগিয়ে দেওয়া হল। বলা হল, যেসব দাবী পূরণ করার বিষয়ে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মতৈক্য হয়েছিল, তা একতরফা লঙ্ঘন করায় যে সব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তা ফ্যাক্টরির কর্তৃপক্ষ প্রত্যাহার করে নিলেন। ম্যানেজমেন্ট এ ব্যাপারে আর কোন কথাবার্তা বলবেন না। এখন যা কিছু হবে, তা অ্যাসিস্টেন্ট লেবার কমিশনারের মারফৎ।

নোটিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাক্টরিতে আগুন জ্বলে উঠল। আশে-পাশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির ও শ্রমিকদের ভিড় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। যে ধর্মঘট এড়াবার জন্যে গঙ্গাধর এত চেষ্টা করলেন, শেষ পর্যন্ত তা প্রতিহত করা গেল না। শপের পর শপ বন্ধ হতে লাগল। মেসিন সব নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে রইল।

সকালবেলা গঙ্গাধর নিজের কোয়ার্টারের উঠোনে গিয়ে চপচাপ বসে থাকেন। ফ্যাক্টরির চিমনিগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেন—মৈত্রেয়ী, খাঁ খাঁ করছে ফ্যাক্টরি, কোন চিমনি দিয়েই ধুঁয়ো বেরোচ্ছে না। দু'টো দিন দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল। সব মেসিন বন্ধ।

গঙ্গাধরের কথা শুনে মৈত্রেয়ীর চোখ দুটো সিক্ত হয়ে ওঠে। মেসিন বন্ধ আছে বলে প্রতি মুহূর্তে মানুষটা যে কত কষ্ট পাচ্ছেন, কিভাবে দগ্ধ হচ্ছেন, তা কেউ জানে না। গঙ্গাধরের প্রাণের কান্না মৈত্রেয়ী শুনতে পান।

কিছু বলতে পারেন না। কোন সান্ত্বনাই তাঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না।

কয়েক দিনের মধ্যেই খবর এল কর্মীরা তাদের পরিবারবর্গকে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কেউ কলকাতায় বাপের বাড়ি গেল। কেউ আসানসোলে, কেউবা বাঁকুড়ায় মামাবাড়ি। তাদের দুঃখকষ্টের সীমা পরিসীমা রইল না। মুদির দোকান কাউকেই আর ধারে জিনিস দেয় না। ধর্মঘট কবে যে প্রত্যাহার হবে তার কোন ঠিক নেই। প্রত্যাহার হলে কে থাকবে, আর কে যাবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। মাস গেলে টাকা, তা পাবারও সম্ভাবনা নেই। তাই ক্যান্টিনও ধার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। সেখানে এখন নগদ পয়সার কদর। আর কয়েক দিন পরে কর্মীরা যে-যার কোয়ার্টার ছেড়ে শহরে চলে গেল। কেউ-বা একটি ঘর ভাড়া করে আছে কিংবা যে ঘর ভাড়া নিয়েছে, তার বাড়িতেই সবাই একসঙ্গে আছে। অল্প খরচে চলে। কোনমতে দিন গুজরান করে। মুর্দাবাদ এখনও চলছে। সে রব থামেনি। দিনের মধ্যে একবার করে সবাই ফ্যাক্টরির আশে-পাশে স্লোগান দিয়ে যায়। ম্যানেজমেন্ট নিপাত যাক, নিপাত যাক'—এই রবে আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে ওঠে।

গঙ্গাধর কোন কথা বলেন না, নীরবে সব শোনেন। আজকাল কারুর সঙ্গে তিনি বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ করেন না। মৈত্রেয়ীকে একদিন ডেকে বললেন—শুনতে পাচ্ছি কর্মীদের ডাল-ভাত ছাড়া আর কিছুই জুটছে না। যে-যার পরিবারকে সব বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। কোয়ার্টার ছেড়ে অনেকে এক সঙ্গে থাকছে। ধর্মঘট যতদিন চলবে, ততদিন আমার বাড়িতেও ডাল-ভাত আর একটা তরকারী ছাড়া কিছুই রান্না হবে না। আমি জানি, তুমি সেটাই করছ, তবু বলে রাখলাম। ওরা যা খাচ্ছে, আমিও তাই খাব। আমার পেটে সয় না বলে তুমি ামার জন্যে যেন বেশী কিছু করতে যেও না। আমার মুখে উঠবে না।

গঙ্গাধরের শরীর খারাপ হতে লাগল। ওজন কমে গেল। মনও নিস্তেজ হয়ে পড়ল। চিমনির দিকে তাকিয়ে বলেন, আজ নিয়ে দু-সপ্তাহ হয়ে গেল, মেসিনগুলো সব বন্ধ। আমার আর সহ্য হয় না, মৈত্রেয়ী। এরপর ফ্যাক্টরিটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কত যে সময় লাগবে, কি পরিশ্রমই যে করতে হবে, আমি ছাড়া আর কেউই তা বোঝে না।

অফিসররা সবাই সময়মতই আসেন। কারুরই কোন কাজ নেই। দু-চার দিন এইভাবে কাটল। গঙ্গাধর একদিন সবাইকে ডেকে বললেন— যত পেন্ডিং কাজ আছে সব আপনারা এই সুযোগে শেষ করে ফেলুন। ফাইলপত্র যত জমেছে সব ডিসপোজ করে ফেলুন। অফিসররা বললেন— আমরাও তাই ভাবছি। কিন্তু কি করে করব, টাইপ করবে কে? গঙ্গাধর

শুনে অবাক। বলেন—আপনারা কেউই টাইপ জানেন না? একটু ভেবে বললেন—এক কাজ করুন। আপনারা যে-যার চিঠি, ও নোট লিখে রাখবেন, আমিই টাইপ করে দেব।

ধীর-মন্থর গতিতে কাজ চলতে থাকে। কার অদৃশ্য ইঙ্গিতে সে কাজও থেমে যায়। গঙ্গাধর বুঝতে পারেন সব। কাজ করতে এদের অনেক অসুবিধা। কুঁজোতে জল নেই, জল আনবে কে? হাঁক মারলে হাতের কাছে জলের গ্লাসটা এগিয়ে দেবার কেউ নেই। টেবিলে জলের গ্লাস ভরা থাকে না। টেবিল পরিষ্কার হয় না। কাগজ, ফাইলপত্র নিয়ে যাবার লোক নেই। অপ্রয়োজনীয় জিনিসে বাসকেট্ ভরে গেছে। ফেলবার লোক নেই। সবচেয়ে বড় অসুবিধা, সময়মত কে চা দেবে ক্যান্টিন থেকে। বেল বাজালেই চা, কফি, বিস্কুট, সিঙ্গারা আসে না। সময়মত কাজ কী করে হবে। এসব কথা মুখ ফুটে অফিসররা বলতেও পারেন না। কিন্তু গঙ্গাধর সবই বোঝেন।

একদিন বাড়িতে এসে গঙ্গাধর বললেন—মৈত্রেয়ী, এক কাজ কর ত। দু-বোতল দুধ, ভাল একটা স্টোভ, একটা কেটলি আর কয়েকটা ডাস্টার দাও ত, দেখি কাজ হয় কিনা। আর হ্যাঁ, ভিম্ দিতে ভুলো না যেন।

মৈত্রেয়ী কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন—এসব নিয়ে তুমি কি করবে? কার কাজে লাগবে শুনি?

—আর বল কেন? এরা কী কেউ মানুষ? টেবিল ডাস্টিং হয় না, কারণ ডাস্টিং করার লোক নেই। কুঁজোতে জল ভরা হয় না, জল আনার কেউ নেই। চা না হলে কাজে মন বসে না। দেখি, এসব কাজ আমিই করতে পারি কিনা। এদের চিঠিপত্তর সবকিছুই টাইপ করে দিচ্ছি, তবুও কাজ এগুচ্ছে না।

পরের দিন গঙ্গাধর সকাল সকাল গিয়ে সবার টেবিল ডাস্টিং করে দিলেন। কুঁজোয় জল ভরে রাখলেন। অফিসরদের জলের গ্লাস সব ভিম্ দিয়ে ধুয়ে জল ভরে রাখলেন। টেবিল চেয়ার সব সাজিয়ে রাখলেন। চায়ের সরঞ্জাম করলেন। সময়মত চা তৈরী করে সবার টেবিলে সার্ভ করতে থাকলেন।

গঙ্গাধরকে এইসব কাজ করতে দেখে সবাই বিব্রত। তারা বাধা দিয়ে বলে স্যার, এ কি করছেন। তাতেও কোন কাজ হয় না। উপায়ান্তর না দেখে মৈত্রেয়ীকে বাড়িতে ফোন করে।

—বৌদি, আপনার মানুষটা বড় অদ্ভুত!

—কেন, কী হল? মৈত্রেয়ী হাসতে হাসতে প্রশ্ন করলেন। আবার কিছু অঘটন ঘটল নাকি?

—অঘটন না বৌদি অঘটন না। রীতিমত কেলেঙ্কারী। দাদা টেবিল সাফ্ করছেন, কুঁজোয় জল ভরছেন, গেলাস পরিস্কার করে জল ভরে রাখছেন, সময়মত চা-বিস্কুট টেবিলে দিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের মাথা কাটা যাচ্ছে। এটা কী বন্ধ করা যায় না, বৌদি?

শুনে মৈত্রেয়ীর যে একটু রাগ হয়নি তা নয়। নিজেকে সংযত করে হেসে বললেন—আপনাদের দাদাকে আমিই বা কতটুকু চিনি। যখন যেটা খেয়াল চাপে, তার নড়চড় হবার উপায় নেই। আপনারাই যখন বন্ধ করতে পারছেন না, আমি ত কোন্ ছাড়। কোন্ সাহসে আমি বারণ করব।

—আপনি একটু বলেই দেখুন না, বৌদি। না হয় কাজগুলো কিছুদিন পরেই হবে। চা না-হয় না-ই খেলাম। ওভাবে ওনার হাতে চা খাওয়া! গলা দিয়ে নামতে চায় না। টেবিল না হয় একটু অপরিস্কারই রইল, অত কাজ কী করা যায়, বৌদি?

সব শুনে মৈত্রেয়ী রূঢ় কথা বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। একটু চুপ করে থেকে শুধ হাসলেন। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, ঐ মানুষটা যদি অত পারে, তবে আপনারাই-বা পারবেন না কেন? এক আঙ্গলে অত কষ্ট করে যদি উনি আপনাদের চিঠি টাইপ করতে পারেন, তবে আপনারাই বা অত নিঃশ্চেষ্ট হয়ে থাকেন কোন্ লজ্জায়? দাদাকে যদি আপনাদের রোজ চা করে খাওয়াতে হয়, তবে আপনারাই-বা পালা করে এ দায়িত্ব ঘাড়ে নিচ্ছেন না কেন? আপনাদের দাদা যদি রোজ টেবিল সাফ করে, কুঁজো ভরে রাখেন, তবে আপনারাই বা তা করছেন না কেন। মানুষটা ধর্মঘটের চিন্তায়, ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকার দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুমতে পারে না। শ্রমিকরা ঠিকমত খেতে পাচ্ছে না বলে নিজেও ডাল-ভাত ছাড়া আর কিছু খায় না। আপনাদের মধ্যে কি এমনও একজন নেই যিনি দাদার পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন? কই অধর লাহিড়ী ত আপনাদের মত বৌদিকে টেলিফোন করেন না। সাহায্য করার যেটুকু তিনিই মুখ বুঁজে করছেন। আপনাদের জন্য তিনিও লজ্জিত নন। স্ট্রাইকের জন্য তিনিই ট্রাইবুনালে ছুটোছুটি করছেন। ঘন ঘন কলকাতায় যাচ্ছেন। এত সব মনের মধ্যে তোলপাড় করা সত্ত্বেও মৈত্রেয়ী চুপ করে রইলেন। অপর দিক থেকে আবার প্রশ্ন করে—চুপ করে রইলেন কেন বৌদি?

—না, এমনি।

—আপনাদের দু-জনকে এতদিনেও আমরা ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না, বৌদি।

—ওনার কথা আমি বলতে পারব না। আমার কথা যদি বলেন, আমাকে না চেনার মত ত কিছু নেই। আপনাদের নিজেদের ঘরে যাকে

দেখেন, আমিও সেই।

—না, বৌদি। আপনি সম্পূর্ণ আলাদা। আপনি মহীয়সী। আচ্ছা বৌদি আমরা এসব কথা বললাম বলে রাগ করলেন না ত। প্রতি মুহূর্তে আমরা কুণ্ঠা বোধ করছি বলেই ভাবলাম সব কথা আপনাকে একবার জানাই, যদি কিছু সুরাহা হয় এই আশায়।

মৈত্রেয়ী হেসে বললেন—ঠিকই করেছেন। আপনারা মাঝে মধ্যে টেলিফোন করেন বলেই ত কাজকর্ম সব কেমন চলছে জানতে পারি। নয়ত ধর্মঘটের সময় আমার ত আর কোন কাজ নেই।

—আমাদেরও সেই একই অবস্থা। আচ্ছা রাখছি, বৌদি। এক্ষুণি দাদা চা করে আনবেন। তাঁর আসার আগেই নোটটা শেষ করে ফেলতে চাই।

—আচ্ছা। মৈত্রেয়ী টেলিফোন রেখে কিছুক্ষণ আনমনা হয়ে বসে রইলেন। মানুষটা কি করতে চাইছেন, কি করার চেষ্টা করছেন, কেউই তা বুঝতে পারে না। সবাই ভুল বোঝে। মৈত্রেয়ীর গাল বেয়ে দু-ফোঁটা জল পড়ল।

কলকাতায় অ্যাসিস্টেন্ট লেবার কমিশনারের সঙ্গে বেশ কয়েকবার ত্রিপক্ষীয় মিটিং বসার পরেও ধর্মঘটের কোন মীমাংসা হল না। গঙ্গাধর এমনিতেই এসব নিয়ে নাজেহাল। এরই মধ্যে আবার দিল্লী থেকে দুম্ করে টেলিফোন। সেই সঙ্গে একটা চিঠিও। দুর্গাপুরের অন্য একটা সরকারী প্রতিষ্ঠানের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। তার দায়িত্ব গঙ্গাধরকে এক্ষুণি নেবার জন্য কড়া তাগিদ। এবার ডুয়েল চার্জ। ওখানে অনেকদিন এম. ডি. নেই। রাশিয়ার সঙ্গে লেনদেন, গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো কাজ আটকে যাচ্ছে, তাতে ফ্যাক্টরির আরও ক্ষতি হচ্ছে। প্রচুর কাজ জমে আছে। চার্জ নিয়ে ফ্যাক্টরির অবস্থা কি এবং কি করলে প্রডাক্শন বাড়বে, কিছুদিনের মধ্যে গঙ্গাধর এসব জানালে দিল্লী পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে। গঙ্গাধরকে এও বলা হয়েছে যে, নতুন মন্ত্রী ফকরুদ্দীন আলী আহমেদ তাঁর সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

গঙ্গাধর মনে মনে ভাবেন, আগের মন্ত্রী সুব্বাইয়ার গঙ্গাধরের ওপর যতটা আস্থা রাখতেন, নতুন মন্ত্রীর আগ্রহ থাকলেও কতটুকুই-বা তাঁকে চেনেন। অতটা আস্থা কি রাখতে পারবেন শেষ পর্যন্ত। বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে মন্ত্রী মহোদয়ের সমর্থনও দরকার। কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে না পেরে চিঠিটা মৈত্রেয়ীকে দেখিয়ে বললেন—কি করব বল ত? আমি যখন সমস্যায় পড়ি, তখন তুমিই আমার একমাত্র উপদেষ্টা।

—তাই বুঝি? জানতাম না। বলে মৈত্রেয়ী একটু হাসলেন। বললেন—তোমার স্বাস্থ্য ভেঙেছে। এ ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট এখনও চলছে।

ডুয়েল চার্জ নিয়ে তুমি কী পেরে উঠবে? ভাল করে ভেবে দেখ। ধর্মঘট না মেটা পর্যন্ত তুমি ত সময় চাইতে পার।

—তা পারি। কিন্তু ধর্মঘটের জন্যে চার্জ নিতে পারব না, সেটা বলার মত অবস্থা এরা রাখেনি।

—হ্যাঁ। দেখছি তাই। এরা তোমাকে শহীদ করে ছাড়বে। যত শক্ত কাজ সব কি তোমার ঘাড়ে চাপাবে? তুমি কী কখনও প্রতিবাদ করবে না?

—প্রতিবাদের কথা নয়, মৈত্রেয়ী। এগুলো ত দেশের সমস্যা। ফ্যাক্-টরি চালাবার উপযুক্ত লোক নেই। দেশের কোন সমস্যার কথা আমাকে বললে, সেটা নিয়ে ত আমাকে ভাবতে হবে। আমি কী তখন মুখ ফিরিয়ে থাকব? প্রতিবাদ করে বলব, আমাকে তোমরা কতটুকু কি দিয়েছ যে, তোমাদের সমস্যার কথা সব সময় ভাবব।

—তাহলে আর কি! একসেপ্ট করে নাও। তোমার শরীরের কথা ভেবেই আমি এতকথা বললাম। তুমি কি কোনকালে আপত্তি শুনেছ। জয়েন করবে বলে যখন ঠিকই করেছ, তখন আমিই বা বাধা দিয়ে তোমার অপ্রিয় হই কেন?

পরের দিনই গঙ্গাধর দুর্গাপুরের অন্য ফ্যাক্টরির চার্জ নিতে গেলেন। বিকেলে দিল্লীকে টেলিফোন করে জানিয়ে দিলেন যে তিনি চার্জ নিয়েছেন। ফ্যাক্টরিটাকে কিভাবে ঢেলে সাজাতে হবে তার বিস্তারিত রিপোর্ট শীগ্গীরই পাঠিয়ে দেবেন। সেক্রেটারী খুশী হয়ে বললেন—গঙ্গাধর, এ আমি জানতাম তুমিই পারবে।

॥ তেত্রিশ ॥

অলকা ঝড়ের মুখে পড়ল। কখনও সন্দীপ, কখনও সুরিন্দর। মাঝ-খানে মেঘ, আকাশ-পটে বিদ্যুতের গর্জন। আবার সেই সুরিন্দর। সেই অবসাদ।

কী যে করবে অলকা, কিছু বুঝতে পারে না, মন আজ বড় চঞ্চল।

যা সহজলভ্য তা গ্রহণ না করে তার প্রতিবাদ করাই কী জীবন? না, যা ঘটতে যাচ্ছে তাকে স্বাগত জানিয়ে গ্রহণ করাটাই কী অনুপ্রবেশ। অনুপ্রবেশ কী মেঘের মত অনুজ্বল, সূর্যের আলো কী তাকে ঢেকে দেয়? আশ্চর্য মানুষের মন! সামান্য একটু অঙ্গীকারে, সামান্য একটু আত্মত্যাগে মনটাকে খুলে ধরলে, গোটা মানুষটার দৃশ্যপটের কী অসাধারণ পরিবর্তন ঘটে!

সন্দীপ যদি বলত, অলকা আমি তোমায় ভালবাসি, আমার চেতনায় আমি তোমারই সত্তা অনুভব করি, যেমনভাবে গর্ভবতী মা সত্তার গভীরে জীবনকে পেয়ে পুলকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তুমি চিরভাস্বর হয়ে থাকতে চাও। তাই তোমার বাইরের যে রূপ, যে রূপ লোকচক্ষুর অন্তরালে, এই নাও, সেটা আমি খুলে ফেলে দিচ্ছি। আমার দিকে একবার এখন তাকিয়ে দেখো আমি আর সন্দীপ নই, চিরন্তন প্রেম। আমি মলিন হব না। শিশির বিন্দুর মত তোমারই চারিপাশে খুব সন্তর্পণে সজল করে রাখব তোমার সত্তার আঙ্গিনা। আমাকে মহৎ ভেব না, প্লিজ। যুদ্ধ করেছি, যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি, তারা একে একে সব মরে গেল। চোখের সামনে দেখেছি। আমি শুধু বেঁচে গেলাম বিধাতার অকরুণ করুণায়। সেই মুহর্তে জীবনকে বড় স্বপ্নময়, বড় সুন্দর লেগেছিল আমার। চারিপাশে আমার রক্ত, স্থবির মৃত্যু। ভেবেছিলাম তাহলে আমরা কেউ কী মরি না? আমাদের সত্তার গভীরে যে জীবন-স্পন্দন, তার কী মৃত্যু নেই? বাঁচার চিরন্তন তাগিদে, বাঁচার বিপুল আয়োজনে সে কী তবে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে, আমি না অন্য কেউ? মৃত্যুর সঙ্গে সে এক আশ্চর্য মোকাবিলা। মৃত্যু আমাকে বুকে তুলে নিয়েও প্রাণটাকে ফিরিয়ে দিল। কত বড় উপহাস করল আমাকে। মৃত্যু হয়ত বলতে চেয়েছিল, বহু মানুষের মধ্যে তুমি বাঁচতে চাও বলে তোমার প্রাণ ফিরিয়ে দিলাম। কী জানি হয়ত বা তাই!

তখন জাহাজ ক্ষতবিক্ষত, আমার চারপাশের বন্ধুরা মৃত্যু শয্যায় শায়িত, শত্রুরা মারমুখী। তখনও আমি বাঁচার শেষ চেষ্টা করছি। কী ভয়ঙ্কর সে অনুভূতি। জীবন ফিরে পেয়ে বাঁচার জন্যে আমি তখন ব্যাকুল। অনেকদিন পরে আমি এ গল্প করছিলাম আমার এক বন্ধুর কাছে। সেও তার এক অভিজ্ঞতার কথা বলল। বন্ধু আমার আর্টিলারী বাহিনীর লোক। অন্য এক জীবন সংঘাতের কাহিনী তা। পশ্চিম পাকিস্থানের এক গ্রামের এবড়ো-খেবড়ো পথে ওরা ট্যাঙ্ক নিয়ে এগোচ্ছিল। হঠাৎ দেখে তার আশে-পাশের সব ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত। চারিপাশে সৈন্যরা সব মরে পড়ে আছে। গোলাগুলি লেগে পায়ের নীচ পর্যন্ত উড়ে গেছে এক সৈনিকের। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে। পশ্চাৎধাবন করার নির্দেশ এসেছে, কোনমতে

বেঁচে যে-যেখানে আছ, ফিরে এস। অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল আমার বন্ধু। এটা কিন্তু আমাদের মিলিটারী এথিক্সের বাইরে। ওই বীর সৈনিক, যার নীচের দিকটা উড়ে গেছে তাকে কাঁধে নিয়ে বন্ধুটি তখন ছুটে চলেছে। কোন হুঁস নেই তার। মরিয়া হয়ে শুধু ভাবছে মৃত-প্রায় এই সৈনিককে ক্যাম্পে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা। বন্ধু অঙ্গীকার করেছিল, ওভাবে ওকে মরতে দেবে না। এবার বল, এ কি মায়া, না একটা জীবনকে ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকার? না, মানুষের জন্যে মানুষের চির আকাঙ্খিত সেই দরদ?

একদিন এইসব বাস্তব ঘটনার কথা টুকরো টুকরো ভাবে সন্দীপ অলকাকে বলেছিল। অলকার আজ এই সব কথাই বার বার মনে পড়ছে কেন তা সে নিজেও বুঝতে পারে না। যে সন্দীপ একদিন মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বেঁচে ফিরে এল, সেই সন্দীপ আজ কত সহজে সরে দাঁড়াচ্ছে অলকার কাছ থেকে। জীবন থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে যে জীবনের সাহচর্য কামনা করে, সে-ই কী জীবনের বৃহত্তর স্বাদ পায়? তবে কেন বলছ আমায় সুরিন্দরকে গ্রহণ করতে? কেন বলছ না, তুমিও থাক, আমিও থাকি। মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হবে। দুপাশে দুই দ্বীপ, মাঝখানে সমুদ্র, দুপাড়ে চাতক পাখিরা বৃষ্টির জল খাবার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। কী ভীষণ তৃষ্ণা নিয়ে তারা সমুদ্রের বুকে উড়ে বেড়ায়! তাদের সংকল্পও সন্দীপ, অনেকটা তোমার মত। নক্ষত্রের জল ভিন্ন অন্য জল খাবনা, তৃষ্ণায় বুক ফেটে গেলেও নয়। আমরা জীবনের দ্যোতনায় উন্মোচিত, উন্মীলিত। তাই কথা হবে কি হবে না, আগে থেকে একথা বলা মুশকিল। সেখানে কোথাও সুরিন্দর নেই। সুরিন্দর কবে বিলেতে ফিরে গেছে। আর ফিরে আসেনি। সুরিন্দর চাতক পাখি সাজতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। শেষে এক মেম-সাহেবকে বিয়ে করেছে। বৃষ্টির জলের অভাবে সে একদিন সমুদ্রের জলই খেয়ে বসল আমার পানে তাকিয়ে। আমি বললাম, নিশ্চয়ই, খেয়ে নাও, কেমন লাগে দেখো, নোনা জল শুনেছি স্বাস্থের পক্ষে ভাল। সুরিন্দরের সংকল্প কলুষিত। সে নির্লজ্জ। তাই ও ভাবছিল এই বরঞ্চ ভাল। তোমার আমার এই গভীর প্রেম, চিরকাল নিষ্কলঙ্ক থাক। দেখা যদি নাও হয়, মনের আয়নায় আমরা পরস্পরের মধ্যে পরস্পরকে খুঁজব, হয়ত দেখতেও পাবো। যদি এ সত্য না হয় তবে দুঃখের দিনে আমরা পরস্পরকে দেখি কী করে?

মার সঙ্গে কথা হবার পর থেকেই অলকা আবোল-তাবোল এইসব ভাবছে। ভাবনার ঘুড়ি উড়লেই সে যেন আকাশে উড়ে যায়, বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দেয়, গোত্তা খায়, শেষে ভো-কাট্টা হয়ে কোন্ এক বাড়ির আল-সেতে বা গাছের ডালে কিংবা কোন্ এক ফুলে-ভরা আঙ্গিনায় গিয়ে পড়ে।

আকাশে ওড়াটা দেখতে সুন্দর, আঙ্গিনায় ঘুড়ি এসে পড়লে পাড়ার ছেলেদের হুটোপাটি। কিন্তু মাকে বোঝান যায় না যে এখনকার ভারতবর্ষে চিরকুমারী হয়ে থাকা যায়। কেউ কৌতূহল প্রকাশ করে না। কেউ অন্যের কথা অযথা জানতে চায় না, মেনে নেয়, সবই ভাগ্য। সুরিন্দরের কথা মা খাপছাড়া ভাবেই বলেন। একদিন বলেছিলেন, এখানকার এমনই সমাজ যে আঙ্গিনায় একা থাকা খুবই মুশকিল। ঘুড়ি কেটে এসে পড়লে ছেলেরা অকারণে ছুটোছুটি করে। গাছে আম ধরলে, কাঁচা আমই পেড়ে খাবে। তুই সুরিন্দরকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যা, আর গোল করিস না। সহজে যা আসে, তোর মত মেয়ে তা গ্রহণ করতে পারে না, আমি জানি। কিন্তু কি করবি। এদেশের পরিবেশে আমরা যতই মর্ডান হই, বৃহত্তর জীবনের আঙ্গিনায় কেউ যদি ডাক দিয়ে ইঁদুরের মত গর্তে চলে যায়, তবে আর কিছু করার থাকে না। মূলত আমরা সব ইঁদুর, গণেশবাবার আশ্রিত ইঁদুর, গর্ত ছাড়া বাঁচার কোন পথ নেই।

আশ্চর্য সব মার কথা। কোন জটিলতা নেই। অর্থে-ঐশ্বর্যে ভরপুর! সারা জীবনের সংগ্রামী মন নিয়ে ইঁদুরের গর্তে থাকলেও জীবনের নির্যাস হয়ত বা কিছু আহরণ করা যায়, যেমন মাকে করতে দেখেছি।

আজ সুরিন্দর-সন্দীপ দুজনেরই আসার কথা। অলকাকে নিয়ে রেস্তোঁরায় খেতে যাবে। কোথাও যেতে অলকার আজ ভাল লাগছে না। মাকে ডেকে বলল—মা, সুরিন্দর-সন্দীপ আসবে। হাসি-গল্প যদি করতেই হয় বাড়িতেই জমবে, কি বল? ওদের বলার কিছু দরকার নেই। তুমি বাড়িতে খাবার ব্যবস্থা কর।

নির্মলা ভাবলেন, আবার দু-জনে কেন? একজনের সঙ্গে শেষ কথা বললেই ত ল্যাঠা চুকে যেত। দৃঢ়চেতা এই মেয়ের মন এখনও কেন সংশয়ে ভরা। এই দোমনা থেকে একবার যদি সরে আসতে পারে, তবে আর কোন ভয় থাকবে না এসব ভেবেও তিনি সায় দিয়ে বললেন—সন্দীপ রাজী হবে ত? যাই বলিস, আমার কিন্তু রেস্টোরেন্টে বসে ভারি অস্বস্তি লাগে। তোর বাবার সঙ্গে যেকবার গেছি, তোর বাবা বেশ জমিয়ে কথা বলে যায়। আমি আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকি, টু-শব্দটি করি না। বলেই নির্মলা একচোট হাসলেন।

অলকা ভাবল, মা কত সরল। দিদিকে নিয়ে তাঁর ভাবনা নেই। দিদি একদিন কথা বলেই অলকার মনের অবস্থা বুঝে গেছে। প্রশ্ন করে বিব্রত করেনি। আজ বাবা বাড়ীতে না থাকলেই ভাল হত। তিনি কিছুটা শুনেছেন নিশ্চয়। কোনরকম আলোচনার মধ্যে অলকা যায়নি বলে বাবা হয়ত একটু কষ্ট পেয়েছেন। এসবে তিনি কখনও মুখ খোলেন না। আসলে, এটা এমন একটা ব্যাপার যে বাবার সঙ্গে আলোচনা করতে অলকার

এই প্রথম কেন যেন সংকোচ বোধ হচ্ছে। মনের এ অবস্থা কেটে গেলে না হয় বাবার সঙ্গে কথা বলবে।

অলকা ঘরে আছে কিনা তা জানার জন্যে চন্দ্রভানু বেরুবার আগে ওর ঘরের সামনে এসে বললেন—ওঃ, তুই আছিস। আমি একটু বেরুচ্ছি। পরাঞ্জপে এক বদ্ধ পাগল। আমি ছাড়লেও সে আমাকে ছাড়বে না দেখছি। এর মধ্যেও বোধহয় কোন পলিটিক্স আছে। গণেশ টাওয়ার সম্পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে সান্ধ্য-পার্টি। এখন এমন কত পার্টি'ই ত হবে। যাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। লোক পাঠিয়ে আবার ডাকা-ডাকি শুরু করবে, তাই বাধ্য হয়েই যাচ্ছি। ফিরতে একটু রাত হতে পারে রে। পরাঞ্জপে গাড়ী করে পোঁছে দেবে বলেছে। বলে তিনি আর দাঁড়ালেন না।

অলকা একটু নিশ্চিন্ত হল। বাস্তবিকই গণেশ অতি সদাশয় দেবতা। করুণা যখন করেন, তখন সত্যিই সিদ্ধি আর ঋদ্ধি, দুটো জিনিসই ওষুধের মত খাইয়ে ছাড়েন। ভাল জাতের ডাক্তার।

চন্দ্রভানু বেরিয়ে গেলেন। সূর্যের আলোও ঢলে পড়ল শিমুল গাছটার মাথায়। ল্যাজ নেড়ে নেড়ে দু-একটা গরু তখনও ঘাস খাচ্ছিল পার্কে। এবার তারা নিরাপদে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। গরুগুলোর ল্যাজ খোয়া যাবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। অলকার মনের অবস্থাই শুধু পালটেছে, পৃথিবীর আর কোন কিছুরই পরিবর্তন হয়নি।

রোমিও-জুলিয়েটকে লম্ফ-ঝম্ফ দিতে দেখে অলকা বুঝল সন্দীপ এসেছে। অলকা নেমে এল। বলল—চল, ওপরে গিয়ে বসি। নির্মলা এগিয়ে এলেন, বললেন—কি সন্দীপ, সময় হল?

—না অ্যান্টি, আজকাল সময়েরই বড় অভাব।

—ওটা বুঝে থাকলে উন্নতি হবে তামার।

—বুঝতে পারলাম, বড় দেরী করে। সময় অনেক পেরিয়ে গেছে।

অলকা একটু হেসে বলল—বোধটা একটু দেরীতে হল, এ যা দুঃখ।

—দুঃখের কপাল, কি আর করা যাবে। সন্দীপ হেসে নিজেকে আড়াল করতে চাইল।

—দুঃখকে শখ করে ডেকে আনলে, কার কি করার থাকে। নির্মলা হাসতে হাসতে বললেন।

—ভুল করছেন, অ্যান্টি। দুঃখ-সুখ কারুর হাতে নয়। ওটা সময়ের। ওটা কর্মফল। কর্মফল কোনকালেই মানতাম না, এখন একটু একটু মানতে বাধ্য হচ্ছি।

নির্মলা জিজ্ঞেস করলেন—আজ কি তোমরা বাইরে যাবে?

সন্দীপ একটু দ্বিধায় পড়ে। অলকার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি ত তৈরী নও দেখছি। এখন ত বসা যাক, সুরিন্দর এলে পরে ভাবা যাবে।

নির্মলা বললেন—আজকে বরং তোমরা এখানেই গল্পগুজব কর। আমি রান্না চড়িয়ে দিয়েছি, খেয়ে যাবে সব।

সন্দীপ হেসে বলল—বেশ, সেটাই ভালো।

দু-জনে এসে অলকার ঘরে বসল।

দু-জনেই নীরব।

দু-জনেই জানলায় দাঁড়িয়ে আসন্ন সন্ধ্যার আলো দেখে। কারুর মুখে কোন কথা নেই। কেউ কাউকে স্পর্শ করল না। একথাও কেউ বলল না, তোমাকে ছাড়া জীবন দুর্বিষহ, এসো, আমরা অঙ্গীকার পাল্‌টে ফেলি, সারা জীবন ধরে দু-জনায় দু-জনকে ভালবাসি।

আলোর শেষ রেখা অলকার মুখে এসে পড়ল।

সন্দীপ অলকার দিকে তাকাল।

চোখাচোখি হল দুজনার। সন্দীপের মনে হল, অলকার চোখেমুখে আসন্ন এক ঝড়ের সঙ্কেত, এক্ষুণি দাপিয়ে আসবে বাইরের আকাশ ছুঁয়ে। সন্দীপ ভাবে, হিসেবে কোথায় যেন ভুল হয়ে গেছে। সংশোধন করার কোন উপায় নেই। সময় পার হয়ে গেছে।

অলকা জিজ্ঞেস করল—লাইট জ্বালব?

—না।

—মোমবাতি?

—ভাল হত। মোমবাতি আছে?

—আজকাল দিল্লীতেও লোড শেডিং হয়। বাবাই কিনে আনেন। তাই প্রয়োজনে অভাব হয় না। বাবাও মোমবাতির আলো খুব পছন্দ করেন।

—আমিও। সন্দীপ হেসে বলল।

—অন্ধকার সবটা দূর হয় না বলে?

—আজ আলো-আঁধারে তোমার মুখ শেষবারের মত দেখব, তাই।

—শুনতে ভালই লাগছে। কাব্য করছ। অলকার গলা ধরে এল।

—কাব্যের উৎপত্তিস্থলে কঠিন সিদ্ধান্ত রয়েছে, জান ত। সিদ্ধান্ত যা নিয়েছি তাতে আমাদের জীবনও চিরকাল কাব্যময় হয়ে থাকবে, অলকা।

—কি করে বুঝলে? অলকা মোটে দুটো মোমবাতি জ্বালাল।

—আরও একটা জ্বালো।

—কেন, আলো কম লাগছে বুঝি?

—ততটুকুই আলো চাই যতটুকু আলোতে তোমার মুখ ভাস্বর হয়ে ওঠে।

অলকা একটু হাসল—আমার মুখ তোমার কাছে ভাস্বর লাগে?

সন্দীপ নীরব। অলকা সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল।

সন্দীপ অলকাকে দেখছিল, ছায়া সরিয়ে স্নিগ্ধ আলোয়।

—কি এত দেখছ? অলকা হাসল।
—তুমি কি খুব কষ্ট পাচ্ছ, অলকা?
—কি মনে হয়?
—আমরা কী ভীষণ ভুল করছি? সংশোধনের কি আর সময় নেই?
—জোর করে আমি ত আর চাইতে পারি না। অবাক হয়ে যাই নিজেকে দেখে।
—আমার মনেও গভীর সংশয়। অথচ এরকম হবার কথা ছিল না।
—তবে কী আমরা ভুল করছি? অলকা ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে প্রশ্ন করল।
সন্দীপ নীরবে অলকাকে দেখল। বলল—ভুল যদি করেও থাকি, নিজেদের সাক্ষী রেখেই করছি, অন্যের অভিযোগের চেয়ে সে বরং ভাল।
—লোকে বলবে, ভুল করছি তোমার পৌরুষের অভাবে। অলকার একটি ছোট্ট কথা। অভিযোগের মত শোনাল।
—কথাটা হয়ত ঠিক, না অলকা।
—আমার তা মনে হয় না।
—তোমার কী মনে হয়?
নিরুদ্বিগ্ন স্বরে অলকা জবাব দিল—আমার ওপরে তোমার গভীর আস্থা, তাই।
—কি করে বুঝলে? এক্ষুণি বলছিলে পৌরুষের অভাবে আমি তোমাকে হারাচ্ছি।
—আমার তা মনে হয় না।
—কী মনে হয়?
—তুমি চিরন্তন সত্যকে চাইছ।
—কী সেই চিরন্তন সত্য?
—জীবনের ঘূর্ণিঝড়ে আমাকে হয়ত হারাতে চাও না। হয়ত বা ভেবেছ আমাকে চির সুন্দর করে রাখবে, সজীব রাখবে তাই।
—খব কষ্ট হবে তোমার, না?
—কষ্ট ত হচ্ছিল, এখন আর নয়।
—কি ভাবছ এখন?
—ভাবছি, অন্য কেউ পারত কিনা। তুমি পারবে সন্দীপ।
—বলছ, আমি পারব?
—আমি জানি তোমার ভীষণ মনের জোর।
—আমাকে ছাত্র পেয়ে তোমাকে আবার কাব্যে পেল নাকি?
—কাব্য? হাসি পায়। আমার জীবনটা আর যাই হোক, কাব্য নয়।
—আমাদেরই অজান্তে যে ট্র্যাজেডি রচিত হয়ে যাচ্ছে, সব কাব্যের মূলেই

ত গভীর কোন ট্র্যাজেডির ছোঁয়া থাকে। তুমি তারই সাক্ষী।

—শুধু এইটুকু? আর কিছু নয়? অলকা প্রশ্ন করে।

—হয়ত নয়। সুরিন্দরকে বিয়ে করলেও তুমি আমার কাছে সেই অলকাই থাকবে।

—এও কি তোমার সেই মনের জোরের পরীক্ষা?

—বলতে পার।

—তুমি বিয়ে করবে না?

—আপাতত নয়, আমাদের ভবিষ্যৎ বড় অনিশ্চিত, অলকা। কিছু লোক আরও স্বাধীনভাবে থাকবে বলে কিভাবে স্টেনগানের অপপ্রয়োগ করছে, দেখছ ত? আমরা সৈনিক, শত্রু-মিত্র চিনতে আমাদের অতটা ভুল হয় না। এরা ভুল রাস্তায় চলেছে, কবে মেরে দেবে কে জানে? ভারতবর্ষে মানুষের মূল্য কমে গেছে। বিশ্বাস, আস্থার অভাবে যা হয়।

—ও কথা বোল না, সন্দীপ।

—আমি ত আর অমর নই। অ্যালবার্ট ক্যামুর 'ক্রস পারপাসের' মত মেয়েটি সমুদ্রের পাড়ে থাকবে বলে পর পর ট্র্যাজেডি ঘটাল, সবাইকে মেরেও কিন্তু সমুদ্রের পাড়ে নীল আকাশের নীচে তার আর থাকা হল না। পড়েছ ত? এই থিমটা আধুনিক যুগকে কত স্পষ্ট রেখায় তুলে ধরেছে।

—পড়েছি, তবুও বলছি, আমার কাছে তুমি অমর।

—ব্রাভো, প্রেম আর কাকে বলে!

—প্রেমই অমর, সন্দীপ।

—ওঃ তাই বুঝি, জানা ছিল না।

—আবার ফাজলামি?

—প্লিজ, আমার সেন্স অব হিউমারকে অতটা অবজ্ঞা কোর না। ওটা নিয়েই একদিন যুদ্ধ করেছি আমি।

—আর এখন বুঝি যুদ্ধ করছ না?

—এ যুদ্ধ, সে যুদ্ধ নয়। এ আরও ভয়ংকর। মনের সঙ্গে যুদ্ধ। গোপন শত্রুর ক্যারাটে।

—অনেক লোকক্ষয়!

—লোকক্ষয় হলেও টের পাওয়া যায় না। ও-খবর রেডিওতে ব্রডকাস্ট হয় না, এ ক্ষতির হিসেব কাগজের পাতায় ছাপা হয় না।

—তুমি মৃত্যুবিলাসী, হুইস্কির মত ওটাও এক ধরনের নেশা।

—অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এলে বোধহয় ওটা একটু হয়। নেশায় ধরে। হুইস্কির নেশা ওর কাছে তুচ্ছ।

—আমার মন এখন অনেক হালকা হয়ে গেছে। অলকা হাসে।

—কি ব্যাপার? মিরাকেল্ ঘটে গেল নাকি—কোন দৈব ওষুধ না

মাদুলি, টোট্‌কা নয়ত।

—তোমার সঙ্গ সেটাই মিরাকেল্‌।

—মিরাকেল্‌ ঘটাতে পারে একমাত্র হিন্দি সিনেমার চিরজীবী নায়ক। আমাকে ত লোকে কাপুরুষ বলবে, তোমার মা-বাবা এমনকি তোমার দিদিও।

—না সন্দীপ, তুমি কাপুরুষ নও, আমি বলছি তুমি বীর।

—এত প্রশংসা ভাল নয়। বাইরে থেকে যারা আমায় বিচার করবে তারা কিন্তু কেউ আমাকে ক্ষমা করবে না।

—সে আমি জানি।

—তবে?

—আমি শুধু জানব তুমি কে, তুমি কী।

—হাত মেলাও। এতক্ষণ পরে ওরা পরস্পরের হাত চেপে ধরে বসে রইল। সন্দীপ আস্তে আস্তে বলল—আসলে কি জান অলকা, তোমার মূল্য একটু বেশী দিয়েছি বলেই তোমাকে আমি গ্রহণ করতে সাহস পাচ্ছি না, এবার বুঝলে? কাব্য রাখ। স্রেফ প্রাক্‌টিকাল্‌ কথা অলকা। তুমি আমার জীবনের আকাশ, ব্যাপ্তি। আমার প্রকাশও। সংক্ষেপে বললে, আমার পসিবিলিটি। ইনফ্যাক্‌ট স্কাই ইজ দ্য লিমিট্‌।

—চমৎকার। শুনলাম, সুরিন্দরের সঙ্গে তুমি নাকি দেখা করেছ? অলকার স্বরে উৎকন্ঠা।

—হ্যাঁ।

—ওকে কি বলেছ?

—বলেছি অলকা যদি বিয়ে করে, তোমাকেই করবে, আমাকে নয়। সন্দীপ হাসছিল।

—শুনে সুরিন্দর কি বলল?

—প্রথমেই হ্যাণ্ডশেক্‌ করল। তারপর জড়িয়ে ধরল।

—ও কথা তুমি কেন বলতে গেলে?

—কেন কিছু অন্যায় করেছি?

—ভীষণ অন্যায় করেছ। এখন ওকে যদি বিয়ে না করি, তোমার মুখ থাকে কোথায়?

—কিন্তু তুমি যে বিয়ে কর, সেটাই আমি চাই।

—সন্দীপ, আমার জীবন থেকে তুমি সরে যাচ্ছ, যাও। আমি কিছু বলব না। কিন্তু ওকথা বলার কোন অধিকার তোমার নেই।

শুনে সন্দীপ চুপ করে গেল।

অলকা একটু হাসল। বলল—আঘাত পেলে, না?

—আঘাত তুমি করতেই পার, অলকা।

অলকা সন্দীপের হাতটা নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল—না, ঠিকই বলেছ। যদি বিয়ে করি, সুরিন্দরকেই করব। তোমাকে আমি অত সহজে হারাতে চাই না।

—আমি কি গডরেজের সুরক্ষিত রত্ন?

—তারচেয়েও বেশী।

—কাপুরুষ? -

—আবার কেন ...ছ, আমি ত বলেছি, তুমি বীর।

—এবার আলোটা জ্বালো। সন্দীপ হঠাৎ বলে উঠল।

অবাক হল অলকা—কেন?

—সুরিন্দর আসছে, তুমি তৈরী হও।

—আজই বিয়ে দিয়ে দেবে নাকি?

নিশ্চল হয়ে বসে রইল সন্দীপ।

—কথাটা মন্দ বলনি, আজই তুমি আমার সামনে ওকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দাও।

—সেটা হবে না।

—কেন?

—ওকে বিয়ে করব কিনা, এখনও ঠিক করিনি।

—এই না বললে, আমি যখন কথা দিয়েছি, তুমি আমার কথার মর্যাদা রাখবে।

—সন্দীপ, তুমি আমাকে নিয়ে এ কী খেলা শুরু করলে!

অলকা জানলার পাশে এসে দাঁড়াল। চোখ অশ্রুসিক্ত। সন্দীপও পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব। সন্দীপ নীরবতা ভেঙে বলল—ঠিক আছে, তোমাকে আর কষ্ট দেব না। তোমাকে আমিই বরং বিয়ে করি—।

—তুমি? আনন্দে উচ্ছ্বসিত হল অলকা।

—হ্যাঁ, আমি।

কি একটু ভেবে অলকা বলল—না, থাক। খুব হয়েছে।

দু-জনে হেসে উঠল। লাইট জ্বলে উঠল। রোমিও-জুলিয়েটের চিৎকার চেঁচামিচি শোনা গেল। সুরিন্দরকে দেখলেই ওরা মারমুখী হয়ে ওঠে।

সবাই এল ড্রইংরুমে। সুরিন্দরকে হাত ধরে নিয়ে এল সন্দীপ। যেন কত দিনের বন্ধু। অলকা পাশেই ছিল। সুরিন্দরের হাসি আর ধরে না।

সন্দীপ বলল—অলকা, আজ আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই। আন্টি বলছিলেন বাড়িতে রান্না করছেন। সেই ভাল, কি বল সুরিন্দর?

সুরিন্দর এখন সবেতেই রাজী।

সন্দীপ প্রস্তাব করল—সুরিন্দর, একটু রাম হলে ভাল হত না, কি বল অলকা?

উল্লসিত হয়ে উঠল সুরিন্দর। বলল—এক্সেলেন্ট আইডিয়া, অলকা তুমি কি—। অলকা এক্ষুণি বোতলটা নিয়ে আসবে কি আসবে না, এই ভেবে সুরিন্দর কথাটা শেষ করল না।

কি ভাবতে ভাবতে অলকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তিনটে গ্লাস ও বোতল নিয়ে অলকা ফিরে এল। সন্দীপ গ্লাস তিনটেতে রাম ঢালতে ঢালতে বলল—একটু বরফ চাই অলকা। অলকা ফ্লাস্কে বরফ ভরে নিয়ে এল। সন্দীপ ওদের দুজনের দিকে গ্লাস এগিয়ে দিল। গ্লাসগুলো যে-যার মুখের কাছে ধরে বলল—চীয়ারস্! সুরিন্দরের আওয়াজ পেয়েই রোমিও-জুলিয়েট আবার ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার শুরু করল।

এতক্ষণ পরে সুরিন্দরের খেয়াল হল, দেরীতে আসার জন্যে ত এপলজি চাওয়া হয়নি। তাই হঠাৎ-ই বলে উঠল—ওঃ সরি, আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল, অলকা। আসলে কাল চলে যাচ্ছি ত, গোছগাছ একটু বাকি ছিল।

অলকা বিস্ময় প্রকাশ করে বলল—কই কিছু বলনি ত। কালই যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, অলকা। ঠিক হয়েছে এই হপ্তাখানেক আগে। বলার সময় পেলাম কোথায়!

সন্দীপ বলল—তাহলে?

অলকা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল—তাহলে কি?

সন্দীপ বলল—সুরিন্দর যখন চলে যাচ্ছে কাল, রেস্তোরাঁয় গিয়ে ওর অনারে একটু হুল্লোড়বাজী করলে হত না?

সন্দীপ হাসছে, ব্যঙ্গ করে ক ` বলছে, ঠাট্টাও জুড়ে দিচ্ছে সুরিন্দরকে নিয়ে, এ আবার কোন্ সন্দীপ? —অলকা ভাবে। একটু আগে ঘরে বসে মোমবাতির মৃদুমন্দ আলোয় যে জীবনের আদি-অন্ত নিয়ে বিশ্লেষণ করছিল সে সন্দীপ গেল কোথায়?

—চমৎকার প্রস্তাব, কি বল অলকা? সুরিন্দর সন্দীপের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল। অলকা কিন্তু বেঁকে বসল—ঠিক এই মুহর্তে আমি রেস্তোরাঁয় যেতে রাজী নই।

—তবে? সুরিন্দর কি যে বলবে ভেবে পায় না।

সন্দীপ হার মানবে না। ওর মতলব অন্য। তাই বলল—চল সুরিন্দর, আমরা না হয় দুজনে একটু ঘুরে আসি। ফিরে এসে না হয় খাওয়া যাবে।

—না তা হবে না। অলকার দৃপ্ত কণ্ঠ।

—কেন, কী হল অলকা? সুরিন্দর ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়।

—ও তুমি বুঝবে না। অলকার স্পষ্ট উক্তি।

আবহাওয়াটা একটু ঘোরাল মনে হয় সুরিন্দরের। কোন্ দিকে ঘুরবে বুঝতে না পেরে সন্দীপের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

সন্দীপ আজ মরিয়া। মীমাংসা একটা করতেই হবে। তাই বলল—মেনে নাও, সুরিন্দর। অলকা যখন চাইছে না তখন আমরাও এখানেই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকি। একটা সমস্যা মিটলো দেখে হাঁফ ছেড়ে একটু সোজা হয়ে বসল সুরিন্দর। বলল—'ওকে', 'ওকে'। ঘরে কি সেরকম জমে? অলকা, চল না, তিন জনে মিলে না হয় একটু ফূর্তি করি—মানে—।

—তুমি যাও। আমার যাবার ইচ্ছে নেই। অলকার রুক্ষ জবাব।

গ্লাস সব খালি হয়ে গেছে। সন্দীপ ভরে দিতে এগিয়ে এল।

অলকা বলল—আর নয়।

—সে কী?

—হ্যাঁ, আর না।

সুরিন্দর হাসছিল। অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে সামলাতে পারল না। হঠাৎ একটা মন্তব্য করে বসল—ভীষণ জেদী ও একরোখা মেয়ে। না ত না-ই। সন্দীপ বলছে, তাও না, একবার না বললে হ্যাঁ হবার উপায় নেই।

সন্দীপ সুরিন্দরের ভুল ভাঙাতে বলল—আমার কথা অলকা শোনে, এ তোমায় কে বলল। খুব ভুল ধারণা তোমার সুরিন্দর।

—দ্যাটস্ অওফুলি ব্যাড—আই থট্।

—না, তোমার ভুল ধারণাগুলো শুধরে নাও ত।

—ভুল ধারণা? সুরিন্দর পাল্টা প্রশ্ন করে।

—এই যে, যা আমি বলব, অতি বাধ্য মেয়ের মত অলকা সুড়সুড় করে তা করবে।

—না, না, তা আমি বলিনি।

—কি বলেছ? ইমপ্লিকেশনে তাই ত দাঁড়ায়।

—অ্যাই সোয়ার, আমি বহুদিন ধরে অলকাকে চিনি, অলকা বড় এক-গুঁয়ে মেয়ে।

—হ্যাঁ, তা ঠিক। অলকা কথায় কথায় স্বাধীনতা খোয়াতে রাজী নয়। আর তা করবেই বা কেন।

—তা ঠিক। বলে সুরিন্দর গ্লাসে চুমুক দেয়।

অলকা গম্ভীর হয়ে বসে সব শুনছিল। উঠে পড়ল। বলল—আসছি।

সুরিন্দর ও সন্দীপ এবার দুজনে একা।

সুরিন্দরের মনে শঙ্কা। বলল—ভাবগতিক ভাল ঠেকছে না, ভায়া। তুমি যা বলেছ তা কী সত্যি?

সন্দীপ হাসছিল, বলল—যাচাই করে দেখই না একবার।

—কী বলব? কিভাবে বলব, সেটাও এখন আমার কাছে এক সমস্যা। তোমার সামনে কথাটা পাড়তে পারলে মনে একটু জোর পেতাম। তা কী বলে শুরু করব। স্ট্রেট্ বলব—তোমাকে আমি বিয়ে করতে চাই—তুমি কি রাজী, অলকা?

—না, না। দ্যাটস্ নট্ দ্যা ওয়ে।

—তাহলে কিভাবে কথাটা তুলব। প্লিজ, এডভাইস মি।

—কিভাবে বলবে। বলবে অলকা, কাল আমি চলে যাচ্ছি। ফিরে গিয়ে তোমার স্কলারশীপের জন্যে সিরিয়াস এ্যাটেম্প্ট নেব। আমি এ্যাব-সলিউট্লি সিয়র, হয়ে যাবে। এতেও যদি অলকা চুপ করে থাকে তাহলে কি বলবে? সন্দীপ হেসে জিগ্যেস করে—এরপর কি বলবে, সেটা ঠিক বলা যাচ্ছে না। যা মনে আসে, তাই বলে দিও।

অলকা চানাচুর ও শামিকাবাব হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল।

সুরিন্দর বলে উঠল—স্পেলন্ডিড্।

অলকা তবুও চুপচাপ বসে রইল। কোন সাড়া-শব্দ দিল না।

সুরিন্দর অলকার একটু কাছ ঘেঁসে বসল। করুণ সুরে বলল—কাল আমি চলে যাচ্ছি, অলকা।

অলকা বলল—হ্যাঁ, একটু আগেই ত সেকথা বলেছ। একই কথা কতবার বলবে।

—ফিরে গিয়ে এবার তোমার স্কলারশীপের জন্যে আমি সিরিয়াসলি চেষ্টা করব।

অলকা তীর্যক ভঙ্গীতে একবার সন্দীপের দিকে তাকাল। সন্দীপ হাসছিল।

অলকা এবার হেসে বলল—কেন, তুমি যাচ্ছ বলে আমাকেও সেই দেশে সুড় সুড় করে যেতে হবে? কঃখনো নয়।

সন্দীপ তখনও হেসে চলেছে। সুরিন্দর হাসবে কি কাঁদবে ঠিক বুঝতে পারে না। তার মুখের রঙ ঘন ঘন বদলাতে থাকে।

সাহস করে বলে ফেলল—তাহলে তুমি বিদেশে যাবে না?

অলকা তেমনি জোর দিয়ে বলল—না।

হঠাৎ সুরিন্দরের মনে পড়ে গেছে এই রকম একটা ভাব দেখিয়ে বলল—ওঃ, তাই ত। তুমি চলে গেলে তোমার বইটা লেখার ক্ষতি হয়ে যাবে যে।

—হ্যাঁ, দেশের মস্ত বড় ক্ষতি। অলকা বিজ্ঞের মত বলে উঠল।

সুরিন্দর একটু প্রশংসা করার সুযোগ পেয়ে বলে—বেশ লেখা হচ্ছিল, অবশ্য আমি যতটুকু শুনেছি।

অলকা প্রতিবাদ করে উঠল—মোটেই ভাল হচ্ছে না, আমি জানি।

সন্দীপ ফোড়ং কাটল—বিদ্বানরা মাঝে মাঝে সেল্ফ অ্যানালাইসিস্

করতেও ভালবাসে।

তিন জনেই হেসে উঠল। তিন জনের হাসিতে তিন রকমের সুর।

—শকুন্তলা বহীনজী কি বাড়িতে নেই? সুরিন্দরের হঠাৎ খেয়াল হল।

—দিদি পার্টিতে গেছে। বলেছিল, তাড়াতাড়ি ফিরবে। পার্টিতে একবার গিয়ে পড়লে কথা রাখা যায় না, সেটা সুরিন্দর, তোমার ত ভাল করেই জানা আছে। অলকার স্বরে একটু উষ্মা।

—যাবার আগে বহিনজীর সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। দু-একজন বন্ধু-বান্ধবকে চিঠি দেবেন বলেছিলেন। কথাটা বলতে বলতে সুরিন্দর ভাবল, ভালই হল, কাল এ ছুতোয় একবার আসাও যাবে আর অলকাকে একটু নিরিবিলিতে পাওয়া যাবে।

—চন্দ্রভানু আঙ্কেলকে ত দেখতে পাচ্ছি না। বাড়িতে নেই বুঝি? সন্দীপ জানতে চাইল।

—বাবা গণেশ টাওয়ারের পার্টিতে গেছেন।

—ওরে বাবাঃ, চারিদিকে পার্টি আর আমরাই শুধু ঘরে বসে। কথাটা বলেই সুরিন্দরের খেয়াল হল, একটু বেশি বলা হয়ে গেল না ত। অলকা কিভাবে কথাটাকে নেবে ঠিক বুঝে পায় না। নিজের অজান্তে মুখ দিয়ে যখন কথা বেরিয়ে যায়, তখন বড় অস্বস্তি হয়। অথচ কিছু করার থাকে না। সুরিন্দর কথাটা অবশ্য শেষ করেনি, অর্ধপথেই থেমে গেছে।

—ঘরকে ভালবাসতে শেখো, সুরিন্দর। সন্দীপ হাসতে হাসতে বিজ্ঞের মত উপদেশ দেয়।

অলকা সন্দীপকে আড়চোখে আর একবার দেখে নিল।

—ঘর নেই, তা কাকে ভালবাসব?

—খুবই দুঃখের কথা। সন্দীপ মুচকে মুচকে হাসে।

—অলকা চাইলেই, আমারও 'সুইট হোম' হবে। সুরিন্দর আজকে কোন সুযোগই ছাড়তে রাজী নয়।

অলকা কিন্তু নীরব। সুরিন্দর আবার অস্বস্তিতে ভুগতে থাকে। সন্দীপের উৎসাহের চাপে বড় বেগতিক কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। সাবধান হয়ে কথা বলতে হবে, সুরিন্দর ভাবে।

—তোমার ত অনেকেই আছে। একজনকে বেছে নিলেই ত ল্যাটা চুকে যায়। অলকা বলল।

—মনমত কেউ নেই অলকা। সুরিন্দর নির্লজ্জের মত বলে ফেলে।

—তবে আমিও নেই। অলকা কথাটা বলে সন্দীপের দিকে তাকায়। তার চোখেমুখে তখন বাক্যহীন একটাই আবেদন, উল্টোপাল্টা কথা বলে হাওয়াটা গরম কোর না, প্লিজ।

সুরিন্দর চুপ করে রইল।

সন্দীপ হাওয়াটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বলল—বিদ্বানদের তর্ক অনেক শুনেছি। এখানে আমরা ঘরোয়া কথা শুনতে চাই।

অলকা বলল—উল্টো-পাল্টা কথা শুনলে কার না রাগ হয় বল, সন্দীপ।

এরকম আন্তরিকতায় ভরা স্বগতোক্তি শুনে সুরিন্দর প্রায় দিশেহারা। কিন্তু সুরিন্দর আজ মরিয়া। যাবার আগে একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। বহুদিন অপেক্ষা করেছে। যাবার মুহূর্তে একেই মন খারাপ, তারপরে অলকার এই সব উল্টো-পাল্টা আব্দার আর সয় না। সুরিন্দর তাই আবার প্রথম থেকে শুরু করল। কাল আমি চলে যাচ্ছি, অলকা।

—যাও, কতবার আর শুনবো?

—তুমি যাবে না?

—যাব।

—যাবে? কবে? সুরিন্দরের বুক ফেটে পড়ে আনন্দে। ইচ্ছে করে, সেই মুহূর্তে অলকাকে জড়িয়ে ধরে ঘন ঘন চুমু খায়। বলতে ইচ্ছে করে, মাই সুইট্ ডারলিং, এতদিন পরে তোমার সময় হল, মাই ডারলিং? কবে? কবে সে সুদিন আসবে মাই সুইট হার্ট? পাল্টা প্রশ্ন—কবে?

—জানি না।

অলকার কথা শুনে সুরিন্দর বেলুনের মত চুপ্‌সে যায়।

—অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করতে পারবে, সুরিন্দর? রতন পেতে ডুব দিতে হয়। সন্দীপ আলতোভাবে কথাটা বলে ফেলল।

সুরিন্দর অনেক কষ্টে একটু হেসে বলল—আর কতদিন অপেক্ষা করব. সন্দীপ?

অলকা সন্দীপের দিকে তাকায়।

—অনেক কাল, আরও অনেক দিন।

—বুড়িয়ে যাব যে। ডুব দিলেই রতন পাওয়া যায় না সন্দীপ। অনেক সময় ঘোলাটে মাটি জোটে কপালে।

অলকা হেসে ফেলে বলে—রতন চাইতে হয়, সুরিন্দর। আবর্জনা চাইলে রতন ওঠে না।

সুরিন্দর চুপ করে যায়। বুঝতে পারে, ওর নিজের জীবনের সফলতা আর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি এ এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত।

তাই সুরিন্দর সাফাই গাইল—নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্যেও মানুষ অনেক কিছু খোঁজে।

—বেড়ে বলেছ কথাটা, আবার বল সুরিন্দর। সন্দীপ বলে।

—হ্যাঁ, সন্দীপ, ব্যথায় ভরা আমার এই কথা। সব পেয়েও মানুষ যে কত নিঃস্ব হতে পারে আমি তার প্রমাণ।

—নিজের দেশকে যে 'কিছুই-না' বলে উড়িয়ে দেয়, তার দশা এই রকমই

হয়। অলকা কটাক্ষ করে।

—হ্যাঁ, দেশজুড়ে সব দেশপ্রেমিক! এখন তাদের মুখোশ খুলছে। বোফর্স সিম্প্লি সীমবলিক্ এক্সপ্রেশন্।

—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে শুরু করে এ-পর্যন্ত তোমার মহাজনেরা ত সব ধোয়া তুলসী গঙ্গাজল ছিল। ভাগ্যিস তাঁদের মধ্যে কিছু পুণ্যাত্মা ছিলেন, যাঁদের পুণ্যের জোরে সব পাপ ধুয়ে গিয়েছিল।

—রাজার জাতকে যতই হেনস্তা কর না কেন তবু তারা রাজাই। স্লেভের দৌড় বড় জোর 'মুক্তি'।

বিরক্ত হয়ে সুরিন্দরের দিকে তাকায় অলকা।

সন্দীপ প্রমাদ গোনে। আবার না একটা অঘটন ঘটে। অলকার মন আজ কি রকম বিচলিত, তা একা সন্দীপই জানে। তাই বলল—যত ভাবি ইতিহাস-ভূগোলের কথা আর শুনব না, ততই দেখি তার কচ-কচানি।

অলকা বলল—বেশ তাহলে আমি চুপ করে থাকি।

সুরিন্দর শশব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—আমাদের কথা কিন্তু শেষ হল না, অলকা।

সন্দীপ ভাবল, নীরবতাকে কেউই শেষ কথা ভাবতে রাজী নয়। শেষটা কি তা সন্দীপ জানে। সে পরিচয় সে পেয়ে গেছে এই ঘরে বসেই। সন্দীপ আর এর মধ্যে ভিড়তে চায় না। ঘটনা নিজের স্রোতেই বইতে থাক। সন্দীপ তা দেখবে।

সুরিন্দর শেষবারের মত সেই একই প্রশ্ন আবার করল—তুমি তাহলে বিদেশে আমার কাছে যাবে না? সমস্ত ব্যবস্থাই আমি পাকা করে রেখেছি। টাকা-কড়ি, ঘর-বাড়ি, ফ্রিজ, মোটর, লাইব্রেরী, পাবলিশার্স। কোন কিছুই বাদ রাখিনি। শুধু তোমার যাবার অপেক্ষায়। যাবে?

—হ্যাঁ, যাব।

—যাবে? সুরিন্দর আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে। কবে?

—সেটা জানি না। সেটা নির্ভর করবে মনের দিক থেকে আমি কখন প্রস্তুত হব।

ঘুরে ফিরে অলকার সেই একই উত্তর। এবার যদিও কথার মধ্যে আশার একটু প্রলেপ আছে।

আচ্ছা জেদী মেয়ের পাল্লায় পড়েছি। জীবনটা দুর্বিষহ করে তুলল। সন্দীপ নিশ্চয়ই মজা দেখছে। মাঝে মাঝে, টিপ্পনী কাটছে। কত সহজেই সন্দীপ এসব পেয়েছে। এত সহজে পেয়েছে বলেই তা গ্রহণ না করে ত্যাগের মহিমা দেখাচ্ছে। আর তার জন্যে তার কী অহংকার। সন্দীপের এই ঔদার্য সুরিন্দরের আর সহ্য হয় না। বদান্যতার এক এক

টুকরো প্রসাদে সন্দিহান হয়ে সুরিন্দর সন্দীপের দিকে তাকায়।

সন্দীপ বোঝে হাওয়া বেশ গরম হয়ে উঠেছে। কথা ঘোরাতেই তাই বলে—খাওয়ার কি খুব দেরী আছে, অলকা?

—না, মা ডাকছিলেন ত। খাওয়া তৈরী, চল।

তিন জনে খাবার টেবিলের দিকে পা বাড়াল। যাবার মুখে সুরিন্দর এক ফাঁকে বলে—কালকে একবার আসতে হবে। বহিনজীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—এসো। অলকা হেসে বলল।

নির্মলা হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন। বললেন—তোমরা সব খেতে চল। উনি বাড়িতে নেই। শকুন্তলাও দেরী করছে। তোমরা যে-যার মত বসে পড়। অলকা, তুই বরং ওদের সব দেখিয়ে দে। তুই-ও বসে পড়, আমি পরিবেশন করে দি।

অলকা সন্দীপ আর সুরিন্দরকে মুখোমুখি বসাল। দু-জনে দু-জাতের। পাশাপাশি বসলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা।

॥ চৌত্রিশ ॥

কদিন ধরেই গঙ্গাধরের শরীরটা খুব খারাপ। পেটে অসহ্য একটা যন্ত্রণা। বহুদিনের অত্যাচারের ফলে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি বুঝি পেটে বাসা বেঁধেছে। গঙ্গাধরকে এক মুহূর্তও সুস্থির থাকতে দিচ্ছে না। সেদিন সন্দীপের ফ্যাক্টরির প্ল্যানের লে-আউট তৈরী করছিলেন। সব কিছুরই খসড়া করে ফেলেছেন। সামান্য আর একটু বাকী। হঠাৎ আবার সেই ব্যথাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সেইখানেই পড়ে গেলেন। সন্দীপ ছুটে আসে। ওর চিৎকার শুনে মৈত্রেয়ী রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এলেন। গঙ্গাধরের জন্য শুক্তো আর স্যুপ তৈরী করছিলেন। ডাক্তার আনা হল, তাঁর পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি করা হল তক্ষুণি। হাজার রকমের টেস্ট। ধরা পড়ল, পেটে দুরারোগ্য ক্যানসার। বাঁচার

কোন আশা ডাক্তাররা দিতে পারলেন না। বললেন, পেটের যা অবস্থা, তাতে অপারেশন করেও কোন লাভ হবে না। গঙ্গাধরের অবস্থা খারাপের দিকে। জোর করে তিনি বাড়ী চলে এলেন।

খবর পেয়ে আত্মীয়-স্বজন ছুটে এলেন। কলকাতা থেকে ছুটে এলেন অধর লাহিড়ী, সঙ্গে এলেন আর দু-একজন কর্মী, যাঁরা গঙ্গাধরের জীবন-আরাধনার সাথী। অনেকভাবে অনেকে বোঝাল। কিন্তু কোন নার্সিং হোমে যেতে গঙ্গাধর রাজী হলেন না। বাড়ীতেই থাকলেন। তাঁর ঘরটা হয়ে উঠল ছোটখাট একটা হাসপাতাল। ঘন্টায় ঘন্টায় বড় বড় সব ডাক্তার আসতে লাগলেন। সকালে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, দুপুরে জেনারেল ফিজিশিয়ান, সন্ধ্যাবেলা কার্ডিওলজিস্ট। এঁরা যে-যাঁর মতামত দিয়ে প্রেস্‌ক্রিপসন লিখে দিয়ে যান। প্রথম দিকে গঙ্গাধর একটু ভাল বোধ করলেন। তারপর আবার যমে-মানুষে টানাটানি শুরু হল। সমানে ড্রিপ দেওয়া চলল। ড্রিপ দেওয়াতে তাঁর খুব আপত্তি। হাত ফুলে ওঠে, যন্ত্রণা আরও বাড়ে। ইশারায় বলেন, ড্রিপ খুলে দে তোরা, আমাকে একটু সুস্থির হতে দে। অক্‌সিজেন সিলিণ্ডার এনে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে যাতে সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া যায়। মৈত্রেয়ী, সন্দীপ সারাক্ষণই সেবা করছে। দু-জন নার্সও রাখা হয়েছে। এক জন দিনের আর এক জন রাতের।

এইভাবে দু-হপ্তা কাটল। মাঝে মাঝে গঙ্গাধর চোখ মেলে তাকান, আবার চোখ বোঁজেন। সারাক্ষণই মৈত্রেয়ীকে আর সন্দীপকে খোঁজেন। আর যাদের কথা জানতে চান তারা সবাই উপস্থিত।

সেদিন অবস্থা একটু ভাল। চন্দ্রভানু নির্মলা, শকুন্তলা ও অলকাকে নিয়ে গঙ্গাধরকে দেখতে এলেন। চোখ মেলে চন্দ্রভানুকে দেখে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—তুমি এসেছ, আমি ত চললাম।

—না, না। আপনি আবার ভাল হয়ে উঠবেন। চন্দ্রভানু আশ্বাস দেন। হাত নেড়ে বললেন—না, যেটুকু কাজ বাকি ছিল, হয়ে গেছে। আর আমি বাঁচব না। কে জানে অন্তরের গভীরে মৃত্যুর ছায়া দেখেছেন কি না।

মৈত্রেয়ী এসে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—তোমার এখনও ত অনেক কাজ বাকি। ওরকমভাবে বলতে নেই। কি হয়েছে তোমার। তুমি ভাল হয়ে উঠবে।

চন্দ্রভানুর চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। গঙ্গাধর অলকাকে কাছে ডেকে বললেন—তুমি শুনলাম বিদেশে যাচ্ছ? যাও, পৃথিবীটা ঘুরে না দেখলে এদেশের প্রতি মমতা আসে না।

অলকা শিয়রে বসে গঙ্গাধরের হাতটা নিয়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। আপন মনে বলল—দেশ ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

গঙ্গাধর একটু হাসলেন। বললেন—তা ত হবেই। তুমি যে দেশকে ভালবাস। আমরাও সবাই ভালবাসতাম, তাই ত এত শত বাধা সত্ত্বেও কাজ করে গেছি। শুধু কাজ করলেই হয় না, ডিরেকশন চাই। সে যাক, তুমি কবে যাচ্ছ?

—আজ, রাত্তিরে। সন্দীপ কাছেই দাঁড়িয়েছিল। আড়চোখে সন্দীপকে একবার দেখে নিল অলকা।

গঙ্গাধর যেন একটু অবাকই হলেন। বললেন--রাত্তিরে। তোমার সঙ্গে তাহলে আমার আর দেখা হবে না। এই শেষ দেখা।

চন্দ্রভানু মাথা নাড়লেন। —ও কথা বলবেন না, মনে জোর করুন। অলকা ফিরে এসে আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখবে।

গঙ্গাধর শুধু একটু হাসলেন। একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার বই কতদূর লেখা হল?

অলকা একটু অস্বস্থি বোধ করতে লাগল। বলল—লেখা বন্ধ ক'রে দিয়েছি। লিখে আর কোন লাভ নেই। ভেবে দেখেছি, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

—না, না, তুমি ওটা শেষ কর। আমার সঙ্গে তোমার বিশেষ কিছু আলোচনা হয়নি। তা কিছু ভেব না। মৈত্রেয়ী সব জানে। ও সব দেখেছে। কি হতে পারত, কেন হতে পারল না, কারা বাধ সাধল। মৈত্রেয়ী সব জানে। আর ঐ যে অধর লাহিড়ী। শুনে অধর একটু এগিয়ে এলেন। ও কে জিজ্ঞেস করলে ভেতরের অনেক কথাই জানতে পারবে। যখন ধরেছ শেষ না করে ছেড়ো না। সারা জীবন সব দেখে শুনে তোমাকে একটা কথা বলে যাই। আমি বিশ্বাস করি পাবলিক সেক্‌টর হতে পারে, হবেও। নেতৃত্বের অভাব, লোভ আর রাজনীতি। এই তিন এর পরিপন্হী। এগুলোই বাধ সাধে। সত্যিকারের কর্মীর অভাব ত আছেই। রিটার্ন আসছে না বলে এরা যতই চেঁচাক, তা কিন্তু সত্যি নয়। এই অবস্থার মধ্যেই আমরা যেটুকু ওয়েলথ জেনারেট করেছি বা করছি, আমি বলব, আমরা অসাধ্য সাধন করছি। শোষণ করে শেষ নির্যাসটুকু শুষে নিয়ে ওরা সরকারের হাতে যত সব আবর্জনা তুলে দেয়। আমাদের পলিসি মেকিং নেই বলে জগদ্দল পাথরে আমরা পিষে মরি। যে ম্যানেজমেন্ট আর প্রফিটের কথা ওরা বলে সেটা লোভী ও সুবিধেবাদীদের কথা। সোশ্যাল বেনিফিটের যদি হিসেব নাও ত দেখবে ওসব কথা অর্থহীন। আর বলতে পারেন না। যন্ত্রণায় কাতরে উঠলেন। মৈত্রেয়ী রাগ করেন। বলেন—থাম ত। অনেক হয়েছে। আর একদম কথা বলবে না। ওসব তোমায় আর ভাবতে হবে না। তোমরা সব উঠে ওঘরে গিয়ে একটু বোস। ওঁকে স্যুপটা খাইয়ে আমি আসছি।

ডইংরুমে নির্মলা, শকুন্তলা, অলকা ও চন্দ্রভানুর সঙ্গে সন্দীপ কথা-বার্তা বলছিল। কিছুক্ষণ পরে মৈত্রেয়ী এসে নির্মলাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। ড্রইংরুমে রইলেন চন্দ্রভানু, অধর লাহিড়ী ও অলকা। সন্দীপ ঘন ঘন উঠে গিয়ে বাবাকে দেখে আসছে। কখনও টেম্পারেচার নিচ্ছে, কখনও মাথায়-কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

চন্দ্রভানু বললেন—সেদিন যখন এসেছিলাম, শরীর ত এতটা খারাপ দেখিনি।

অধর বললেন—শরীর বহুদিন থেকেই খারাপ। আমল দেননি। মনের জোরে চালাতেন।

অলকা বলল—উনি আপনার কথাই বলছিলেন, আজকে আমি চলে যাব, ওঁর সম্পর্কে কিছু বলুন না।

অধর বললেন—কত কথাই ত বলার আছে। কোন্ কথাটা বলব। এতকথা শোনার কি তোমার সময় হবে?

অলকা বলল—যারা কাজে বাধার সৃষ্টি করেছে, যাদের কথা গঙ্গাধর মেসো একটু আগেই বললেন, তাদের কথা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন।

অধর বললেন—বিদেশে এমন সব সোশ্যয়াল সাইনটিস্টরা আছেন, যাঁরা সোশ্যাল বেনিফিট নিয়ে রীতিমত চিন্তা করেন। এর রেজাল্ট্‌স্ তাঁরা অঙ্ক কষেও দেখাতে পারেন। এখানে ওসব নেই। ইনডাসট্রিয়াল রেজিল্যুশনে অস্পষ্টভাবে সোশ্যাল্ বেনিফিটের কথা বলা আছে। তবে কিছুই স্পষ্ট নয়। বাই ইম্প্লিকেশনে বুঝতে হবে। দাদা সেটা প্রাক্‌টিকালি করে দেখিয়েছেন। ফ্যাক্টরিতে টেকনিকাল স্কুল খুলিয়ে-ছেন। প্রথম জেনারেশনে যারা অদক্ষ কর্মী হিসেবে ফ্যাক্টরিতে ঢুকে-ছিল, তাদের ছেলেমেয়েরা এই টেকনিকাল স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়ে পরবর্তীকালে দক্ষ কারিগর হিসেবে সরাসরি ফ্যাক্টরিতে ঢুকছে। পাবলিক সেক্টর আনডারটেকিংগুলো বেশীর ভাগই অনুন্নত জায়গায় স্থাপিত হয়। এই সব জায়গায় টাউনশীপ, বাজার-হাট, রাস্তাঘাট, বাসপোযোগী কোয়ার্টার সব গড়ে উঠেছে। গোটা ফ্যাক্টরিটাই এক একটা গ্রোথ সেন্টার হয়ে গেছে। এসবের জন্যে একটা জেনারেশনের আয়, জীবনধারা সবই পালটে যাচ্ছে। এছাড়া কর্মীদের ওয়েলফেয়ারের দিকটা। প্রাইভেট সেক্টর কখনই কর্মীদের জন্য কোয়ার্টার, কমিউনিটি সেন্টার, সিনেমা হল, ক্লাব ঘর—এসব তৈরী করার কথা ভাবে না। অক্ষম, পঙ্গুদের বড় একটা অংশকে ফ্যাক্টরিতে কাজে লাগান হয়। এসব সম্ভব হয়েছে দেশে এই পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল বলেই।

চন্দ্রভানু মন দিয়ে সব শুনছিলেন। বাধা দিয়ে বললেন—গঙ্গাধরের

কর্মজীবনের কিছুটা দেখার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। গঙ্গাধরদের মত কিছু মানুষ ছিলেন বলেই ষাট ও সত্তর দশকে পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছে। তা না হলে কি হত বলা মুশকিল।

অধর সায় দিলেন। বললেন—দাদার জীবনটা রিট্রোস্পেকটিভে দেখলে মনে হয় উনি আরও অনেক বেশী কাজ করতে পারতেন যদি পলিটিকস্ না থাকত, স্বজন-পোষণ না হত, ঘন ঘন সব অন্যায়-আব্দার' মেটাতে তাঁর সময় অযথা ব্যয় না হত, রাজনীতি ও ব্যুরোক্যাসি তাঁর কাজে বাধার সৃষ্টি না করত। তাছাড়া অর্থ ও শক্তির অপচয়, প্রায়রিটি বোধের অভাব ত আছেই।

সন্দীপের এসব আলোচনা ভাল লাগছিল না। বাবার এই বাড়াবাড়ি অসুখে ও দিশেহারা হয়ে গিয়েছে। ও যে কত বিচলিত হয়ে পড়েছে তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। কখনও ড্রইংরুমে এসে বসে। দু-একটা কথা শুনতে না শুনতেই আবার উঠে যায় শকুন্তলাদের কাছে। সারাক্ষণই ওরা গঙ্গাধরকে নিয়েই আলোচনা করছিল। গঙ্গাধরের কথা ছাড়া কারুর মুখে আর কোন কথা নেই। মাঝে মধ্যে থেকে থেকে উঠে এসে একটু-আধটু অফিসের কাজকর্ম, ফাইলপত্র দেখছে। আবার উঠে ডইংরুমে যায়। ওদের গুরুগম্ভীর আলোচনায় বাধা দিয়ে বলে ফেলে, আজ ওসব আলোচনা থাক না, অন্য দিন হবে। সবাই তখন একটু চপ করে যায়। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই একই আলোচনা নিজেদের অজান্তেই শুরু করে। সন্দীপ উঠে গেল। দেখতে গেল, বাবা ঘুমুচ্ছেন, না জেগে আছেন। ক-রাত যন্ত্রণায় বাবা ঘুমোতে পারেননি। কাল রাতে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। মাঝে মাঝে জেগে উঠে একটু-আধটু কথা বলছেন। বাকী রাতটা নিঝুম হয়ে শুয়েছিলেন। ড্রইংরুমে সবায়ের জন্যে চা-বিস্কুট এল। সন্দীপ চায়ের কাপে চুমুক দিল। কোন কিছু খেতেও ওর ভাল লাগে না। আজ অলকাও চলে যাবে, মনের মধ্যে বিচ্ছেদের একটা করুণ সুর অহরহ বেজে চলেছে।

মৈত্রেয়ীও সমানে গঙ্গাধরকে দেখে আসছেন। ওষুধ খাবার সময় ওষুধ খাইয়ে এসে নির্মলা ও শকুন্তলার সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। অলকা-সন্দীপের প্রসঙ্গে কোন কথা উঠেছিল কিনা, সন্দীপ তা জানে না। তবুও এরই মধ্যে মা একবার প্রশ্ন করেছিলেন—অলকা এসময় বিদেশে যাচ্ছে কেন? দেশেই যখন এত ভাল কাজ করছে। শকুন্তলা উত্তরে মাকে কি বলেছে, আন্টিই বা ওদের দু-জনের সম্পর্কে কোন কথা মার কাছে তুলেছেন কিনা, সন্দীপ এসব কিছুই জানতে পারেনি। ড্রইংরুমে দু-চারবার গিয়েছে। কিছু শুনতে পেলেও ঠিক বুঝতে পারেনি।

মাঝখানে অলকাকে ডেকে সন্দীপ কি যেন বলল, অলকাও একবার

ঘুরে এল ভেতরের ঘরে। অলকার মনটা কিন্তু পড়ে আছে ড্রইংরুমে। গঙ্গাধর মেসোর সম্পর্কে আরও দু-চারটে কথা ওর জানা দরকার।

অলকা আবার ড্রইংরুমে এসে বসল। অধর তখনও আস্তে আস্তে গঙ্গাধরের কথাই বলছিলেন। চন্দ্রভানু মাঝে মাঝে দু-চারটে কথা জুড়ে দিচ্ছেন মাত্র। শুনে যাচ্ছেন বেশী। একটা কর্মমুখর যুগ টেলিভিশনের স্ক্রীনের মত তাঁর চোখের সামনে ভাসছে। চন্দ্রভানু অলকাদের নিয়ে যেবার ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলেন, সেকথাই তখন অধরকে শোনাচ্ছিলেন। চন্দ্রভানুদের দেখে গঙ্গাধর কি খুশী, কি খাওয়াবেন, কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। নিজে সঙ্গে নিয়ে সমস্ত ফ্যাক্টরি ঘুরিয়ে, দেখিয়ে বঝিয়ে দিয়েছিলেন। চন্দ্রভানুর দু-একটা প্রশ্নের উত্তরে কত না অভিজ্ঞতার কথাই বলেছিলেন। অলকা তখন গঙ্গাধরের সঙ্গে লেগে থাকত সব সময়। ঘরের কাজে মৈত্রেয়ীকে সাহায্য করত নির্মলা ও শকুন্তলা। আর একবার গিয়েছিলেন দুর্গাপুরে। গঙ্গাধরের সেই খুশী খুশী মুখখানা চন্দ্রভানুর চোখে ভেসে ওঠে।

অলকা বলল—আমরা যেবারে দুর্গাপরে গিয়েছিলাম, ফ্যাক্টরির প্রডাকশন তখন গঙ্গাধর মেসো কোথায় তুলে নিয়ে গেছেন। সবে ইনসেন-টিভ স্কীম চালু করেছেন। তা নিয়ে নানা বিভাগের কর্মীদের মধ্যে একটু মন কষাকষি চলছিল। মাসীমা ব্যস্ত ছিলেন টেকনিকাল স্কুল নিয়ে। পরে শুনেছিলাম ধর্মঘট হয়েছিল এবং তার মধ্যেই তিনি দুর্গাপুরের আর একটা ফ্যাক্টরির ডুয়েল চার্জ নিয়েছিলেন, সেখানেও নাকি দুর্ধর্ষ গতিতে কাজ করেছিলেন।

অধর হেসে বললেন—শুধু যে কাজ করেছিলেন তাই নয়, সেখানে রাশিয়ানদের সঙ্গে ওঁর লেগে গিয়েছিল। আসলে এমন শক্ত লোক দেশে থাকতে পারে রাশিয়ান এক্সপার্ট'রা এর আগে তা দেখেনি। সত্যি নিজে চোখে না দেখলে এসব বিশ্বাস করা যায় না। মডার্ন টেকনলজি দিতে কোন দেশই চায় না। ওরাও যে সব সময় নির্দ্বিধায় দিয়েছে তা নয়। বড় বড় সব মেসিন খারাপ হয়ে পড়ে আছে। টুক্-টাক্ করে কিছুই হয় না। অথচ রাশিয়ানরা সারায়ও না; এ নিয়েই দাদার সঙ্গে লাগল। তিনি দেখলেন, কিছুই কাজ হচ্ছে না। এরা শেখাবেও না, মেসিন সারাবেও না। জনগণের রাষ্ট্র রাশিয়াকেও দাদা স্পেয়ার করেননি। এই চার্জে তিনি বেশ কিছু রাশিয়ান এক্সপার্ট'দের মস্কোতে ফেরৎ পাঠালেন। তাও উৎপাদন বাড়ে না। যেসব মেসিন খারাপ হয়ে পড়ে আছে, সেগুলো নাকি সারাবার জন্যে মস্কোতে না পাঠালে ঠিক হবে না। এ নিয়ে ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছিল। ভারত সরকারও ওঁর ওপরে প্রেসার দিচ্ছিলেন। তিনি অত সহজে ওসব

মানার পাত্র নন। এসব দেখে রাশিয়া থেকে একজন সিনিয়র পার্টি মেম্বর এদেশে এলেন কথা বলতে। ঠিক হল, দাদা মস্কোতে গিয়ে মেসিনগুলোর বিষয়ে আলোচনা করবেন। যেদিন মস্কোতে যাবেন, সেদিন ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। অত ধকল কি সয়? বেশ মনে আছে, অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে বলে। তিনি ঐ অবস্থায় দুই ফ্যাক্টরির ইনচার্জদের প্রত্যেকের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে• তারপর হাস-পাতালে যাবার জন্যে তৈরী হলেন। কিন্তু গাড়িতে যাবেন না। অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে বললেন। বুকে ব্যথা উঠেছে, ডাক্তাররা বলছে আর দেরী করলে কিন্তু মহাবিপদ হবে। রাস্তাঘাট ভাল নয়। পাছে উঁচু-নীচু এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় বেশী ধকল না লাগে তার জন্যে কয়েক জন কর্মী মিলে একটা মার্সিডিস্‌এর ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু তিনি অ্যাম্বুলেন্স করেই হাস-পাতালে গেলেন। পরে রাশিয়ানদের সঙ্গে গণ্ডগোল যখন চরমে ওঠে এবং ফকরুদ্দিনের সঙ্গে দাদার ভুল বোঝাবুঝি হয়, দাদা চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে সোজা শান্তিনিকেতনে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বসে রইলেন। সেখানে কিচেন গার্ডেন, পলট্রি এই সব নিয়েই থাকতেন। বৌদি অবশ্য ছায়ার মত সব সময় দাদার পাশেই ছিলেন। পরে বন্ধুবান্ধবেরা ধরে বেঁধে দিল্লীতে নিয়ে এসে কনসালটেন্সির কাজে বসিয়ে দেয়। সত্যি দাদার মত এরকম এক ডায়নামিক ফোর্সকে ভারত সরকার কতটুকুই বা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। মাঝে মাঝে সেই কথা ভাবি।

অধর এবার চুপ করলেন। ভেতর থেকে গঙ্গাধরের কাতরানির একটা করুণ শব্দ আসছিল। সবাই একে একে উঠে গিয়ে গঙ্গাধরের কাছে বসলেন। চন্দ্রভানু জিজ্ঞেস করলেন—কি কষ্ট? পেটের দিকে বাঁহাতের একটা আঙুল তুলে দে লেন।

মৈত্রেয়ী ওষুধ খাইয়ে দিলেন। নার্স ড্রিপ এহাত থেকে অন্য হাতে করে দিল। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে গঙ্গাধর বললেন—এরা সবাই মিলে হাত দুটো ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলল।

সন্দীপ কখনও মাকে কখনও বা নার্সকে সাহায্য করে। কখনও বাবাকে ওষুধ খাইয়ে দেয়। কখনও গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ও যেন সবই জানে।

সেদিন রাত আটটায় গঙ্গাধরকে আর কেউ ধরে রাখতে পারল না। তিনি একবার এদিক-ওদিক চাইলেন। মৈত্রেয়ীর হাত ধরে, সন্দীপের গায়ে একটু হাত বুলিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সন্দীপ শিশুদের মত চিৎকার করে কেঁদে উঠল। মৈত্রেয়ী বজ্রাহতের মত বুকের ওপর পড়লেন। খবর শুনে অলকা ও ওদের বাড়ির সবাই ছুটে এল। অলকা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চোখে জল। ড্রইংরুমের এক কোণে

নিভৃতে বসে সন্দীপ কাঁদছিল। মাঝে মাঝে উঠে এসে সন্দীপ বাবার শান্ত-সমাহিত শীতল মুখখানা দেখছিল। অলকা তার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। অলকার আর বিদেশ যাওয়া হল না।

পরের দিন। সমানে লোকজনের আসা যাওয়া, টেলিফোন আর ফুলের স্তবক। ফুলে ফুলে ভরে গেছে গঙ্গাধরের অমর দেহ। তাঁর সুসজ্জিত অমর দেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার সব প্রস্তুতি হয়ে গেছে। মৈত্রেয়ী ব্যাকুলভাবে কেঁদে বলে উঠলেন-- ওগো, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না। আমাকে ছেড়ে তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না।

অলকা সারা বাড়িতে মৈত্রেয়ীকে ছায়ার মত অনুসরণ করতে লাগল, কখনও বা সন্দীপকে। সন্দীপকে এভাবে না আগলালে তার যে কি অবস্থা হত, তা অলকাই জানে।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

গণেশ টাওয়ার দেখতে সারা দেশে যে অভাবনীয় উদ্দীপনা তা সত্যিই বিস্ময়কর। জনগণের চাহিদা মেটাতে উত্তর রেলওয়েকে দিল্লীর জন্য অনেক স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করতে হল। বাসেও প্রচুর ভিড়। একে অন্যকে জিগ্যেস করে--কোথায় চললেন? একই উত্তর—গণেশ টাওয়ার দেখতে। এক-আধজন যারা অন্য কথা বলে তাদের সহযাত্রীরা বলে—গণেশ টাওয়ার দেখেননি? করেছেন কি মশায়? পৃথিবীর অষ্টম অত্যাশ্চর্য এই গণেশ টাওয়ার। আমি যাচ্ছি, দেখবেন ত চলুন আমার সঙ্গে। এই নিয়ে পাঁচবার। সকালে-বিকেলে পুজো দিলাম। তাও যেন মন ভরে না। দাঁড়িয়ে থাকি, তাকিয়ে থাকি, অন্তর দিয়ে প্রার্থনা করি, আর যেন মনে হয় ম্যাজিকের মত তা সঙ্গে সঙ্গে পূরণ হয়ে যাচ্ছে। সাক্ষাত জাগ্রত দেবতা মশায়। পাগলের মত সব ছুটছে। গণেশায় নমঃ, জয় গণেশ বাবা কী জয়! একজন ব্যবসার কাজে একটু ভয়ে ভয়েই চণ্ডীগড়ে যাচ্ছিল। গণেশ বাবার এই দৈব ক্ষমতার কথা শুনে সে ভাবল,

চণ্ডীগড়ে যাচ্ছি, জানি না স্টেনগানের গুলি খেয়ে কোথায় পড়ে থাকব। সহযাত্রী যখন এত করে বলছে, তখন না হয় ঘুরেই আসি। ব্যবসা যখন করছি মাথায় বিপদ নিয়ে চণ্ডীগড়ে ত ছুটতেই হবে। গণেশ বাবার পুজোটা দিয়েই যাই। বাস্তবিকই কিছু ত বলা যায় না। পথের সব সঙ্কট গণেশ বাবা মোচন করে দেবেন। এসব অনেকটা ছোঁয়াচে রোগের মতই। পুজো দেবার পরেই আত্মবিশ্বাস দ্বিগুণ বেড়ে গেল! এরপর থেকে যখনই সে চণ্ডীগড়ে যায়, আগে গণেশ বাবার পুজো চড়িয়ে, তাঁর দর্শন করে তবে ওমুখো পা বাড়ায়! পুজো-আচ্চা দিয়ে ব্যবসায় নামার অভ্যেসটা কাজে দিল। যে অর্ডারটার জন্যে তিন মাস ধরে হন্যে হয়ে চণ্ডীগড়ে ছুটোছুটি করছিল, শেষে গুলির ভয়ে ছেড়ে দেবেই ঠিক করেছিল, সে অর্ডারটা গণেশ-বাবার অশেষ কৃপায় হয়ে গেল ক-দিনের মধ্যে। সে গণেশ বাবার এক গোঁড়া ভক্ত হয়ে পড়ল। নিজের কথা শুনিয়ে ধর্মান্ধ সব ব্যবসায়ীদের দলে দলে গণেশ টাওয়ারে টেনে আনতে লাগল।

এভাবেই ভক্তের ডাকে আসে অন্য ভক্ত, ব্যবসায়ীর ডাকে ব্যবসায়ী আর বুরোক্র্যাটের ডাকে বুরোক্র্যাটরা। দিন দিন লোক-ডাকার এই চেন যেন বাড়তেই থাকল।

দু-তিন মাসের মধ্যেই অপজিশন পার্টিরা আশঙ্কিত হয়ে পড়ল। লক্ষ্য করল, গণেশ টাওয়ারের ময়দানে জনসভা না করলে জনসভায় অত লোক আর হয় না। রুলিং পার্টি এর মধ্যে যে-কটা জনসভা করেছে ওখানে তাতে আর ট্রাক ভাড়া করে লোক ডাকতে হয় না। গণেশ টাওয়ারের নামেই কাতারে কাতারে ভক্ত-অভক্তের দল, সাধারণ মানুষ, মুটে-মজুর, কৃষক-শ্রমিক, মেহনতী মানুষ, ভিখারী, সাধু-সন্ন্যাসী, গোটা ভারতবর্ষ ফেটে পড়ে।

গণেশ-শীর্ষে বসে পরাঞ্জপে যতই এসব লক্ষ্য করেন, ততই পুলকিত হয়ে পড়েন। ততই উল্লসিত হয়ে ওঠেন। বুকের মধ্যে আনন্দের ঝন-ঝনানি ওঠে। অধীর হয়ে তিনি বাইরে এসে দাঁড়ান। তাঁকে দেখে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে। শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে নমস্কার জানায়। পরাঞ্জপে রাতারাতি দেশের নেতাদের চেয়ে বেশী সম্মান কুড়োতে লাগলেন।

এদিক রুলিং পার্টির সব কাজেই আজকাল পরাঞ্জপের ডাক পড়ে। লোকেরা বলে বেড়ায় প্রধানমন্ত্রীর খাশ্ দরবারে তাঁকে আজকাল ঘন ঘন দেখা যায়। পরাঞ্জপে এখন প্রধানমন্ত্রীর চেয়েও পাওরফুল শক্তি। তাঁর পেছনে অর্থ নয়, সরকারী সামর্থ্য নয়, বিদেশী শক্তি নয়—তাঁর পেছনে আছে এখন জনগণের শক্তি। গণেশ জনগণের দেবতা, সেই গণেশ একবার যখন মুখ ফিরে তাকিয়েছেন, কোন ইলেকশনেই এখন আর রুলিং পার্টিকে কাবু করা যাচ্ছে না। আগে যেসব জায়গায় রুলিং পার্টি মার খেয়েছিল, গণেশ টাওয়ারের মডেল নিয়ে ইলেকশন লড়লে দেখা যায় জয় অবধারিত।

অচিরেই দেখা গেল, গণেশ টাওয়ার সারা দেশে এক অদৃশ্য শক্তি ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করছে। রুলিং পার্টি'র নেতারা এখন যা-কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন, তা গণেশ টাওয়ারের সেমিনার রুমে বসে। কনফারেন্স হলে সব গুরুত্বপূর্ণ মিটিং বসে। লোকেরা, পার্টি'র কর্মীরা আগের মত আর নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করে না। মারামারি কাটাকাটি করতে তারা ভুলে গেছে। গণেশায় নমঃ বলে কাজে নামলে মন্ত্রের গুণে সব অসাধ্য সাধন হয়ে যায়। এ বিশ্বাস যতই বাড়তে লাগল, রুলিং পার্টি ততই সারা দেশে গণেশের মডেল হাতে নিয়ে যেতে লাগলেন। কুমোররা মেলার জন্যে গণেশ টাওয়ার তৈরী করতে লাগল। ব্যবসাদাররা গণেশ টাওয়ারের ছবি দিয়ে ক্যালেণ্ডার ছাপায়, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সব ডায়েরী, কোম্পানীর বাজেটে, অ্যানুয়াল রিপোর্টে গণেশ টাওয়ারের ছবি ছাপতে লাগলেন। নানা রঙের সে কি বাহার!

অপজিশন পার্টি'গুলোর একত্রিত সম্মিলিত সব স্ট্রাটেজি, সব প্রচেষ্টা ভণ্ডুল হতে থাকল। এর থেকে পরিত্রাণের কোন পথ তাঁরা খুঁজে পান না। ঘন ঘন তাঁদের মিটিং বসে, বচসা হয়, স্কীম তৈরী হয়, প্ল্যান হয়। এ অবস্থায় কি করা উচিত, তা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পরস্পরের মধ্যে শুধু ঝগড়া হয়। তা নিয়ে আবার কাগজে কাগজে রিপোর্ট ছাপা হয়।

পরাঞ্জপে এখন দেশ-বিদেশ করে বেড়ান। ভারতীয় কালচার নিয়ে, গণেশ টাওয়ার নির্মাণের বিস্ময়কর কাহিনী নিয়ে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ আর হার্ভার্ডে বক্তৃতা দিয়ে আসেন। প্রশংসার পর প্রশংসা। কখনও ইটালী, কখনও আমেরিকা, কখনও লণ্ডন, কখনও ফ্রান্সের পণ্ডিত মহল পরাঞ্জপের মধ্যে অসাধারণ এক মেধা, কৃষ্টি ও সংস্কতির এক আশ্চর্য সমাবেশ দেখতে পেলেন। তাঁরা পরাঞ্জপেকে আর স্থির হয়ে বসতে দেন না।

দীর্ঘ দিনের বিদেশী পরিক্রমণ শেষ করে বড় ক্লান্ত হয়ে সেদিন তিনি গণেশ শীর্ষে বসে বিশ্রাম করছিলেন। গণেশ শীর্ষে দুটো বড় ঘর। একটিতে পরাঞ্জপের আন্তর্জাতিক অফিস। ছোটখাট একটা মিউজিয়াম। ঘর-ভরা বিশ্বজোড়া কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নানা নিদর্শন। অসংখ্য দুর্লভ আর্ট, ইতিহাস ও কালচারের বই। লাইব্রেরীতে অনুসন্ধিৎসু পাঠক, উৎসাহী স্কলার নানা রেকমেন্ডেশন নিয়ে এক এক করে আসতে লাগলেন। আম জনতার লাইব্রেরী এটা নয়। বিদগ্ধ বিদ্বজ্জনের জন্যেই এর সৃষ্টি। নানান দেশ থেকে স্কলার, শিল্পী, প্রফেসর এখানে আসেন, বসে পড়াশোনা করেন, নোট্স্ নেন। দশ-বারোজনের পড়াশোনা করার সুন্দর ব্যবস্থা। যেমন পরাঞ্জপের কর্মক্ষমতা, তেমনি তাঁর অসাধারণ আইডিয়া।

ঠিক এই সময় এক অঘটন ঘটল। অপজিশন পার্টি'দের নেতারা

পরাঞ্জপের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পরাঞ্জপে তাঁর অভ্যাসমত তাঁদের স্বাগত জানালেন। প্রথমেই তাঁরা কথা তুললেন ধর্মীয় আঞ্চলিকতাবাদ নিয়ে। গণেশ টাওয়ার ধর্মীয় আঞ্চলিকতাবাদকে উস্কানি দিচ্ছে। পরাঞ্জপে মৃদু হেসে বললেন—ভুল করবেন না আপনারা। এখানে সারা ভারতের লোক আসে গণেশ বাবাকে দেখবার জন্যে, তাঁকে পুজো দেবার জন্যে। এটা সর্বভারতীয়। এখানে আঞ্চলিকতাবাদের কোন স্থান নেই। দ্বিতীয় অভিযোগ ঃ রুলিং পার্টি গণেশের সিমবল দেখিয়ে ভোট নিচ্ছে। এ সম্বন্ধে পরাঞ্জপের বক্তব্য তাঁরা জানতে চান। হেসে পরাঞ্জপে বললেন—গণেশ জনগণের। আপনাদের ত আমি তাঁর সিমবল ব্যবহারে বাধা দিচ্ছি না। আপনারাও ব্যবহার করুন। সারা দেশ জাগুক—এটাই ত আমি চাই। এতে যদি আপনাদের দলগত স্বার্থসিদ্ধি হয় তাতে আমার কি আপত্তি থাকতে পারে। হার-জিত গণেশ বাবার হাতে। অপজিশন পার্টি অনেক বাত-বিতণ্ডা করে পরাঞ্জপেকে শাসিয়ে যায়।

সেদিন পরাঞ্জপে তাঁর বিশ্রামকক্ষে দুপুরবেলা একটু গা এলিয়ে দিয়েছিলেন। আজকাল বড় ক্লান্ত থাকেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু গড়িয়ে না নিলে আর কিছুতেই পেরে ওঠেন না। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলেন। বিশাল এক জন সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে পরাঞ্জপে তাঁর সৈন্য-বাহিনী নিয়ে চলেছেন দেশ জয় করতে। সেনাপতির সজ্জায় তিনি স্বয়ং সজ্জিত। অসংখ্য সেনা তাঁর পেছনে—হাতি, অশ্ববাহিনী। যুদ্ধের দুন্দুভি বাজছে। পেছনে চলেছে ট্যাঙ্ক। আকাশপথে নানা ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করছে মিগ-২১। পেছনে ঝাঁকে ঝাঁকে আসছে মিরাজ ২০০০। কোথায়, কোন্ দেশে এরা এসব নিয়ে যাচ্ছে, কেউ জানে না। জনতা চিৎকার করে উঠছে, পরাঞ্জপে শুধু তাদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছেন। গণেশের ছোট্ট একটা মডেল তাঁর হাতে। সেটাকে দেখিয়ে বললেন—গণেশ বাবার কি ইচ্ছে, গণেশ বাবাকেই জিজ্ঞেস করুন আপনারা। তবে একটা কথা আপনাদের বলতে পারি, সেনাপতি যখন আমি নিজে স্বয়ং, যে-দেশের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে নামি না কেন, তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধে লোকক্ষয় হবেই। তবু বিজয় আমার কপাল-লিখন। কথাটা বলেই তিনি একটু হাসলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে আকাশপথ বিশাল এক সমুদ্রে পরিণত হল। সেখান দিয়ে তীর বেগে চলতে থাকে 'বিক্রান্ত জাহাজ', তার বুক থেকে অসংখ্য জেট্ প্লেন উড়ে যেতে থাকল নানা দিকে, দেশ-দেশান্তরে। স্বপ্নের মধ্যেই পরাঞ্জপে ভাবলেন, তবে কী কোথাও যুদ্ধ বেধে গেল? যুদ্ধ যদি বাধে তবে ত শত্রুরা আগে গণেশ টাওয়ারের ওপর বোমা ফেল্‌বে। তখন গণেশ টাওয়ার ত একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তাঁর এত বড় ঐতিহাসিক লিখন এক মুহূর্তে যদি নিঃশেষ হয়ে যায়? যতই

ভাবেন ততই তিনি ঘামতে থাকেন। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন—না, না, যুদ্ধ হবে না, তোমরা সব ফিরে চলো। যুদ্ধ বন্ধ। কিন্তু একবার যুদ্ধ শুরু হলে, কেউ কী আর কথা শোনে? ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি প্রধান-মন্ত্রীর বাসভবনের দিকে যেতে থাকলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, দেশের এত বড় যে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাসভবনেও কেউ কোথাও নেই কেন? সবাই কী তাহলে যুদ্ধে চলে গেছে? গণেশ টাওয়ারে বোমা পড়ার আগে যদি যুদ্ধ থামাবার প্রয়োজন হয়, তখন যুদ্ধ বিরতির চুক্তিপত্রে সই করবে কে? তিনি প্রাণপণ চিৎকার করে প্রধানমন্ত্রীকে ডাকতে থাকলেন। মাথাটা কেমন যেন করছে। বুকে অসহ্য একটা ব্যথা। তবে কী অকালে, পুরোপুরি সম্মান পাবার আগেই হার্ট অ্যাটাকে মরে যাবেন? এরকম কিছু হবার আগেই হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তার দেখান দরকার। শহরে যত হাসপাতাল আছে, তিনি এক এক করে সব জায়গায় ছুটলেন। ডাক্তার-দের যত তিনি ডাকেন, তত তাঁরা ছুটে পালায়। প্রচুর লোকের ভিড়ও জমে যায়। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে সেনাপতির সজ্জার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাতে থাকল। হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজ। কিসের এক ভয়ানক উত্তাপ। পরাঞ্জপের ঘুম ভেঙে গেল। জেগে উঠে দেখেন, অসংখ্য লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

গণেশ টাওয়ারে বিশাল অগ্নিকাণ্ড। দমকলবাহিনী প্রাণপণে আগুন নিভাতে জল দিয়ে যাচ্ছে। অফিসের অনেকেই ছাদে উঠবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। পাশে গণেশ ও ইঁদুর মহলের বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সব কিছুই শেষ হয়ে যাবার উপক্রম। হঠাৎ পরাঞ্জপের মনে হল এ নিশ্চয়ই ঐ অপজিশনের কারসাজি। ধোঁয়া উঠছে ভীষণভাবে। গণেশ শীর্ষে দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। গণেশ টাওয়ারেই আগুনটা লেগেছে। কেউ কোথাও নেই। পরাঞ্জপে একা গণেশ টাওয়ারের শীর্ষে আবদ্ধ। ফিরে যাবার বা বাঁচার কোন পথই তিনি দেখতে পান না। তিনি দ্রুত ভেতরের চত্বরে ছুটে চললেন। দেখেন, সিঁড়ি দিয়ে লিফট দিয়ে আগুন উঠ্‌ছে। প্রাণপণে তিনি চিৎকার করে উঠলেন—বাঁচাও, বাঁচাও। কেউ কোথাও সাড়া দিল না। তিনি ঘরে এসে মরিয়া হয়ে আগুন নেভাবার আধুনিক সাজসরঞ্জামের কম্‌পিউটারাইজড্‌ সুইচটা হাতড়াতে লাগলেন। মনে পড়ে গেল, সেটা এঘরেই আছে। কিন্তু ঠিক কোনখানে কিছুতেই তা মনে করতে পারেন না। সারা ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেছে। আগুনের তাপে দিশেহারা হয়ে তিনি সেই সুইচ্‌টা খুঁজতে থাকেন। ঘরের কোথাও সে সুইচ্‌ নেই। তবে যে এক্‌স্‌পার্টরা বলেছিলেন, আগুন নেভাবার এই যে ব্যবস্থা, এটা পৃথিবীর খুব কম দেশেই আছে। এই সুইচ্‌টা টিপলেই এই বাড়ির

মধ্য থেকে একশোটা দমকল রবোটের মত ছুটবে আগুন নেভাতে। বাইরে থেকে এর ভেতরের আগুন যদি নেভান না যায়, তাহলে ভেতরের এই 'মিরাকেল সুইচ্‌টা' টিপে আপনি সোজা লিফ্‌ট দিয়ে নেমে যাবেন। এই সুইচ টেপার পরে যেন আর এক মুহর্তেও ঘরের মধ্যে থাকবেন না। গণেশ বাবার হাত-পা তখন মিরাকেল ঘটাতে থাকবে। তাহলে শুধু ত সুইচ্‌ টিপলেই হবে না। বাইরে বেরিয়ে যাবার পথ কোথায়? ঘরে যে-কটা এলার্ম ঘন্টা ছিল, সবগুলো তিনি একসঙ্গে বাজিয়ে দিলেন।

ততক্ষণে দমকলবাহিনীর লোক ও কয়েকজন পার্টির লোক আগুন মাথায় করে গণেশ টাওয়ারের ভেতরে গণেশ শীর্ষে উঠে এসেছে। বলছে, বেরিয়ে চলুন, সারা গণেশ টাওয়ারে আগুন লেগেছে, আগে আপনি নিজে বাঁচুন, তারপরে গণেশ টাওয়ারকে বাঁচাতে চেষ্টা করবেন। তিনি চিৎকার করে হাত নেড়ে বাধা দিলেন--দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমাকে নিশ্চয়ই বাঁচিও। একটু দাঁড়াও। আমি সেই মিরাকেল সুইচ্‌ খুঁজছি। বলে উন্মত্তের মত তিনি এঘর-ওঘর, লাইব্রেরীর তাক, ড্রয়ার সব তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকলেন। যারা পরাঞ্জপেকে বাঁচাতে এসেছে, তাদের আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করার উপায় নেই। দেরী হলে মৃত্যু অবধারিত।

পরাঞ্জপে চিৎকার করে উঠলেন--দাঁড়ান, পেয়েছি, পেয়েছি, সেই মিরাকেল পেয়েছি। এই সুইচ্‌ টিপে দিলাম। হ্যাঁ, সুইচ্‌ টিপে দিলাম। দেখুন, আগুনের কি হয়। চলুন, শীগ্গির বাইরে চলুন। পরাঞ্জপে চত্বরের সিঁড়ি বেয়ে আর নামতে পারলেন না। ওখান থেকে পাহাড় পড়ার শব্দ আসছে। জানলা-দরজা নেই। মহা বিপদ। নয়ত ঝাঁপিয়ে পড়া যেত। পরাঞ্জপে দেখলেন, হঠাৎ গণেশজীর শুঁড়টার মুখ খুলে গেল। সেই বিরাট জায়গা দিয়ে তাঁরা সবাই ফায়ার ব্রিগেডের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন। ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরাও এতক্ষণ গণেশ বাবার শুঁড়, গণেশ বাবার বিশাল হাতগুলোর বিশাল মুখ খোলার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল।

আগুন দশ মিনিটের মধ্যেই নিভে গেল।

চারিদিকে লোকে লোকারণ্য। গণেশ টাওয়ারের বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি দেখা গেল। পাশের গণেশ-ইঁদুর মহলের বিলডিং-এর একটা পাশ একেবারে পুড়ে গেছে।

পরাঞ্জপে বাইরে দাঁড়িয়ে। ভাবতে থাকেন, খুব বেঁচে গেছি। আর একটু হলেই গেছিলাম। গণেশ টাওয়ারে আগুন লাগায়, কার এত সাহস? আমি ওঁদের বিষ দাঁত ভাঙব।

জনতার বিশাল ঢেউ পরাঞ্জপের দিকে ক্রমশ এগিয়ে যায়। আশ্চর্য হয়ে তারা দেখে, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলা সত্ত্বেও গণেশ বাবার কিছু হয়নি। সত্যিই আশ্চর্য ব্যাপার। সবাই গণেশ বাবার জয় জয়কার

করতে লাগল। আকাশ-বাতাস তখন গণেশের কৃপা ও মাহাত্ম্যের ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। চতুর্দিকে পুলিশ, সি. আর. পি., দমকল বাহিনীর লোক। বিরাট জনসমুদ্রকে আর আটকে রাখতে পারা যাচ্ছে না। গণেশ টাওয়ারের 'মিরাক্‌ল্‌' দেখে সবাই এখন বিমোহিত। আকাশ-বাতাস সব কাঁপতে থাকে—জয় গণেশ বাবার জয়, জয় গণেশজীর জয়। গণেশায় নমঃ, নমঃ গণেশায় নমঃ।

ঃ সমাপ্ত ঃ

গণেশ টাওয়ার সমস্ত ভারতবর্ষের বর্তমান চিত্র।

[illegible] হলেন গণদেবতা। তিনি জাগলে মানুষও একদিন জাগবে।

গণেশ সিমবলের এই গূঢ় অর্থ বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে

বোঝাতে চেয়েছেন কিং-মেকারদের প্রতিনিধি পুরন্দরে পরাঞ্জপে।

সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নামে আজকাল এঁদেরই প্রভাব ও

প্রতিপত্তি। এঁরাই দেশের বৃহত্তর কল্যাণের নামে বিপুল

কর্মযজ্ঞের নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেন।

পরাঞ্জপের মহাযজ্ঞে গঙ্গাধরদের মত কর্মীরা বিপন্ন হন।

পঞ্চাশ-ষাট দশকে পাবলিক সেক্টর গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন

গঙ্গাধরের মত কিছু মানুষ। সেই গঠনের কাজে একদিকে বাধার

সৃষ্টি করেছে এঁদের নীতি ও রীতি, অন্যদিকে অযোগ্য ও

সুবিধেবাদীর দল। তবুও যাঁরা সুখ ও আয়াস বিসর্জন দিয়ে,

প্রচণ্ড বিরুদ্ধ-শক্তির সঙ্গে লড়াই ক'রে দেশ গড়ার কাজে

নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের কাজের গভীর তাৎপর্য এবং

সেইসঙ্গে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কাজ ও অকাজের যে দ্বন্দ্ব

তারই প্রামাণ্য দলিল গণেশ টাওয়ার।

ISBN 81-85169-19-5

প্রকাশক : দরবারী উদ্যোগ

গঙ্গানগর উত্তর ২৪ পরগণা

পরিবেশক : এম পি সেলস্ (প্রাঃ) লিঃ

১০৮ বিবেকানন্দ রোড

কলিকাতা ৭০০ ০০৬